উত্তর হিমালয় চরিত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩:

UTTAR HIMALAY CHARIT
Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৭

চিত্র মানচিত্র প্রচ্ছদপট
ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ
বিশ্বজিৎ সেন
"Abode of Snow"
অর্ধেন্দু দত্ত অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর :
বাণীশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীঅমরেন্দ্রজিৎ রায়

সুহৃদ্‌বরেষু—

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

বিবাগী ভ্রমর
বেলোয়ারী
জলকল্লোল
মনে রেখ
তুচ্ছ
হাস্নুবানু
দেবতাত্মা হিমালয় (১ম ও ২য়)
আগ্নেয়গিরি
বনহংসী
রাশিয়ার ডায়েরী
উত্তরকাল
আঁকাবাঁকা
মহাপ্রস্থানের পথে
নওরঙ্গী
দুই পাখি
কাচকাটা হীরে
জনম জনম হম
অগ্নিসাক্ষী
নিত্যপথের পথী
দেশ-দেশান্তর
পর্যটকের পত্র
শ্রেষ্ঠ গল্প

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

সোলেমান-শিউয়ালিক পীর-পাঞ্জাল

শিবলিঙ্গ পর্বতমালা আপন জটিল জটারাশিকে বিস্তার ক'রে রেখেছে প্রাচীন গান্ধারভূমিতে। সেই এলায়িত বিলম্বিত জটারাশির তলায়-তলায় চ'লে যাচ্ছিলুম হিমালয়ের প্রান্তসীমায়। ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্যে, ইতিহাসের আদিপর্বে এ পথের বর্ণনা সর্বত্র। গৌতম বুদ্ধের সঙ্ঘমিত্রদল এই পথ দিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির নিত্যকালের বাণী বহন ক'রে নিয়ে গেছেন মহাপ্রাচ্যের নানাপথে। কিন্তু শিবলিঙ্গের পার্বত্যগহ্বর মুখ ব্যাদান ক'রে রয়েছে সেই পুরাকালের বোবা ইতিহাসের মতো। আমি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম।

তখন হেমন্তকাল। তক্ষশীলা থেকে সিন্ধুর সীমানা অতি রোমাঞ্চকর। দূর দূরান্তরের হরিৎবর্ণ অধিত্যকার আশেপাশে দেখা যাচ্ছে ছমছমে অরণ্যছায়া, কোথাও কোথাও ঝিলমিল করছে গিরিনদী,—যার দুই পারে নেমেছে হেমন্তের রঙ্গীন পাখীরা, তাদের আশেপাশে যাযাবর বনহংসের দল। তাদেরই উপর দিয়ে আকাশপ্রান্তে চোখ তুলে দেখা যায় হিমালয়ের চীরবাসা জটাধারী সন্ন্যাসীর ললাটে যেন কনককান্ত রাজমুকুটের মতো রৌদ্রদীপ্ত তুষারচূড়া!

সেই সম্রাট-সন্ন্যাসী সমগ্র গান্ধারের উপর আপন সিংহাসন রচনা করেছে।

তক্ষশীলা থেকে উত্তরে চ'লে গেছে হাভেলিয়ানের একটি পার্বত্য সুন্দর প্রশস্ত পথ। তার বর্ণ রক্তিম। দুই দিকে প্রান্তর, মাঝে মাঝে উপত্যকার পুষ্পকাননলোক। হাভেলিয়ানের পরে আর রেলপথ নেই। সেখান থেকে মোটরপথ গেছে উত্তরে ও দক্ষিণে। এই দুঃসাধ্য পার্বত্য অঞ্চলে একদিকে শিবলিঙ্গ ও অন্যদিকে পীর পাঞ্জাল—হিমালয়ের এই দুই বিশাল বাহু যেন অনন্ত রহস্যজাল সৃষ্টি করেছে।

প্রাচীন তক্ষশীলা একটি উপনগরী। এটি অনেকটা গান্ধারের তোরণদ্বার। ত্রেতাযুগে সূর্যবংশের রাজকুমার তক্ষ এখানে রাজত্ব করতেন। পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ এইস্থলে সম্পাদিত হয়। তক্ষশীলার ঐতিহাসিক যুগ বহু উত্থান-পতনের কাহিনীতে পূর্ণ। এখানে খৃষ্টজন্মের পূর্বে শকেরা রাজত্ব করেছে। তারপর এসেছেন কণিষ্ক, এসেছে গ্রীকরা। সম্রাট আলেকজাণ্ডার এখানে অম্ভিরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এর পরে আসে বৌদ্ধযুগের পালা। স্যর জন মার্শালের

চেষ্টায় সেই বৌদ্ধযুগকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং বাঙ্গালীরা গিয়ে তাঁর সহায়ক হন্। তক্ষশীলার যাদুঘর পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এখানকার মাটির তলায় ছিল বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধমূর্তি, নানাবিধ স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, স্ফটিকসম্ভার প্রভৃতি। এখানকার বিবিধ সুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্যে নাগরাজ এলাপত্রের নামাঙ্কিত শতদল-সরোবরটি বহু পর্যটককে আকর্ষণ ক'রে আনে।

আমি যাচ্ছিলুম তক্ষশীলার পথ দিয়ে সিন্ধু পার হয়ে গান্ধারের অন্তঃপুরে। উত্তর হিমালয়ের পথ দিয়ে নামছিল তুহিন বাতাস।

শিবলিঙ্গ পর্বতমালার ইতিহাস প্রধানত ছড়িয়ে রয়েছে তিনটি রাজ্যে,—উত্তর-প্রদেশে, হিমাচলে এবং পাঞ্জাবে। কিন্তু এর বিলম্বিত জটারাশি ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—যেখানে রাওয়ালপিণ্ডি ও হাজারা জেলা মিলেছে পশ্চিম কাশ্মীরে। কিন্তু কী আশ্চর্য ভূ-প্রকৃতির দুরন্ত তাড়না। যে-বিতস্তা কাশ্মীর উপত্যকায় ছিল মন্দগতি,—যার প্রবাহ ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং তার পরে শ্রীনগর ও বরামূলা হয়ে পশ্চিমের দিকে, সে সহসা 'দোমেল' এবং 'ত্রেমেল' থেকে আপন চেহারা বদলিয়ে নিল। যে ছিল শান্ত, মৃদুবাহিনী, স্বল্পভাষিণী, পীর পাঞ্জালের সেই বিতস্তা এখানে শিবলিঙ্গের পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকে রুদ্ররূপিণী ছিন্নমস্তা হয়ে উঠল। যে ছিল শুধু "খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার", সে মুজাফ্‌ফরাবাদের দক্ষিণ পথে নেমে যেন ভীমা ভয়ঙ্করীর মতো চীৎকার করে ছুটল, "হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা, রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।"

একদিকে কাশ্মীর অন্যদিকে রাওয়ালপিণ্ডি-হাজারা—এই দুই ভূ-ভাগের মাঝখানে শিবলিঙ্গ পর্বতমালাকে বিদারণ ক'রে বিতস্তা, যার প্রাচীন নাম 'বেদস্তা'—সে চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই পুণ্যময়ী বেদস্তা যখন প্রথম পশ্চিম পাঞ্জাবে অবতরণ করে, তখন তার তীরে একটি মন্দিরপ্রধান নগর গড়ে ওঠে। এই নগরের নাম 'ঝিলম।' এই নগরের নদীতটবর্তী স্নানের ঘাট, শঙ্খ-ঘণ্টামুখরিত অগণ্য শিব ও শক্তি মন্দির, সাধু সন্ন্যাসীর ধুনি, পূজাপার্বণ ব্রতকথার ছোটখাটো জনতা, স্নানার্থীদের মন্ত্রতন্ত্র, পূজাপাঠ, প্রদীপ ভাসানো,—এগুলি সমস্তই স্মরণ করিয়ে দিত গঙ্গার পশ্চিম-কূলবর্তী বারাণসী, শিপ্রা তীরবর্তী উজ্জয়িনী, অথবা গোদাবরী তীরবর্তী নাসিক নগরীর কথা। ঝিলমের উত্তরপারে কাশ্মীরের মীরপুর এলাকা।

পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরের মতো পিণ্ডিও দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পুরনো শহর, অন্যটি ছাউনী। ছাউনী শহর সুন্দর ও মসৃণ এবং প্রশস্ত, চারিদিক বন-বাগান এবং অট্টালিকায় সুশ্রী। যেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, তেমনি সমৃদ্ধ। অমৃতশহর, লাহোর বা

পেশাওয়ারের মতো এখানকারও বাঙ্গালীপাড়া 'বাবুমহাল্লা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বাবু মানে বাঙ্গালী এবং চাকরিজীবী,—অন্য পরিচয় নেই। উনিশ শতাব্দীর আগা-গোড়া বাঙ্গালী লেখাপড়া শেখে সবচেয়ে বেশি এবং ইংরেজীজানা কেরানী বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশি সংখ্যক পাওয়া যেত। সেই কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ইংরেজের সঙ্গে চলে গিয়েছে দূর দূরান্তে। তাদেরই সঙ্গে গিয়েছে ডাক্তার, অধ্যাপক, উকীল, পোষ্টমাস্টার এবং মিলিটারী হিসাব-দপ্তরের 'বাবু।' শুধু পিণ্ডি বা পেশাওয়ার নয়—কোহাট, বান্নু, মীরম শা, রজমক, ডেরা গাজি খান, হিন্দুবাগ, কোয়েটা, এমন কি সুদূর বেলুচিস্তানের কুন্দি ও জাহিদান পর্যন্ত। এর মধ্যে কোয়েটা কতকটা নিষিদ্ধ এলাকা হলেও বাঙ্গালীর প্রভাব সেখানে কম ছিল না। এসব অঞ্চলে পৌঁছবার জন্য আমারই মতো সকলকে পেরিয়ে যেতে হত পঞ্চনদের এক একটি 'দোয়াব' (দো-অব) বা দুই নদীর অন্তর্বর্তী এক একটি সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাঞ্চল, লবণ পর্বত, সোলেমান গিরিশ্রেণী, এমন কি উপজাতি অঞ্চলও ছাড়িয়ে আফগান-বালুচ সীমানায়। ইংরেজের প্রত্যেক ছাউনী নগর রচনায় কাজে বাঙ্গালীরা মস্তিষ্ক ব্যায়াম করেছে প্রচুর।

কিন্তু এসব পাণ্ডব-বর্জিত অঞ্চলে গিয়ে বাঙ্গালী শুধু 'পেরিমিটার'-এর বেড়ার মধ্যে বসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকেনি। প্রায় সর্বত্রই সে তার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করেছে। আঞ্চলিক ভাষা ও 'বোলি'তে কথা বলেছে, পাঠান বা পাখ্‌তুনদের নিয়ে আসর ফেঁদেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে, ক্লাব এসোসিয়েশন গড়েছে, এবং চারিদিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও সহায়তা করেছে। একথা বোধহয় লোকে ভুলতে বসেছে, পেশাওয়ার থেকে খাইবার গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে যে-পঁয়ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথটি অগণিত সংখ্যক সুড়ঙ্গ এবং লুপ অতিক্রম করে লাণ্ডিখানায় আফগান সীমান্তে পৌঁছেছে, সেটি বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারদেরই কীর্তি। এ সব অঞ্চল পাখতুনি-স্তানের অন্তর্গত—এবং এদেরই মর্মে মর্মে প্রবেশ করেছে শিবলিঙ্গের শাখা ও প্রশাখা। এখানকার পার্বত্যলোক নীরস ধূসর ও রুক্ষ—যেন মৃত এক সন্ন্যাসীর হাড়ের মালা সর্বত্র ছড়ানো।

ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটিগুলির মধ্যে পিণ্ডির ঘাঁটিই ছিল সর্বপ্রধান। এখানকার সুবৃহৎ ছাউনীতে এককালে ৫০ হাজার খাস বৃটিশ সৈন্যকে নিত্য উৎকর্ণ করে রাখা হত। পাঠান, পাখতুন, বালুচ এবং 'ইপির' ফকিরের দলকে ইংরেজ বিশ্বাস করত না। এখান থেকেই চোখ যেত বহু দূরে—আফগানিস্তান, ইরান, উত্তর কাশ্মীর, মধ্য এশিয়া তথা সোভিয়েট ইউনিয়ন ইত্যাদি অঞ্চলে। চীনকে নিয়ে তখন অতটা মাথাব্যথা ছিল না।

কোয়েটা শহর ছিল প্রায় সম্পূর্ণ ই সামরিক। এটিও পার্বত্য ভূ-ভাগ। ওয়েস্টার্ন কমাণ্ডের এইটি ছিল হেড কোয়ার্টার, এবং এখানকার চতুর্দিকব্যাপী রুক্ষ গিরিশ্রেণী 'তোবা কাকার' ও দক্ষিণের 'বারাহু' গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নি পরিবেশন করত। মূল কোয়েটা হল উপত্যকাময় এবং অনেকটা মৃৎপ্রকৃতি। কোয়েটার পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর—অন্তহীন মরুপাথর এবং ঊষর গিরিশ্রেণীর দ্বারা সমাকীর্ণ। আফগানিস্তানের মরুভূমির যে প্রবল ভয়াল কৃষ্ণকায় এবং দানবাকার আঁধি বা বালুর ঝাপটা পূর্বভূ-ভাগকে আক্রমণ করে, তার থেকে কোথাও আত্মরক্ষার পথ নেই। এই ঝাপটা আসে সোলেমানের উপর দিয়ে অবারিত পূর্বপথে। শিকারপুর, জেকবাবাদ, খয়েরপুর, বাহাওয়ালপুর হয়ে রাজস্থানের দিকে সেই ঝাপটা ছোটে। বেলুচিস্তান বা আফগানিস্তানের এই রুক্ষ মরু প্রান্তরে সর্বনাশা পঙ্গপালের জন্ম ঘটে লোকলোচনের অন্তরালে। শুধু গ্রীষ্মকাল নয়, প্রচণ্ড শীতের মধ্যাহ্নকালও প্রখর উত্তাপে জ্বলতে থাকে। প্রভাতকালে যেখানে জলের পাত্রে বরফ জমে যায়, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে সেখানে মুখের উপর ফোস্কা পড়ে। বাতাসে বিন্দুমাত্র জলকণা অথবা ভিজাভাব নেই, সেই কারণে মেয়ে অথবা পুরুষ সর্বদেহ এবং মুখমণ্ডল মোটা কাপড়ে ঢেকে রাখে। পার্বত্য কোয়েটার অনেকটা অংশ ছিল ইংরেজ সামরিক উপনিবেশ। কিন্তু এখানকার হাটে-বাজারে যাদের দেখতে পাওয়া যেত, তাদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান বা হিন্দুর সংখ্যা ছিল অল্পই। শিখ পুলিসদের দেখা যেত মিলিটারী ধরনের পোশাক পরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতুম, এই সব অঞ্চলে বন্দুক সঙ্গে নিয়ে সাধারণ লোক চলাফেরা করে। এরা পাখতুন কিংবা বালুচ। সেই কারণে সাধারণ সামাজিক বিতর্কও মধ্যে মাঝে সশস্ত্র লড়াইয়ের চেহারা নিত। সিন্ধু রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিমে যারা মরুভূমির বিভিন্ন 'ওয়েসিস্' জনপদে বাস করে তারা মূলত আরবীয় এবং হুন বংশীয়। শুনেছি পাঞ্জাবের শিখদেরও একটা অংশ হুনীয়। এই বিশাল মরুলোকে রেলপথ সামান্য. মেন লাইন এসেছে মাত্র তিনটি। একটি গেছে কোয়েটা হয়ে জাহিদান, একটি রাজস্থান থেকে হায়দারাবাদ ও করাচি, তৃতীয়টি পেশাওয়ার রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দক্ষিণ পথে মুজাফ্‌ফরগড় ও মূলতান হয়ে সুদূর করাচির দিকে। এই পথেই 'হরপ্পা' 'মাহেঞ্জোদারো' পাওয়া যায়। এখানকার মরুলোকের ভিতর দিয়ে সুক্কুর বারেজের দ্বারা মহাসিন্ধুনদের (ইন্দুস বা ইন্দাস) জলরাশি হায়দারাবাদ পেরিয়ে সিন্ধুভূমিকে ব-দ্বীপে পরিণত করেছে। সিন্ধুভূমির উর্বরতা প্রসিদ্ধ। এখানকার চাউল, অন্যান্য ফসল, এবং লবণ—দেশপ্রসিদ্ধ। বেলুচিস্তান, সিন্ধুর উত্তর পথ, পূর্ব আফগানিস্তান, পশ্চিম রাজস্থান—এই ভূ-ভাগের উপর দিয়ে উটের ক্যারাভান চলেছে চিরকাল—জলবিক্রি যাদের ছিল অন্যতম পেশা। এদের সঙ্গে উপমহাদেশের সামাজিক যোগ

ছিল কম, এবং কেউ কারও খবর রাখেনি। এরা চিরকাল স্বচ্ছন্দচারী। যে-ভারতের সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয় সেই ভারতকে সোলেমানের আশেপাশে খুঁজে পেতুম না। এই মরুলোকের ভিতরে ভিতরে বেদুইন দলের মতো দৈত্যকায়, ভিন্নভাষী, ভিন্নদেশী যে দলগুলি আনাগোনা করে তারা উপমহাদেশের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

১৯৩৫ সালের প্রবল ভূমিকম্পে কোয়েটার বৃহৎ অংশ ধূলিসাৎ হয় এবং প্রায় ৫ হাজার নরনারী মারা পড়ে। এই ভূমিকম্পের ফলাফল কী প্রকার বীভৎস চেহারা নিয়েছিল, আমার সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা অন্যত্র করেছি। 'শিবি' থেকে 'বোলন্' গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে রেলপথ চলে গেছে মাছ, স্পেজন্দ এবং শরিয়ব নদীর ধার দিয়ে কোয়েটা। এই রেলপথই আবার কোয়েটা থেকে উত্তর-পশ্চিম পার্বত্যপথে বোস্তান ও গুলিস্তান হয়ে আফগান-সীমানা নগরী 'চমন' অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে। এরই পাশে পাশে মোটর পথ আফগানিস্তানে গিয়ে ঢুকেছে।

অনেকে মনে করেন শিবলিঙ্গের শাখা হল সোলেমান গিরিশ্রেণী। হিমালয়ের মাথার জটা যেমন পূর্বলোকে দক্ষিণ আসাম ছাড়িয়ে ব্রহ্মদেশে নেমে গেছে, পশ্চিম হিমালয়ের জটা ঝুলেছে তেমনি সোলেমান পেরিয়ে কার্থার মাক্রান্ গিরিশ্রেণীর সংযোগস্থল করাচির সাগরসীমানায়। আমার সঠিক জানা নেই, বোধহয় গান্ধারকে নিয়ে সুপ্রাচীন 'ইন্দাস' বা 'ইন্দুস-স্তানে'র মোটামুটি এইটিই একটা কাঠামো ছিল।

দক্ষিণ ভূ-ভাগ ছেড়ে উত্তর হিমালয়ের দিকে পাড়ি দেবার কালে এটি আমার জানা ছিল, প্রাচীন গান্ধার অতিক্রম করে যাচ্ছিলুম। যাচ্ছিলুম পশ্চিমোত্তর কাশ্মীরের দিকে। তক্ষশীলা ছাড়িয়ে গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোড আটক পুল অতিক্রম করে পেশাওয়ার ও আফগান দেশে পৌঁছেছে। কিন্তু এই পথেরই মাঝখানে নওশেরা হয়ে একটি সুন্দর শাখা-পথ সোজা চলে গেছে উত্তরে মর্দান ছাড়িয়ে মালাকান্দ থেকে সৈদু পর্যন্ত। মালাকান্দ থেকে অপর একটি প্রশস্ত মসৃণ পথ অরণ্যকান্তার ও পার্বত্য উপত্যকার ভিতর দিয়ে আরও উত্তরে গিয়ে চিত্রল রাজ্যে পৌঁছেছে। এখানে তিনটি প্রধান নদী নেমে এসেছে হিন্দুকুশের ক্রোড়পর্বত হিন্দুরাজ গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে। একটির নাম সোয়াৎ বা 'শ্বেত', একটির নাম 'ইয়ারখুন', এবং তৃতীয়টি হল 'কুনার'—যেটি চিত্রলের ভিতর দিয়ে আফগান নগরী জেলালাবাদে এসে কাবুল নদীতে মিলেছে। আটকের কাছে এসে পড়েছে কাবুল নদী ও মহাসিন্ধুনদ বা ইন্দাস। 'চিত্রল' চিরকাল কাশ্মীরের ছত্রচ্ছায়াচ্ছাদিত।

সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্বে ইংরেজ পরম যত্নে নতুন করে সৃষ্টি করেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভূমি। উপমহাদেশের অপর কোনও অঞ্চলে সাম্রাজ্য-নিরাপত্তার এমন নিখুঁত

ব্যবস্থাপনা আর নেই। ফলে, শত শত মাইলব্যাপী উপত্যকালোক উন্নত অবস্থা ও নবগঠনের ফলে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্বপ্নলোকে পরিণত হয়েছে। এমন স্বাস্থ্যকর ও সুপরিচ্ছন্ন উপত্যকাপথ ভূ-ভারতে নেই। অন্যদিকে ইংরেজ শাসকরা প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রকে কখনও বিশ্বাস করেনি, এবং মোগলদের হাত থেকে শাসন ভার কেড়ে নেবার পর থেকে মুসলীম রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে তাদের ভয় ও সংশয় ছিল। এর ফলে সামরিক প্রস্তুতির দিক থেকে তাদের হাতে রাওয়ালপিণ্ডির নর্দান কমাণ্ড ও কোয়েটার ওয়েস্টার্ন কমাণ্ড ছিল খুব কাছাকাছি। এই নর্দান কমাণ্ডের অধীনে আউটপোষ্ট, ফরোয়ার্ড পোষ্ট বা ফ্রন্টিয়ার গার্ডের সংখ্যাও কম নয়। সেগুলি হিন্দুকুশ ও হিন্দুরাজ গিরিশ্রেণীর ভিতরে ভিতরে নিত্যপ্রহরায় নিযুক্ত। এগুলি এমন নিরাপদ এবং আঞ্চলিক সুকৌশল ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে, যে কোনও কালে এবং যে কোনও অবস্থায় কাজে লাগে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—যেমন লাণ্ডিকোটাল, মালাকান্দ, দীর, চিত্রল বা মাস্তজ, রাওয়ালপিণ্ডির দক্ষিণে বা উত্তরে—যেমন চাকলালা, কোমারী, অথবা অ্যাটক, হাভেলিয়ান, আব্বটাবাদ ইত্যাদি, সর্বত্র ওই একই ঘাঁটি। উত্তরে চিত্রল ও দক্ষিণে বেলুচিস্তান—এই দুইয়ের মাঝখানে এক হাজার মাইল ভূভাগ লোহার শৃঙ্খলে ও বারুদের স্তূপে ইংরেজ সুরক্ষিত রেখে গেছে। উত্তর কাশ্মীরকে পাহারা দেবার প্রধান ঘাঁটি ছিল গিল্‌গিট এজেন্সি। হিন্দুরাজ গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে চিত্রল ও মাস্তজ ছাড়িয়ে একটি পার্বত্য নদীর পারে-পারে গিল্‌গিট পৌঁছবার পথ ছিল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। হিন্দুরাজ ও কৃষ্ণগিরিশ্রেণী (কারাকোরম)—দুইদিকের দুই পর্বতমালা ও হিমবাহ থেকে অগণ্য গিরিনদী এসে মিলেছে গিল্‌গিট অঞ্চলে। সে যাই হোক, ইংরেজ সর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন ও উৎকর্ণ ছিল যাদের সম্বন্ধে তারা কেউ ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করেনি। কিন্তু বৃটিশ ভারত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল সেদিন চীন সম্বন্ধে! 'অহিফেন সেবী' চীনের দুর্বল মেরুদণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজের মনে যেমন সেদিন কোনও সংশয় ছিল না, তেমনি আমার মতো লক্ষ লক্ষ অর্বাচীন ভারতবাসী 'চণ্ডুখোর' চীনের কারুশিল্পকলা ও 'কৃষ্টি'র বাহবায় সেদিন মুখর হয়ে থাকত। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

কলকাতার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাঙ্গলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব ছাড়িয়ে বরাবর চলে গেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে। আবার সেই পথ হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চলে গেছে 'তারমেজ'। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্ভবত এই পথে আমুদরিয়া অতিক্রম করে সোভিয়েট 'তারমেজে' পৌঁছে ছিলেন। উজবেক সেনানায়ক এবং পরবর্তীকালের সম্রাট বাবর সম্ভবত তারমেজ থেকেই দক্ষিণে মাজার-ই-শরিফে এসে

পৌঁছন। অশোক, কণিষ্ক, ললিতাদিত্যের আমলে বৌদ্ধভিক্ষুরা তারমেজের পথটি ব্যবহার করতেন। এই সুদূর প্রসারিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই পাশে বিগত পাঁচ শ' বছরের ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজের অগণিত সংখ্যক স্থাপত্য ও ইতিবৃত্ত বিজড়িত। বলা বাহুল্য, আফগানিস্তানের একটা বড় অংশ এককালে ভারতের অঙ্গীভূত ছিল।

এপারে পশ্চিম পাঞ্জাব, ওপারে পশ্চিম কাশ্মীর—মাঝখানে ঝিলম বা বিতস্তা। ঝিলম পারাপার হবার জন্য পিণ্ডিজেলায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ফেরিঘাটের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাদের মধ্যে কাটিয়ালি, মীরপুর, দাঙ্গালি, সালগ্রাম, লছমন, চিরালা দেবল, কোহালা, রারু প্রভৃতি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কাশ্মীর যাবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিকটবর্তী পথ,—পিণ্ডি, সানি ব্যাঙ্ক, কোহলা। এটির নাম ঝিলমভ্যালী রোড। দ্বিতীয়টি রেলপথ—তক্ষশীলা থেকে হরিপুর ও হাভেলিয়ান। হাভেলিয়ান থেকে মোটর পথে আব্বটাবাদ, তারপর মানসেরা ছাড়িয়ে পার্বত্য নদী অতিক্রম করে কাশ্মীর। এগুলি সবই পল্টননগরী বা ছাউনী শহর। যাই হোক, এই অঞ্চলে এসে মিলেছে তিনটি প্রধান নদীপ্রবাহ,—কঙ্কাতরী বা প্রাচীন সরস্বতী, কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা। এই এলাকার নামকরণ হয়েছে ত্রেমেল, দোলাই ও দোমেল। এটি কাশ্মীরের মধ্যে। তৃতীয় পথটির কথা আগে বলেছি—মর্দান, মালাকান্দ, চিত্রল ও মাস্তজ। চতুর্থ পথটি হল শিয়ালকোট থেকে সুচেতগড় ছাড়িয়ে জম্মু। ইদানীং অপর একটি পথ খোলা হয়েছে পাঠানকোট থেকে জম্মু ও 'বানিহাল' বা 'বান্-হাল্' গিরিছিদ্রপথে। এই পথটি যারা দেখেছে তারা জানে নীচের দিকে নবনির্মিত ছিদ্রপথটি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়! এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নেহরু-টানেল।' কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের শাসনকালে এই টানেলটি নির্মিত হয়। কিছু দিন আগে আপার মুণ্ডার পুরনো সুড়ঙ্গ পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলা প্রাচুর্য এবং সম্পদের দেশ। জল, বায়ু এবং স্বাস্থ্য মনোরম। উত্তরে অরণ্যসম্পদ, দুই দিকের প্রান্তর শস্যসম্পদে পূর্ণ, কিন্তু দক্ষিণে এর বিপরীত। বৃহৎ সিন্ধুনদকে নিয়ে যে পশ্চিম পাঞ্জাব মোট ছয়টি নদ ও নদীর দ্বারা বিধৌত,—তার নানা অঙ্গ মরুপর্বতে পরিপূর্ণ। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব দিক বৃহৎ পর্বতশ্রেণীর কাঠামোর দ্বারা বেষ্টিত থাকার জন্য এটি সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট নিরাপদ। এর বিভিন্ন উপত্যকার বিমান ঘাঁটিগুলি জনচক্ষুর অন্তরালে রাখার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার দক্ষিণে এবং ঝিলম নগরীর পশ্চিম পথে অগ্রসর হলে পাওয়া যায় 'লবণ পর্বত।' এই লবণ পর্বত হল সিন্ধুসাগর 'দোয়াবের'

অন্তর্গত,—যেটি থল মরুভূমিকে ধারণ করে রয়েছে। পশ্চিম পাঞ্জাবকে রক্ষা করছে ছয়টি নদ ও নদী।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে উত্তরপথে একালে নগর সম্প্রসারিত হয়েছে। এপথটি সানিব্যাঙ্ক হয়ে কোহালার দিকে যাবে। এই পরম রমণীয় পথটি ধরে বহুকাল অবধি লোকে কাশ্মীর গিয়েছে। শেগুন, শিশম, ওক এবং চিড় পাইনে ভরা এই পথ। এককালে মোগল সম্রাটগণ ঠিক কোন্ পথ দিয়ে কাশ্মীর যেতেন সেটি খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই পথটি নির্মিত হয় উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে তদানীন্তন কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে। তারপর থেকেই অল্প-স্বল্প টুরিস্ট-ট্রাফিকের সূচনা হয়। এই পথ দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীরে যান। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর মোট দু'শ মাইল।

প্রথম মাইল কয়েক অনেকটা সমতল, এর পর অধিত্যকাপথ ধরে গেলে মাঝে মাঝে ছোটখাটো জনপদ পাওয়া যায়। দু-চারটি দোকান বসে গেলেই একটি ক্ষুদ্র জনপদ। নিরিবিলি অঞ্চলে শিখদের গুরদোয়ারা বা শিবমন্দির মাঝে মাঝে যেন গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যে অঞ্চল প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম, সেখানে মন্দির বা গুরুদ্বার—একটা না একটা আছেই। কিন্তু জনবহুল জনপদ ছাড়া মসজিদ চট করে চোখে পড়ে না। আমরা শিবলিঙ্গ গিরিশ্রেণীর অরণ্য-শোভার পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত ধূসরবর্ণ পীর পাঞ্চালের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এককালে রাওয়ালপিণ্ডির অর্থনীতি প্রধানত পাঞ্জাবী শিখ ও হিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মুসলমান সমাজ সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী জমিদার বা জাইগিরদার অথবা বড় রকমের ব্যবসায়ী—যাদের বিলাস-বৈভবের সীমা ছিল না। অন্য শ্রেণী ছিল শ্রমিক সাধারণ। তারা ছিল চাষী, মজুর, ফিরিওলা, দোকানদার, রুটিওলা, টাঙ্গাওয়ালা, মিস্ত্রি বা কারিগর। মুসলমান সমাজে তখনও ঠিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। অপরপক্ষে হিন্দু বা শিখরা ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের ভিতর থেকেই উঠত সামাজিক বা রাজনীতিক নেতৃত্ব। তাদের মুখ দিয়েই জনসাধারণের মনের কথা শোনা যেত। শিখ সমাজেরও হাতে ছিল জমি ও লাঙ্গল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বহু ভূ-সম্পত্তি। সে-পক্ষে হিন্দু সমাজের বসবাস ছিল প্রধানত শহরগুলিতে। চাষবাস ছিল তাদের সামান্য। তারা সরকারী বা বে-সরকারী চাকরি-বাকরি নিয়ে থাকত। প্রশাসনের দায়িত্ব থাকত তাদের হাতে। সৈন্যদলের দায়িত্বপূর্ণ পদে শিখ বা হিন্দুই বেশির ভাগ বহাল থাকত। আফগান যুদ্ধের পর থেকে আফগানরাজ আমানুল্লার গদিচ্যুতি অবধি, অর্থাৎ ১৮৮০ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ইংরেজ কোনও মুসলমানকে বড় রকমের সেনাধ্যক্ষ হতে দেয়নি। এটি মুসলমান সমাজের

পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। আমাদের গাড়ি কয়েকটি পল্টন-ব্যারাক ছাড়িয়ে অপরাহ্ণ-কালে 'সানি-ব্যাঙ্ক' বাজারেরর কাছে এসে থামল।

মস্ত বাজার। কাশ্মীরের আভাস পাওয়া যায় এখানে ফলের বাজারের দিকে তাকালে। সর্বাপেক্ষা দরিদ্র চাঁদিটুপিপরা আফ্রিদি কিংবা হাজারার বস্ত্র পাঠান শ্রমিক—তারা আপেল, আঙুর, বাগুগোসা, আনার প্রভৃতি চিবোয় প্রায় সারাদিন। ঝাড়ুদার মেয়ে তার কামিজ আর উড়ানির কোঁচড়ে ষ্ট্রবেরীর রাশি নিয়ে পথের ধারেই বসে গেছে। মুসলমানের কাফিখানায় 'দুম্বা' ভেড়ার সিদ্ধ মাংস আর মসলাদার শিক-কাবাব থরে-থরে সাজানো। খরিদ্দাররা বসে গেছে গরম-গরম ঘৃতপক্ব মুর্গি-বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে। দরিদ্র আফ্রিদি শ্রমিকরা জুলজুল ক'রে সেইদিকে ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে কাঁধের দড়িগুলি ঝুলিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। এই দড়ির ফিতা কপালে লট্‌কিয়ে হেঁট হয়ে তারা তিন-চার মণ বোঝা নিয়ে পাহাড়ে ওঠে। সেই বলিষ্ঠতা শীর্ণ-শ্রী বাঙালীর কল্পনায় আসে না!

সানি ব্যাঙ্ক থেকে 'মারী' প্রায় মাইল পাঁচেক। এর উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। পীর পাঞ্জালের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা নীলকান্ত আকাশের নীচে যেন সুবৃহৎ প্রাকারের মতো এই ছোট সুন্দর শহরকে আবেষ্টন করে রয়েছে। উত্তরে 'ছাঙ্গলা-গল্লি'র শীর্ষদেশ পাইন-অরণ্যে আচ্ছন্ন। উচ্চতায় প্রায় নয় হাজার ফুট। দূরে নাঙ্গার চূড়ালোক, অন্যদিকে হরমুখ—বিশ্বলোক যেন চারিদিকে আদি অন্তহীন। পর্বত প্রাকারের মাঝখানে ঘন দেওদার বন তপস্যার আসনে দাঁড়িয়ে যেন যোগতন্দ্রায় নিমীলিত। দেবালয়ের ঘণ্টা শুনেছি দূর থেকে। শিখদের গুরদোয়ারে সন্ধ্যারতির আয়োজন চলছিল। মারী শহরকে সাধারণ লোক বলে, 'কো-মারী'। মহাভারতের আমলে পঞ্চপাণ্ডব নাকি এই পাহাড় কবে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁদের নামে এখানে একটি পথ নামাঙ্কিত রয়েছে। পথের উত্তরপ্রান্তের নাম কাশ্মীর পয়েণ্ট্—দক্ষিণের অংশটিকে বলা হয় পিণ্ডি পয়েণ্ট্।

যে-পথটি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেটি ম্যাল্। এ শহর ইংরেজের সামরিক বিভাগ থেকে তৈরি, এবং এখানকার সামরিক বিভাগের দপ্তর মস্ত বড়। প্রতি শীতকালে এই দপ্তর নেমে যায় রাওয়ালপিণ্ডিতে। বড় একটি মদের ভাঁটিখানা এখানে আছে, তার নাম 'মারীব্রুয়েরী।' সামরিক অফিসারদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য আছে 'সেণ্ট লরেন্স' স্কুল ও কলেজ। পাওয়ারহাউস আছে একটি। প্রত্যেক পার্বত্য শহরে যেমন—এখানেও তেমনি বৃহৎ একটি গির্জা। মারীপাহাড়ে নিজস্ব জলাধার না থাকায় কোহালা থেকে পাম্প ক'রে জল এনে রিজার্ভয়েরে রাখা হয়।

কো-মারী সম্বন্ধে 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করা আছে। রাওয়াল-পিণ্ডি ও কো-মারীতে আমি বহুদিন কাটিয়েছি। এটি আমার কর্মকেন্দ্র ছিল।

কার্টরোড ধ'রে অগ্রসর হলে কম বেশি ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব পথে উৎরাইয়ে নামলে ছোট কাষ্ঠশহর 'কোহালা।' বাঁ দিকে উত্তুঙ্গ শীর্ষ ছাঙ্গলা-গল্লির বিরাট প্রাকার। সূর্যালোক অতি প্রখর এই অধিত্যকায় কিন্তু অরণ্যে কান্তারে বনশোভায় এবং রক্তবরণ গিরিখাদগুলিতে বসন্ত-বাহার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো! পুষ্প-সম্ভারে অবনম্রা যেন বনলক্ষ্মী। বিচিত্রবর্ণা পাখিদলের সঙ্গে রঙ্গীন পতঙ্গ-প্রজাপতিরা পাইনের কাঁচা-কাঠের বন্য-মধুর গন্ধে আবেশ-বিভোর হয়ে ঘুরছে নানাস্থানে। সেই গৈরিক-বিহ্বল-মদিরতা যেন ছায়া ফেলেছে শ্রমিক কাশ্মীরী মেয়ের চোখে-চোখে। রক্তিম-গৈরিক বর্ণা বিতস্তা এখানে যেমন মুখরা, তেমনি প্রখরা। অদূরে কাশ্মীর মহারাজার দ্বারা নির্মিত সাঁকো। ওপারে পীর পাঞ্জাল গিরিমালা নিত্যকালের প্রহরীর মতো কাশ্মীরের রাজনীতিক সীমানা নির্দেশ করার জন্য সারি সারি দৈত্যদানবের মতো দণ্ডায়মান। রাওয়ালপিণ্ডি জেলা এখানে শেষ হয়েছে। দক্ষিণে মীরপুরের পশ্চিম দক্ষিণ এলাকা অবধি বিতস্তার ধারা সম্পূর্ণ কাশ্মীর রাজ্যের অধীনে।

কোহালায় জনসমাগম প্রচুর। ইদানীং বাজার বড়। কাঠের কাজ প্রায় সর্বত্র। শীতকালে এখানে বসবাস করার বহু আরামদায়ক ব্যবস্থা আছে। সমুদ্র সমতা থেকে এ অঞ্চল দু'হাজার ফুটও উচ্চ নয়। এখানে পূর্ণিমা রাত্রে আনন্দ উৎসব করার জন্য বহু লোকই আসে। সেই আমোদ-আহ্লাদ মাঝে মাঝে কিরূপ রঙ্গরসাবিষ্ট হয়ে ওঠে—সে আলোচনা অন্যত্র করেছি।

কোহালার পুল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুল পার হওয়ামাত্র কাশ্মীরে প্রবেশলাভ ঘটে। কিন্তু এটি যাত্রীদের মালপত্র খানাতল্লাসীর প্রধান ঘাঁটি। নাম ও পরিচয় লিখিয়ে দেওয়া চাই। কেন কাশ্মীর যাচ্ছ, কবে ফিরবে, কোথায়-কোথায় যেতে চাও, রাজনীতিক ছোঁয়াচ আছে কিনা, কী করা হয়—ইত্যাদি সকল প্রশ্নের জবাব চাই। এ রীতি ইংরেজ আমলের। ইংরেজ রেসিডেন্ট কাশ্মীরে কখনও রাজনীতি ঢুকতে দেয়নি। কৃষ্ণগঙ্গার উত্তর পারে কেউ যায়, জোযিলা গিরিসঙ্কট কেউ অতিক্রম করে, সিন্ধুনদ বা 'ইন্দাস্' কেউ পার হয়—এটি ইংরেজ আমলে অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণে বৃহত্তর উত্তর কাশ্মীর বাদ দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কাশ্মীরে একটা বিশেষ অংশের সঙ্গেই সাধারণ লোকের পরিচয়। ইদানীং সেটুকুও কমে এসেছে। জম্মু অংশের সমস্তটায় পর্যটকরা আগেও যেতো না এবং এখন যাওয়াও কতকটা নিষিদ্ধ। তাছাড়া জম্মু আগে ছিল পাঞ্জাবেরই একটা অংশ মাত্র। সুতরাং মূল কাশ্মীরের কতটুকু অংশ পর্যটকদের পক্ষে অবারিত সেটি ভাবতে হয়।

কোহালা থেকে পথ সোজা উত্তরে। বাঁ দিকে প্রস্তরখণ্ডে আহতা প্রতিহতা বিতস্তা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে কল্লোলিত। ডানদিকে ও নদীর অপর পারে বিশালকায় পীর পাঞ্জাল। অরণ্য অটবীর ধ্যানগম্ভীর শোভা মানুষের দুই চক্ষুকে বিহ্বল বিস্ময়ে বিমূঢ় ক'রে রাখে। উৎরাই এবং চড়াই পেরিয়ে সুন্দর মসৃণ পথ দূর দূরান্তরে চলে গেছে। পথের দুই পাশে অধিত্যকার সৌন্দর্যে যেন মহাকাব্যের আভাস উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে!

কোহালা থেকে মুজাফ্‌ফরাবাদ আন্দাজ ত্রিশ মাইল। কিন্তু এই নগরে পৌঁছবার আগে বড় বড় দুটি নদী-সঙ্গম পেরিয়ে আসতে হয়। একটির নাম 'দো-লাই।' বিতস্তার সঙ্গে এসে মিলেছে প্রাচীন কর্নাহ, যে নদীটি দক্ষিণ চিলাসের অন্তর্গত 'বেবুসায়র' গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে বেসল ও কাগন্ জনপদের উপর দিয়ে। এর উৎপত্তি নাঙ্গা গিরিশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে। এখানকার পুরনো ডাক-বাংলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুই নদীপথের শোভা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে দেব-প্রয়াগের কথা মনে প'ড়ে যায়। আমরা এতক্ষণ ঝিলমভ্যালী রোড দিয়ে আসছিলুম। এবার মোটর পথে আরও প্রায় দশ মাইল পথ পেরিয়ে এলে দ্বিতীয় নদীসঙ্গম 'দো-মেল' পাওয়া যায়। এখানে বিতস্তা ও কৃষ্ণগঙ্গা গলাগলি করেছে। আশেপাশে জনবসতি কম নয়। দুটি সঙ্গমই মুজাফ্‌ফরাবাদের এলাকায় পড়ে। এখানে এসে মিলেছে অন্য পথটি, যেটি তক্ষশীলা, হরিপুর, হাভেলিয়ান ও আব্বটাবাদ হয়ে এসেছে। এখানে পুনরায় চেকিং ও টোল ট্যাক্স আদায় করা হয় যাত্রীদের কাছে। এই এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে দেখতে পাওয়া যায়—যাদের সাধারণভাবে বলা হয় হাজারা পাঠান, আফ্রিদি, দার্দ, চিলাসি, চাক, হুনজা,—ইত্যাদি। এরা চিরকাল দরিদ্র ও বুভুক্ষু। এদের স্বভাব-সরলতার সঙ্গে প্রচণ্ড জান্তব হিংস্রতা কার্পেটের বুননের মতো মিলিয়ে থাকে। এদেশের পুরুষের বিশাল দেহের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যশ্রী দেখলে গলা শুকিয়ে যায়। ইংরেজ টমীরা এদের ভয়ে উৎকণ্ঠিত থাকত এবং নানাবিধ উৎকোচের দ্বারা এদেরকে বশীভূত রাখত। এদের সঙ্গে বিবাদ বাধলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। গায়ের জোরে শাসন বা ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার—এ দুটি এদের দু'চোখের বিষ। এদেরকেই অসম্মান ক'রে বলা হয় উপজাতি বা ট্রাইবাল। স্ত্রীলোকের সংখ্যা এদের এলাকায় কম। সেই কারণে স্ত্রীলোক অথবা তরুণ বালককে নিয়ে এদের নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়া বাধে,—তখন রণোন্মত্ত হস্তীদলের মতো এরাই চারিপাশের সংসার-যাত্রাকে দলিত-মথিত করে। এদের জন্য সশস্ত্র সৈন্যদল মজুত থাকে প্রায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে। বিগত শতাব্দীতে আফগান যুদ্ধের কালে লর্ড লিটন এই সকল জাতির শক্তি, সাধ্য ও হিংস্রতার আস্বাদ লাভ করেছিলেন। সেটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রকৃতপক্ষে মুজাফ্‌ফরাবাদ যেন পশ্চিম কাশ্মীরের তোরণদ্বার। অন্যদিকে এটি

মস্ত সামরিক ঘাঁটি এবং আধুনিক যুগের বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রের আর্সেনাল। একদা শিখজাতি এই অঞ্চল ও সোপোরের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে 'বমবাস' নামক এক পার্বত্য জাতির সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়ী হয়। সেইজন্য শিখ দুর্গটি এখানে দ্রষ্টব্য। বমবাসরা বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে একপ্রকার যাযাবর জীবনযাপন করত। যাই হোক, উপজাতিরা সেই আক্রোশ ভোলেনি। সেইজন্য কয়েক বছর আগে 'সোপর' নগরী আক্রমণকালে উপজাতিরা প্রথম ধাওয়া করে শিখদের বিরুদ্ধে। এবার শিখরা নগর ছেড়ে ঝিলম নদী পার হয়ে পাহাড়-পর্বতের দিকে পালায়। বহুদিন পরে আবার তারা ফিরে আসে 'সোপরে'।

প্রাচীনকালের 'উরসা' (হাজারা) রাজ্য ছেড়ে বিতস্তার তীরে-তীরে 'দ্বারবতী' রাজ্যে প্রবেশ করলুম। অর্থাৎ আধুনিক হাজারা জেলা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালুম মুজাফ্‌ফরাবাদে। উপত্যকা পথে মুজফ্‌ফরাবাদ নগরী প্রথম দৃষ্টিগোচর হলে মনে হয় ছবির মতো আঁকা। দুই পবিত্র নদীর ধারা—বিতস্তা ও কৃষ্ণগঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র বলে এই বনরাজিনীলার পটভূমিতে দেবমন্দির নির্মাণের এত উদ্দীপনা। নিতান্ত আধুনিক-কালের কথা এখন বলছিনে, কিন্তু সমগ্র কাশ্মীরে যেখানে যত পুরাকীর্তি ও স্থাপত্য আজও কিছু কিছু বর্তমান,—তার দুই ভাগের একভাগে দেখি শিব, শক্তি বা সরস্বতীর উপাসনা; অন্যভাগে বৌদ্ধস্থাপত্যে অবলোকিতেশ্বর, তারা ও বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির পূজা। রাওয়ালপিণ্ডি শহরের কালীস্থাপনা থেকে আরম্ভ ক'রে এই মুজফ্‌ফরাবাদ অবধি অধিকাংশ স্থলেই লক্ষ্য ক'রে এসেছি দেব-দেবীর মন্দির এবং এখান থেকে যতদূরেই অগ্রসর হচ্ছিলুম, পথের একদিকে এবং বিতস্তার ওপারে বহুস্থলেই শিখ সম্প্রদায় বা হিন্দুদের এক-একটি মন্দির স্থাপনা।

ঝিলমভ্যালী রোড উঠছে উপর দিকে। কিন্তু দুই দিকে তার ছবির মত উপত্যকা যেন দূর্বাদলশ্যাম। মাঝে মাঝে বাঁকের মুখে আসছে গিরিখাদ—অথৈ নীচে বয়ে চলেছে গৈরিকবর্ণা বিতস্তা। শীতল-মধুর বাতাস উঠেছে গিরিলোকে। অপরাহ্ন এখনও ম্লান হয়নি। এখনও কাশ্মীরী মেয়ের হাতে মাঠের কাজ শেষ হয়নি। মুজাফ্‌ফরাবাদ ছেড়ে আমরা যাচ্ছিলুম 'গার্হি'-র দিকে। পুরাকালে এই অঞ্চলের প্রত্যন্তভাগকে বলা হত, 'প্রস্তর তোরণ বা দ্বোয়ারা।' বহু সংখ্যক 'দ্বোয়ারা'র প্রহরীরা কাশ্মীরকে বহির্জগতের থেকে চিরকাল বিচ্ছিন্ন রাখত।

চড়াই উঠেছে ধীরে ধীরে। উপত্যকা দুই পারে বিস্তার লাভ করছে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য—চেনার বৃক্ষের সাক্ষাৎ মিলছে। দেওদার গোষ্ঠীর মধ্যে যেটি চিড়—সেটির দেখা মেলে দু হাজার ফুটের উপর থেকেই। পাইন গাছ চার হাজারের নীচে প্রায়ই থাকে না। পাইনের বৃহত্তম সমারোহ পহলগাঁও এলাকায়। দ্বিতীয়

বৈশিষ্ট্য যেটি চোখে পড়ছে সেটি সামগ্রিক মৃন্ময়তা। এমন বহু পাহাড় রয়েছে, যেগুলি মৃৎপ্রধান—সেখানে যেন গ্রানাইট পাথরের বড় বড় চাঁই (boulder) মাটির গায়ে পুঁতে রাখা! বর্ষাকালে আনাগোনার সময় মাঝে মাঝে বেশ আতঙ্কিত চক্ষে ভাবতে হয়, এই বুঝি মাটি ধসে গিয়ে পাথর গড়িয়ে নেমে আসে! ঝিলমভ্যালী রোডে এমন দৈবদুর্বিপাক ঘটে গেছে বহুবার। বর্ষায় ও ভূমিকম্পে পার্বত্য পথ অতিশয় বিপজ্জনক।

'হাতিয়ান গাঁও' ছেড়ে গিয়ে কিছুদূর এসে পাওয়া গেল একটি সুন্দর লৌহরজ্জু বাঁধা সাঁকো—সেটি পেরিয়ে অন্য একটি পথ চলে গেছে কার্নাল ভ্যালীর দিকে। এখানে দ্বিতীয়বার শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে উপজাতি বমবাসদের প্রচণ্ড হিংস্র সংগ্রামে পরাজিত শত শত শিখ প্রাণ হারায়। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল চেনারি এলাকার শস্য-প্রান্তরের প্রতি। কেননা দিগ্‌দিগন্তজোড়া পর্বতমালার ক্রোড়ভূমিতে সুসমতল মৃণ্ময় ময়দান খুব সুলভ নয়। বোধ করি, কাশ্মীরেই এইগুলির সংখ্যা অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী এবং এই কারণেই পৃথিবীর পটে এই ক্ষুদ্র ভূ-ভাগটি চিরদিন অভিশপ্ত। কাশ্মীরকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা একের পর এক হিংস্র সংগ্রাম করে এসেছে, তাদের প্রত্যেকটি দ্বন্দ্বের মূল কারণটি হল, কাশ্মীরের মোট আড়াই হাজার বর্গমাইল সমতলব্যাপী মৃণ্ময় কোমল উপত্যকার উপর আধিপত্য লাভ। শক, হুণ, তাতার, তুর্কী, মোগল, পাঠান, আফগান, ইরান—সকলের ওই একই লোভ। শুধু কাশ্মীরের পাহাড়গুলি দখল করে কেউ খুশী থাকে না, পাহাড়ের বন-সম্পদ লাভ করেও কেউ তুষ্ট নয়, কিন্তু ওই উপত্যকাটুকু তাদের চাই! দুর্ভাগ্যের কথা, সেই চিরকালের দ্বন্দ্বটি আজও শেষ হয়নি!

'চেনারি'র বাজার এবং জনপদ ছাড়িয়ে আমরা ক্রমশ গিরিসঙ্কটের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পার্বত্য পথের চেহারা প্রায় সর্বত্রই এক। উঁচুতে চড়তে গেলেই এক দিকে বিশাল দেওয়াল, অন্য দিকে ভয়াল গহ্বর! সরযূ, সারদা, অলকানন্দা, ভাগীরথী—এদের গর্জ বা খদের ধার দিয়ে যারা পথ পেরোয়নি, তারা জানে না, প্রকৃত মৃত্যুভয় কাকে বলে! নেপালের অন্তর্গত অরুণ-কোশীর খদ কোথাও-কোথাও পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর, অর্থাৎ সাড়ে চার মাইলেরও বেশী নীচু!

'চেনারি' এলাকা ছাড়িয়ে একটি বড় জলপ্রপাত পেরিয়ে আমরা এক সময়ে 'চাকোঠি' হয়ে 'উরি'-র দিকে চললুম। এখান থেকে একটি সুন্দর পথ 'পুঞ্চ'-এর দিকে চলে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীরে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মাঝখানে যে কয়টি প্রসিদ্ধ জনপদ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে 'পুঞ্চ, পালন্দ্রি, মেনধার, কোট্‌লি, রাজাউরি, মীরপুর, রিয়াসি, ভিমবার, আখনুর, মানাওয়ার,'—ইত্যাদি প্রধান। এগুলি প্রধানত পীর পাঞ্জাল ও 'শিউয়ালিক' গিরিশ্রেণীর আশেপাশে। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটি

উপত্যকাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সবগুলি জনপদের পাশ কাটিয়ে চলেছে এক-একটি স্বচ্ছতোয়া পার্বত্য স্রোতধারা। কাশ্মীর আগাগোড়া নদীমাতৃক। কাশ্মীরের মতো অন্য কোনও রাজ্যে এত সংখ্যক নদী নেই। কাশ্মীরবাসী দুবেলা ভাত খায়—কিন্তু অন্নের অভাব তার ঘটেনি কোনওকালে! মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, খাঁটি দুধ ও মাখন—যা আজ অবিশ্বাস্য রূপকথার মতো—এগুলি আজও কাশ্মীরে প্রচুর। কিন্তু বাইরের লোক ও-রাজ্যে বেড়ে যাচ্ছে বলেই ক্রমশ ভেজাল দেখা দিচ্ছে খাদ্য-সামগ্রীতে! বছর দশেক আগেও 'বনস্পতি' ঘি কাশ্মীরে বিষবৎ নিষিদ্ধ ছিল।

সেকালে সুলতান উরি নামক এক গোষ্ঠীপতি যে-অঞ্চলটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সেটির নাম হয়েছে 'উরি'। উচ্চ মালভূমির উপর এই জনপদটি অবস্থিত। অদূরবর্তী মালভূমির উপর সেই পুরনো দুর্গটি ছবির মতো। চারিদিকে আরণ্যক পর্বতমালার মাঝখানে এই উপত্যকার শোভা ও শ্রী যেন অমৃতের আস্বাদ মনে আনে! দুর্গটির কাছাকাছি একটি পুল। 'উরি' থেকে 'রামপুর' পায়ে হেঁটে গেলে চার ঘণ্টা। পায়ে না হাঁটলে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। দেখা সত্য নয় যদি না হাঁটি! পথের মাঝখানে থমকিয়ে না দাঁড়ালে, সুশ্যাম দূর্বাদলের উপরে বসে অলসবেলা না কাটালে, চন্দ্রহাস রাত্রে সমগ্র পীর পাঞ্জালকে আলিঙ্গনের মধ্যে নিয়ে শেষ রজনীর শুকতারার দিকে একান্ত লক্ষ্যে চেয়ে না থাকলে—ভ্রমণকালের সব ভাবনাই মিথ্যে! চারিদিকের এই নিসর্গ শোভা—এই পুষ্পসমারোহ, গিরিগাত্রের নির্ঝরিণী, বনান্তের অন্তরালে দিগন্ত-কালের পাখীর আর্তকণ্ঠ—আর তাদেরই পাশে এই পারিজাত কুঞ্জকাননের এক প্রান্তে ছারখার হয়ে পড়ে রয়েছে কতকগুলি হিন্দুস্থাপত্য ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ!'

'রামপুর' পিছনে ফেলে এসে 'বানিয়ার' নদী পার হয়েছি। দূরে-দূরে তুষারশৃঙ্গ চোখে পড়ছে,—যেমন কুমায়ুনে সোমেশ্বর পেরিয়ে 'গরুড়ে'র পথে 'ত্রিশূলে'র চূড়াদের দেখা যায়। নদী পার হয়ে অল্প দূরে গেলেই পাওয়া যায় প্রাচীন 'বানিয়ার মন্দির।' এটি যেন কবেকার শিবস্থাপনা! বানিয়ারের পরেও চড়াই। কিন্তু শেষ চড়াইতে ওঠার আগেই বহু দূরে বিতস্তার উপত্যকালোক মাঝে মাঝে দেখা যায়। দিগন্তের চারিদিকে শুধু তুষারশৃঙ্গ একটির পর একটি। নাঙ্গা, হরমুখ, জান্সার, কোলাহই, কোহিনূর,—কাকে বাদ দিয়ে কার দিকে তাকাই! ওদেরই কোলে-কোলে অস্পষ্ট কুহেলীসমাচ্ছন্ন কাশ্মীর উপত্যকা! বানিহাল গিরিসঙ্কটের সুড়ঙ্গ পথের ভিতর দিয়ে এলে নীচের দিকে ঠিক এমনি দৃশ্যই চোখে পড়ে। এটি ঝিলমভ্যালী রোডের প্রায় শেষ প্রান্ত। দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেক দূর। পাহাড়ে-পাহাড়ে চাষীবস্তি একের পর এক পেরিয়ে এলুম। এবার নামবার পালা। রামপুর থেকে 'বরামূলা' (বরাহমূল) পনেরো মাইলের কম নয়। বরামূলা থেকে দক্ষিণে একটি সুন্দর আঁকাবাঁকা

পথ চলে গেছে গুলমার্গ-এর চওড়া পথের মোড়ে—যে-পথটি শ্রীনগরে গিয়ে মেলে। গুলমার্গের এই নিরিবিলি পথটি যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। এটি গিয়ে মিলেছে বাস-রুটে। সেখান থেকে টাংমার্গ। টাংমার্গ থেকে তুটি পথ। একটি পায়ে হাঁটা অথবা ঘোড়া, অন্যটি নতুন মোটরপথ। কাশ্মীর উপত্যকায় বর্তমান পর্যটকদের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা ও সম্ভোগের কার্পণ্য কোথাও দেখছিনে। গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গ পায়ে হাঁটা বা ঘোড়া। বরামূলা থেকে এই পথটি গুলমার্গ অবধি কম-বেশি কুড়ি মাইল।

পীর পাঞ্জালের অন্তর্গত বানিহাল পাহাড় প্রাকার—যেটিকে বলা হয় আপার বা লোওয়ার মুণ্ডা—তারই তলার ফাটল দিয়ে যে কয়টি জলধারা একটি বিশেষ অঞ্চলে বেরিয়ে এসেছে সেটির নাম 'ভেরিনাগ।' এটি বিতস্তার উৎসমুখ। এই নদী এদিক-ওদিক ঘুরে গিয়ে পড়েছে উলার হ্রদে। উলার দাল-হ্রদের সমগোত্রীয়। তফাৎ এই উলার হ্রদটিতে প্রায় চারিদিক থেকে এসে পড়েছে ছোট ও বড় পার্বত্য নদী, কিন্তু দালহ্রদে বাইরের জল সরবরাহ কম। উলার হ্রদের ওপারে হরমুখের বিরাট গিরিশ্রেণী, এবং তার ক্রোড়ভূমিতে—উলারের এপারে-ওপারে মনে হয় যেন অন্তহীন সমতল। উলারের উত্তরে ও পশ্চিমে বিশাল 'লোলাব' উর্পত্যকা। দক্ষিণ-পশ্চিমে 'সোপর' নগরী।

বরামূলার প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদ অনন্ত। বস্তুত, কাশ্মীরের কোনও নগর-পরিবেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি হয়নি। কাশ্মীরবাসীদের সহজাত সৌন্দর্যরসবোধ প্রত্যেকটি জনপদ পরিকল্পনায় কাজ করে গেছে,—এবং প্রকৃতিদেবী সেটির বিকাশের জন্য পদে পদে সহায়তা করেছেন। ইংরেজ শাসকরা এককালে আপন আপন সুবিধা, স্বার্থ এবং সম্ভোগের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও-কোথাও অনেকগুলি পার্বত্য জনপদকে নগরে রূপান্তরিত করেছিল,—যেমন কো-মারী, মানসেরা, মালাকন্দ, হাভেলিয়ান, হরিপুর ইত্যাদি; ওদিকে যেমন রানীক্ষেত, ল্যান্সডাউন, ডালহাউসী, শিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরি, দার্জিলিং ইত্যাদি। এসব অঞ্চলে সেই সব শ্বেতচর্মীরা প্রকাশ্যে বায়ু বদলের বিলাসকুঞ্জ নির্মাণ করাতো এবং গোপনে সশস্ত্র পাহারাদার বা রেজিমেন্টাল হেড কোয়ার্টার্স বসিয়ে দিত!

বরামূলার মতো মনোরম নগরী নির্মাণ করেছিল কাশ্মীরের জনসাধারণ। বনময় শোভা একদিকে, অন্যদিকে উত্তরে বনবাহিনী উর্মিলা বিতস্তা। কোনও এককালে বরাহ অবতার তাঁর দাঁতের ঘায়ে নদীপথ কেটে দিয়েছিল কিনা,—সেটি ইতিহাসে নেই, কিন্তু রাজা অবন্তীবর্মার কালে যে-প্রসিদ্ধ পূর্তবিদ্ এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম 'সূয্য' (Suyya)। অনেকে বলে, 'সুইয়া।' 'সুইয়াপুর' থেকে অপভ্রংশ 'সোপোর।' বরামূলা থেকে সোপোর আন্দাজ পনেরো ষোল মাইল। আসবার কালে ঝিলম-

ভ্যালী রোডে—রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রামপুর পর্যন্ত যেমন ভারতীয় স্থাপত্য এবং হিন্দু দেবালয় বা মন্দিরগুলি দেখতে দেখতে এসেছি, উরি বরামূলা বা সোপোরেও তার ব্যতিক্রম নেই। আনন্দ এবং ঔৎসুক্যের বিষয় এই, এই দেবালয় এবং স্থাপত্যগুলি মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শ্রমিকদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে তৈরি! সেখানে আপন-আপন অধ্যাত্মবিশ্বাস নিয়ে কোনও কালে কোনও তর্ক ওঠেনি। বরামূলায় রঘুনাথজীর মন্দির এবং সোপোরে শিবমন্দির তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গুরুনানক এবং গুরু গোবিন্দ সিং শিখ সম্প্রদায়ের পূজ্য। কিন্তু শিখরা মনে মনে কালীপূজা করেন! তাঁদের প্রধান শহর কালিকা বা কাল্‌কা, চণ্ডীগড় (দুর্গা), তারাদেবী ইত্যাদি। তাঁদের দলপতি নামগ্রহণ করেছেন—তারা সিং; এককালে তিনি ছিলেন হিন্দু নানকচন্দ্‌।

আজকের বরামূলায় চেহারা অন্যপ্রকার। রাজনৈতিক হিংস্রতা ও বিদ্বেষ এবং তার সঙ্গে নিত্য উদ্বেগ বরামূলার শান্ত ও নিরীহ জনজীবনকে একটি দিনের জন্যও স্থির থাকতে দিচ্ছে না! জীবনযাত্রার মধ্যে দেখা দিয়েছে ঘোরতর অনিশ্চয়তা। একই পরিবারের একজন অন্যজনকে সন্দেহের চক্ষে দেখছে। সারাদিনমান কাটে কাজকর্মে, সন্ধ্যার দিক থেকে ঘরে-ঘরে রাজনীতিক কানাকানি ও দলগত বিতর্ক দেখা দেয়। মুসলমান মেয়ে সমাজে প্রবল অশান্তি,—হিন্দু বা শিখ মেয়ে সমাজে অনিশ্চিতের আশঙ্কা! কিন্তু এদেরই ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে নূতন কালের কাশ্মীর, বেরিয়ে আসছে এক নূতন জাতি,—তারা মুসলমান, হিন্দু বা শিখ—কোনওটাই নয়। তারা আসছে, তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে! তারা কাশ্মীরী।

ঝিলম নদী পার হয়ে আমি সোপোরের দিকে যাচ্ছিলুম।

॥ ২ ॥

সরস্বতী-শারদাস্থান

ভারতীয় পুরাণের বর্ণনানুযায়ী ঋষি পুলস্ত্য একদা উত্তর কাশ্মীরের 'সতীক্ষেত্রে' তপস্যায় বসে ছিলেন। তাঁর সেই তপস্যার প্রভাবে হিমবৎ পর্বতে (হিমালয়ে) এক বিদারণ হয় এবং স্রোতস্বতী 'দেবীগঙ্গা'র আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ঋষি পুলস্ত্য সেইখানে তাঁর যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পর পুলস্ত্য নির্দেশ দেন, গঙ্গাদেবী তাঁর স্রোত সম্বরণ করুন। এমন সময় আকাশপথে মহাশ্বেতা সরস্বতী এক দৈববাণীর দ্বারা পুলস্ত্যকে জানান যে, 'ভেদবনে,' যেখানে পর্বতবিদারণ ঘটেছে, ঠিক সেই স্থানটিতে 'গঙ্গোদ্‌ভেদতীর্থে'র প্রতিষ্ঠা হোক। পুলস্ত্য সানন্দে মহাশ্বেতার নির্দেশ মেনে নিলেন, কিন্তু তাঁর দেবী দর্শনের বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় পুনরায় তিনি তপস্যায় বসলেন। এক হাজার বছর চলে গেল। অবশেষে একদিন বাক্‌দেবী অমর্ত্য এক রাজহংসীর ছদ্মবেশে সেই মহাহৈমবতের প্রান্তে 'ভেদবনে' এসে অবতীর্ণা হলেন। সেটি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী-নবমী তিথি। সেই মধুর জ্যোৎস্না রাত্রের স্বপ্নছায়াময় ভেদবনে দাঁড়িয়ে ঋষি পুলস্ত্য স্তবমন্ত্র পাঠ করলেন, "যদা সম্ভেদভিন্নসি তদা ভেদসি ভামিনী।" অতঃপর দেবী সরস্বতীর আরাধনায় তাঁর নবতন নামকরণ করা হয়েছিল, "হংসভাগীশ্বরী ভেদা।" এই নামেই তিনি অদ্যাবধি পূজিতা হন।

হরমুকুট পর্বতের (১১,২৫০ ফুট) উপরে 'গঙ্গাবল' হ্রদ সম্বন্ধে এই পৌরাণিক উপকথাটি প্রচলিত আছে। এই হ্রদেরই পূর্বপ্রান্তে যে শীর্ণ নদীটি বর্তমান, তার নাম 'অভয়া'। 'কাশ্মীর মাহাত্ম্যে' বলা আছে, এই চিত্তকলুষ-বিনাশিনী কোনও দিন কূলপ্লাবিনী হবেন না বা নিম্ন সমতলে অবতরণ করবেন না! 'গঙ্গাবল' তীর্থে পৌঁছবার পথ যথেষ্ট দুঃসাধ্য বলে মনে করিনে। কেননা, মানসবল ছাড়িয়ে সোমবল পেরিয়ে মোটরপথ চলে গেছে বান্দীপুর পর্যন্ত। সেখান থেকে গঙ্গাবল কত আর। না-হয় মাইল দশেক। সেখানে 'গোবর্ধনধারা বিষ্ণু' এবং 'আয়ুযশের' মূর্তি (যমরাজ) রক্ষিত। অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় রামাশ্রম, রামসায়, এবং সপ্তঋষির আশ্রমের পার্শ্বচারিণী বৈতরিণী নদী। এগুলি সবই "গঙ্গোদ্‌ভেদ তীর্থে"র অন্তর্গত।

কাশ্মীরের পৌরাণিক গ্রন্থাদির সংখ্যা কম নয়। সেগুলি অধিকাংশ মাহাত্ম্য নামে পরিচিত। এগুলির মধ্যে 'নীলমত' বিশেষ প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক কালের

পর ঐতিহাসিক যুগে এসে সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরের পুরা ইতিহাস প্রথম রচনা করেন চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ। কবি কল্হনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রাচীন শ্রীনগর তথা প্রবরপুরার যে বৌদ্ধমঠে হুয়েন সাঙ সুদীর্ঘকাল বাস করেছিলেন, সেটির নাম ছিল "জয়েন্দ্র বিহার"।

'সোপোর' অভিমুখে যাচ্ছিলুম। এটি "শারদা তীর্থে" যাবার অন্য একটি পথ।

মূল শারদা তীর্থের সম্বন্ধে 'শারদা মাহাত্ম্যে' বিশদ বর্ণনা আছে। শারদা তীর্থ অতি প্রাচীন। কবি কল্হনের পর সম্রাট আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজল অবধি শারদা তীর্থযাত্রার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। 'ভৃঙ্গিসা-সংহিতা' নামক একখানি মাহাত্ম্যে একটি উপকথা পাওয়া যায়। একদা মাতঙ্গের পুত্র মুনি শাণ্ডিল্য দেবী-শারদার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের প্রত্যাশায় যোগসাধনা ও নানাবিধ যাগ-যজ্ঞ নিয়ে বসেছিলেন। শারদা হলেন ত্রি-শক্তির অভিব্যক্তি। যোগসাধনার ফলে মুনি শাণ্ডিল্য দৈবাদেশ লাভ করেন যে, তিনি অবিলম্বে 'শ্যামলা মহারাষ্ট্র' অভিমুখে যাত্রা করুন।

সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'ঘোষ ক্ষেত্রে' শাণ্ডিল্যের সম্মুখে 'মহাদেবী' আবির্ভূতা হয়ে প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, তিনি শারদার পার্বত্য অরণ্যে শক্তিরূপিণী হয়ে তাঁকে দর্শন দান করবেন। যে স্থলটিতে দেবী অন্তর্হিতা হন, সেটির নাম 'হয়শিরাশ্রম'। কৃষ্ণগঙ্গার দক্ষিণে 'লোলাব' (গুরেজ জেলা) উপত্যকায় সেই স্থলভাগটিকে অদ্যাবধি বলা হয়, 'হয়হোম',। 'হয়হোম' বর্তমান 'গুষ' থেকে চার মাইল পথ। অতঃপর শাণ্ডিল্য আসেন কৃষ্ণগঙ্গার স্রোতধারার তীরে। উত্তর কাশ্মীরে দেবশাহী পর্বতমালা এবং হরমুকুট পর্বতের নানা অঞ্চল থেকে যে গিরিনদীগুলি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, তাদের কয়েকটিতে 'কনকচূর্ণ' অদ্যাবধি পাওয়া যায়। 'সোনামার্গের' খ্যাতিও সেই কারণে। যাই হোক, কৃষ্ণগঙ্গায় স্নানের ফলে শাণ্ডিল্যের অর্ধদেহ স্বর্ণমণ্ডিত হয়, অর্থাৎ তাঁর চিত্তলোক থেকে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়। আজও কৃষ্ণগঙ্গার ধারে এই অঞ্চলটির নাম 'সোনব্রাং' রয়ে গেছে। যাই হোক, স্নানান্তে স্বর্ণময় ও সৌম্যদর্শন শাণ্ডিল্য কৃষ্ণগঙ্গা অতিক্রম করে উত্তর পার্বত্যলোকে অভিযান করেন। পথ বহু দূর এবং রহস্যগর্ভ। অবশেষে এক মহারণ্যে প্রবেশ করামাত্র তিনি নৃত্যশীলা অপ্সরাগণকে দেখতে পান। এই মহারণ্যের তৎকালীন নাম ছিল 'রঙ্গবতী'। ঠিক সেই স্থলে সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে যে মালভূমি আজও দেখা যায়, তার আধুনিক নাম, 'রংভোর'। এটিও কৃষ্ণগঙ্গার সেই অববাহের প্রান্তসীমা। এরপর শাণ্ডিল্য একে একে অরণ্য অতিক্রম করেন, তার কোনওটির নাম 'গৌতমভান্' কোনওটির নাম 'তেজোবন'। প্রায় সবগুলি নামই একাল পর্যন্ত আসতে আসতে উচ্চারণের বিকৃতিলাভ করেছে।

অবশেষে একদিন শাণ্ডিল্য 'শারদাবনে' এসে উপস্থিত হন। এখানে বহু জোড়-

পাঠের পর শারদা দেবী 'ত্রি-শক্তি'রূপে মুনির সম্মুখে আবির্ভূতা হন—শারদা, নারদা বা সরস্বতী ও বাগেদবী। দেবী অতঃপর শাণ্ডিল্যকে আমন্ত্রণ করেন আপন বিহার-ক্ষেত্রে। সেটি এক সুউচ্চ পর্বতশীর্ষ। তার প্রাচীন নাম, শিরহ্শীলা।

কৃষ্ণগঙ্গার অপর একটি নাম 'সিন্ধু।' একই নদী, কিন্তু অঞ্চলভেদে তার নাম বদলাতে পারে বৈকি। কর্ণালী হয় ঘর্ঘরা, কালী হয় শারদা, ভাগীরথী হয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র হয় ডিহং। শিরহ্শিলার নীচে যে দুই নদীর সঙ্গম দেখা যায়, সে-দুটি ওই কৃষ্ণগঙ্গা এবং 'মধুমতী।' শাণ্ডিল্য যখন এই সঙ্গমের ধারে এসে পৌঁছলেন, তাঁর পিতৃলোক থেকে আদেশ এল, এই সঙ্গমে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ সমাপন করো। শাণ্ডিল্য সেই তর্পণের জন্য স্বচ্ছসলিলা মধুমতীর জল অঞ্জলিতে ধারণ করেই বুঝলেন, সমগ্র নদী মধু প্রবাহে পরিণত হয়েছে। তিনি সাশ্রুনেত্রে মন্ত্রপাঠ করলেন, "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।"

উত্তর কাশ্মীরের দুস্তর, দুঃসাধ্য ও জনবিরল পার্বত্যপথ বহু দূর পর্যন্ত তীর্থযাত্রীকে টেনে নিয়ে যায়, শারদার মহাপীঠে। শারদার আধুনিক নাম 'শার্দি'। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে কাশ্মীররাজ জয়সিংহের আমলে শারদার নিকটে একটি প্রাসাদ-দুর্গ ছিল। সেটির নাম শিরহ্শিলা প্রাসাদ। সেটির ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। শারদার অপর নাম শক্তি,—সেই কারণে এখানে, এমন কি বৈষ্ণবদের পক্ষেও, পশুহোম বা পশুবলিদান বিধি!

সোপোর থেকে ত্রেগাঁও টাঙ্গায় গেলে প্রায় উনত্রিশ মাইল, অথবা আর একটু বেশি। মোটর বাস হান্দোয়ারা হয়ে ত্রেগাঁও যায়। কিন্তু পথ এমন ভাবে হান্দোয়ারার দিকে ঘুরেছে যে, টাঙ্গায় চড়ে যাওয়াই সুবিধা। কিন্তু সাধারণ তীর্থযাত্রী যাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্তই ব্যস্ত, তাঁদের কাছে কাশ্মীর আর কালীঘাট বোধ হয় একই।

একেই ত' শারদাতীর্থ কাশ্মীর যাত্রীর জানাপথের বাইরে বহু দূরে এক প্রকার অজানা লোকে অস্পষ্ট ছিল, তার ওপর ইদানীং ভারতীয় যাত্রীদের পক্ষে উত্তর কাশ্মীর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। ভারতীয়দের পক্ষে কৃষ্ণগঙ্গা পথ কবে যেন হারিয়ে গেছে! 'গুরেজ' তহশিল এখন আর নিরাপদ নয়।

সেকালের সেই শারদা যাবার যে-পথ 'ঘোষক্ষেত্র' অঞ্চলের চেনার ও আখরোটের বনের ভিতর দিয়ে 'কামিল্-কাবেরী' নদী ডিঙ্গিয়ে পাওয়া যেতো, যেখান দিয়ে ব্রাহ্মণ পূজারীর দল রঙ্গবতীর উপত্যকা ছাড়িয়ে গ্রাম-গ্রামান্ত পেরিয়ে 'শীতলবন' অতিক্রম ক'রে যেতো কৃষ্ণগঙ্গার উপকূলবর্তী 'দুধ-নিয়াল'-এর উদ্দেশ্যে,—সে-পথ একালে আর নেই। 'রঙ্গবতী' আর 'তেজোবন' পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যেই তলিয়ে রইল।

ওদিকে এখন 'সীজ্ ফায়ার লাইন।'

১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত 'দুধনিয়াল' পৌঁছতে গেলে অন্য পথ ছিল। সেটি সোপোর থেকে ত্রেগাঁও হয়ে 'লোধ্রবন'। এখানকার উপত্যকা প্রস্তরময়। কিন্তু পার্বত্য কান্তার সুস্নিগ্ধ সুন্দর। এ অঞ্চল 'লোলাব' উপত্যকার অন্তর্গত। তবে লোধ্রবন ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথ অতিশয় চড়াই। শ্রীনগর থেকে প্রাচীন শারদা হয়ত অল্পবিস্তর নব্বই মাইল পড়ে যদি সোপোর হয়েই যাই—কিন্তু লোলাবে গিয়ে দাঁড়ালে জীবন-ব্যবস্থার যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য চোখে পড়ে তার তুলনা কম। মন্দিরের ভাস্কর্য, ঘরকন্না, মেয়েদের পোশাক বা অলঙ্কার, ঘর-দুয়ারের নকশা,—যেগুলি দেখতে পাওয়া যায় 'কুষ্টোয়ারে' বা জম্মুতে অথবা 'অনন্তনাগে'—এখানে তাদের অনেকটাই অদৃশ্য। কিন্তু মূল কথাটা কাশ্মীরে চিরকালই এক। সেটি মাছ, ভাত ও মাংস। খাদ্যবস্তুর তালিকা কাশ্মীরে কোনও দিন বদলায়নি। জম্মুতে এর কিছু ব্যতিক্রম, কারণ জম্মু পুরনো পাঞ্জাবেরই একটি অংশ। তার সেই পুরনো স্বাতন্ত্র্য মহারাজা গুলাব সিং—যিনি পাঞ্জাবী, তিনি বজায় রেখে গেছেন। দুর্ভাগ্য এই, স্বাতন্ত্র্য থেকেই পার্থক্য আসে। গুলাব সিং ছিলেন ডোগরা রাজপুত গোষ্ঠীর এবং তিনি কাশ্মীরের মহারাজা হবার আগেও ছিলেন মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের অন্যতম সেনাপতি এবং জায়গীরদার। যাকে বলে, ছোটখাটো সামন্ত রাজা। কিন্তু এ আলোচনা এখন থাক।

যা বলছিলুম। জম্মুর খাদ্যতালিকা মূল কাশ্মীরের সঙ্গে মেলে না। বস্তুত, পীর পাঞ্জালের এপার-ওপারের মধ্যে আগাগোড়া পার্থক্য। এপারে নাগরিক জীবনের যে উত্তেজনা, দ্রুতগতি কর্মতৎপরতা, প্রবল ও প্রচণ্ড আধুনিকতা,—সেটি ওপারে গিয়ে নিঃসীম শান্তির মধ্যে মিলিয়ে যায়! জম্মু যেন চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকে,—আমাকে দেখো, আমার কৃতিত্বে হাততালি দিয়ে যাও, আমার বেতার যন্ত্রবাজা হোটেলে ঢুকে হল্লা করে যাও! কিন্তু কাশ্মীর যেন শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে কানে-কানে বলে, আমাকে অনুভব করো শুধু পাইনের বনে একান্তে বসে! যাবার আগে আমার বুকের তলাকার শত শতাব্দীর চাপা কান্না শুনে যেয়ো। যদি পারো আমার এই গগনজোড়া সুগন্ধ এলোচুলের মধ্যে মুখ রেখে আশ্বাসের বাণী রেখে যেয়ো!—কাশ্মীরের ভাগ্য চিরকাল বিড়ম্বিত।

লোলাব উপত্যকায় দাঁড়িয়ে একদা ভাবছিলুম, গ্রীকদের প্রাচীন ইতিহাসে শ্রীমতী হেলেনের অভিশপ্ত রূপরাশি সর্বনাশা ট্রয়-যুদ্ধের অবতারণা ঘটিয়েছিল! সীতার জন্য ছারখার হয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

শারদা তীর্থের পার্বত্য অঞ্চলে যারা বাস করে, যতদূর বুঝতে পারা যায়—তারা নানা জাতির সংমিশ্রণ। কোনও দল পুরাকালের পাহাড়ী—তাদের বলা হয় 'কর্ণাও'

বা 'কর্ণাহ', আরেক দল যারা সিন্ধুনদের উপত্যকা 'চিলাস', বা 'দার্দ' অঞ্চল থেকে এসেছে—এরা নাঙ্গা এবং দেবশাহী উপত্যকার লোক। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় একশ্রেণীর কাশ্মীরী। আবার এদের সকলের সঙ্গে মিলেছে নানা উপজাতির নরনারী। কোন কোনও ঐতিহাসিক এমন কথা বলেন, চারিদিকের এই পার্বত্য অবরোধ এবং দূরবিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও মূল কাশ্মীরের মধ্যে শারদার অবস্থান বিচিত্র বটে; তার চেয়েও বিচিত্র এই পরিপার্শ্বিক 'আসুরিক জগতে' শারদাতীর্থের প্রতিষ্ঠা। সন্দেহ নেই, এ অঞ্চলে ছিল এককালের ছোট ছোট হিন্দু নরপতি,—যারা কাশ্মীররাজের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

ঘন গভীর অরণ্যানী, তার সঙ্গে ভয়াল উষরতা, তদপেক্ষাও জনবিরলতা, সেদিন শারদাতীর্থে পৌঁছবার পক্ষে মস্ত বাধা ছিল। পথ ছিল দুঃসাধ্য, অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং খাড়াই—যেখানে পাহাড়ি ঘোড়া নিয়ে যেতেই সাহস হত না, মালপত্র নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যেতো না, এবং গর্জমান নদী পার হবার মতো সাঁকো পাওয়াও ছিল দুর্লভ—এই সকল কারণে শারদাতীর্থে যাবার চিন্তা কাশ্মীরী পণ্ডিতরা বহুকাল আগে থেকেই একপ্রকার পরিত্যাগ করেছে। পুরাণ ও ইতিহাসের এই সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান মোগল আমল অবধি বৃহত্তর ভারতের তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করত। মোগল শাসন অবসানের পর অরাজকতা এবং পুনরায় আফগান আক্রমণ ও তাদের ষাট বৎসরব্যাপী অন্যায় ও অনাচারের ফলে যে কোনও হিন্দুতীর্থে যাওয়া কাশ্মীরীদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ভীরু প্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরীরা পুনরায় আত্মনিয়ন্ত্রণের সুবিধালাভ করে মহারাজা গুলাব সিংয়ের আমলে। তথাপি বিস্মৃতপ্রায় ও দীর্ঘকাল-পরিত্যক্ত শারদাতীর্থ তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আগেকার মতো উজ্জীবন লাভ করে নি। দ্বিতীয় কারণ, কাশ্মীরের রক্ষণশীল 'পণ্ডিত' সমাজের গোঁড়া মনোবৃত্তি! কেননা প্রায় প্রত্যেক যুগেই শারদা তীর্থযাত্রার সকল পথঘাট এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল 'নবদীক্ষিত' মুসলমান জনসাধারণের দ্বারা অধ্যুষিত হয়ে চলেছে—যারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেরই রক্ত সম্পর্কিত ছিল এইমাত্র গত যুগে।

'শীতলবন' গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে গেলে তবে 'দুধনিয়াল'-এর পথ। এর পরে যে উপত্যকা পার হতে হয় সেটি অধিকাংশই জনবসতিশূন্য। উপত্যকার চারিদিকে ঢালু বনভূমি। সেখানে কৃষ্ণকায় হিংস্র ভল্লুকের দল চিরকাল স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। দিনমানের প্রখর রৌদ্রেও জনবিরলতার জন্য গা ছমছম করতে থাকে। গিরিগাত্রে জলধারা আপন আঘাতে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক একটি সঙ্কীর্ণ গিরিখাত রচনা ক'রে চলেছে। সেগুলি শীর্ণ কিন্তু অতি গভীর এবং যাত্রীর পক্ষে মস্ত বাধাস্বরূপ।

লোধ্রবন থেকে 'জুমাগন্দ' ঠিক ক'মাইল তার হিসাব রাখি নি, কারণ কোথাও কোনও পথচিহ্ন ছিল না। তবু আমার ধারণা, মাইল দশ-বারো। এ পথ অতি দুঃসাধ্য এবং কষ্টদায়ক। এ পথে জনবসতি একপ্রকার নেই বললেই চলে। তবে লোমশ ভেড়া বা ছাগল, বা কচিৎ দু' চারটি মহিষকে এনে গুজর বা দার্দ জাতির লোক এখানে চরিয়ে নিয়ে যায়। কাশ্মীরে এমন অগণিত সংখ্যক বনময় ও জলময় উপত্যকা আছে, যেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও শোভায় ঝলমল করছে—কিন্তু সেখানে মানুষের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না!

জুমাগন্দ্ থেকে দুধনিয়ালও মোটামুটি মাইল দশেক। এককালে এখানে দুরন্ত কৃষ্ণগঙ্গা পার হ'তে হত দুগাছা দড়ির সাহায্যে—ঠিক যেমন গার্বিয়াংয়ের পথে ধরচুলায় নেপালী শ্রমিকরা দড়ির তলায় ঝুলতে ঝুলতে এপার-ওপার করে। দৃঢ়মুঠি কখনও আল্‌গা হয় না জানি, কিন্তু দৈবাৎ হাত ফসকালে মৃত্যু অবধারিত। শারদায় আর ধরচুলায় এমন মৃত্যু ঘটেছে অনেকবার। যাই হোক, মহারাজা গুলাব সিংয়ের আমলে মন্দির সংস্কারের সঙ্গে দুধনিয়ালে কাঠের সাঁকো তৈরি হয়। সে শুধু তীর্থযাত্রীদের জন্যই নয়, এখানকার বহু প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার ক'রে সশস্ত্র পার্বত্য প্রহরীদল এখানে নিযুক্ত হয়। শারদা পর্বতের প্রকৃত নাম 'গণেশগিরি' বা 'গণেশঘাটি'। ঘাট বা ঘাটির ভিন্ন অর্থ হ'ল পাহাড়। যেমন গুজরঘাটি, পশ্চিমঘাট, গিলগিটের অন্তর্গত রামঘাট ইত্যাদি।

নদী পার হবার আগে 'তেজোবনে'র সীমান্তে, জনশূন্য প্রাণীশূন্য কৃষ্ণগঙ্গার তীরে অমৃতলোক থেকে পিতৃপুরুষরা যাত্রীদের সম্মুখে নাকি অশরীরী ছায়ার মতো এখানে আবির্ভূত হন। 'আত্মা' অবিনশ্বর—কাশ্মীরী পণ্ডিত বলেন। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ ইতি শ্রাদ্ধম্। কিন্তু তার আগে দেহ ও মনের শুচিশুদ্ধতা একান্ত দরকার। মুনি শাণ্ডিল্য এই কৃষ্ণগঙ্গায় স্নান ক'রে স্বর্ণাঙ্গ হয়েছিলেন! তুষারবিগলিত কঠিন শীতল জল—তরল তুহিন—কিন্তু অবগাহন করো, দেখবে তুমি মধুমান! মধু-র মতো মধুর উষ্ণতা তোমার সর্বদেহে মনে। দেহ ক্লিষ্ট হয় অতিরিক্তের স্পর্শে, মনে রেখ। সর্পবিষ এবং রিরংসা দেহে বিকার আনে। কিন্তু আত্মার বিকৃতি নেই! জরা, মৃত্যু, ক্লেশ, দুষ্কৃতি, শীতাতপ—এরা স্পর্শ করে না আত্মাকে—স্নান করো কৃষ্ণগঙ্গায়!

আত্মা নির্লিপ্ত, নিঃস্পর্শ—আত্মার অপর নাম নাকি 'চৈতন্য বিন্দু।' একদা শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বৌদ্ধ কাশ্মীরের চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মনীতিকে রূপান্তরিত করতে। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল সরস্বতী-শারদা বা শারদা-মণ্ডল। এখান থেকেই সমগ্র কাশ্মীর, এমন কি কাশ্মীরের বাইরেও বহু রাজ্যে কাশ্মীরের বৌদ্ধপণ্ডিত সমাজের বিদ্যা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, অধ্যাত্মনীতি, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা,

ভাস্কর্য, স্থাপত্য—ইত্যাদি বহু বিষয়ে দেশজোড়া খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল। বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রের পীঠস্থান এই শারদা মণ্ডলেই প্রথম আচার্য শঙ্করকে আসতে হয়েছিল। 'চির-জাগ্রতা' সরস্বতী-শারদা যখন শুনলেন, আচার্য মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা পাচ্ছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বেঁকে বসলেন—এ মন্দিরে আচার্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ, দেবী তাঁকে দর্শন দান করতে প্রস্তুত নন্।

হেতু?

শারদা মণ্ডলের পণ্ডিত সমাজ জানালেন, আচার্যের দেহ, মন এবং আত্মা একান্তই অশুচি এবং নারকীয়। কারণ, কোনও এক রাজার মৃতদেহমধ্যে আপন আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আচার্য শঙ্কর নারীসঙ্গমের নিগূঢ় আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর আত্মা কলুষিত। শারদা দর্শনে তাঁর অধিকার নেই!

আচার্য জানালেন, আমার পক্ষে যৌনবিদ্যালাভের প্রয়োজন ছিল। সকল বিদ্যা, জ্ঞান ও তত্ত্বলাভ আমার জীবনে প্রয়োজন। আত্মাকে কখনও কলুষ স্পর্শ করে না, কারণ সে চৈতন্যস্বরূপ, স্পর্শলেশচেতনাশূন্য।

কাশ্মীরের পণ্ডিত সমাজ এই শারদামণ্ডলেই মস্ত তর্কসভার আয়োজন করলেন। কাশী ও কাঞ্চীর মতো কাশ্মীরের পণ্ডিতসমাজও আচার্য শঙ্করের যুক্তি ও বিদ্যার নিকট পরাজিত হল এবং এই শারদাতীর্থেই বেদান্ত দর্শনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপনা ক'রে শঙ্করাচার্য জয় গৌরব নিয়ে ফিরে গেলেন। সেই থেকে কাশ্মীরে বৌদ্ধ দর্শন ম্রিয়মাণ হতে লাগল!

'গণেশগিরি'র আকার হ'ল অনেকটা হস্তীমুণ্ডের মতো এবং এই পর্বত পিছনের উত্তুঙ্গশীর্ষ চূড়ার ক্রোড়পর্বতের মতো। সেটি বারো হাজার ফুটেরও বেশি। শারদা বা গণেশগিরির উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট।

শিখ আক্রমণের আগে এ অঞ্চলে স্বাধীন মুসলমান নরপতি রাজত্ব করতেন—তখন 'কিষণগঙ্গা' উপত্যকায় কয়েকটি স্বাধীন মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন। কাশ্মীরবাসীরা বলেন, সেই সময়ে শারদার মন্দিরকে গোলাবারুদের ভাণ্ডারে পরিণত করা হয়। সেই বারুদে নাকি অতর্কিতে কবে আগুন লাগে এবং তার ফলে মন্দিরের প্রাচীন ছাদ ও দেওয়াল উড়ে যায়। মহারাজা গুলাব সিং এই ভগ্নাবশেষ থেকে পাথরখণ্ড কয়েকটি উদ্ধার ক'রে এ মন্দির সংস্কার করান এবং এখানকার পূজারীদের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থাও করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন, দূরবর্তী 'সগন' উপত্যকা থেকে 'চিলাসে'র দস্যুদল কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকায় লুটপাট ও খুনজখম করতে আসত। মহারাজা গুলাব সিং সেই কারণে এখানে সশস্ত্র ডোগরা সৈন্যদল রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে শারদাযাত্রার বিধি। 'সর্গন' নদীই হল পুরাকালের 'সরস্বতী' বা 'কঙ্কাতরী'।

গণেশগিরির উপরিভাগে মস্ত সমতল প্রাঙ্গণ। দূর থেকে দূরে চতুর্দিকে বৃহৎ গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণীর প্রাকার। নীচে কৃষ্ণগঙ্গা ও মধুমতী কোনদিকে যেন হারিয়ে গেছে। কিন্তু নীচের দিকে যে-পুরনো আলগা সাঁকোটি পেরিয়ে আসতে হয়, সেটি একেবারেই নিরাপদ নয়।

কুমায়ুনের কেদারনাথ মনে পড়ে যায়। এখানেও তেমনি কয়েকটি সিঁড়ি উঠে তবে মন্দির। নীচে আশেপাশে দু' একটি দোকান বসেছে। সমগ্র ব্যাপারটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। সামনে সিঁদুরমাখা ত্রিশূল। শারদা এখন সরস্বতী, শক্তি ও দুর্গার সমাবেশ। মন্দিরের পাশেই যাত্রীদের জন্য যেমন-তেমন বিশ্রামের জায়গা। পৃথিবী এবং সভ্য জগৎ কোথায় এবং কতদূরে পড়ে রয়েছে—এখানে এসে এটি ভাবতে হয়। মূল শারদার মন্দির প্রাকার বেষ্টিত। মন্দিরের পিছনে উঁচু পাহাড়ের ধারে একটি ঝরণা এসে পড়েছে। তার নাম 'অমরকুণ্ড।'

মন্দিরের স্থল-নির্বাচন এবং নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে এমন একটি বিজ্ঞতা একদা প্রকাশ পেয়েছিল, যেটি আজও আনন্দ দেয়। এ মন্দিরের সামগ্রিক বিশালতা একটি পর্বতশীর্ষের উপরে দাঁড়িয়ে দূর-দূরান্তরে পার্বত্যলোককে যেন শাসন করছে। এরই নীচের দিকে মধুমতী ও কৃষ্ণগঙ্গার সঙ্গম—অদূর-পর্বতের ক্রোড় বেয়ে 'সরস্বতী'র ধারা নেমে আসছে বিরাট নাঙ্গা ও চিলাস পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে। এখানে পাইনবনের তলায় শুয়ে-শুয়ে শুধু স্বপ্নের জাল বোনো!

মূল মন্দিরের পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন ঘটেছিল ততটুকুই সংস্কার করা হয়েছিল মহারাজার আমলে। বাকি অধিকাংশই ভগ্নাবশেষের ইতিহাস। মন্দিরের প্রবেশপথ ঠিক কোনদিকে প্রথমকালে ছিল, সেটি সুনির্দিষ্ট নয়। দক্ষিণের প্রধান প্রাকারের অংশটি ভেঙ্গে বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। ওরই পাশে মধুমতীর খাদ। ঐতিহাসিক এবং কবি কলহন দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শারদামন্দিরের উল্লেখ যে ভাবে করেছেন, তা'তে মনে হয় এই মন্দিরের বয়স দু'হাজার বছরের কম নয়। কাশ্মীরের একটি অচলিত নাম হল 'শারদা স্থান।'

মূল মন্দিরের বর্তমান প্রবেশদ্বার পশ্চিমে। ভিতরটি ক্ষুদ্রায়তন, ছায়াচ্ছন্ন। মনে হয়েছিল বিগ্রহদর্শন ঘটবে, কিন্তু বিগ্রহ নয়—একটি চতুষ্কোণ বৃহদাকার সিঁদুরলেপিত শিলামাত্র! কষ্টিপাথরও নয়, বরং রুক্ষরূপ এবং কয়েক ইঞ্চি পুরু শিলাখণ্ড। দেখে-শুনে মনে হয় গ্রানাইট্ পাথরই হবে!

আশ্চর্য এই শিলাখণ্ডকে কেন্দ্র ক'রে কাশ্মীরের অগণিত যুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সাহিত্য, কাব্য, গাথা, লোক-সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি—সমস্তই। আজ যেটিকে বলা হচ্ছে; 'কাশ্মীরী বোলি'—অর্থাৎ কাশ্মীরের নিজস্ব ভাষা—সেটির

মূল নাম 'শার্দি বোলি' বা শারদামণ্ডলের ভাষা। এই ভাষার ভিত্তি, নির্মাণ ও গঠন আগাগোড়া প্রাচীন সংস্কৃত। শারদালিপির মূল উৎপত্তি হল 'ব্রাহ্মী' থেকে এবং সর্বশেষ রূপটি হ'ল আধুনিক পাঞ্জাবের গুরমুখী। কাশ্মীরের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস সমস্তই সংস্কৃতে লেখা। এই সংস্কৃতের উপর একদিকে এসে পড়েছে 'পালি' এবং অন্যদিকে পারসিক। আজও কাশ্মীরের জনসাধারণের ভাষার নাম, 'শারদা।' কাশ্মীর দরবারে এই সেদিন পর্যন্তও দেখা গেছে, পারস্য ভাষায় কাজ চলছে। হিন্দুস্থানী বা উর্দু গিয়েছে অনেক পরে। যাঁরা কাশ্মীরের সুপণ্ডিত মুসলমান তাঁরা অদ্যাবধি তাঁদের কাশ্মীরী 'বোলি'র মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। পারস্য ভাষা প্রাচীন সংস্কৃতের সঙ্গে মিলে একাকার হয়েছে—এটি কাশ্মীরের অনন্য বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, শারদার শিলাখণ্ডের নীচে একটি গহ্বর দেখা যায়। জনশ্রুতি হল, এই কুণ্ডের ভিতর থেকে পৌরাণিক যুগে শারদাদেবী উঠে এসে মুনি শাণ্ডিল্যের সম্মুখে আবির্ভূতা হন্ এবং ঐতিহাসিক যুগে এই কুণ্ডের সম্মুখেই প্রসন্না সরস্বতী-শক্তি ও দুর্গার সম্মিলিতা মূর্তি আচার্য শঙ্করের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। অতি প্রাচীন যুগ থেকে ভারত ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং মহাকাল একটির পর একটি ক্ষয়ের চিহ্ন রেখে গেছেন এই মন্দিরে, কিন্তু এর সকল ধ্বংসাবশেষ ও ভগ্নস্তূপের প্রস্তর জটলার মধ্যে এসে দাঁড়ালে প্রতি পাথরের অবক্ষয়ের ছিদ্রপথ দিয়ে একপ্রকার বন্য, রহস্যময়, অনাঘ্রাতপূর্ব এবং নিবিড় ও গভীর গন্ধ পাওয়া যায়,—যেটি অদ্যাবধি অবিভক্ত ও বিশালতর ভারতের অপর কোনও তীর্থমন্দিরে, বা অন্য কোনও স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই অদ্ভুত পাথরগুলির সেই বিচিত্র বন্য গন্ধ প্রেতচ্ছায়ার মতো যেন প্রত্যেক পর্যটকের পাশে-পাশে হাঁটে। চুপি চুপি যেন বলতে থাকে কবেকার কোন্ মহৎ অতীতের দুর্বোধ্য রহস্য কাহিনী, যেটি শোনা যায় উত্তর কাশ্মীরের নানা উপত্যকায়, বিভিন্ন অরণ্যে, জনপদে, গিরিশ্রেণীমালার আশে-পাশে, হিমালয়ের কন্দরে ও রহস্যগর্ভে, জনশূন্য জীবনশূন্য তৃণশূন্য ভীষণা প্রকৃতির আনাচে কানাচে!

হিন্দু পণ্ডিতদের কথা বাদ দিই, কিন্তু কাশ্মীরের শেখ-সমাজ যখন প্রাচীন শারদা-তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভাবে অভিভূত হন্, তখন সেটি লক্ষ্য ক'রে আনন্দ :পতুম।

কিন্তু এই শিলাখণ্ডেই সরস্বতী-শারদার পরিচয় শেষ হয় নি। কাশ্মীরের পুরা সংস্কৃতির প্রধানতম পীঠস্থান এই শারদায় যে দেবীর বিগ্রহমূর্তি ছিল সেটি ভারততীর্থ পর্যটক 'আলবেরুনি' তাঁর বিবরণে বলে গেছেন। সোমনাথের শিবলিঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানের সূর্যনারায়ণের মূর্তি, থানেশ্বরের বিষ্ণুচক্রস্বামী,—এদেরই সঙ্গে তিনি বলে গেছেন, মহাসিন্ধু নদের পথে 'বোলর' গিরিশ্রেণীর মধ্যে বৃহৎ এক

মন্দিরে 'দারুমূর্তি' সরস্বতী-শারদার কথা! এই তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য ও বিবরণ তিনি প্রকাশ করে গেছেন। কবি কল্‌হনের আগে কাশ্মীরের অন্যতম কবি 'বিল্‌হন' একাদশ শতাব্দীতে শারদা মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "রাজহংসেশ্বরীর মতো সুবিশাল মূর্তির পিছনে চালচিত্র সমস্তই স্বর্ণমণ্ডিত—মধুমতী-গঙ্গার স্বর্ণরেণুকণায় বিধৌত সেই মূর্তি! তিনি জ্যোতির্ময়তা বিকীর্ণ করছেন বিশ্বভুবনের দিকে, স্ফটিক-স্বচ্ছতায় তিনি নিত্য উজ্জ্বলা! তাঁর উন্নত শিরের গৌরবমহিমা অবলোকন করে স্বয়ং গৌরীপতি দেবাদিদেব হিমালয় যেন চঞ্চল হয়ে আপন গর্বকেও অধিকতর উন্নত করেছেন।"

কাশ্মীরের ইতিহাসখ্যাত সুলতান জয়নুল আবেদিন পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ বৎসরকাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন। তিনি আদর্শবাদী, ধর্মনীতিপরায়ণ এবং উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর আমলে উপত্যকা-কাশ্মীরে শান্তি, সচ্ছলতা ও ন্যায় বিচার ফিরে আসে এবং তাঁরই আমলে কাশ্মীরে ভারতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিতি হয়। ১৪২২ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে সুলতান জয়নুল আবেদিন বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকজন সহ শারদাতীর্থ যাত্রা করেন। শারদাদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা তিনি বিশেষভাবে বিদিত ছিলেন। তিনি সেখানে মধুমতীর তীরে তেজোবনের সীমান্তে অবগাহন স্নান, অঞ্জলি ভরে পুণ্য সলিল পান এবং পুরোহিত-দলের মাঝখানে পবিত্র ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। কিছু তৎকালীন একশ্রেণীর পাণ্ডা-পুরোহিত দলের ইতরতা, অসাধুতা, নীতিজ্ঞানহীনতা, পাপাচার ও চাতুরী লক্ষ্য করে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং তাঁদের দেবদেবী সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হন। কিন্তু সুলতান জয়নুল আবেদিন সেই সেকালের স্বর্ণপ্রবাহিনী মধুমতীর তীরে বসে যদি আরে বার এই নীচাশয় পাণ্ডাদের বিচার করতেন, তবে দেখতেন, এই নীতিভ্রষ্ট শুচিতাভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকুলের পিছনে রয়েছে বিগত একশ' বছরের অবর্ণনীয় অনাচারের কাহিনী! তাতার যোদ্ধা জুল্‌ফি কাদির খানের অবিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পীড়নের ইতিবৃত্ত, গজনীর মামুদের আক্রমণ, শাহ মীর্জার অরাজকতা এবং জয়নুল আবেদিনের ঠিক আগে সমগ্র কাশ্মীরে যাঁর আমলে আগুন, হিন্দু হত্যা, লুটতরাজ, মন্দিরবিনাশ ও সর্বব্যাপী ধ্বংসসাধন ঘটেছিল সেই কুখ্যাত সিকান্দারের কাহিনী কি প্রকার দেশব্যাপী অধোগতি ও মূঢ়তা এনেছিল! পূর্বোক্ত পাণ্ডার দল ছিল সেইদিনের অধঃপতিত ও ব্যাধিগ্রস্ত কাশ্মীরের গলিত কয়েকটি বিস্ফোটক মাত্র! সেই চতুর চাটুকারের দল সুলতানের হাত থেকে বকশিস্ পাবার লোভেই হয়ত এই কথা বলে থাকবে যে, দর্শনমাত্রই দেবীর মুখে ও কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দেয়, তাঁর হাত কাঁপে, এবং তাঁর চরণ স্পর্শ করলে নাকি প্রখর উত্তাপ অনুভূত হয়!

বলা বাহুল্য, এর কোনটাই ঘটে নি! অতঃপর সুলতান সেই রাত্রে যাত্রীশালায়

নিদ্রা যাবার সময় একান্তমনে কামনা করেন, জাগ্রতা দেবীকে তিনি যেন অন্তত স্বপ্নের মধ্যেও দর্শন করতে পারেন। সুলতানের সেই বাসনাও পূর্ণ হয় নি!

ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার জন্ত তৎকালীন 'ম্লেচ্ছ' সহচরদের এবং একশ্রেণীর অসচ্চরিত্র পাণ্ডাদের কঠোর নিন্দা করেন। কথিত আছে, সুনীতিপরায়ণ সুলতানের এই সাময়িক অসৎ সংসর্গের জন্ত শারদাদেবী তাঁকে নিরাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার জন্ত দেবীর নিজ চিত্তেও নাকি ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল! সেই কারণে নাকি একদা নিজ বিগ্রহমূর্তিকেও তিনি স্বহস্তে চূর্ণবিচূর্ণ করেন!

ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনি তাঁর বিবরণে শারদা মাহাত্ম্যের বর্ণনা করতে গিয়ে দেবীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপেরও উল্লেখ করেছেন।

একটি সময় ছিল, যখন উত্তর ভারতের অধিবাসীরা শারদামণ্ডলকে ভারত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পীঠস্থান মনে করত। প্রতি বছরের বিশেষ একটি সময়ে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একটি করে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল যেত উত্তর হিমালয়ের অন্তর্গত এই উত্তর কাশ্মীরের মহাপীঠে। পথ ছিল দুর্গম ও দুঃসাধ্য, ছিল নানাবিধ অনিশ্চয়ের আশঙ্কা এবং আক্রমণকারী দার্দ ও চিলাসি দস্যুদলের ভয়। কিন্তু সেদিনকার পথ অবরুদ্ধ ছিল না কোনও সময়ে। দস্যুভয় সত্বেও সেদিন পর্যটকরা একান্ত উদ্দীপনা নিয়ে দুস্তর পথের দিকে পা বাড়াত—সেটি তীর্থশ্রেষ্ঠ কৈলাসের দিকেই হোক, বা মহাপীঠ শারদামণ্ডলই হোক। আজকের মতো ইতর আন্তর্জাতিক রাজনীতির নীচতা সেদিন ছিল না। বলা বাহুল্য, এপারেই হোক বা ওপারেই হোক, দস্যুভয় অপেক্ষা একালে রাষ্ট্রনীতিক ক্রূরতা অধিকতর আশঙ্কাজনক। স্বাধীনতা লাভের আগে এ উপমহাদেশের ভদ্রজীবন উদার ও মহৎ আদর্শবাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, আজ স্বাধীনতা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভদ্রজীবনের সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের উপর!

সে যাই হোক, শারদাপীঠে যাবার পক্ষে বাধা ও বিপত্তি প্রতি যুগেই বেড়ে চলেছিল। তার উপরে ছিল লুঠপাট, খুনজখম এবং অরাজকতার ভয়। এই সকল কারণে মূল শারদার হাস্যকর অনুকরণে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, এমন কি দক্ষিণ কাশ্মীরে শ্রীনগরের আশেপাশেও এক একটি 'শারদাপীঠে'র জন্ম হয়। গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকাধামে বা পশ্চিমবঙ্গে যে শারদাপীঠের প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি কাশ্মীরের মূল শারদাস্থানেরই অনুকরণ।

উত্তর কাশ্মীরের কল্হন-পরবর্তী কাহিনীকার জোনারাজ এবং ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবুল ফজল—যিনি সম্রাট আকবরের একজন সভাসদ ছিলেন এবং 'আইন-ই-আকবরী' রচনা করেছিলেন, এঁরা উভয়েই শারদামাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। আবুল ফজল বলেন, "স্বর্ণরেণু প্রবাহিণী একটি নদী পদমতীর (মধুমতীর অপভ্রংশ)

তীরে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর মন্দিরের নাম 'শারদা'—এটি দেবী দুর্গার মন্দির—ইনি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিতা! প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই দেবীর মূর্তিকম্পন ঘটে, এবং তাঁর অলৌকিক প্রভাব প্রতিভাত হয়।"

পার্বত্য নদী কোথাও কথনও দুই পাশে বিস্তারলাভ করে না। সে সমতল ভূভাগে না এলে তার বিস্তৃতি নেই। এ সত্য সর্বত্র এক। এর প্রধান কারণ, তার নিজের আঘাতেই তাকে নালী কাটতে হয়। এই নালীপথকেই বলা হয় 'গর্জ'। কৃষ্ণগঙ্গার চেহারাও তাই। তার সঙ্গে প্রাচীন মধুমতীর যোগ। কৃষ্ণগঙ্গা ও মধুমতীর উৎস একই পার্বত্য অঞ্চলে। সেই কারণে অনেক সময়ে উভয়ের পরিচয়ে একটি জটিলতা পাওয়া যায়। এই দুই ধারার জন্ম 'দার্দ' জাতি অধ্যুষিত এলাকায়—যারা বিশেষ কোনও কালে কাশ্মীর দরবারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নি। এরা প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় অরাজকতারকালে মাথা তোলে এবং সুযোগ খোঁজে। এদের সঙ্গে সভ্যজগৎ ও সমাজের যোগ সামান্যই। এরা উত্তর কাশ্মীরের বিভিন্ন টুকরো সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা এই বিচ্ছিন্ন 'দার্দ' সম্প্রদায়ে সুবিধার জন্য একটি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সুযোগ দান করেছেন, সেটি কৃষ্ণগঙ্গার সহজাত (auriferous) স্বর্ণরেণুকণা! নদীর বালুর দানা মাঝে মাঝে স্বর্ণকণায় পরিণত হয়! একেকটি পীতবর্ণ বালু তখন স্বভাবক্রমে স্বর্ণাভায় ঝলমল করে ওঠে। এই কৃষ্ণগঙ্গার অন্যান্য শাখা-প্রশাখাও নেমে আসছে একই পাহাড়তলীর ভিতর দিয়ে। তার স্থানীয় নাম 'পাকলি' গিরিমালা। 'পাকলি' শব্দটির বঙ্গার্থ আমার জানা নেই, তবে টেনে-টুনে অর্থ দাঁড়াতে পারে, 'পবিত্র পর্বত'।

আবুল ফজল ও জোনারাজের উল্লেখে পাই, কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকার নদীগুলিতে স্বর্ণরেণু সংগ্রহের উপর সুলতান জয়নুল আবেদিন একটি কর ধার্য করেন। 'সোনামার্গ' অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে সমগ্র কৃষ্ণগঙ্গাপথ পশ্চিম এবং উত্তরে চলে গিয়েছে নানা নদী, উপনদী, ও শাখানদী মিলিয়ে। এদের আশে-পাশে অরণ্য ও তুষার সমাকীর্ণ পর্বতমালা বিশাল থেকে বিশালতর হয়েছে। দশ হাজার ফুট থেকে আঠারো হাজার ফুট অবধি তাদের উচ্চতা। এদেরই ভিতরে ভিতরে বয়ে চলেছে তুষারবিগলিত নদী, মাঝে মাঝে পথভোলা টুকরো মেঘদলের কচিৎ বর্ষণ। এই ভূভাগের মধ্যে শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপত্যকা স্বর্ণরেণুবিধৌত নদীর দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু এই সকল আশ্চর্য অমরাবতীর মধ্যে মানববসতির সংখ্যা কম। এসব অঞ্চলে এমন কঠিন ঠাণ্ডা, মেরু-বাতাস এত প্রবল যে, যে সকল যাযাবর জাতি এক অঞ্চল থেকে সরে অন্য অঞ্চলে গিয়ে 'ডেরা' বাঁধে, তাদের মধ্যে সুতীবস্ত্রের ব্যবহার সামান্যই। জন্তুর চামড়া,

ভেড়া-ছাগলের লোম, পরিধেয় ছিন্নভিন্ন কম্বল, কাঠ ও পাথরের ঘর, চর্বির আলো, যবের রুটির সঙ্গে পোড়া অথবা আধসিদ্ধ মাংস, শস্যজাত একপ্রকার দুর্গন্ধ তাড়ি—এই নিয়ে তাদের প্রাণযাত্রা। যদি কোনও সময়ে তাদের খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটে, যদি স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে, যদি অত্যধিক তুষারপাতের ফলে তাদের জীবন বিপন্ন হয়—তবে তারা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

'শারদাভূমি' কাশ্মীরের কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকায় সেকালের বাঙালী জাতির 'গৌড়ীয়' একটি শৌর্যের ইতিহাস আজও রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। সেটি না বললে উত্তর কাশ্মীরের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

সম্রাট ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড় ছিলেন দিগ্বিজয়ী, দুর্ধর্ষ, গর্বোদ্ধত এবং অতিশয় আত্মাভিমানী। তিনি মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বত জয় করেছিলেন। অদ্যাবধি, তুরস্ক, গ্রীস, আরব, মিশর, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসে সম্রাট ললিতাদিত্যের রাজ্যজয়ের বহু ইতিহাস রচিত আছে। তাঁর সমসাময়িককালে তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হত। তিনি নাকি উত্তর ভারতসহ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এবং দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন। গৌড় ও কলিঙ্গ থেকে তাঁকে হস্তীর পাল সরবরাহ করা হত। রাজনীতিক কারণ অথবা যে কোন কারণেই হোক, বঙ্গ বা গৌড় দেশের রাজাকে তিনি শারদাভূমিতে একদা আমন্ত্রণ করেন। গৌড়রাজ যখন কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকার পরশপুর পরগণার অন্তর্গত ত্রিঁগাও বা ত্রিগম বা 'ত্রিগামী'তে গিয়ে পৌঁছন, তখন সম্রাট ললিতাদিত্যের নির্দেশ অনুসারে গৌড়রাজকে বিশ্বাসঘাতনক্রমে হত্যা করা হয়! ইতিহাস এজন্য সম্রাট ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড়কে বারংবার ধিক্কার দিয়েছে। এটি ৮ম শতাব্দীর কাহিনী।

তৎকালে রাজকীয় আমন্ত্রণলিপির সঙ্গে 'দেবতা-সাক্ষ্য বা মধ্যস্থতা' পাঠানো হত। অর্থাৎ অমুক দেবতাকে 'মধ্যস্থ' রেখে আপনাকে এই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং উক্ত দেবতার প্রসাদ ও আতিথ্য আপনি এসে গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব! পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এই রীতি আজও বর্তমান! সম্রাট ললিতাদিত্য তাঁর আরাধ্য দেবতা শারদাপীঠের শ্রীবিষ্ণু 'পরিহাসকেশবে'র শপথ গ্রহণ করে গৌড়রাজকে সুদূর বঙ্গদেশ থেকে ডেকে এনেছিলেন!

বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন রাজনীতি ইতর, চতুর, কপট এবং দুষ্কৃতিভরা ছিল কিনা, সে ইতিহাস আমার জানা নেই। কিন্তু প্রখর জাতীয়তাবাদী ও আদর্শবাদী বাঙালীর বুকের রক্ততরঙ্গ সেদিন প্রতিহিংসাপরায়ণতায় টগবগ করে উঠেছিল। সেদিন এরোপ্লেন, রেলগাড়ি, মোটর, সাইকেল, ঘোড়ার বা গরুর গাড়ি—কোনটাই ছিল না, অথবা

অশ্বযান বা গো-যান থাকলেও পীরপাঞ্জাল পার হওয়া যেত না। সেকালে গৌড় থেকে কৃষ্ণগঙ্গা কমবেশি দু' হাজার মাইল দূর ছিল। এই সুবৃহৎ দূরত্ব সেদিনকার সেই অপরাজেয় বাঙালী কেমন করে অতিক্রম করে গিয়েছিল সে খবর কেউ রাখে নি, কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায় তারা সংখ্যায় সাত বা আটশ' ছিল। একাল হলে তাদেরকে বলা যেতে পারত, 'Suicide squad', অর্থাৎ আত্মহন্তার দল!

ঐতিহাসিকমাত্রই জানেন, এই সুপ্রাচীন কাহিনীর নির্ভুল বিবরণটি লেখা হয় ঘটনার বহু যুগ পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে। ততদিনে বহু খুঁটিনাটি তথ্য বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেছে। তবু সেই অভ্রান্ত ইতিবৃত্তের বাকি অংশটুকু আরেকবার এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"সেইকালে গৌড়রাজের 'সেবকদলে'র বীরত্ব ছিল আশ্চর্যজনক। তারা সকলেই তাদের রাজার জন্য নিঃশেষে প্রাণদান করেছিল। তারা সদলবলে শারদাদেবী দর্শনের অছিলায় এসেছিল কাশ্মীরে, কেননা তাদের আতিথ্যগ্রহণে দেবীকে 'মধ্যস্থ' (surety) রাখা হয়েছিল। সম্রাট ললিতাদিত্য তখন কাশ্মীরের বাইরে বিদেশে ছিলেন। গৌড়বাসীর দল অতি ব্যস্ত হয়ে মন্দির প্রবেশের চেষ্টা পায়, সেটি লক্ষ্য করে পুরোহিতগণ 'পরিহাসকেশব' বিষ্ণুর মন্দিরদ্বার বন্ধ করে দেন। সেইখানে ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। গৌড়ীয় যোদ্ধাগণ 'পরিহাসকেশবে'র মূর্তি মনে করে রৌপ্যবিগ্রহ 'রামস্বামী' বিষ্ণু মূর্তিটিকে গদিচ্যুত করে, এবং তাদের হাতে সেই মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে পরিণত হয়। শ্রীনগর থেকে সৈন্যদল শারদায় এসে পৌঁছয় এবং সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বাঙালীদলের প্রত্যেককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়!"

ঐতিহাসিক বলছেন, "এই কৃষ্ণকায় যোদ্ধার দল তরবারির আঘাতে যখন খণ্ড-বিখণ্ডিতভাবে ভূপাতিত হচ্ছিল, তখন তাদেরকে দেখা যাচ্ছিল যেমন রক্তাক্ত প্রস্তর খণ্ড, যেন স্ফটিক-পর্বতচ্যুত স্বচ্ছোজ্জ্বল কৃষ্ণাভ ও লোহিতরঞ্জিত কঠিন ধাতুখণ্ড চতুর্দিকে বর্ষিত হচ্ছে! তাদের সেই বক্ষোরক্তধারা অনন্য-সাধারণ রাজভক্তিকেই আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছিল—ভূপৃষ্ঠকে সম্পদশালিনী করেছিল! এই অপরিমেয় শক্তির অধিকারীরা ছিল মানবরত্নের দল। কেমন করে তারা এসেছিল সেই সুদূর দুস্তর পথে, কি প্রকার ছিল তাদের রাজভক্তি—এটি বিস্ময়জনক। গৌড়জন সেদিন যে অসাধ্য সাধন করেছিল, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষেও সে কাজ সম্ভব ছিল না। আজ 'রামস্বামী'র মন্দির শূন্য বটে, কিন্তু গৌড়াগত সেই বীর যোদ্ধাগণের গৌরবে ও খ্যাতিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ!"

॥ ৩ ॥

হিন্দুকুশ-হুনজা-গিলগিট কারাকোরম

উত্তর কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তে মহাঋষি হিমালয়ের ধবলজটা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করেছে। পূর্বপর্বতশ্রেণীর প্রাচীন সংস্কৃত নাম কৃষ্ণগিরিলোক অর্থাৎ কারাকোরম; পশ্চিম পর্বতশ্রেণী হিন্দুরাজ ধীরে-ধীরে বিশালতর হয়ে হিন্দুকুশ গিরিলোকে পরিণত হয়েছে। এই দ্বিধাবিভক্তির সিঁথিমূলের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটপথ উত্তরে চ'লে গেছে মধ্য এশিয়া বা লিটল পামীর উপত্যকায়। কাশ্মীর অংশে এই অঞ্চলের কয়েকটি গিরিপথ ইংরেজ আমলে সুরক্ষিত রাখা হ'ত। এই গিরিসঙ্কটগুলির গায়ে-গায়ে মেলানো থাকত চারটি রাষ্ট্র সীমানা। তারা হ'ল ভারত, চীন, আফগানিস্তান ও সোভিয়েট তাজিকিস্তান। রাষ্ট্রের নামগুলি ছিল পৃথক,—কিন্তু এই চতুঃরাষ্ট্রের সম্মিলিত সীমানা-অঞ্চলের জনসাধারণের ভাষা, জীবনযাত্রারীতি, খাদ্য, ধর্ম, লোকাচার, শিক্ষাদীক্ষা,—প্রায় সমস্ত একপ্রকার। অবশ্য বংশ রক্তধারার ইতিহাসে কিছু পার্থক্য এদের মধ্যে পাওয়া যায়। মঙ্গোলীয়, ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয়ান, তুর্ক-ইরাণী, স্লাভ-তাতারের অবশেষ—ইত্যাদি। ইংরেজরা তাদের স্বাস্থ্য ও শরীরের দিকে তাকিয়ে একশ' বছর ধ'রে ভয়ে-ভয়ে থাকত। এই গিরিসঙ্কটগুলির নাম মিন্‌তাকা, কিলিক দাওয়ান, পার্পিক, খুনজেরাব, দ্বারকোট, বারোঘিল, খুইয়ান ইত্যাদি। সমুদ্র-সমতা থেকে এ অঞ্চল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ফুট উঁচু। এ ভূভাগ অতিশয় জনবিরল। কিন্তু এটি ছিল তিনটি সাম্রাজ্যের সংযোগস্থল। রাশিয়া, বৃটিশ ভারত ও চীন। প্রথম দুটি ছিল পরস্পরের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহশীল এবং তৃতীয়টি কিছু অসাড় এবং ইংরেজের মুখ-চাওয়া। তবু এদিকে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার-ষড়যন্ত্র ও ভারতরক্ষা বাবদ কূটনৈতিক সশস্ত্র ঘাঁটি ছিল অনেকগুলি। তৎকালীন হেড কোয়ার্টারের নাম ছিল, গিলগিট-এজেন্সি। এই এজেন্সির জন্য মস্ত এক দুর্গ নির্মিত হয় ১৯শ শতাব্দির শেষ দিকে।

প্রাচীনকাল থেকে একাল পর্যন্ত কাশ্মীরের সীমানা অনেকবার অদল-বদল হয়েছে। উত্তর সীমানা উত্তর দিকে বেড়েছে সম্ভবত মহারাজা গুলাব সিং ও তৎপরবর্তী ইংরেজ আমলে। মহারাজা যখন কাশ্মীরের দায়িত্বভার নেন তখন কাশ্মীরের উত্তর ভাগ তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল না। উত্তর ভাগে হুনজা, উত্তরপূর্বে দার্দ, উত্তর-

পশ্চিমে বম্‌বা ও চীলাসি প্রভৃতি অনধীন ও স্বচ্ছন্দচারী জাতিগুলির সঙ্গে তাঁর বারম্বার প্রবল সংঘর্ষ বেধে ওঠে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে কেবলমাত্র জম্মুর 'রাজা' ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। অতঃপর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এসে যখন দেখা যায় 'ডোগরা' সম্প্রদায় প্রবল প্রতাপান্বিত এবং শিখ-ইংরেজ যুদ্ধে গুলাব সিং নির্লিপ্ত, তখন তিনি ইংরেজের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করেন। শিখ শাসনের ইতিহাস কাশ্মীরে গৌরবজনক নয়। নিরীহ এবং নিরুপায় কাশ্মীরীরা মোগল আমলের আগে ও পরে যেমন ধর্ষিত, লুণ্ঠিত ও অনাচারপীড়িত হয়েছে, শিখ আমলও তার ব্যতিক্রম নয়। পাঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে ইংরেজের এক অদ্ভুত সন্ধি স্থাপিত হয়, যার ফলে এক কোটি টাকায় লাহোর নগরী ইংরেজ কিনে নেয়। ঠিক জানিনে, তবে স্বর্ণমুদ্রাগুলি বোধ করি তৎকালীন বঙ্গদেশের। সেটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল।

সে যাই হোক, অতঃপর ইংরেজ দলপতি স্যর হেনরি লরেন্সের মধ্যস্থতায় বম্‌বা জাতির পাঠান শাসনকর্তা ইমামউদ্দিনের সঙ্গে গুলাব সিংয়েব সন্ধি ঘটে পশ্চিম কাশ্মীরে—কারণ উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল ইতিমধ্যেই এবং গুলাব সিংয়ের সহায়ক ছিলেন ইংরেজ। এই সন্ধির পরে জম্মুরাজ গুলাব সিংয়ের হাতে কাশ্মীরের যে অংশটি আসে সেটি দক্ষিণ কাশ্মীর। সেই থেকে কাশ্মীরে 'ডোগরা' রাজত্বের শুরু। মহারাজা গুলাব সিং ছিলেন ডোগরা সেনাপতি এবং ডোগরা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক।

'ডোগরা' শব্দটি শুনলে ঠিক দুর্ভাবনা হয় না বটে, তবে ওই শব্দটির সঙ্গে 'গোর্খা' শব্দটির যেন ধাতু মেলে! 'ডোগরা' হল মূল 'দুগড্ডা' শব্দের তৃতীয় অপভ্রংশ! 'দুগড্ডা' নামক পার্বত্য জনপদ আছে কুমায়ুন বিভাগে—কোটদ্বার থেকে কালদণ্ড (লান্সডাউন) পর্বতে যাবার পথে। যাই হোক, জম্মু থেকে কিছু দূরে পাওয়া যায় দুটি হ্রদ—সারুঁয় ও মান সায়র। এই দুটি সায়রের মধ্যবর্তী উপত্যকাটির নাম, 'দ্বিগর্তদেশ', অর্থাৎ দুইটি গর্তযুক্ত একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসী সকল শ্রেণীর জনসাধারণকেই 'ডোগরা' বলা হয়। ডোগরাদের মধ্যে রাজপুতের একটা বড় অংশ আছে। এদের মধ্যে শিখ, মুসলমান, হিন্দু এবং উচ্চ-নীচ সবাই বর্তমান। ডোগরারা পার্বত্য দেশের লোক, সুতরাং কষ্টসহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী! ইংরেজ আমলে কাশ্মীররাজের সহায়তায় এরা সুবিধা পেয়েছিল প্রচুর, সেই কারণে এদের কতকটা খ্যাতিও রটেছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে শিখ, রাজপুত, পাঠান, বালুচ, মারাঠা, কুমায়ুন ইত্যাদি রেজিমেন্টগুলি ডোগরা রেজিমেন্ট অপেক্ষা সাধ্য ও শক্তিতে একেবারেই কম ছিল না। রাওয়ালপিণ্ডি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, হাজারার দক্ষিণাংশ, —এসব অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে পাঠান, বালুচ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রেজিমেন্টের

সাধারণ শক্তিমত্তা এবং দুর্ধর্ষ সাহস লক্ষ্য করতুম। আফগানরাজ আমানুল্লার সিংহাসনচ্যুতি অথবা সীমান্তে ইংরেজ অফিসারের কন্যা শ্রীমতী এলিসের অপহরণকালে আফ্রিদি পাখতুনদের সঙ্গে পূর্বোক্ত সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ কাহিনী এখনও অনেকেই ভোলে নি!

কাশ্মীরের ইতিহাস সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের আদি ইতিহাস অপেক্ষাও প্রাচীন। পৌরাণিক, প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, বর্তমান—ইত্যাদি বহুভাগে কাশ্মীরকে ভাগ করা চলে। কাশ্মীরের ভৌগোলিক ইতিহাসও প্রায় সেই প্রকার। একাদশ শতাব্দির আরব পর্যটক আলবেরুনি থেকে ষোড়শ শতাব্দির আবুল ফজল—এই পাঁচশ' বছরের মধ্যে দেখা যায় যে, যে-কাশ্মীর তাঁদের নিকট পরিচিত সেটি মোটেই বৃহৎ নয়! তার উত্তর ভাগ ছিল হরমুখ পর্বতের এলাকা। পশ্চিমে কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকা, পূর্বে জোযিলা গিরিসঙ্কট এবং দক্ষিণে পীর পাঞ্জালের সীমানা। অর্থাৎ সেই কালের কাশ্মীর চতুর্দিকে বিরাট পর্বতশ্রেণীর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত,—আর তাদের ঠিক মাঝখানে ছিল বিশাল সমতল এক উপত্যকা আপন নদীনালা জলা বিল নিয়ে—যার পরিমাপ হল কমবেশি দুই হাজার বর্গমাইল। ঐতিহাসিক যুগে দেখা যাচ্ছে, তিনজন দিগ্বীজয়ী কাশ্মীরের আশেপাশে ঘুরেছেন, কিন্তু উত্তুঙ্গ প্রাকারবেষ্টিত 'উপত্যকা' আক্রমণ করেন নি,—এবং ওই উপত্যকাই ছিল তৎকালের প্রকৃত কাশ্মীর! এই তিনজনের নাম আলেকজান্দার, চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ।

আলবেরুনির আগে উত্তর কাশ্মীরের ভৌগোলিক ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। কবি কলহন কোথাও এ বিষয়ে উল্লেখ করেন নি তাঁর গ্রন্থে; জোনারাজের তথ্যাবলীতেও পাওয়া যায় না। তারপর ষোড়শ শতাব্দিতে যখন সম্রাট আকবরের কালে কাশ্মীরে শান্তি ও ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখনও হরমুখ বা হরমুকুট পর্বতের উত্তরে কাশ্মীর কতটুকু আছে আমরা জানতুম না। আবুল ফজল তাঁর বইতে জানিয়েছেন, মোট ৩৮টি পরগণায় যে-কাশ্মীরকে সম্রাট ভাগ করেছিলেন সে-কাশ্মীর হল উপত্যকা এবং তার চক্রবেড় গিরিশ্রেণী। উত্তর কাশ্মীর কেবল আজই যে শুধু আমাদের কাছে অন্ধকার তা নয়, সম্রাট অশোকের আগের আমল থেকেই অন্ধকার। গুলাব সিংয়ের আগে শিখপ্রভুত্বকালে নাঙ্গা পর্বতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল 'আস্টোর' এলাকায় এক সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিল। দ্বিতীয় পাহারা বসেছিল, গিলগিট ও হুনজা—এই দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্র গিল্‌গিট উপত্যকায়। মহারাজার ডোগরা সৈন্যদল সেখানে গিয়ে শিখ কমাণ্ডার নাথু শাহকে অপসারিত করে। অতঃপর নাথু শাহ এসে মহারাজার অধীনে চাকরি নেন। কিন্তু কিছুকালের শাসনকর্তা ডোগরা দলকে

আক্রমণ ক'রে গিলগিট এবং তার সঙ্গে পুনিয়াল, ইয়াসিন, দারেল প্রভৃতি এলাকা দখল করে। অতঃপর মহারাজের দুটি সেনাদল আস্টোর এবং বালতিস্তান থেকে 'সাঁড়াশি' কৌশলে এগিয়ে হুন্‌জা শাসক গাউর রহমানের সেনাদলের উপর আক্রমণ চালিয়ে পুনরায় গিলগিট দখল করে। কিন্তু এই অদম্য পার্বত্য জাতির শাসক রহমান সেখানেই নিরস্ত হন নি। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হুন্‌জার মীর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র ডোগরা সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করেন। মহারাজকে গিলগিট ছেড়ে দিয়ে সিন্ধুনদ পেরিয়ে দক্ষিণে রাষ্ট্রসীমানা বানাতে হয়। পরবর্তী আট বছরকাল 'আস্টোর' ছিল মহারাজার সামরিক ঘাঁটি। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, ১৮২০ থেকে ১৮৬০ এই চল্লিশ বছরের মধ্যে উত্তর কাশ্মীরের উত্তর সীমানা সিন্ধুনদ অবধি বিস্তৃত হয়েছিল! ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গুলাব সিংয়ের মৃত্যু ঘটে। গুলাবের পুত্র রণবীর সিং মহারাজা হন এবং তিনি তাঁর সেনাধ্যক্ষ দেবী সিংকে ডোগরা সৈন্যদল সহ গিলগিট বিজয়ে পাঠান। এই অভিযান পরোক্ষভাবে ইংরেজ রাজের সহায়তা লাভ করে। দেবী সিংয়ের সৈন্যদল সিন্ধুনদ পার হবার কালে সংবাদ আসে, গাউর রহমানের মৃত্যু ঘটেছে। ডোগরা সৈন্যদল নদী অতিক্রম করে গিয়ে পুনরায় গিলগিট দখল করে। গিলগিট অধিকারের পর যদিও উত্তর সীমান্ত মহারাজার আধিপত্যের মধ্যে আসে, কিন্তু হুন্‌জা এবং পার্বত্য জাতির সঙ্গে কাশ্মীর রাজের মনোমালিন্য ঘোচে নি। দলিলপত্রে কাশ্মীর রাজের শাসনাধীন থাকলেও আসলে ইংরেজ অতি নিঃশব্দে আস্টোর, চিলাস, বুন্‌জি, দাস, রন্দু, স্কার্দু প্রভৃতি এলাকা এবং সিন্ধুর উত্তর পারে গিলগিট এজেন্সীর মারফৎ তেরু, ইয়াসিন, ইস্কুমান, গুপিস, শেরকিলা এবং অন্যান্য উপজাতির অঞ্চলে কড়া পাহারা মোতায়েন করে। এই কড়া পাহারাই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যেটি কাশ্মীররাজেরও অনেকটা অগোচরে থেকে যায়! এরই ফলাফল স্বরূপ আফগান যুদ্ধ ঘনিয়ে ওঠে কয়েক বছরের মধ্যে। এই গিলগিট এজেন্সী এলাকা থেকেই রাশিয়ার জারের সাম্রাজ্য সীমানা নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হত, এবং যতদূর মনে হয়, পামীর এলাকায় দু'একবার সংঘর্ষও বুঝি বেধে ওঠে! চীন সাম্রাজ্য তৎকালে অসাড় ছিল, এবং পূর্বলোকে তাকলা মাকান তথা সিনকিয়াঙের মরুপার্বত্য জগতে তখন 'পীতাতঙ্কে'র জন্ম হয় নি! সেই কারণে ইংরেজের সতর্ক প্রহরা এবং উৎকর্ণ চক্ষু থাকত পশ্চিম ও উত্তরের দিকে। রাশিয়ার জারকে ইংরেজ কোনদিন বিশ্বাস করে নি।

এর পর উত্তর কাশ্মীরের উপর দিয়ে চলে যায় মোটামুটি পঞ্চাশ বছর, এবং ততদিনে ভারতে ইংরেজ সম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তি রচনা করে। কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে আসে দিল্লীতে। ক্রমে ক্রমে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, রাওয়ালপিণ্ডি ও হাজারা

জেলায়, চিত্রল ও চিলাসে অর্থাৎ বেলুচিস্তান থেকে উত্তর কাশ্মীরের শেষ প্রান্ত অবধি—দক্ষিণ থেকে সুদূর উত্তরে শত শত মাইলব্যাপী এক একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করা হয় এবং তাদের প্রত্যেকের নাম দেওয়া হয় ক্যান্টনমেণ্ট। এই সকল ঘাঁটি দুটি কমাণ্ডের দ্বারা পরিচালিত হ'ত,—নর্দার্ন ও ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ড। এদের প্রধান দপ্তর ছিল শিমলার পথে 'ডগসাই' নামক শহরে। ভারতীয় মশা-মাছি সেখানে ঢুকত না!

অতঃপর রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবকালে এই দুটি কমাণ্ডেরই টনক নড়ে। পৃথিবীর তেরোটি জাতির সঙ্গে ইংরেজও চেষ্টা পায় এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তারা ভারতের সর্বত্র বলশেভিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব'লে বেড়ায়, এবং প্রচারকার্যের দ্বারা দেশময় একটি ত্রাসের সঞ্চার করে। এই সময় উত্তর কাশ্মীর ও আফগান সীমানা থেকে তারা রুশবিপ্লবের 'রেডগার্ড'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে সামরিক বাহিনী পাঠায়, এবং সংগোপন শত্রুতার বিভিন্ন পন্থা বার করে। এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে 'রাশিয়ার ডায়েরী'তে আমি আলোচনা করেছি।

দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম সভ্যতার জন্ম হয় নি। আড়াই হাজার বছর আগে 'হিন্দু' শব্দটি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিল কিনা তার আলোচনাও আমার পক্ষে অনধিকার। আরবী বা পারসিক লিপি দেখে যেমন মুসলমানকেই শুধু মনে পড়া উচিত নয়, তেমনি দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা দেখেও শুধু 'হিন্দু' শব্দটি ভাবতে চাইনে! উত্তর কাশ্মীরে যে সকল উপজাতির বাস ছিল, তারা কোন্ লিপি বা ভাষা ব্যবহার করত, আমরা তার খবর পাই নি। কিন্তু তারা যে এককালে বৌদ্ধ-প্রভাবে আসে, তার পরিচয় ও ইতিহাস আছে অজস্র। উত্তর কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিমে চিলাস উপত্যকার 'দারিল' নামক জনপদে মৈত্রেয় বুদ্ধের যে বিরাট দারুমূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেটি দু'হাজার বছরেরও আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। ছোট ছোট উপজাতির মধ্যে যে-যুগে কোনও প্রকার 'ধর্মমত' প্রচলিত ছিল না, সেইকালে বৌদ্ধদর্শন বা জাতিনির্বিশেষে সমাজব্যবস্থার রীতিগুলি উত্তর কাশ্মীরের বহু অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের বড় রকমের কোনও বিরোধ বাধে নি। বৌদ্ধ এবং মুসলমানদের মধ্যে কায়িক সংঘর্ষের সংবাদ শোনা যায় কম। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগেও মধ্য এশিয়ায় এবং সিনকিয়াঙে, মঙ্গোলিয়ায়, চীনে, বর্মায়, বা ইন্দোনেশিয়ায়—কোথাও বড় রকমের বৌদ্ধ-মুসলমানে লড়াই বাধে নি। সামাজিক ভেদনীতি, জাত্যাভিমান বা জাতিবৈষম্য, আনুষ্ঠানিক কুসংস্কার, উচ্চনীচ বিচারের কঠোরতা, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব, শ্রেণী-বিচার—প্রভৃতি মূল বিরোধের কারণগুলি উভয়ের মধ্যে কোথাও উগ্র হয় নি।

মহারাজা গুলাব সিংয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল, তিনি কাশ্মীরের সামগ্রিক চেহারায় একটি সংহতি সৃষ্টি করেছিলেন। রাজ্যবিস্তারের অভিসন্ধি অপেক্ষা কতগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, উপেক্ষিত এবং অরাজক অঞ্চলকে একত্র করে একটা রাজনীতিক সমন্বয় সাধন করা—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভারতীয় সামন্ত নরপতিদের মধ্যে উত্তরে কাশ্মীরের মহারাজা এবং দক্ষিণে হায়দরাবাদের নিজাম-উল-মুলুক—এঁদের দুজনকে ইংরেজ সর্বাপেক্ষা বেশি 'স্বাধীনতা' দিয়েছিল। কিন্তু উত্তর কাশ্মীরের রাজনীতিক সীমানারক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ কখনও কাশ্মীররাজের পরামর্শ নেয় নি! 'গিলগিট এজেন্সী'তে ইংরেজ বসেছিল শুধু কাশ্মীরকে পাহারা দেবার জন্য নয়, ভারত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রেখে নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করার জন্য। (Frederic Drew—1875)

দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের কোনও কালের ইতিহাসে উত্তর-কাশ্মীরের রাজনীতিক সীমানা নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয় নি! কিন্তু এ ঘটনা অনস্বীকার্য, সর্বকালের মধ্যে প্রথম ইংরেজ জাতি—যাদের তত্ত্বাবধানে এবং অনলস পরিশ্রমে ভারত রাষ্ট্রের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা মোটামুটি প্রথম নির্ভুলভাবে জরীপ ও নির্ধারণ করা হয়। এই কর্মে রাশিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, চীন, তিব্বত, বর্মা ইত্যাদি প্রত্যেকের সমর্থন পাওয়া যায়। গিলগিট পর্যন্ত ছিল জানা পথ, গিলগিটের উত্তরে সমস্তটাই অজানা। মানব-বসতিচিহ্নহীন শত শত পার্বত্য বর্গমাইল এলাকায় দক্ষিণ কাশ্মীরের বা ভারতবর্ষের,—কেউ কখনও পদার্পণ করে নি। সেখানে রাজনীতিক সীমানার দাগ কেউ টানে নি, এবং সেখানকার খবরও কেউ রাখে নি। উত্তর কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হুন্‌জা নদীর দুই পারই হিন্দুরাজ পর্বতমালার অন্তর্গত। কিন্তু কোন্ পারটি আফগানদেশ, আর কোন্‌টি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীর—এটি সেই কালের হুন্‌জা জাতি ভাবে নি। তারা উভয় পারেই আজও বাস করে, এবং সমগ্র ভূভাগটিকেই তারা জানে হুন্‌জা দেশ! কাশ্মীর বা আফগান—কোনও দেশকেই তারা কখনও রাজস্ব দেয় নি, বা অদ্যাবধি কারও কাছে তারা সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারও করে নি। গিলগিট এলাকা ধ'রে উত্তর-দক্ষিণে একশ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আড়াইশ' মাইল—এই ভূভাগটিকে এরা 'হুন্‌জা-দেশ' বলে জানে,—এটিকে এরা কাশ্মীর বলে না! আমার হিসাবটি হল মোটামুটি এবং কমবেশি। বর্গমাইলের হিসাব আমি করি নি। হুন্‌জার পার্বত্য জাতিরা হিন্দুরাজ এবং 'মস্তাগ' গিরিশ্রেণীর সঙ্গেই সংলিপ্ত। এরা একালের মুসলমান,—আফগানি মোল্লাদের দ্বারা ইসলামভুক্ত। কিন্তু ওরই মধ্যে আছে দুইভাগ—শিয়া এবং ইসমাইলি। যেমন একই বাঙ্গালী—কিন্তু শাক্ত আর বৈষ্ণব! এরা মেষপালন করে, কম্বল বা জন্তুর চামড়ায় গা ঢাকে, ভুট্টা জন্মায় যদি থামার পায়, লবণ আনায় সিনকিয়াং-এর ওদিক থেকে, পাথরের ঘরে থাকে, জন্তুর

চামড়া ওপর দিকে বিছিয়ে। পামীরের প্রচণ্ড, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ এবং তুহিন ঝড়ো হাওয়া ও তার সঙ্গে অনাবৃষ্টি হুন্‌জাদেশে লতাদূর্বা কোনটাই সহজে জন্মাতে দেয় না। বোধ করি সেই কারণেই এরা সহজে হিংস্র হয়ে ওঠে! কাশ্মীরিদেরকে এরা বিশ্বাস করে না, এবং এরা অবিভক্ত পাঞ্জাবের হিন্দু বা মুসলমানকে একই প্রকার অশ্রদ্ধা করে! হাল আমলের পাকিস্তানের সঙ্গেও এদের সুখের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় নি। একটা না একটা বিরোধ উভয়ের মধ্যে লেগেই থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নূতন চীনের শাসকবর্গ সম্প্রতি সন্দেহ করেন ইংরেজদের জরীপের কারচুপিক্রমে তাগদুম্বাস পামীরের একটা অংশ হুন্‌জাদেশের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে, এবং এ কাজে রাশিয়া ও আফগানিস্তানের সমর্থন ছিল। সে যাই হোক, পামীর-পাঠান, যারা পশ্চিম কাশ্মীরে চল্লিশ দশকে আশ্রয় পেয়েছিল, হাজারার পাঠান আফ্রিদি-পাঠান ও দক্ষিণী বালুচ-পাঠান—যারা প্রবল জাতীয়তাবাদী,—তারা হিন্দু বা মুসলমান—উভয়কেই অপছন্দ করে এবং তাদেরকে 'হিন্দুস্তানী' বলে। ভারতে উর্দু যাঁদের মাতৃভাষা, এবং আরবী লিপি যাঁদের প্রাথমিক শিক্ষার সোপান,—যেমন আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু—এঁরাও ভারতকে 'হিন্দুস্তান' বলতেন!

গিলগিট এজেন্সীর পশ্চিমে 'শিনাকি' নামক একটি পার্বত্য উপজাতি অঞ্চল 'চিলাস' এলাকার মধ্যে পাওয়া যায়। এটির একটি অংশ সিন্ধু-কোহিস্তানের মধ্যে পড়ে। এসব অঞ্চল অজানা রহস্যে ঘেরা এক একটি পার্বত্য এলাকা,—এদের আশে পাশে সিন্ধু উপত্যকা ছোট ছোট হরিৎক্ষেত্রের ছোপ ফেলেছে। মাঝে মাঝে জনশূন্য বন্য ভূভাগে মহাস্থবিরের মতো দণ্ডায়মান বনস্পতি আপন খুশি মতো রচনা করে চলেছে অপার্থিব একেকটি ভূস্বর্গলোক। সেখানে অনৈসর্গিক জ্যোৎস্নারাত্রে অতিকায় বন্য-জন্তুরা এসে আপন দেহগাত্র ঘর্ষণের দ্বারা বৃদ্ধ বনস্পতির জানুদেশে একপ্রকার নিগূঢ় বনগন্ধ রেখে চলে যায়! 'চিলাসে'র প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে একদা 'সঙ্ঘমিত্রে'র দল মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহারাজা গুলাব সিং পার্বত্য চিলাস এলাকা জয় করেন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, এবং এটিকে গিলগিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গিলগিটে বৃটিশ এজেন্সীর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ মহারাজাদের মারফৎ ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহ, সংঘর্ষ, অশান্তি ইত্যাদি শেষ হবার পর যখন শান্ত ও নিরাপদ অবস্থা ফিরে আসে! বলা বাহুল্য, ইংরেজ এবং গুলাব সিং উভয়ে প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল যাবৎ অনেকটা একযোগে কাজ করে গেছেন। উত্তর কাশ্মীর এবং লাদাখের বহিঃসীমানার রক্ষণদায়িত্ব ইংরেজ নিজের হাতে নিয়েছিল।

রাজা গুলাব সিংয়ের একজন দুর্ধর্ষ, অপরাজেয়, অসমসাহসিক এবং দীর্ঘকায়

দানবের মতো উজীর সেনাপতি ছিলেন। জম্মু রাজ্যে তিনি ভয় ও বিস্ময়ের পাত্র ছিলেন। তাঁর নাম জরোয়ার সিং এবং তিনিও ডোগরা ছিলেন। জরোয়ার সিংয়ের খ্যাতি যখন সর্বত্র প্রচারিত, তখনও গুলাব সিং কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন নি। তিনি তখন শুধু জম্মুরই শাসনকর্তা। রাজা তাঁর উপাধি। পঁচিশ বছর কাল জম্মু শাসন করার পর তিনি কাশ্মীরের গদি লাভ করেন। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে তাঁর সেনাপতি এবং উজীর জরোয়ার সিং মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের প্রশ্রয়ে দুই প্রধান ভূভাগ জয় করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লাদাখ, এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালতিস্তান। এ দুটি ভূভাগ ভারতীয় বৌদ্ধ হলেও এদের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সিকিম ও ভুটানের সঙ্গেও তিব্বতের এই প্রকার যোগাযোগ বহুকালের।

পুরা-ইতিহাসে বালতিস্তান সঠিকভাবে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না, কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুস্তানের একটি দূরবিক্ষিপ্ত এলাকা হিসাবে ওটাকে ধরা হ'ত। অষ্টম শতাব্দীতে গান্ধারের (পেশাওয়ার) পথ দিয়ে একজন চৈনিক তীর্থযাত্রী ভারতে আসেন এবং চল্লিশ বৎসরকাল কাশ্মীরে তিনি বসবাস করেন। তাঁর নাম 'ওউ-কং'। তিনি তৎকালীন কাশ্মীরে তিনশত বৌদ্ধ গুম্ফা এবং বহু সংখ্যক স্তূপ ও মূর্তি দর্শন করেন। তিনি যখন বালতিস্তানের বৌদ্ধ বিহারগুলি পরিদর্শন করেন, তখন এই প্রদেশের আঞ্চলিক নাম ছিল 'পো-লিউ'। তৎকালে এই প্রদেশের অধিবাসী 'দারদ' জাতি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছিল। পৃথিবীতে যে কয়টি ভয়ভীষণ ঠাণ্ডা দেশ আছে— যেমন আলাস্কা, নভাজেমব্লিয়া, আইসল্যাণ্ড ইত্যাদি—তাদের মধ্যে এই বালতিস্তান অন্যতম। এই ভূভাগে কেবলমাত্র যে চিরতুষারাচ্ছন্ন কারাকোরম পর্বতমালা সমগ্র উত্তর ও পূর্বদিগন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে তাই নয়, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে বা কোনও পার্বত্যলোকে এত অধিক সংখ্যক হিমবাহ নেই। এই বিরাট পর্বত-শ্রেণীর ভারতীয় নাম কৃষ্ণগিরি শ্রেণী, কিন্তু সিনকিয়াঙের অধিবাসীরা একে কবে থেকে যেন আখ্যা দিয়ে রেখেছে, 'কারাকোরম্'। এটি ইদানীং এই নামেই পরিচিত। এই বিরাট হিমভূভাগ বহুশত বর্গমাইলে পরিব্যাপ্ত। এখানকার গুরুগুরু মেঘনাদের মতো হিমবাহধ্বনি (rumbling) সমগ্র আকাশ-বাতাস ভূ-মণ্ডলকে ঘন কুহেলিকার অন্ধকারের মধ্যে যেন মহাপ্রলয়ের আতঙ্কে ভ'রে তোলে। তরল জলধারা এখানে কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন কাজ। জীবনধারণের নিত্য কর্তব্য এখানে সর্বদাই সমস্যাসঙ্কুল। বোধ করি ভূপৃষ্ঠের জন্মের আদি ইতিহাস থেকে অদ্যাবধি হিমবায়ু এই ধূমেল ভূভাগকে চিরদিন অসাড় ক'রে রাখে। এরই উপর দিয়ে যখন উত্তর মেরুর প্রচণ্ড তুষার বায়ু ঝড়ের ঝাপট দিতে থাকে, তখন মনে হয় সৃষ্টি রসাতলে চলল! এই প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি, জনৈক রুশ বিমানচালক আমাকে

এগুলি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। একখানি রুশীয় বিমানের 'ককপিটে'র মধ্যে নাসাগ্রভাগে বসিয়ে তিনি আমাকে হিন্দুকুশ ও কারাকোরমের শীর্ষলোক এবং তাদের পারিপার্শ্বিক চেহারা উত্তমরূপে দেখিয়েছিলেন। এই ভূভাগ জীবজন্ম ও তৃণ-লতাশূন্য। এখানকার হাজার হাজার হিমবাহের মধ্যে পৃথিবীর অগণ্য অভিযাত্রী 'কে-১' ও 'কে-২' বিজয়যাত্রার পথে অপমৃত্যুর গর্ভে মিলিয়ে গেছে কতবার। নিজ নিজ আকাররক্ষার (Configuration) প্রাকৃতিক তাগিদে কখন এই সকল হিমবাহের বিদারণ ঘটে, এবং এক একটি বিরাট ফাটল (Crevasse) ভয়-ভীষণ মৃত্যুর মতো মুখব্যাদান করে, তখন তাদের সেই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী বজ্রনাদন মহাতপা ধরিত্রীর ভিতরে-ভিতরেও হৃৎকম্প আনে!

এই কৃষ্ণগিরিশ্রেণী বা কারাকোরম সুদূর উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তরক্ষীর কাজ করে এসেছে চিরকাল। এর উত্তরে 'সারিকোল' এবং 'মস্তাগ আতা' এবং পূর্বে 'আঘিল' গিরিশ্রেণী—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সিন কিয়াংয়ের মধ্যে পড়ে। কৃষ্ণগিরির পূর্বপর্বতশ্রেণী যেখানে 'আঘিল'-এর সঙ্গে মিলেছে উত্তর ও দক্ষিণে—তারই ভিতরে-ভিতরে পাওয়া যায় অনেকগুলি গিরিসঙ্কট। এগুলির নাম আঘিল, মার্পো-লা, শক্সগাঁও, কারাকোরম. কারাতাগ,—ইত্যাদি। এই সকল গিরিসঙ্কটের পথ মোটামুটি ষোল থেকে প্রায় উনিশ হাজার ফুট উঁচু উপত্যকা পেরিয়ে এসেছে। যে-কালে রাজনীতিক রাষ্ট্রীয় সীমানা নিয়ে আন্তর্জাতিক ইতরতা ছিল না, সেই কালে পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় আনাগোনার জন্য এই গিরিপথগুলি ছিল অবারিত। চিরদিন ধরে এই সকল পথ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পণ্যসম্ভার নিয়ে ব্যবসায়ীরা আনাগোনা করেছে। এসব অঞ্চলে পথ একটি দুটি নয়,—প্রতিটি সঙ্কট মানেই এক একটি পথ। মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে উত্তর কাশ্মীর অতিক্রম করে গিলগিট চিলাস হয়ে দু হাজার বছর আগে থেকে পণ্যসম্ভার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল আনাগোনা করেছে 'উরসা' ভূমি (হাজারা জেলা) হয়ে গান্ধার দেশে। এই সকল পথ দিয়েই এসেছে সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতিনিধিদল। যারা আসত তারা সেকালের কবি, দার্শনিক, মনীষী, ঐতিহাসিক এবং পরিব্রাজক। সেকালে কৃষ্ণগঙ্গা, হরমুখ এবং জোঘিলার উত্তরভাগকে কেউ 'কাশ্মীর' বলে নি,—যেমন বাল্‌তিস্তান, লাদাখ, হুন্‌জা, গিলগিট—এগুলি তৎকালে 'হিন্দুস্তান'-এর এক একটি মধ্য এশীয় এলাকা বলে পরিচিত ছিল। এই সকল ভূভাগে যে সব জাতির বসবাস ছিল তারা ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দোব্যাকৃট্রিয়ান তুর্ক-ইরানি প্রভৃতি নানা জাতির লোক। অদ্যাবধি এদের বর্ণ, স্বাস্থ্য, মুখশ্রী, দেহ-গঠন, শারীরিক বিশালতা—সমস্তগুলি সুদৃশ্য। যাই হোক, অতঃপর ঐতিহাসিক যুগে আন্তঃসামাজিক ও বহিঃসামাজিক যোগাযোগের ফলে হুন্‌জা, তুর্ক, আফগান,

তাজিক, কিরগিজ, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় মিলিয়ে হুন্‌জা ও দার্দরাই গিলগিট, বালতিস্তান প্রভৃতি এলাকায় নিজেদেরই শাসন ব্যবস্থা গড়তে থাকে—যার সঙ্গে এককালে কাশ্মীর বা হিন্দুস্তানের সামান্যই কায়িক যোগাযোগ ছিল। এই সময়কালেই তুর্ক-ইরাণ-পাঠানরা ধীরে ধীরে এই সকল কাশ্মীরোত্তর হিন্দুস্তান এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এই 'পিতৃ-মাতৃহীন' অঞ্চলগুলিকে যখন ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করতে থাকে, তখন প্রাকারবেষ্টিত মূল কাশ্মীর উপত্যকার হিন্দুজাতি একটি অঙ্গুলি হেলনও করে নি! এই হিন্দুজাতি ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং কূটস্থ। এর সম্রাট অশোকের কাল থেকে সম্রাট আকবরের কাল অবধি ঘরের বাইরে আসে নি বা বাইরের হিন্দুজাতিকে এরা কোনও কালে বিশ্বাস করে নি, এবং নিতান্ত সুপরিচিত 'হিন্দু' ছাড়া এরা 'পীর পাঞ্জাল'-এর দরজা খোলে নি। প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'পাঞ্জাল' শব্দটি মূল 'পাঞ্চাল' শব্দের রূপান্তর। এটি পুরাকালের 'পাঞ্চালদেব' নামক তীর্থস্থান। এর আরেকটি নাম 'পাঞ্চালধারা'। ঠিক এই প্রকার বানিহাল শব্দটিরও মূল হল 'বনশাল', তার থেকে 'বানশাল'। অর্থাৎ 'শ' হয়েছে 'হ', যেমন সিন্ধু (হিন্দু), মাস (মাহ), সহস্র (হাহ্‌জার) ইত্যাদি। স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু এখনও 'পাঞ্চাল' এবং 'বান-হাল' বলে। পীর শব্দটি পারসিক। বহু কাল পূর্বে জনৈক ধর্মপরায়ণ এবং তপস্বী ফকির এই গিরিসঙ্কটে দেহত্যাগ করেন। এ অঞ্চল তাঁরই নামাঙ্কিত। ইদানীং বহু গিরিসঙ্কটের সঙ্গে 'পীর'শব্দটি যুক্ত। তারা অনুকরণ মাত্র।

যা বলছিলুম। একটি অস্বাভাবিক এবং অনড় আত্মতুষ্টির ভাব কাশ্মীরী হিন্দুদেরকে অবরোধের মধ্যে চিরকাল রেখে এসেছে। বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢোকে নি। ভিতরের হাওয়া বাইরে বেরোয় নি। অমন যে আশ্চর্য কাশ্মীরের ইতিহাস, 'রাজ-তরঙ্গিণী'—যে-ইতিহাস পৃথিবীবাসীকে আজ মুগ্ধ করেছে, তার ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন, 'রাজ-তরঙ্গিণীর' মূল পাণ্ডুলিপি লেখা হয় 'শারদা' লিপিতে, যেটি কাশ্মীরের নিজস্ব। সেই মূল পাণ্ডুলিপি থেকে দেবনাগরী অক্ষরে রূপান্তরিত রাজতরঙ্গিণীর অধিকাংশ পত্রাবলী অত্যন্ত অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় খুঁজে পান জনৈক তরুণ ইংরেজ পণ্ডিত। তাঁর নাম মিঃ এম এ স্টাইন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের বাড়িতে তিনি ইতিহাস গবেষণার ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যান। সে ভদ্র-লোকের নাম পণ্ডিত জগন্মোহনলাল হুন্দ। এই দেবনাগরী লিপির বয়স ততদিনে দেড়শ' বছরও পেরিয়ে গেছে। অতঃপর অতি প্রসিদ্ধ অপর এক কাশ্মীরী পণ্ডিত, প্রতিভাবান ও মনস্বী এবং বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত গোবিন্দ কাউলের সাহায্যে স্টাইন সাহেব সেই পাণ্ডুলিপির আনুপূর্বিক পাঠোদ্ধার করেন। কবি কল্‌হন—যাঁর মূল

নাম ছিল 'কল্যাণদেব' এবং যিনি তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় রাজমন্ত্রী চম্পকের পুত্র—তিনি শারদালিপিতে এবং সংস্কৃত ভাষায় 'রাজতরঙ্গিণী' রচনা করেছিলেন (১১৪৮ খৃঃ)। এই সূত্রেই খোঁজ পাওয়া যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে মূল সংস্কৃত থেকে রাজতরঙ্গিণী প্রথম অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৯-৮৭ খৃষ্টাব্দে। সে-বই দু খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। সেই মূল্যবান বইটি এখন পাওয়া যায় কিনা জানিনে।

কৃষ্ণগঙ্গার উত্তরভাগ, হরমুকুটের উত্তরভাগ এবং জাস্কার গিরিশ্রেণীর উত্তরভাগ,— এই তিনটির উপর দিয়ে সমান্তরাল রেখা যদি টানি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, তবে উত্তর অংশে যে-ভূভাগ পড়ে সেটির সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর কোনওকালেই কোন পরিচয় নেই। এসব অঞ্চলে বিশেষ 'ছাড়পত্র' ছাড়া ভারতবাসীর পক্ষে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইংরেজ বা ইংরেজপক্ষের এক আধজন অফিসার অথবা ইংরজ সেনাধ্যক্ষ—এদের পথ ছিল অবারিত। এই প্রদেশগুলিতে আনুমানিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দুটি প্রধান কাজ ইংরেজরা সম্পন্ন করেছে। এ দুটিই ভারতবাসীর পক্ষে তৎকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ছিল। প্রথমটি হল জরীপের কাজ। সমগ্র কারাকোরম পার্বত্যলোক, পামীর ও সিনকিয়াংয়ের অংশ, বালতিস্তানের এক একটি জগৎ প্রসিদ্ধ হিমবাহ—যেমন দিস্তেঘিল, কানজুত, বিয়াফো, হিস্পার, সিয়াচেন, বলতোরো, উর্দক, বাটুরা, রিমো এবং এ-ছাড়া তাগ্‌দুম্বাস পামীরের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণে বালতিস্তান এবং হুনজার অনধিগম্য পার্বত্য উপত্যকা, বৃহৎ অনামা নদীপথের ভয়াবহ খাদ, বিভিন্ন তুষার হ্রদ, বহু সংখ্যক পর্বতচূড়ার নির্ভুল উচ্চতা এবং সামগ্রিক বর্গ মাইলের প্রকৃত পরিমাপ, এ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে ইংরেজ অভিযাত্রীমহলের বিজ্ঞানীর দল চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু ভারত-সাম্রাজ্য অনির্দিষ্টকাল অবধি তাঁদের দখলেই থাকবে এ কাজগুলির মধ্যে সে-আশ্বাসও তাঁদের ছিল।

কাশ্মীরোত্তর হিন্দুস্তান এলাকায় পৌঁছবার তিনটি পথ বরাবর প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে একটি হল হাজারা ও চিলাসের ভিতর দিয়ে গিলগিট রোড, এবং এটি হুনজা অঞ্চল দিয়ে যেতে হয় কারাকোরমের দিকে; দ্বিতীয়টি শ্রীনগর থেকে উত্তর পথে মিনিমার্গ হয়ে বুর্জিল দাস, আস্টোর এবং বুঞ্জিতে মহাসিন্ধু পার হয়ে গিলগিট। এ-সকল পথ অন্তহীন ও দুস্তর গিরিমালায় সমাকীর্ণ, এবং তাদেরই মধ্যে এক একটি মনোরম উপত্যকা। তৃতীয় পথটি লাদাখের রাজধানী লেহ্ জনপদের দিক থেকে সোজা উত্তরে চির রহস্যময় 'নুবরা' ও 'শিয়োক' উপত্যকার ভিতর দিয়ে। উপত্যকা

শব্দটি শুনতে ভাল, কিন্তু সেটি যদি ১২ হাজার থেকে ২২ হাজার ফুটের উপরে গিয়ে পার্বত্যসমতল হতে থাকে তবে সেটি সহজসাধ্য নয়। এটি শুনে রাখা বোধ হয় দরকার, এভারেষ্ট শৃঙ্গ অভিযানের পথ অপেক্ষা কারাকোরমের পথ অনেক বেশি দুঃসাধ্য। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাবনার কারণ এই, এখানে প্রকৃতি হলেন ক্ষণমর্জীসম্পন্না এবং চটুল। বাতাবরণ মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল। যে অগণন হিমবাহ কারাকোরমকে ভীষণতর করে রেখেছে সেগুলির স্বভাব প্রকৃতির অনিশ্চয়তা এবং এক একটি হিমবাহ ২০, ৩০ বা ৫০ মাইলেরও বেশি লম্বা। অপরাহ্নকালে যখন হিমবাহগুলির থেকে নীলকায়া রাক্ষসীরূপিণী 'বন্যাপ্রবাহ' নামতে থাকে তখন তাদের সেই বিপুল মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক অভিযাত্রী যেন আপন বক্ষোস্পন্দনের দুরু দুরু শব্দ শুনতে পায়। বলা বাহুল্য, বীরের, বলিষ্ঠের এবং বেপরোয়ার বুকের রক্ত চিরদিন উদ্দাম চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে ওঠে। ইংরেজরাই হিমালয় ও কারাকোরমের প্রথম প্রেমিক।

কাশ্মীরে সিন্ধুর শাখা-প্রশাখা ও উপনদী অনেকগুলি, সেই কারণে সিন্ধু একটি সাধারণ নাম। ওর জটাজটিলতা বা শিরা-উপশিরা কোথায় কতটুকু 'ইন্দুস' নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেটি বলা সহজ নয়। কিন্তু যে-নদ 'ইন্দাস' বা 'ইন্দুস' নামে সর্বত্র প্রচারিত, আমি সেইটিকেই 'মহাসিন্ধু' আখ্যা দিচ্ছি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত আমুদরিয়া নদী অতি বৃহৎ, সমগ্র পামীরের জল নিয়ে সে পূর্ব থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম পেরিয়ে 'তারমেজ' নগরী ছাড়িয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে 'আরল হ্রদে'র দিকে। 'শিরদরিয়া'ও তাই। তিয়েনসান থেকে তার উৎপত্তি এবং উত্তর মরুপথ দিয়ে আরলের দিকে তার গতি। কিন্তু 'মহাসিন্ধু'র ইতিহাস অন্যরকম। এমন 'সর্বগ্রাসী' নদ এশিয়ার মধ্যে নেই বললেই হয়। এই নদের জন্ম তিব্বতে। অতঃপর দক্ষিণ লাদাখের অন্তর্গত রূপস্থ এবং উত্তরের দেপসাং, আকসাই চিন, চাংচেনমো প্রভৃতির জল স্নুবরা ও শিয়োক নদীর সাহায্যে মহাসিন্ধু গ্রহণ করে থাপালু ও স্কার্দুর কাছাকাছি এসে, এখান থেকে গিলগিট পর্যন্ত আপন ক্রোড়ে সে শত শত উপনদীর সাহায্যে সমগ্র কারাকোরমের প্রতিটি নদী ও দুরন্ত হিমবাহধারাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। ওখানে গিলগিট, ইয়াসিন, হুনজা, নাগার, থুইয়ান, ইসকুমান, নাগিট, বলতিং, শক্সগম—প্রভৃতি বহু নদী নেমে এসে 'বুনজি' জনপদের নিকট মহাসিন্ধুতে মেলে। তারপর এই নদ গোর ও চিলাস জনপদের ধার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোহিস্তানে প্রবেশ করে। চিত্রলরাজ্য এবং কোহিস্তানের মাঝখানে 'শ্বেত' এবং 'দীর', চিত্রলের 'ইয়ারখুন', আফগানিস্তানের 'কুনার', এবং জলালাবাদের 'কাবুল' নদী—এরা একে-একে যুক্ত হয়ে এসে মিলেছে পেশাওয়ার পেরিয়ে 'আটক'-এর কাছাকাছি। আটক থেকে লাণ্ডিকোটালের পার্বত্য উপত্যকার ভিতর দিয়ে কাবুল নদী প্রবাহিত। এই নদী মহাসিন্ধুতে

মিলেছে। এর পরে মহাসিন্ধু যখন পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রবেশ করে তখন আফগানিস্তানের 'খুরুম' নদী এসে এর সঙ্গে মেলে। অতঃপর সোলেমান গিরিশ্রেণী থেকে উদ্ভূত বহু নদীর ধারা একটির পর একটি এসে দাউদ খেল্, মিয়ানওয়ালি, ডেরা ইসমাইল খান, সরিয়া খান, প্রভৃতি বিভিন্ন নগরের ধার দিয়ে মহাসিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়। আফগান সীমান্তের 'তোবাকাকা'র পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে গুলিস্তান ও হিন্দুবাগ নামক নগরের ধার দিয়ে 'ঝোব' নদী এসে মহাসিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়। এর পরের ইতিহাস সবাই জানে। সমগ্র কাশ্মীর, জম্মু, এবং উভয় পাঞ্জাবের 'পঞ্চনদ' একে একে এই বিস্তৃত মহাসিন্ধুর জঠরে এসে মিলিত হয়েছে। একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ পর্যটক সেকালে বলেছেন, "মহাসিন্ধুনদ (ইন্দাস) তার আগাগোড়া প্রবাহপথে অন্তত দশ হাজার উপনদীর জল গ্রাস করেছে।" (Travels in Kashmir—Ladak, 1835-39, Vol. II—G. Vigne) এই অর্ধ-চন্দ্রাকার মহানদ কল্প-কল্পান্ত কাল থেকে ভারতের উত্তর-পূর্ব, এবং উত্তর সীমানাকে মোটামুটি নির্দিষ্ট করে এসেছে। রোমানলিপিতে এর বানান হয়েছে, 'Indus-stan' বা 'ইন্দুস্তান' বা 'হিন্দুস্তান।' মধ্য এশিয়ায়, ইউরোপে এবং অন্যান্য বহু অঞ্চলে ভারতকে বলা হয়, 'ইন্দে' বা 'ইন্দেশ'। ইন্দি বা সিন্ধির অপভ্রংশ 'হিন্দি'। সে যাই হোক, যাঁরা সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মীরপুর খাস, হায়দরাবাদ, নবাবশাহ বা সুক্কুর বারেজ, রোরি ও খয়েরপুর অঞ্চল পর্যটন করেছেন তাঁরা জানেন, কী বিপুল উদ্দাম জলরাশি মহাসিন্ধু বহন করে! ও নদ মানুষের সকল কল্পনাকেও বিভ্রান্ত করে। ভারতীয় বেদশাস্ত্রের আচমনী মন্ত্রে মহাসিন্ধু হল একটি অপরিহার্য অঙ্গ!

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গিলগিটের উত্তরভাগে হুনজা এলাকার যিনি শাসনকর্তা ছিলেন তিনি তদানীন্তন ভারতীয় জরীপ বিভাগের অধিনায়কের (মিঃ কেনেথ মেসন) নিকট স্বীকার করেন, তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দারের 'প্রত্যক্ষ' বংশধর (direct descendant)। তিনি বলেন, হিন্দুকুশ অঞ্চলের জনৈকা অপ্সরাসমা সুন্দরীর গর্ভে এবং আলেকজান্দারের ঔরসে এখানকার এই মীর বংশের জন্ম হয়। আলেকজান্দারের অপর একটি নামের সৃষ্টি হয় মধ্য এশিয়ায়। তাঁকে বলা হত, শিকান্দার। হুনজা উপত্যকায় একটি প্রাচীন গ্রামের নাম 'শিকান্দারবাদ।' কাশ্মীরের উত্তরে পার্বত্য ভূভাগে ইন্দো-গ্রীক বংশপরম্পরা অদ্যাবধি বর্তমান।

বোধ করি আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের কাল থেকেই একরূপ হিমালয়ের নাম ইউরোপে প্রচারিত হয়। সেটি খৃষ্টপূর্ব ৩২৩। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৫৭৯ খৃঃ) আকবরের কালে স্পেন থেকে ফাদার এণ্টনি মনসেরেট নামক এক মিশনারি এসেছিলেন হিমালয় পেরিয়ে মধ্য এশিয়া হয়ে ইয়ারকন্দে যাবার জন্য।

তিনি অবশ্য গিয়েছিলেন পামীরের পথ দিয়ে সিনকিয়াঙে। কিন্তু ২৮ বছর পরে সেই অঞ্চলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর পর আরও দুজন পাদরি আসেন ১৬২৪-এ। তাঁরা বদরিনাথ ও 'মানা' হয়ে তিব্বতে যান; তুষার-ক্ষত হয় তাঁদের হাত-পায়ে, কিন্তু তবুও তাঁরা তিব্বতের ইতিহাসে 'প্রথম' একটি গির্জাস্থাপনা করতে সমর্থ হন (১৬২৬)। কিন্তু চার বছর পরে সেখানকার রাজ-অভিষেকের কালে যে-বিপ্লব ঘটে, তাতে পূর্বোক্ত গির্জাটি তচনচ করে চারশ' নবদীক্ষিত তিব্বতী খৃষ্টানকে পুনরায় 'ভূমিদাসে পরিণত করা হয়। বলা বাহুল্য, লাদাখের পথ দিয়ে 'রূপসু' অঞ্চল পেরিয়ে তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। তাঁরাই প্রথম বড়ালাচা (১৬,২০০) ও রোটাং পাশ (১৩,০৫০) অতিক্রম করেন। এরপর মিশনারী দু-চারজন ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করতে গিয়ে ফাঁদে পড়েন, কারাবাস করেন, এবং তাঁদের আর খোঁজখবর পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক ফ্রাঙ্কয় বার্নিয়ের আসেন সম্রাট আকবরের দরবারে। তাঁর তৎকালীন কাশ্মীরের বিবরণ ঐতিহাসিক দিক থেকে অতিশয় মূল্যবান। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরেকজন ইউরোপীয় আসেন দিল্লী ও লাহোরে। তিনিই বোধ করি প্রথম ইউরোপীয় যিনি পীর পাঞ্জাল ও জাস্কার গিরিসঙ্কট পেরিয়ে একদা লাদাখের রাজধানী লেহ্ শহরে পৌঁছেছিলেন—(১৭১৪)। এই পর্তুগীজ পর্যটক পরের বছরে লাস নগরীতে গিয়ে পৌঁছন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর হিমালয় অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচার—এর জন্য বহু মিশনারী বহু দুঃখ কষ্ট এবং অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। একটি বিশেষ আদর্শের জন্য তাঁদের অনেককেই জীবনদান করতে হয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার একজন পদস্থ অফিসার 'অনাবিষ্কৃত' হিমালয় সম্বন্ধে আকৃষ্ট হন। তিনি এক সঙ্গীসহ ছদ্মবেশে কর্ণপ্রয়াগ, যোশীমঠ এবং নিতি গিরিসঙ্কট হয়ে তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবরে গিয়ে পৌঁছন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, গঙ্গার সঙ্গে মানস সরোবরের কোনও যোগ নেই! এঁর নাম উইলিয়ম মুরক্রফ্‌ট্। এঁর আলোচনা এর পরেও করব।

অতঃপর ইনি কাশ্মীরোত্তর অঞ্চলের একজন বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি সৈয়দ মীর ইজ্জতুল্লাকে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উত্তর কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে সিনকিয়াংয়ের দিকে পাঠিয়ে দেন। সৈয়দ সাহেব হাজারার ভিতর দিয়ে উত্তর কাশ্মীরে ঢোকেন। তিনি জোযিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে লেহ্ জনপদে গিয়ে পৌঁছন। অতঃপর উত্তর লাদাখের শিয়োক নদীর তীরে তীরে 'দিগরলা' পর্বত পার হয়ে কারাকোরম গিরিসঙ্কট-এ আসেন। তারপর তাঁর পথ ছিল অবারিত। তিনি ইয়ারকন্দ ও কাশগড়ে এসে উপস্থিত হন। এটি সিনকিয়াং ওরফে তাকলামাকান মরু-পার্বত্য

অঞ্চল। সৈয়দ সাহেব এই ভূভাগের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। অতঃপর এই অসমসাহসিক পর্যটক হিন্দুস্তানে ফিরে এসে পারস্ত ভাষায় তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, এবং তার ইংরাজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজ-ঘাঁটি বঙ্গদেশে (Calcutta Quarterly Oriental Magazine, 1823)।

॥ ৪ ॥

চিত্রল-পামীর-গিলগিট-বালতিস্তান

পামীরের মালভূমি মধ্য এশিয়ার একটি অতিবৃহৎ পার্বত্য অঞ্চল। এই মালভূমি অসমতল পার্বত্য ভূভাগ এবং নিত্য তুষারমণ্ডিত। সমুদ্রসমতা থেকে এর উচ্চতা কোথাও কুড়ি হাজার ফুটের কম নয়। এর একটি উচ্চ চূড়া বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের তাজিকিস্তান অঞ্চলে। এই চূড়াটি কমবেশি ২৪ হাজার ফুট উঁচু। কিছুদিন আগে এই চূড়ার নাম ছিল 'স্টালিন পীক্'। এখন তার পরিবর্তিত নাম, 'লেনিন পীক্।' অল্প কয়েক বছর আগে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং কয়েকজন সোভিয়েট সঙ্গী নিয়ে 'লেনিন পীকে' আরোহণ ক'রে এসেছেন।

সমগ্র পামীরের পার্বত্য ভূভাগ বহু নামে বিহিত। যেমন গ্রেট্ পামীর, লিট্‌ল পামীর, আলিচুর পামীর, তাগদুম্বাস পামীর, দি পামীর ইত্যাদি। পৃথিবীর মধ্যে এটি উচ্চতম মালভূমি বলেই এটিকে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ।' সূর্যগোলক থেকে যেমন সাতটি রশ্মির বিকীরণ ঘটে ঠিক তেমনি পামীর ভূভাগ থেকে বিকীর্ণিত হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম এক একটি পর্বতশ্রেণী,—যেমন হিন্দুকুশ, হিমালয়, কারাকোরম, সারিকোল, মুজতাগ আতা, তিয়েন সান, কুনলুন ইত্যাদি। পামীরের উচ্চতম চূড়া সিনকিয়াং অঞ্চলের মুজতাগ আতা গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এটির নাম 'কুঙ্গুর।' উচ্চতায় প্রায় ২৫ হাজার ফুট। এটি বর্তমান চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

সমগ্র পামীর হল তুষারভূমি। কিন্তু এই সুবৃহৎ মালভূমির 'ছাদ' থেকে নেমে গিয়েছে শত শত জলধারা এবং গিরিনদী। তারা যখন নীচের দিকে নেমে গিয়ে বহু অঞ্চলে মৃৎভূমি (alluvial) স্পর্শ করেছে তখন তারা ফলবান ক'রে তুলেছে আপন আপন পরিপার্শ্বকে। এই সকল নদী এবং জলধারাগুলি পামীর ভূভাগে বিভিন্ন নামে পরিচিত,—যেমন, অব, ধারা, দরিয়া ইত্যাদি। অব-ই-পাঞ্জা, (সোভিয়েট-আফগান সীমানা) গজধারা (সিনকিয়াং ও সোভিয়েট সীমানার কাছাকাছি), আমুদরিয়া,—(সোভিয়েট নদী)। এ ছাড়া পামীরের মধ্যে আছে 'কোল' এবং সায়র', —যেগুলিকে হ্রদ, সরোবর বা জলাশয় বলা যায়। যেমন 'সার-ই-কোল'—অর্থাৎ 'লেক ভিক্টোরিয়া'—এখান থেকে পামীর নদীর উদ্ভব ঘটেছে। আরেকটি যেমন 'শিবসায়র' (উত্তর আফগানিস্তানের 'শিব' প্রদেশের অন্তর্গত, এটি 'শিবনদীর' উৎস।

এমনি আছে একটির পর একটি। 'চাকমাতিন্ কোল্, জয়শীল কোল্' প্রভৃতি।

তুষারমণ্ডিত পামীরের অগণিত সংখ্যক হিমবাহ এবং তুষার হ্রদ থেকে উদ্ভূত জলধারা উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে,—অর্থাৎ চতুর্দিকেই নেমে এসেছে বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে। এই জল ভাগ ক'রে নিয়েছে হিন্দুস্থান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, এবং চীন তুর্কিস্তান। দক্ষিণ পামীরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে কয়েকটি নদী এ স উত্তর দিক থেকে মিলেছে মহাসিন্ধুনদে। যেগুলির নাম 'ইয়াসিন, ইস্কুমান, গিলগিট, নাগির, হুন্জা' প্রভৃতি। আফগানিস্তানে এসেছে 'কুনার, কুন্দুজ, কোক্চা ইত্যাদি। চীন-তুর্কিস্তানে গেছে 'তুমাক্বিসু, 'গজধারা, ইয়ারকন্দ, তিজনাফ' এবং আরও দু-একটি। যে নদীগুলি সোভিয়েট উজবেক ও তাজিকে প্রবাহিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'সুর্খ-অব, কাফিরনিহন, সুর্খন, শিরদরিয়া, কোরা', প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। শেষের এই নদীগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে কাজে লেগেছে সর্বাপেক্ষা বেশি। তাঁরা এই পামীরের জল নিয়ে এক একটি মরু অঞ্চলকে ফলবান ক'রে তুলছেন। আন্দিজান, ফারগানা (এটি সম্রাট বাবরের জন্মভূমি। এখানে তিনি 'বাবুর' নামে প্রসিদ্ধ) প্রভৃতি যাঁরা স্বচক্ষে দেখেন নি, তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। নদীর জলধারা নিয়ে যে-মধ্য এশিয়ায় যুগযুগান্তকাল ধ'রে হিংস্র রক্তপাত ঘটে গেছে, এবং মরুলোকের মধ্যে জলের উপর দখল নিয়ে যে-ভূভাগে রাজনীতিক সংঘর্ষ ছিল নিত্য নিয়মিত এবং যেখানে জলের উপর আধিপত্যই নেতৃত্বের মানদণ্ড ছিল,—সেখানে সোভিয়েট বিজ্ঞান যাদুকরের মতো সমগ্র পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার আগাগোড়া চেহারা ফিরিয়েছে। এই পামীরের জল মধ্য এশিয়ায় শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। এমন অনেক অঞ্চল পামীর এলাকায় বিগত ৪৫ বৎসরকালের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যেগুলির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের কথা মনে পড়বে! পামীরের সোভিয়েট এলাকার আশে পাশে আমি বহু পর্যটন করেছি। 'রাশিয়ার ডায়েরী'তে তার আলোচনা আছে।

এই পামীরের দক্ষিণে উত্তর ভারতের শীর্ষদেশ পাথরের ফ্রেমে আঁটা। এ পাথর যুগিয়েছে হিন্দুকুশ আর কারাকোরম। বৃটিশ ভারত কর্তৃপক্ষ যখন তাঁদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে উত্তর সীমানা রচনা করেন, তখন একমাত্র রুশ কর্তৃপক্ষ ভিন্ন সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না। না স্বাধীন ভারত, না স্বাধীন আফগানিস্তান, না লালচক্ষু চীন! এই অঞ্চলে তখন দুই সাম্রাজ্যরক্ষী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা কাটাকাটি এবং মনোমালিন্য ঘটাচ্ছে! এদের একজনের সাকিন হল লণ্ডন, এবং অন্যজনের সেণ্ট পিটার্সবার্গ। অর্থাৎ একদল এসেছে পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে, এবং অন্যদল প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূর থেকে। চীনের ব্যাপারটাও তাই।

তারাও দু' হাজার মাইল দূরের। কিন্তু তখন তারা ধ্যানী বুদ্ধের মতো নিমীলিত চক্ষু! তারা তখন অসাড়!

পামীরে রুশ সম্রাটের সঙ্গে বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর আপন-আপন সীমানা নিয়ে যে বুঝাপাড়া হয়, সেটি বাকি তিনজনের সম্মতি লাভ করল কিনা,—সেটি জানা যায় নি। তখন না ছিল লোকসভা, না বিধান সভা, না বা কলকাতার মিছিল! ইংরেজ তখনও বাঙ্গলায় ব'সে নির্দেশ জানাচ্ছে কাশ্মীরকে, দিল্লীকে, পাঞ্জাবকে এবং কতকটা পূর্ব আফগানিস্তান ও চীনকেও। ইংরেজের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলা মানে রাজদ্রোহ! অর্থাৎ ভারতীয় কাশ্মীরের সঠিক উত্তর সীমানা কি প্রকার দাঁড়াল, সেটি শুধু জেনে রইল গিলগিট এজেন্সির বিশাল বৃটিশ দুর্গ, এবং তৎকালীন কাশ্মীরের মহারাজা (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে) শুধু হয়ে রইলেন ইংরেজের খয়ের খাঁ। লাদাখ বা বালতিস্তান নিয়ে বৃটিশ ভারতের কর্তৃপক্ষ অতটা মাথা ঘামালেন না, কারণ ওদিকে শাঁস তেমন ছিল না। শুধু ব্যবসায়ী ইংরেজ পশম ব্যবসায়ের দিকে লুব্ধ হয়ে লাদাখের দক্ষিণাংশ লাহুল ও স্থিতি উপত্যকা নিজেদের দখলে নিয়ে লাদাখের মরুপাথরের রুক্ষ অংশটা দিলেন কাশ্মীররাজকে। (Alexander Cunningham—1854). সমগ্র লাদাখ-বালতিস্তান তখন কাশ্মীররাজের সম্পত্তি এবং মহারাজা গুলাব সিংয়ের জীবন-কাল অবধি (১৮৫৭ খৃঃ) কাশ্মীরের রাজত্ব এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সমমর্যাদা-সম্পন্ন ছিল। সে যাই হোক, পামীর এলাকায় তিনটি সাম্রাজ্যের সংযাগস্থলে ভারতের সঠিক সীমানার বিবরণটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ অবধি কাগজপত্রের মধ্যে চাপা পড়ে রইল।

কাশ্মীরোত্তর অঞ্চলে ইংরেজ ঘুরেছে সর্বাপেক্ষা। সাম্রাজের নির্ভুল সীমানা নির্ণয়ের জন্য তারা সংঘর্ষ বাধিয়েছে অনেকবার, হত্যা হানাহানির ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছে. হুন্‌জা পাঠানদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, ডাকাত ও লুটেরা দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এবং জরীপের দুরূহ কাজে জীবন দিয়েছে তারা একটির পর একটি। সামরিক অফিসারের দল, রাজকর্মচারী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক. মিশনারী, পর্যটক, পর্বত-অভিযানকারী—এককালে প্রায় সবাই ছিল ইংরেজ। এ কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, কাশ্মীরোত্তর অঞ্চলগুলিতে ইংরেজ কোনওদিন সম্পূর্ণভাবে মহারাজা গুলাব সিং, রণবীর সিং, প্রতাপ সিং, অমর সিং বা হরি সিংকে দখল দেয় নি! কেননা গিলগিট এজেন্সির মারফৎ যে সকল ব্যবস্থাপনা হুন্‌জায়, চিলাসে, বালতিস্তানে গ্রহণ হ'ত, সেটি শ্রীনগরের কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হতেন! গুলাব সিংয়ের পর প্রত্যেকটি মহারাজা অতিশয় বশম্বদ এবং ইংরেজ-বাধ্য ছিলেন। উপত্যকাময় কাশ্মীরের সুদূর উত্তর পার্বত্যলোকে প্রতিদিন কী কী ঘটনা ঘটছে, তার হিসেব হয়ত থাকত শ্রীনগরের কাগজপত্রের ফাইলে। কিন্তু সেই ফাইল গিলগিট এজেন্সির দ্বারাই তৈরি। তৎসত্ত্বেও

শিখ-শাসনকালের অমানুষিক বর্বরতার পর গুলাব সিংয়ের কালে হতভাগ্য, দরিদ্র এবং নির্যাতিত দক্ষিণ কাশ্মীরে নবজীবনের সূচনা ঘটে। সেক্ষেত্রে ইংরেজের সহায়তা ছিল প্রচুর। দেড়শ' বছর ধ'রে অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অনাচারের পর কাশ্মীরে আবার শান্তি ফিরে আসে।

ইংরেজ কর্মচারীরা পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে সাধারণত কাশ্মীরে ঢুকত না। এমন কি গিলগিট পৌঁছবার জন্য তারা 'ঝিলম ভ্যালী কার্ট রোড' ছেড়ে মর্দান, মালাকান্দ-এর ভিতর দিয়ে শ্বেত নদী পেরিয়ে দীর, চিত্রল, ও মাস্তুজ হয়ে গিলগিট পৌঁছত। চিত্রল রাজ্যের উত্তর সীমান্ত ছিল দ্বারকোট ও বারঘিল গিরিসঙ্কট অবধি। এখানে 'হিন্দুস্তানে'র সঙ্গে আফগান সীমান্ত সংযুক্ত হয় লিটল্ পামীর এলাকায়। 'চিত্রল' বা চিত্রালী রাজ্য এই সেদিন অবধি কাশ্মীরের 'ছত্রচ্ছায়া' মেনে চলত এবং বাৎসরিক নজরানা দিত। চিত্রল রাজ্য অধিকাংশ উপত্যকাময়। এই উপত্যকার প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদ পৃথিবীর যে কোনও পর্যটকের পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু। এর মনোরম অরণ্যালোক, নদীকান্তারপর্বতের আনন্দশ্রী, নির্ঝরিণীদলের কলতান-মুখরতা, খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য, নরনারীগণের বলিষ্ঠ দেহশোভা—এগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখবার মতো। চিত্রলের অধিবাসীরা অধিকাংশ ইন্দো-এরিয়ান বংশজাত। এরা শান্তিপ্রিয়, সুকর্মী, অনেকে কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত সভ্যতার থেকে অনেকটা দূরে থাকার জন্য স্বভাব-সরল। এটি হাজারা জেলার উত্তরে।

ইন্দো-গ্রীক, ইন্দো-ব্যাকট্রিয় বা মূল আর্যবংশের একটি অবশেষ আজও ধুকধুক করছে হিন্দুকুশের ক্রোড়গিরিলোক হিন্দুরাজের আশেপাশে। এই বংশ একটি বিশেষ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে যেটি উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত সামন্তরাজ্য চিত্রলের পশ্চিমভাগ। এই পার্বত্য এবং দুস্তর অঞ্চলটির নাম কাফিরিস্তান। এই কাফিরিস্তান বর্তমানে পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানের মধ্যে—যেমন বাঙ্গলাদেশে বালুরঘাট, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলির দশা ঘটেছে।

পেশাওয়ার অঞ্চল থেকে যে-পথটি চ'লে গেছে উত্তরে মর্দান ও মালাকন্দ এজেন্সি হয়ে,—সেটি প্রায় পৌনে দুশ' মাইল গিয়ে দীর জনপদ অবধি পৌঁছেছে। এ পথ অতি মসৃণ ও মনোরম। মাঝে মাঝে পাখতুনবস্তি, মাঝে মাঝে দেওদার, ওক এবং আখরোটের ঘন অরণ্য, এবং তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে অযত্নরক্ষিত ও উপেক্ষিত কৃষ্ণাভ আঙ্গুরগুচ্ছের বন। দুই ধারের পার্বত্য উপত্যকা অজস্র বর্ণাঢ্য পুষ্পসমারোহে আকীর্ণ। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে পাড় বানানো যব, গম, ভুট্টা অথবা এক আধ টুকরো ধানের আবাদ। দুইধার দিয়ে গিরিখাদের তলায় তলায় বয়ে চলেছে স্বচ্ছস্রোতা পার্বত্য জলধারা। এ

অঞ্চলের পাখতুনরা অতি দরিদ্র, অনেকটা যাবাবর সম্প্রদায়ের মতো। কোনও দল চাষী, কোনও দল বা মজুরি খুঁজে বেড়ায়। এদের কাঁধে ঝোলে একপ্রকার দেশী রাইফেল, মাথায় পাগড়ি অথবা চাঁদিটুপি, গায়ে জড়ানো লুইকম্বলের কোঁচড়ে আপেল, মোটা রুটি ও দুম্বাভেড়ার মাংস সিদ্ধ, কেউ বা রাখে চরসের বা ভুরা তামাকের থলি। এদের স্বভাবসরলতা, চরিত্রের সততা ও সৌজন্য—বিশেষ প্রসিদ্ধ। এদেরকে লুব্ধ করা যায় সহজে, উত্তেজিত মারমুখী ক'রে তোলা যায় অনায়াসে। এরা ক্ষণ-মর্জি। খাদ্যের লোভ, স্ত্রীলোকের লোভ এবং টাকাকড়ির লোভ দেখাতে পারলে এদেরই একশ্রেণীকে একান্তভাবে হিংস্র ক'রে তোলা যায়। প্রকৃত ভালোবাসা পেলে এরা প্রহার সহ্য করতে প্রস্তুত। যে মেয়েকে এরা চুরি ক'রে নিয়ে পালায়, তাদের আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েও এরা তাকে হাসিমুখে সমাদর করতে থাকে। এরা পাঠান। এরা আফগানিদের কুটুম্ব, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীরা এদের কেউ নয়। পাকিস্তানী শাসকরা এদেরকে নিরস্ত্র ক'রে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চান বলেই কথায় কথায় সংঘর্ষ বেধে ওঠে। এরা প্রখরভাবে জাতীয়তাবাদী, স্বচ্ছন্দচারী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণশীল। এদের নিজস্ব এলাকাকে এরা বলে, পাখতুন বা 'পস্তুনিস্তান'। এদের ভাষা পারসিক ও সংস্কৃতসহ শারদী এবং প্রাদেশিক বুলিমিশ্রিত। এক কথায় যাকে বলা হয় পস্তু বা পুস্তু।

চিত্রলের সঙ্গে কাফরিস্তান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু যারা কাফির তারা মূল আর্যবংশীয়, এবং শিবের উপাসক। এদের সামাজিক জীবন, লোকাচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমস্তই ভারতের সমগোত্রীয়। মেয়েদের অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা এবং দারুশিল্প—এগুলির বৈশিষ্ট্য বহুকালের। বিগত পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে এদের জীবনযাত্রা বা ধর্মবিশ্বাসের কোনও পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি বলেই এরা ইসলাম-বাদীগণের চোখে 'কাফের' বা অ-মুসলমান হিসাবে পরিচিত। এদের এই ভূভাগটি উত্তর ও পশ্চিমে বিশাল 'তিরিচ-মীর' পর্বতপ্রাকারের দ্বারা অবরুদ্ধ। পূর্বদিকে 'সিন্ধুর সঙ্কট' (১২,২৫০) পেরিয়ে গেলে গিলগিটের পথ, এবং দক্ষিণে 'লোয়ারাই সঙ্কট' (১০,২৫০) অতিক্রম ক'রে চিত্রলের ভিতর দিয়ে 'দীর' পৌঁছলে তবে সুদূর পেশাওয়ারের পথ পাওয়া যায়। চিত্রলে মীর বা মেহ্তার গোষ্ঠীর রাজত্বকাল প্রায় চারশ' বছরের, এবং তার সর্বশেষ নাবালক মেহ্তার সুজাউলমূল্কের কালে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দখল করেন। হিন্দুকুশ গিরিলোকের এই জঠর ভূভাগে পুরাকলে সম্রাট আলেকজান্দার এবং মধ্যযুগে পরিব্রাজক মার্কোপোলো অভিযান করেন। তিরিচমীরের বিশাল চূড়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপর একটি গগনচুম্বী গিরীচূড়া সরাঘর। উভয়ের উচ্চতা যথাক্রমে ২৫,২৬০ এবং ২৪,১১১।

কাফিরিস্তান উপত্যকা চিত্রলের ঠিক দক্ষিণে 'ব্রশ' জনপদের নিকটবর্তী। কাফিররা বাস করে আফগানিস্তান সংলগ্ন তিনটি প্রধান উপত্যকায়—রামবুর, বেরের ও বম্‌বেরেট। এরা ইন্দো-ব্যাকট্রিয় বা আর্যবংসম্ভূত। এদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক রক্তধারা এদের চেহারা ও প্রকৃতির মধ্যে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রেখে গেছে। এককালে সংখ্যায় এরা কয়েক লক্ষ মাত্র ছিল। ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশে এই 'বিধর্মীগণকে' নিশ্চিহ্ন করার জন্য আফগান আমীর আবদুর রহমান খান ফৌজ পাঠিয়ে দেন, কিন্তু এই পৌত্তলিক আর্যগোষ্ঠীর একটা অংশ চিত্রলের পাহাড় পর্বতে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু এখন এদের সংখ্যা একেবারেই কম। হয়ত কয়েক হাজার মাত্র হবে। এই ক্ষুদ্র ও মৃতপ্রায় জাতিটিকে আজও বাঁচানো যায়—যদি ভারত গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে তৎপর হন।

এই দূরক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জাতিটির প্রতি নরনারীর জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুর যে সকল বিশেষ অনুষ্ঠানাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি ভারতীয় হিন্দু-ঘেঁষা। এদের নিজস্ব ভাষা নেই, লিপি নেই, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতি বর্তমান। কাফিরদের দারুশিল্প বা খোদিত দারুমূর্তিগুলি একপ্রকার অদ্ভুত ভীতিচেতনার সঞ্চার করে। এ সকল শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন কাবুল ও পেশাওয়ার প্রভৃতি নগরের যাদুঘরে সুরক্ষিত আছে।

হাজারা এবং চিত্রলের ভিতর দিয়ে গিলগিট পৌঁছবার পক্ষে ইংরেজের কয়েকটি কারণ ছিল। পাঠান এবং আফগানি-পাঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা বন্ধুত্ব বিপদের সঙ্কেত আনে কিনা সেটি জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, গিলগিট এজেন্সির জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক লোকজন মহারাজার খাস এলাকা দিয়ে পরিবহণের অসুবিধা এবং তৃতীয় ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যসীমানা সংগোপনে সম্পাদন করা!

শ্রীনগর থেকে বিমানযোগে উত্তরে উড়ে গেলে প্রায় ১৭৫ মাইল পরে যে গিরিসঙ্কট পাওয়া যায়, সেটির নাম 'কিলিক দাওয়ান'। এটি প্রাচীন হিন্দুস্তান সীমানা। এই সীমানা পূর্বদিকে 'মিন্‌তাকা' ও 'পার্পিক' ও 'খুনজেরাব' গিরিসঙ্কট অবধি প্রসারিত। পশ্চিমে এই সীমারেখা গিয়ে মিলেছে 'বারোঘিল্, দ্বারকোট এবং থুইয়ান' গিরিসঙ্কটে। ইংরেজদের চেষ্টায় উত্তরে এই সীমারেখাগুলি এত স্পষ্ট, নির্দিষ্ট এবং সুনির্ণীত যে, এদের নিয়ে কেউ কোনও দিন এবং কোনওকালে কথা তোলে নি! পামিরের দক্ষিণ অংশে এগুলি যেন নিত্যকালের তোরণদ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এবং মনে হয় ইংরেজ এগুলির ব্যাপারে ভুল করে নি। এই তোরণগুলির মধ্যে প্রবেশ করা মানেই হিন্দুস্তানের ভূমিতে পা দেওয়া। ইয়ারকন্দি, খোরাসনি, ইস্পাহানি, আরবীয়, তুর্কি, তাজিক, কিরগিজ, উজবেক প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবসায়ীর দল ক্যারাভান নিয়ে হয় এই

পথ দিয়ে ঢুকতে হিন্দুস্তানে, নয়ত যাতায়াত করত পামীর পেরিয়ে। লুটপাট ছিল, রেষারেষি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল, কিন্তু রাজনীতিক সীমানা নিয়ে কোনও যুগে বিতর্ক ছিল না। একালে সেই পরিবেশও মুছে গেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃপায় এবং আজ মধ্য-এশিয়ার চরিত্রেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

যাই হোক, সেকালের ইংরেজদের না ছিল বিমান, না মোটর, না ট্রাক, না বা কোনও চাকার গাড়ি। সুতরাং ছোট ছোট পার্বত্য ঘোড়া, ঘণ্টায় যারা তিন মাইলও যায় না—তারাই ছিল সম্বল। শত শত মাইল পায়ে হাঁটা, আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য-সামগ্রী তখনও স্বপ্নবৎ, বর্ষা ও ঠাণ্ডায় শুধু কম্বল, কাঠকুটো সংগ্রহ করে মাংস সিদ্ধ, পথে কোথাও বিশ্রামশালা না-থাকা, জনপদবাসীদের বৈরীভাব, ঔষধপত্রের অভাব, অক্সিজেন গ্যাসের মুখোস অভাবনীয়, এইরূপ অবস্থায় পাথর-কণ্টকিত পায়ে-হাঁটা-পথে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধরে আনাগোনা! গিলগিট এলাকায়, হাজারা জেলায়, হুন্জা প্রদেশে—স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার যখন-তখন সম্ভাবনা থাকে, সেই কারণে পেশাওয়ার থেকে গিলগিট—প্রায় সর্বত্রই এই নোটিসটি দেওয়া হত—"non-family station". যদি মেয়েছেলের পক্ষে একান্তই যাবার প্রয়োজন ঘটত, তবে সারাক্ষণ প্রবল সশস্ত্র পাহারা তাকে ঘিরে থাকত। অদ্যাবধি, এই আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক যুগেও, এমন বহু এলাকা আছে—যেখানে স্ত্রীলোক, শিশু বা বালক-বালিকার যাতায়াত ও রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। একজন শক্তিশালী ও দীর্ঘকায় পাঠান যে কোনও ইংরেজ 'টমিকে' দু হাতে নিয়ে পুতুলের মতো নাড়াচাড়া করতে পারে!

এই সকল বিচিত্র পরিবেশ এবং অনধিগম্য প্রদেশগুলিতে উনিশ শতাব্দীর ইংরেজ কর্মচারীদের যে কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রকাশ পেয়েছে, ইতিহাসে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। এখন শুনলে একটু যেন বিস্ময় লাগে, ভারত-চীন-রাশিয়া—এই তিনটি সুবৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গমকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কম-বেশী দেড়শ' বছর ধরে পামীর, কারাকোরম, হিন্দুকুশ, কুন-লুন প্রভৃতি অজানা ও চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতমালার ভিতরে ভিতরে যে সকল অতিমানবিক ও বিজ্ঞানধর্মী কর্মসম্পাদন তারা করেছে, সমগ্র পৃথিবীর পার্বত্য-অভিযানকারী সমাজ তার জন্য কৃতজ্ঞ। অবশ্য এর জন্য তারা সৌভাগ্যের হাত থেকে শেষ পুরস্কারও লাভ করেছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ অভিযানকারীর দলই প্রথম গৌরীশৃঙ্গ অভিযানে সাফল্য লাভ করেন।

যাঁরা হরমুখ বা হরমুকুট পর্বতে অথবা জোযিলার উত্তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করেছেন তাঁরাই জানেন, হিমালয়, কারাকোরম ও হিন্দুকুশ অবিচ্ছিন্ন। কোন্‌টার সীমানা ও শেষ কোন্ দিকে এবং কতদূরে ও তার শ্রেণীস্তরে বিচ্ছেদ ঘটেছে কোথায়, জলধারা অবতরণের গতিপথ (watershed) ঠিক কি প্রকার ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের বিচার

ও সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে। ইংরেজের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে একে একে ফরাসী, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, সুইটজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ওলন্দাজ প্রভৃতি বহু অভিযাত্রী হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন।

তুষারতুঙ্গ কারাকোরম মধ্য-এশিয়ার মহাকালের প্রহরীর মতো উন্নত শিরে নিত্য বিরাজমান। কারাকোরমের বিপুল পরিমাণ তুষারবিগলিত জলধারা একদিকে বিশাল তাকলা-মাকান মরুপাথরলোকে হারায়, অন্য দিকের জলধারা মহাসিন্ধু নদ (Indus) বহন করে আনে সিন্ধুদেশের দক্ষিণে আরব সাগরে। দৈব-দুর্বিপাকে এই মহাসিন্ধু নদে একদা জলপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়। এই বন্য, দুরন্ত ও ভয়ভীষণ নদ যখন হাজার হাজার ফুট খাদ কাটতে কাটতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তখন একদা এক প্রবল ভূমিকম্প ঘটে। সেই ভূ-কম্পনের ফলে গগনচুম্বী নাঙ্গাপর্বতের ক্রোড়চ্যুত একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র চূড়া এই নদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে সমগ্র ভূ-ভাগে দ্বিতীয় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে এবং তার বজ্রবিঘোষণা প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে একটি সন্ত্রাস আনে। সেটি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। এর ফলে অবরুদ্ধ নদের থেকে যে জলপ্রাচীর খাদের নীচের থেকে উঠে দাঁড়ায়, সেটি প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু হয়ে তীরবর্তী জনপদ 'গোর' এবং চল্লিশ মাইল দূরবর্তী গিলগিট—এই দুই উপত্যকাকে কেন্দ্র করে এক বিশাল 'সমুদ্র' রচনা করে। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যে কারাকোরমের অগণন হিমবাহপ্রসূত জলরাশির দুর্দান্ত তাড়নায় সেই নদগর্ভস্থ প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণ প্রবাহ পথে ছুটে চলে যায় গুরুগুরু মেঘনাদের মতো আওয়াজ তুলে। মহাসিন্ধু নদের সেই বিপুল বন্যায় পশ্চিম পাঞ্জাবের বহু জনপদ ও গ্রাম পাখীর পালকের মতো ভেসে চলতে থাকে! একদিকে উত্তর স্কার্দু ও অন্যদিকে গিলগিট—এই দুই জনপদের মাঝখানে সেদিনের জলপ্রাচীরের ইতিহাস অদ্যাবধি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে!

কারাকোরমের উত্তরসীমা মিলেছে হিন্দুকুশ এবং তাগ্‌ডুম্‌বাস পামীর গিরিশ্রেণীর মধ্যে। কারাকোরমের পশ্চিম ও দক্ষিণ অগণ্য হিমবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। কিন্তু হুনজা, বাল্‌তিস্তানের 'ভোটা,' (অতি প্রাচীন জাতি) এবং যারা এখন 'দার্দ' নামে পরিচিত—তারা মূল কারাকোরমে পৌঁছবার তিনটি পথের সন্ধান দেয়। প্রথম অভিযান পথটি গিলগিট থেকে হুনজার ভিতর দিয়ে যায়—এটি পশ্চিম পথ, এটি ইংরেজ বেছে নিয়েছে অনেকবার। হুন্‌জা নদীর ধার দিয়ে উত্তরপথে চালৎ, হুনজার প্রধান জনপদ বালতিৎ, হিস্পার ও আস্কোল পেরিয়ে নানা 'মুজ্‌তাগ'-এর পাশ কাটিয়ে কারাকোরমের মেরুদণ্ড-পথের দিকে এ পথটি গেছে। 'মুজ্‌তাগ' আছে অসংখ্য। পামীরে, হিন্দুস্তানে এবং এ কালের সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেকগুলি। তুষারের বিস্তার যে সকল পর্বতের দেহে চিরস্থায়ী ও কঠিন বরফে সমাকীর্ণ করে রাখে,

সেগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, 'মূজ্-তাগ', বা বরফ-পর্বত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুটি পথ সোনামার্গ হয়ে একটি গেছে মিনিমার্গ ছেড়ে বুর্জিল সঙ্কটের দিকে এবং অন্যটি জোযিলা অতিক্রম করে কার্গিল হয়ে স্কার্দু এবং সেখান থেকে মহাসিন্ধু পেরিয়ে। সে যাই হোক, বহু অসমসাহসিক ইউরোপীয় কারাকোরমে মৃত্যুবরণ করেছে। এভারেস্টের কাছাকাছি যেমন মানুষ এবং জনপদের চিহ্ন মেলে এবং কাঠমাণ্ডু নগর নিকটবর্তী থাকার ফলে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায়—কারাকোরমে তাদের চিহ্নমাত্র নেই। তা ছাড়া নেপাল ও দার্জিলিংয়ে যেমন একটি বৃহৎ শেরপা সমাজকে দেখা যায়—যারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত আরোহণকারীদের সমতুল্য, হুন্জা প্রদেশে সে ধরনের দুর্লভ অভিজ্ঞতার অধিকারী শেরপাদের মতো আত্মপ্রত্যয়ী হুন্জা নেই। তারা ভারবাহী, শক্তিমান, আজ্ঞানুবর্তী—কিন্তু শেরপাদের মতো অভিজ্ঞতা, অসমসাহসিকতা, আবহ-বিশারদ এবং কার্যক্ষম তারা নয়। এই হুন্জাদের একটি শ্রেণীকে তৈরী করে' ইংরেজ তাদের কাজে লাগায়।

দেবসাহী পর্বতমালার পশ্চিমে চিলাস এবং নাঙ্গার উচ্চতম চূড়া—পূর্বপথে স্কার্দু ও মাসেরব্রুম পর্বতশ্রেণী এবং তার সর্বোচ্চ শিখর। এই শিখরলোকের পিছনে কারাকোরমের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—যার নাম কে-২ এবং ঠিক তারই তলায় মাসেরব্রুমের উত্তুঙ্গ চূড়া। কিন্তু এই বিরাট চূড়ার দ্বারপালস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে জগৎপ্রসিদ্ধ অগণিত সংখ্যক হিমবাহ। পশ্চিম দিকে নাঙ্গা পর্বত চিরদিন দুঃখদায়ক এবং এটিকে জয় করার জন্য মোট ৩১ জন আরোহণকারী একে একে প্রাণ হারায়। অবশেষে মিঃ বুহ্ল নামক অসমসাহসিক এবং মৃত্যুভয়হীন এক ব্যক্তি সঙ্গীদের পিছনে রেখে ১৬ ঘণ্টা হামাগুড়ি দিয়ে তুষার দেওয়াল বেয়ে ওঠেন কোনও এক সন্ধ্যায়। তিনি চূড়ার ওপর পৌছন সেই অবস্থায়, হিমগর্ভে সমস্ত রাত্রি কাটান একা এবং পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে নেমে এসে ক্যাম্পের কাছাকাছি পড়ে যান। তাঁর পা দুখানা ততক্ষণে মৃত্যুর মতো অসাড় হয়েছে। মিঃ বুহ্লের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি শুধু বলতে থাকেন, কে যেন একজন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কে যেন তাঁকে ভয়াবহ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এখানে এনে পৌছিয়ে দিল। ক্যাম্পের বন্ধুরা তাঁর কথা শুনে হতবাক এবং স্তব্ধ। এ কি সত্য, দুর্গমে দারুণে দুস্তরে সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী! কিন্তু কে সে? কোথা সে? সে কি মৃত্যু অপেক্ষাও বড়?

বন্ধুরা আগের দিন থেকে নিশ্চিন্তভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল, বুহ্ল বেঁচে নেই! কিন্তু এবার তাকে সুস্থ করে তোলার পালা এল।

নাঙ্গার উচ্চতা ২৬,৬২০ ফুট। এই পর্বত এবং কাশ্মীরোত্তর ভারত সীমান্তের

কারাকোরম সম্বন্ধে যাঁরা সর্বাপেক্ষা তথ্যপূর্ণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড, জেনারেল কানিংহাম, গার্ডনার, কেনেথ মেসন, স্ট্যাচি, টমাস টমসন প্রভৃতি হিমালয়-বিশারদ ব্যক্তিরা ছিলেন। আজও এঁদের মধ্যে জীবিত আছেন কেউ কেউ। চীন-ভারত-পাকিস্তান সীমানা সঙ্ঘর্ষে এঁদের দায়িত্ব কম নয়। ডুরাণ্ড লাইন থেকে ম্যাক্‌মেহন লাইন অবধি সমগ্র হিমালয়ের উপর দিয়ে জরীপের কাজ করে গেছেন ইংরেজ কর্মচারীর দল তথা ভারতের বৃটিশ গভর্নমেণ্ট! এখানে প্রকৃতপক্ষে আঙ্কিক, বৈজ্ঞানিক ও ত্রিকোণমিতি-ভিত্তিক নির্ভুল সীমানা নির্ধারণের কথাই ওঠে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কথা এ স্থলে সম্পূর্ণই অবান্তর। ১৯০৭-এ অ্যাংলো-রাশিয়ান সীমানা নির্ধারণের ত্রিকোণভিত্তিক পর্যবেক্ষণের কাজে উভয়ের গণনায় মাত্র 'সাড়ে তিন ফুটে'র পার্থক্য ঘটেছিল। সুতরাং কোনও পক্ষের জিদ যদি প্রবল বাধা না ঘটায় তবে সমস্যার মীমাংসা সহজ হতে থাকে।

স্যর ফ্রান্সিসের কথায় ফিরে আসি। এই অনন্যসাধারণ শক্তিধর পুরুষ এককালে ইংলণ্ডের 'কিংস ড্রেগুন গার্ডস'-এর একজন সামান্য লেফ্‌টেনাণ্ট থাকাকালীন সুদূর মঙ্গোলিয়ার পূর্ব উত্তরবর্তী বিশাল এবং মেঘজলচিহ্নহীন গোবি মরুলোকের ভিতর দিয়ে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে সিনকিয়াং-এ প্রবেশ করেন (১৮৮৭ খৃঃ)। তৎকালে বহু দুর্ধর্ষ জাতি ও সম্প্রদায় সমগ্র পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার মরু-পাথরপূর্ণ ও তৃণলতাশূন্য পার্বত্য ক্যারাভানপথে লুঠপাট, খুনজখম ও দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। সেইকালে ভয়বাধাচিন্তাহীন স্যর ফ্রান্সিস তাঁর নবাবিষ্কৃত আঘিল পর্বতমালার ভিতর দিয়ে গিরিসঙ্কট পেরিয়ে বিশাল কারাকোরম অতিক্রম করেন। কারাকোরমের সর্বোচ্চ চূড়া কে-২ তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর এই অভিযান পথে তাঁর না ছিল নিজস্ব তাঁবু, না ছিল সেই কালের কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম। এইরূপ দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া অবস্থায় তিনি 'মুজতাগ' গিরিসঙ্কটের (১৮০০০) ভিতর দিয়ে একদা 'বালতোরা' হিমবাহের উপরে এসে উত্তীর্ণ হন এবং সেখান থেকে বালতিস্তান হয়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। দস্যু এবং লুটপাটের ভয় সেকালে এত বেশি ছিল যে, সন্ধ্যাকাল থেকে তিনি কোনও প্রকার প্রদীপ জ্বালাবার সাহস পান নি, পাছে হুন্‌জা ডাকাতের লোকরা তাঁকে দেখতে পায়! পৃথিবীবাসীরা সেদিন অবাক হয়ে শুনেছিল এই বিরাট ও সামগ্রিক অভিযান পথে স্যর ফ্রান্সিস একটি দিনের জন্যও রাত্রির মাথাগোঁজার আশ্রয় পান নি এবং তাঁকে প্রতি রাত্রে খোলা জায়গায় শুতে হয়েছে। (Kenneth Mason: 'Abode of Snow')

পরবর্তীকালে স্যর ফ্রান্সিস পুনরায় সেই একই পথে দ্বিতীয়বার অভিযান করেন। এবার তাঁর সঙ্গে একজন গুর্খা সৈন্য যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কারাকোরমের গিরিসঙ্কটে

মধ্য-এশিয়ার ব্যবসায়ী যারা ক্যারাভান নিয়ে আসে তাদের ওপর হুন্‌জা দস্যুদলের আক্রমণ কি প্রকারে প্রতিরোধ করা যায়। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, বহিঃশত্রু ভারতবর্ষকে কোন্ কোন্ পথে আক্রমণ করতে পারে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন গিরিসঙ্কট তদন্ত করা। স্যর ফ্রান্সিস প্রমুখ ইংরেজ সামরিক নেতাদের মনে সে-কালে রাশিয়া সম্পর্কে কিছু দুর্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁরা চীন সম্বন্ধে সে-কালে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন! এ কথা তাঁদের মনে আসে নি, ইতিহাসের গতি জটিল, এবং কালের গতি কুটিল। তাঁরা সেদিন কল্পনাও করেন নি, পরবর্তী মাত্র পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে দুইটি 'পারমাণবিক' ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁদের প্রবল 'বিস্ফোরণে' এক দিকে একটি বিচিত্র ও বিস্ময়কর সভ্যতার সৃষ্টি হবে এবং অন্য দিকে ছয়টি মহাদেশব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্য ছারখার হতে থাকবে! সেই দুই ব্যক্তি লেনিন ও গান্ধী! এ কথাটিও সেদিন তাঁদের মনে আসে নি, রুশ সাম্রাজ্য এককালে সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিণত হবে এবং পৃথিবীতে একচ্ছত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সংগ্রাম করবে। তাঁদের মনে এ 'চিন্তাবিভ্রম'ও সেদিন ঘটে নি যে, চীনের কখনও পুনরুজ্জীবন লাভ ঘটবে, তাদের পীতবর্ণ হবে রক্তিম, এবং তারা সাতশ' বছর পরে পুনরায় চেঙ্গিস খাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যালোকে অস্বস্তি ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করবে!

এখানে বলা উচিত, বীরশ্রেষ্ঠ স্যর ফ্রান্সিসের ভিন্ন একটি পরিচয় আছে। তিনি ভারতীয় তথা বৌদ্ধ বা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতীয় যৌগিক শক্তিকে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং অধ্যাত্ম জীবনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থও আছে। তাঁর শেষ জীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দর্শন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে সশস্ত্র তিব্বত-অভিযান-কালে লাসা নগরীর 'জো-খাং' মন্দিরে ঢুকে তিনি বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে অভিভূত হন। তাঁর অভিযানের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় ছিল এই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল দুর্নীতিগুলি এর মধ্যে ছিল না। তাঁর এই অভিযানের ফলে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে একটি স্থায়ী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 'চীন-ভারত চুক্তি' উপলক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের অদূরদর্শিতার ফলে এই বন্ধুত্বের প্রাণধারার ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটে। এই চুক্তির ফলে তিব্বতের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক অধিকারকেই যে শুধু হরণ করা হয়েছিল তাই নয়, তিব্বতের ওপর চীনের সর্বময় প্রভুত্ব স্বীকার ক'রে নেবার সময় তিব্বতের স্বাতন্ত্র্যকেও তাঁরা মনে রাখেন নি!

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্নমেণ্ট স্থির করেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে নতুন করে একবার জরীপ করবেন। তাঁরা প্রথমেই কাশ্মীরোত্তর

হিন্দুস্তান প্রদেশগুলিতে প্রথম কাজ শুরু করেন। এই প্রদেশগুলির ভিতরে-ভিতরে সুশৃঙ্খল রাজ্যপাট তখনও বসে নি। ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত এলাকাগুলি আপন-আপন শাসনকর্তার মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী চলে। 'সিয়া ও সুন্নি'র মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আগাগোড়া প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগই মুসলমানের এলাকা। এদের উত্তরে ছিল পামীর, মধ্য এশিয়া, কারাকোরম, হিন্দুকুশ, দক্ষিণে ছিল বিশাল নাঙ্গা, হরমহেশ, দেবশাহী, পশ্চিমে হিন্দুরাজ গিরিশ্রেণী এবং পূর্বে শত শত হিমবাহের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেই কারণে, এরা বিচ্ছিন্ন ও দূরক্ষিপ্ত (far-flung) ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। এদের সঙ্গে ভারতবর্ষ কথা বলে নি কোনও যুগে, কাছে ডাকে নি, বন্ধুত্ব পাতায় নি, সুখ-দুঃখে সামনে এসে দাঁড়ায় নি, কোন সম্পর্ক রাখে নি। তার ফলে তারা সভ্যতার মুখ দেখে নি, লেখাপড়া শেখে নি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের নাম শোনে নি, দারিদ্র্য কেমন ক'রে ঘোচাতে হয় সে-বিদ্যা আয়ত্ত করে নি! এদেরই সহোদররা আছে আরেকটু উত্তরে, তাজিক ও কিরগিজ অঞ্চলে—যারা আধুনিক কালের সমস্ত উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা পেয়ে প্রচুর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে!

যাই হোক, এই নূতন জরীপের কাজ আরম্ভ হবার কালে এটি বিচার করতে হয় যে, হিন্দুস্তানের সর্বোত্তম সীমানায় তখন তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সংযোগস্থল। ভারতের তদানীন্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং হিমালয়াগ্রহী স্যর সিডনী বুরার্ডের নেতৃত্বে কাশ্মীরে নূতন জরীপের ব্যবস্থা হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে রুশ গভর্নমেণ্টের একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক চুক্তি হয়, যার ফলে উভয়ে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সীমানা সংযোগ এবং ত্রিকোণমিতি (trigonometrical) বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজ সংযুক্তভাবে চালাবার ব্যবস্থা হয়। ভারতের পক্ষে থাকেন ডাঃ গ্রাফ হাণ্টার, রাশিয়ার পক্ষে আসেন ৎচেকিন, কিন্তু চীন-সিনকিয়াংয়ের পক্ষে সেদিন কেউ উপস্থিত ছিলেন কি না, সেটি জানতে গেলে "Records of the Survey of India, Vol. VI (1914)" নামক বিরাট গ্রন্থখানির পাতা ওল্টাতে হয়। সম্ভবত উপস্থিত থাকার দরকার তাঁরা মনে করেন নি! সে যাই হোক, ঠিক এই অঞ্চলটিতে প্রাকৃতিক বাঁটোয়ারার ফলে চীন-ভারত সীমানা-বিরোধের কোনও ক্ষেত্র নেই! এটি লক্ষ্য করবার বিষয়, সর্বাধুনিক সোভিয়েট ইউনিয়নের মানচিত্রে (Administrative Map of the U.S S R.) ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি সংযোগস্থল দেখানো আছে, সেটি বোধ করি মাইল পনেরো চওড়া! এই স্থলটির দক্ষিণে ভারত, উত্তরে সোভিয়েট তাজিক, পশ্চিমে আফগান হিন্দুকুশ ও পূর্বে চীনের সিনকিয়াং এলাকা। এই মানচিত্র মস্কো থেকে ছাপা হয়েছে। এই অঞ্চলে মুজতাগআতা ও তাগ্‌তুমবাস পামীরের পর্বতমালার জটা-

জটিলতার মধ্যে রুশ-চীনের সীমানা কোথায় সংযুক্ত হয়েছে, সেটি আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু পামীর এবং প্রাক্তন তুর্কীস্তানের রাজনীতিক সীমানার প্রশ্ন নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে মন-কষাকষির সংবাদ বার বার শোনা গিয়েছিল।' সে যাই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে অ্যাংলো-রাশিয়ান দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সেদিন যে কয়টি দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, ভৌগোলিক ইতিহাসে তার উদাহরণ বিরল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এসে এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা যুদ্ধের দামামা নিনাদে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই অসাধ্য-সাধন কর্মে ইংরেজ দলের মিঃ বেল প্রমুখ কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেন।

অনধ্যুষিত তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকা, ভয়াবহ গিরিখাদ, প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা, তুষার প্রতিফলিত রৌদ্রের সাংঘাতিক খরতাপ, পর্বতক্রোড়চ্যুত হিমবাহের বিভীষিকাময় তাড়না, অপরাহ্নকালের বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসভীতি—এইগুলি প্রত্যেক অভিযাত্রীকে নিত্য সতর্ক এবং উৎকর্ণ করে রাখে। কিন্তু এই সকল দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা-যন্ত্রণা, দুঃসাহস ও মৃত্যুর ইতিহাস সকল দেশের এবং সকল কালের যৌবনকে ডাক দিয়েছে উদ্দাম জীবনের দিকে। হিমালয়ের অজানা উপত্যকা, পার্বতী নির্ঝরিণীর যন্ত্রণা, বালুপাথরের পথচিহ্নহীন শূন্য ভূভাগ, মেঘলোকে উধাও হরিত-নীল মহারণ্যের রহস্যরন্ধ্রপথ, 'তিরিচ মীরের' তলায় জ্যোৎস্না পুলকিত সেই জনহীন অপ্সরালোক—এরা বার বার ডাক দিয়ে যায় দিগন্তের তারকালোক থেকে ; আরামের সুখশয্যাকে এরা দুঃসাধ্য দুরাশায় কণ্টকিত ক'রে তোলে! এই দুরাশার সঙ্কেত আজ 'ঘরপোষা নির্জীব' বাঙালীর ছেলেমেয়েকেও স্থির থাকতে দিচ্ছে না।

কাশ্মীরোত্তর প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন উপজাতির নামে নানা অপবাদ প্রচলিত। তাদের পরিচয় নানা নামে—খাখ্‌খা বা খাসা, দম্বা, দার্দ বা দারদ বা দরদ, ভোটা বা ভোট্টা বা ভুট্টা বা বুট্‌। এ ছাড়া আরও। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক হ'ল দার্দ এবং ভোট্টারা। আজও এরা আছে এবং প্রায় ঐ নামেই আছে। দার্দরা পশ্চিমের লোক। কৃষ্ণগঙ্গার উত্তর থেকে বুন্‌জি, চিলাস, গিলগিট, ইয়াসিন ও চিত্রল—এই ভূ-ভাগের মধ্যে দার্দরা বাস করে। উত্তর হাজারাতেও এরা জায়গা নিয়ে বসেছে। জাতি হিসাবে এরা প্রায় যাযাবর। সমাজ-ব্যবস্থা, পারিবারিক শৃঙ্খলারক্ষা, নৈতিক মান—এ-সব দায় এদের কম। এরা অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির। সুন্দর, বলবান এবং বৃহদাকার এদের দেহ, কিন্তু অতিশয় দুর্ধর্ষ। ইংরেজ আমলে এদের একটা শ্রেণী কিছু বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এরা শ্রমিকের কাজ করেছে প্রচুর। কিন্তু এদের হিংস্রতা আজও কাশ্মীরে সর্বজনবিদিত। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরোত্তর এলাকাগুলিতে পর্যটনকালে পার্বত্য উপজাতিগণের মধ্যে পৌঁছে এ-কালের কোনও

সভ্য মানুষ নিরাপদ বোধ করে না! পাকিস্তানের সঙ্গেও এদের বনিবনা ঘটে নি। এখনও সেই অবস্থাই প্রায় আছে, তবে যে-জনপদগুলি ছিল ছোট, সেগুলি জনবহুল হয়ে ইদানীং বৃহদাকার হয়েছে। দার্দ অঞ্চলে এখন এসে পৌঁছেছে আধুনিক কালের সামগ্রীসম্ভার, মোটর পথ নির্মিত হয়েছে বহুদূরবিস্তৃত পার্বত্য এলাকায়, কাজ-কারবারের ঘাঁটি বসেছে অনেক স্থলে, বিদেশী মদ্যের সঙ্গে চিলাসি আর চিত্রালী মেয়েদের নাচের আসর বসেছে বহু জনপদে, সানাটোরিয়াম গড়ে উঠেছে কয়েকটি এবং কয়েকটি পাকিস্তানী বিমানঘাঁটি নির্মাণের সঙ্গে সর্বাধুনিক সমরসম্ভারও এখানে-ওখানে থৈ-থৈ করছে। পানাসক্তির দিক থেকে দার্দ জাতির খ্যাতি আছে প্রচুর। সে যাই হোক, ইদানীং যানবাহন ও যোগাযোগের সুবিধা এবং আন্তঃসামাজিক যোগাযোগের ফলে দার্দ জাতির একটি বিশেষ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটেছে। দক্ষিণে কৃষ্ণগঙ্গার উপত্যকা এবং উত্তরে গিলগিট-হুন্‌জা—এর সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল এখন বহু পরিমাণ অনিশ্চয়তায় ভরা—যদিও পাকিস্তানের সামরিক বিভাগের নির্দেশক্রমে এই ভূ-ভাগের অনেকগুলি এলাকা—যেমন চিলাস, চিত্রল, গিলগিট, আস্টোর, বুন্‌জি, আস্কোল,—এদের হেড কোয়ার্টার্স-সংলগ্ন উপত্যকা বা পার্বত্য এলাকার অংশবিশেষ বর্তমানে নিষিদ্ধ অঞ্চল। এই ভূ-ভাগের পার্বত্য উপত্যকাগুলির ভিতরে-ভিতরে এমন অগণিত সংখক পর্বতপ্রাকার ঘেরা পরম রমণীয় সমতল ভাগ আছে, যেগুলি আধুনিক কালে অতিশয় নিরাপদ বিমানঘাঁটিতে পরিণত হয়ে চলেছে। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইংরেজ এ-কাজে হাত দিয়েছিল গিলগিট ও চিত্রলে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের ঘোরতর দুর্দিন আসন্ন হবার ফলে এ-কাজ আর এগোয় নি। তবে চীনদেশে নতুন কম্যুনিস্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন (১৯৪৯) এবং চীন কর্তৃক প্রেরিত 'মুক্তি ফৌজ' প্রথম তিব্বত অবরোধ করার কাল (১৯৫০) থেকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় কয়েকটি নতুন বিমানঘাঁটি এ-সব অঞ্চলে নির্মিত হয়। এদেরই একটি ঘাঁটি থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা-বিমান 'ইউ-২' সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার কালে রকেট-গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রায় ৭০ হাজার ফুট শূন্যলোক থেকে নীচে পড়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব পাশ্চাত্য দেশগুলিকে আরেকবার অভিভূত করে!

দার্দ জাতি ছাড়া দম্বা বম্বা খাসা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের মধ্যে চাক্ জাতির মতোই মিলিয়ে এসেছে।

বালতিস্তানের কাহিনী একটু অন্যরকম। উত্তরে কারাকোরম এবং দক্ষিণে মূল কাশ্মীর—এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বালতিস্তান। এই ভূ-ভাগকে জয় করতে হয়েছে বারম্বার প্রাচীনকাল থেকে এ-কাল পর্যন্ত। এদের অখ্যাতি চিরকালের—মুক্তাপীড়

ললিতাদিত্যের বহু আগে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক কবি কল্‌হন (কল্যাণ দেব) অতিশয় নিন্দা করেছেন চতুর্বর্ণকে—দার্দ, দামরা, চাক এবং ভোট্টাদের। এই ভোট্টারাই বালতিস্তানের আদিম অধিবাসী। ভোট্টাদের মূল রক্তের ধারা মঙ্গোলায়। তিব্বতীদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ রক্তসংস্রব থাকার জন্য বালতিস্তানের অপর নাম হয়েছে 'লিটল্‌ টিবটে' বা ক্ষুদ্র তিব্বত। পুরাকালে এটিকে বলা হত 'বুট' ভূমি। এদের এক শ্রেণীর বর্ণ শ্বেতরক্তিম, অন্যশ্রেণীর দল পীতশ্যাম। এদের জীবন কঠিন ঠাণ্ডা এবং শিলা-বরফের (ice) মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। সমতল ভূ-ভাগ বা অতি নিম্ন অধিত্যকা কাকে বলে এরা জানে না। যদি কখনও এদের কেউ কাশ্মীরের সমতল নিম্ন-অধিত্যকায় (৫২০০ ফুট) নেমে আসে, তবে গরমে এবং ব্যাধিতে মারা পড়তে বসে। সমগ্র বালতিস্তানের চেহারা মুণ্ডিতমস্তকের মতো। তরু-বৃক্ষ-তৃণলতা সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। কাশ্মীরের প্রধান বৈশিষ্ট্যস্বরূপ যে অরণ্যরহস্যভূমি—সেই চেহারা বালতিস্তানের কোথাও নেই। গ্রাম্যপথের কোন কোনও ক্ষেত্রে যেখানে জলের অভাব কম, সে সব অঞ্চলে গাছপালা বা ফল-ফুল জন্মায়। বৃষ্টিপাত হয় বছরে পাঁচ-ইঞ্চি মাত্র। প্রবল ঠাণ্ডায় সর্বত্র মৃত্যুর মতো অসাড়। তুষারের জল দিয়ে সেচ-এর কাজ করতে হয়। অধিকাংশ নদী কঠিন বরফে আকীর্ণ —তারই মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে চলাচলের পথ। ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া বা ঝব্ব নদীবক্ষের ওপর দিয়েই পথ বেছে নেয়। ভয়াল গিরিগহ্বর, তুষার ঝঞ্ঝা, রুক্ষ শুষ্ক হিমেল হাওয়া—এরই ভিতরে ভোট্টারা মানুষ হয়ে জন্মায় এবং 'পশু'র জীবন যাপন ক'রে মরে। চারদিকের উত্তুঙ্গ কঠিন নির্দয় পর্বতমালার মাঝখানে ছায়াচ্ছন্ন বালতিস্তানকে দেখলে প্রথমেই মনে হবে এ ভূ-ভাগ পৃথিবীবিচ্যুত এবং এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে বহিঃপৃথিবীর আশা-আশ্বাস কোনও দিন এসে পৌঁছয় না। এমন অনেক জনবসতি দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি পর্বতের আড়ালে থাকার জন্য সমস্ত দিনমানের মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টার বেশী সূর্যালোক সেখানে পৌঁছয় না। সমগ্র বালতিস্তান অতিশয় বিরাট ও কঠিন হিমবাহের (glaciers) দ্বারা পরিবেষ্টিত,—এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন, উত্তর প্রাচ্যের মেরু সমুদ্র (Arctic) ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোনও শীতল ভূভাগে এমন বৃহৎ, ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ হিমবাহ দেখা যায় না! বালতিস্তানের চতুর্দিকে যে কয়েকটি গগনস্পর্শী এবং নগ্নকান্ত চূড়া সমস্ত প্রদেশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তাদের উচ্চতা সকল দিকে ২৫, ২৬ এবং ২৮ হাজার ফুট। উত্তরে মুজতাগ ও নাগর, পূর্বে লাদাক গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে জাস্কার এবং পশ্চিম অবরোধের ওপারে আষ্টোর এবং দেবশাহী দলের চূড়া। এরই তলায় গভীরতর নিম্নলোকে প্রাচীন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের উপবীত গুচ্ছের মতো তুষারশিলাকণ্টকিত মহাসিন্ধু নদ (Indus)

দক্ষিণ-পূর্ব থেকে চলে গিয়েছে উত্তর-পশ্চিম গিরিগর্ভের জটিল রহস্যলোকে। সে যেন অসূর্যম্পশ্য, ছায়াচ্ছন্ন, নিবিড়, আদিম—সেই একপ্রকার জীবজন্ম-চিহ্নহীন শিলাসমাকীর্ণ গিরিখাদের নীচে পার্বত্য বালতিস্তানীরা প্রেতচ্ছায়া দলের ইশারা দেখতে পায় বলেই এমন অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে, "Devils Place" (বা ভৌতিক এলাকা)। ভোট্টা দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভূতবিশ্বাসী অধিবাসীরা বিভিন্ন জনশূন্য অধিত্যকায় শুধুমাত্র প্রাণভয়ে ভেড়া ছাগলের পাল চরাতে যায় না।

পথঘাট সেই আদিমকালের পায়ে-চলা। দুস্তরেই হোক আর দুর্গমেই হোক, মানুষের পায়ের দাগ এখানে ওখানে যেন উর্ণনাভের জাল সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। এখানে ওখানে পাহাড়ী ছোট আধমরা ঘোড়া,—এই হ'ল কেবল অবস্থাপন্নদের বাহন। ফল-পাকড়ের বোঝা দুদিকে ঝুলিয়ে হয়ত বা কোথাও চলেছে বিবর্ণ অশ্বতর, আর নয়ত ধীরগতি অবশ্যম্ভাবী চামরী (যার ভিন্ননাম হ'ল 'চওর')। হাজার বছর আগে ঠিক যেমন ক'রে একই পথচিহ্ন ধ'রে ওরা চলত, আজও তেমনি ক'রে ওরা চলেছে। কালের তাড়না নেই কোথাও, জীবনের বৈচিত্র্যকল্পনা কোথাও জন্মগ্রহণ করে নি, আদিমের সঙ্গে আধুনিকের যোগ হয় নি কোনও সূত্রে,—শুধু এক অবিচ্ছিন্ন. অচ্ছেদ্য, অব্যয়—সব মিলিয়ে যেন একটা বংশপরম্পরাগত জড় জীবনের ধারাবাহিকতা। এখানে সর্বনিয়ন্তা মহাকাল স্তব্ধ, হিমেল অসাড়তার মধ্যে কেমন যেন মৃত্যুর মতো সর্বব্যাপী গতিহীনতা। জটাজুটবিলম্বিত প্রাগৈতিহাসিক এক সন্ন্যাসী তা'র জপের আসনে অটলভাবে বসে কবে থেকে যেন 'ফসিলে' পরিণত হয়ে গেছে!

বালতিস্তানের পার্বত্য জটিলতার ভিতর দিয়ে নানা শীর্ণ রেখাপথ নানাদিকে চলে গেছে। পূর্ব দক্ষিণে গিয়েছে লাদাখের দিকে; অতিশয় বিপজ্জনক দু-একটি রেখাপথ গেছে বহুদূর গিলগিটে; উত্তর লোক হিমবাহে অবরুদ্ধ; শুধু পশ্চিম পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার দিকে যাবার কয়েকটি ওই ধরনেরই পথ দেবশাহীর জনহীন উপত্যকায় গিয়ে মিলেছে। তবু ফল পাকড়ের মরশুমের কালে দুঃসাধ্য-সাধকের দল ওই সকল পথ দিয়েই বাণিজ্য করতে আসে পশুর দল সঙ্গে নিয়ে। আঙুর, জাম. তুঁত, খুবানি, সেউ, বাগুগোসা ইত্যাদি পাক ধরলে বালতিস্তানীরা মাথার চুলের সঙ্গে বর্ণবাহার ফুলের গোছা বেঁধে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেশি তাড়ির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

॥ ৫ ॥

উত্তর কাশ্মীর

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্প্রসারণবাদ নেই। সেই কারণে যেগুলি ভারতীয় এলাকা নয়, সেগুলি বিসর্জন দিতে তার কৃপণতা ঘটে নি। পশ্চিমে বেলুচিস্তানে বহু যুগ আগে ভারতীয় নরপতি ছিল, কিন্তু ভারত সে-ইতিহাস নিজেই মুছে দিয়েছে। ঠিক এই প্রকারে পূর্ব আফগানিস্তান, পশ্চিম তিব্বতের 'পুরঙ্গ' উপত্যকা,—(যেখানে আজও আছে বহু পরিমাণ ভারতীয় ও ভূটানী এলাকা), ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, সিংহল ইত্যাদি একে একে ত্যাগ করেছে। সিনকিয়াং এলাকায় অদ্যাবধি প্রায় এক হাজার বৃহৎ ভারতীয় ভূ-সম্পত্তি বর্তমান, যেমন বর্তমান ইয়াটুং, জ্ঞানৎসী, সিগাৎসি প্রভৃতি তিব্বতীয় অঞ্চলে। ভারতের বৈদান্তিক ঔদাসীন্য, স্বভাব-শান্তি, খাদ্যের ও সম্পদের প্রাচুর্য এবং জলবায়ুর তারতম্য,—এগুলি ভারতের আত্মতুষ্টির কারণ যুগিয়ে এসেছে। বাইরের লোক এসে চিরকাল এদেশে জায়গা নিয়েছে, কিন্তু ভারত কখনও বাইরে যায় নি। যদিবা গিয়েছে, সেটি সংস্কৃতি প্রচারের কামনায়। একমাত্র কাশ্মীরের মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য বোধ হয় এর কিছু ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় প্রধান ব্যতিক্রম ইংরেজ আমল।

যে এলাকাটাকে কাশ্মীরের একালের উত্তর-সীমানা বলে আমি নিজেই বারবার ঘোষণা করছি, সেটি কিভাবে ভারতীয় এলাকাভুক্ত হয় দেখা যাক। যেমন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরোত্তর বৃহৎ একটা ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ স্বাধীন কয়েকটি ছোট রাজ্য (Sovereign) বর্তমান ছিল। এদের নাম ইয়াসিন, তাংগির, সোয়াং, দারেল, চিলাস, হুনদার, হুনজা ও নাগর। মূল কাশ্মীরের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্কই ছিল না। (Frederic Drew : Jammu and Kashmir Territories—1875) ভারতবর্ষের মন যেটি কোনও দিন চায় না, ইংরেজ সেটি কাশ্মীররাজকে দিয়ে করিয়ে নেয়। পূর্বোক্ত পার্বত্য রাজ্যগুলি কাশ্মীররাজের নামে ধীরে ধীরে ইংরেজ বৃটিশ-ভারতের আধিপত্যের মধ্যে আনে।

ইংরেজ চলে যাবার পর পাক-অধিকৃত পূর্বোক্ত প্রাক্তন 'রাজ্যগুলি' বেঁকে বসেছে। তারা না চায় পাকিস্তানের কর্তৃত্ব, না বা চায় 'আজাদ কাশ্মীরে'র আধিপত্য। কারণ 'আজাদ কাশ্মীরে'র যাঁরা কর্তা, তাঁরা হলেন প্রধানতই দক্ষিণের লোক। তাঁদের সঙ্গে

উত্তরের কোনও সামাজিক বা রাজনীতিক সম্পর্ক কোনও কালেই ছিল না। সেই কারণে পূর্বোক্ত 'রাজ্য'গুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে কথায়-কথায়। সমগ্র বেলুচিস্তান, পাখ্‌তুনিস্তান, হাজারা, হুনজা দার্দিস্তান,—কোথাও শান্তি নেই। বর্তমানে যাঁরা পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ,—তাঁরা যে সৈন্যদলের দ্বারা 'আজাদ কাশ্মীরে'র তথাকথিত এলাকাগুলি শাসন করছেন, তাদের মধ্যে 'আজাদ কাশ্মীরে'র লোক একবারেই কম।

একদা ইংরেজের সহায়তায় ডোগরারা গিলগিট পুনরধিকার করে, এবং গিলগিট পর্যন্তই ছিল কাশ্মীরোত্তর সীমানা। ইংরেজের মনে ছিল সাম্রাজ্যরক্ষা, সুতরাং তারা ছিল সর্ববিষয়ে তৎপর। কিন্তু যারা চিরকালের দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি বা উপজাতি, এবং বিধিবদ্ধ শাসনশৃঙ্খলা যারা বংশ-পরম্পরায় কখনও স্বীকার করে নি, পামীর-হিন্দুস্তান-সিনকিয়াং-তুর্কিস্তান-আফগানিস্তান ইত্যাদির রাজনৈতিক সীমানা নিয়ে কোনও কালে যারা মাথা ঘামায় নি, ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় করা ছিল যাদের চিরকালের ব্যবসা,—লুণ্ঠন হত্যা দস্যুবৃত্তিতে যারা যুগ-যুগান্ত কাটিয়ে এসেছে,—তাদেরকে আয়ত্তে আনা সেদিন খুব সহজসাধ্য ছিল না। সেদিন মোটর গাড়ি চলে নি, বিমান ওড়ে নি, রেডিয়ো বাজে নি, টেলিফোনের ডায়াল ঘোরে নি। সেদিনের চেহারা ছিল অন্য প্রকার। সেদিন আমেরিকান দুধের গুঁড়ো বা টিনপ্যাক করা খাদ্যসামগ্রীর সৃষ্টি হয় নি! ছিল বড় জোর জ্যাম-জেলি-মাখন-বিস্কুট আর 'গোয়ালিনী মার্কা' টিনের ঘন করা দুধ। সে যাই হোক, হিন্দুকুশ আর কারাকোরম অঞ্চলের যে মধ্য-এশিয়া, সেখানকার সাংঘাতিক 'অরাজকতা'র মধ্যে গিয়ে ইংরেজ দেখল, মধ্য-এশিয়ার এই বিরাট ভূ-ভাগে যে চারটি রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও রাজনীতিক সীমানা নেই, কারও কোনও 'আঞ্চলিক এক্তিয়ারী' (sphere of influence) নেই, এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে আনাগোনার পথে বিন্দুমাত্র বিধিনিষেধও নেই। সেখানে আমুদরিয়া আর শিরদরিয়ার এপার-ওপার একাকার, আঘিলের সঙ্গে আলিচুড়ের গলাগলি, চিলাসী আর ইয়ারকন্দিতে তফাৎ নেই!

পঁচিশ বছর ধরে দলে দলে ইংরেজ ঘুরে বেড়াতে লাগল হিন্দুকুশে, পামীরে, হুনজায়, কারাকোরমে, সিনকিয়াংয়ে এবং চিত্রল ও হাজারায়। ইংরেজ মানচিত্রে এগুলিকে দেখানো হয়, "Unexplored Territory" (1875)। কিন্তু তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। সেই কালে দুটি জাতির সঙ্গে সীমানা বাঁটোয়ারা নিয়ে ইংরেজ কখনও কারচুপি করে নি,—তার একটি হল রাশিয়া, অন্যটি চীন। চীনের প্রতি তৎকালে ইংরেজের হৃদ্যতা এবং কতকটা প্রভাব থাকার জন্য চীনের স্বার্থের প্রতি তাদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু রুশ সম্রাট সম্বন্ধে মনে মনে উদ্বেগ থাকার জন্য হিন্দুকুশের সীমানায় ইংরেজরা রাশিয়ানদের সঙ্গে প্রথম একটি সীমানা চুক্তি সম্পন্ন করে

(১৮৮৫)। এই চুক্তির ফলে পামীর এলাকাতেও রুশ-ভারত-চীন—এই তিন রাষ্ট্রের একটি সম্মিলিত রাজনীতিক সীমানা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়। একথা এখানে আরেকবার মনে রাখা দরকার, এই চুক্তি সম্পাদনকালে রাশিয়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইংরেজ তিনটি রাষ্ট্রের মুখপাত্রের কাজ করেছিল, তার প্রথমটি হল আফগানিস্তান, দ্বিতীয়টি হুনজা তথা কাশ্মীর তথা ভারতবর্ষ, এবং তৃতীয়টি হল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত চৈনিক তুর্কিস্তান তথা সিনকিয়াং। এই চুক্তির ১১ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৬-তে একটি বিশেষ নীতি অনুযায়ী দক্ষিণ পামীরে রুশ-বৃটিশ সীমানা এইভাবে নির্দিষ্ট হয় যে, রুশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য—দুইয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্থল-সংযোগ না থাকে। সেই কারণে সর্বোত্তর আফগান এলাকা 'ওয়াখানের' সঙ্গে একখণ্ড সরু ভূভাগ (যতদূর মনে হয় এটুকু ভারতীয় ভূ-ভাগ) টেনে এনে পূর্বদিকে সিনকিয়াংয়ের সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ অঞ্চলটিকে বলা হয় 'তাগ্‌ডুমবাস পামীর।' অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি কৃত্রিম আফগান প্রাকার দাঁড়িয়ে গেল। ("On the principle that the boundaries of Russian and British interests should not touch, a small finger of Afghan territory in Wakhan was 'extended' eastwards to touch the province of Chinese Turkestan (sinkiang) on the Tagdumbas pamir"—Kenneth Mason, Superintendent, (formerly) Survey of India).

এর আগে বলে এসেছি ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থলপথে আনাগোনার জন্য ১৫ বা ২০ মাইলব্যাপী ভারতীয় অঞ্চল ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট ১৯৪৭-এর ৩০ অক্টোবরের মধ্যে গিলগিটে যেমন ভারতীয় সৈন্যদল পৌঁছাতে পারেন নি, তেমনি আফগান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তির দ্বারা ওই স্থলভাগটুকু তাঁরা ফিরিয়ে নিতেও সমর্থ হন নি।

যাই হোক, এর পরে সীমানা অঞ্চল নিয়ে একটি নতুন মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং সেদিন থেকে রুশ সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের পক্ষে এবং এদিকের বৃটিশ 'এক্তিয়ারী অঞ্চলের' লোকদের পক্ষে অবাধ আনাগোনার পথও বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৮-র ঠিক পরে 'গিলগিট এজেন্সি'তে যে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়, সেটি সেকালে মধ্য-এশিয়ার বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ অভিযানকারী দল এই চুক্তির পর থেকে রুশীয় পামীরে আর প্রবেশ করার অনুমতি পান নি। মধ্য-এশিয়ায় এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব রক্ষার ক্ষেত্র ছিল সামান্যই!

এখানে বলে রাখা দরকার, কাশ্মীরোত্তর 'ইন্‌দুস-স্তানের' উপর কাশ্মীর বা উপমহাদেশ

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ অধিকার অপেক্ষা উক্ত অঞ্চলে তৎকালীন বৃটিশ গভর্নমেন্টের সার্বভৌম অধিকার ছিল অনেক বেশি প্রবল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট' নামক আইন পাস করিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের উপর আপন সার্বভৌম অধিকার যখন ভারতের নিকট হস্তান্তরিত করেন, তখন ভারত-বৈরী চার্চিল এবং তাঁর রক্ষণশীল সহচরগণ যে ষড়যন্ত্রটি করেন, লর্ড ইসমে সেটি বহন করে আনেন এবং 'অহিফেনসেবী' মহারাজা হরিসিং সেটিতে প্রভাবিত হন—এটি অনেকেরই অনুমান। এই ব্যক্তি ছিলেন ইংরেজের কেনা গোলাম, এবং ইনি কাশ্মীরে যে ঐতিহ্যটি বজায় রেখে-ছিলেন সেটি হল এই, ভারতবর্ষের কোনও রাজনীতিক আন্দোলন, কোনও সংবাদপত্র (তৎকালীন স্টেটসম্যান ছাড়া), কোন রাজনীতিক নেতা, কোনও জাতীয়তাবাদী বক্তা, —কাশ্মীরে এঁদের সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ-নিষেধ। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট এই মহারাজার কুশাসনের বিরুদ্ধে দুর্গত কাশ্মীরে এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যিনি প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি একজন স্বল্পবিত্ত ইস্কুল-মাস্টার,—যাঁর পিতৃপুরুষ হলেন যজ্ঞোপবীতধারী হিন্দুকুলশ্রেষ্ঠ কাশ্মীরি 'ব্রাহ্মণ', এবং এখন যাঁকে বলা হচ্ছে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা! এককালে উত্তর প্রদেশের বারাণসী এবং কাশ্মীরস্থ মার্তণ্ড (মাটান) নগরীর রক্ষণশীল হিন্দু চক্রান্তের ফলে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদেরকে হিন্দুসমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরের শেখ সম্প্রদায় উনিশ শতকের কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ মাত্র। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মধ্যে এই কারণটি অন্যতম ছিল কিনা সেটি আমার সঠিক জানা নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, মীর্জা আফজল বেগ হলেন মোগল বংশের সন্তান। রাজনীতিক 'ব্যঞ্জন' প্রস্তুতের জন্য চিনি ও লবণ একত্র মিলেছে!

সে যাই হোক, 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স অ্যাক্ট' ছিল বৃটিশ ভারত সম্পর্কিত, এবং এই আইনের দ্বারা, সামন্তরাজ্যময় ভারতকে দূরে রাখার চেষ্টা ছিল। লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন এটি অবশ্যই জানতেন। এখনও বহু ভারতবাসীর ধারণা, কাশ্মীর আক্রান্ত হবার মূলে ভারত-বৈরী বিলাতের রক্ষণশীল দলের অপ্রত্যক্ষ সঙ্কেত ও ষড়যন্ত্র ছিল!

বালতিস্তানের আলোচনায় আবার ফিরে আসি। উপরে অপ্রিয় কথাগুলি বলার কারণ হল এই, স্বাধীনতালাভের পরেও ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরোত্তর 'ইনডুস-স্তানের' পরিচয় হতে পারল না! সে অংশ রয়ে গেল তেমনি রহস্যময় এবং 'অনাবিষ্কৃত', যেমন সে রয়ে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে। মোগল-আফগান বা পাঠান আমলে কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লী-লাহোরের স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিল, কিন্তু বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে পার্বত্য কাশ্মীরের নাড়ির সংযোগ হয় নি! তার ফলে হুনজা, বালতিস্তান,

চিলাস, শারদা বা 'যোগীস্তান'—এরা রয়ে গেল চিরকালের অজানা। ওরা নীচে এল না গরমের ভয়ে, এরা উপরে গেল না ঠাণ্ডার ভয়ে! শুধু আফগান আমলে এবং দুরানি আক্রমণের কালে কিছু সংখ্যক কাশ্মীরি পণ্ডিত পালিয়ে এসেছিল জাতিচ্যুতির ভয়ে, এবং তাদের সঙ্গে এসেছিল কিছু সংখ্যক কাশ্মীরি পশমিনার কারিগর। এই কারিগরদের মধ্যে যারা ছিল মুসলমান, তারা সিপাহী-বিদ্রোহের কালে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এরা প্রায় সকলেই তৎকালে পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী হয়েছিল।

বালতিস্তান চারিদিক থেকে পার্বত্য প্রাকারের দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল বলেই কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ভারতীয় জরীপ বিভাগ থেকেই ইংরেজ অধিনায়ক বলছেন, গুলাব সিং যখন মহারাজা হলেন তখন কাশ্মীরের সর্বসমেত শাসিত এলাকা হল ২৫ হাজার বর্গমাইল মাত্র। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২০ বছরের মধ্যে লাদাখ সমেত কাশ্মীর ভূখণ্ডের সামগ্রিক পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪ হাজার বর্গমাইল! এই সম্প্রসারণের ইতিহাস ইংরেজ জানত, এবং ইংরেজ ছাড়া আর কেউ কোনওদিন ভারত রাষ্ট্রের রাজনীতিক সীমানা নিয়ে মাথাও ঘামায় নি!

বালতিস্তানেও তাই। সেখানেও ইংরেজেরই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত। লাদাখের রাজা ওয়াজির ওয়াজারৎ-এর হাতে ইংরেজ স্বাভাবিক কারণেই বালতিস্তানের শাসনদায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ লাদাখ ও বালতিস্তানের একই অধিবাসী। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, জন-প্রকৃতি প্রভৃতি আগাগোড়া এক। সুতরাং ইংরেজের সেখানে সুবিবেচনা ছিল। লাদাখ ভূভাগের রাজাকে বলা হত, 'গিয়ালপো'। গিয়ালপো ওয়াজির ওয়াজারতের শাসনকর্মের সুবিধার জন্য বালতিস্তানকে দুইটি তহশীলে ভাগ করে দেয় ইংরেজ। উত্তরাংশের নাম হয় 'স্কার্দু' এবং দক্ষিণাংশটি আসে 'কার্গিলে'। দুর্গত এবং দরিদ্র বালতিস্তানীরা এই ব্যবস্থায় কিছু সুবিধালাভ করেছিল। কাশ্মীরের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন ফসলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারকে দেওয়া হত!

লাদাখকে যেমন বলা হয় 'পশ্চিম তিব্বত', তেমনি বালতিস্তানকে বলা হয়, 'ক্ষুদ্র তিব্বত।' এ দুটি নামই অলীক। কিন্তু এই প্রকার ইংরেজি নামকরণের প্রধান কারণ, সামাজিক জীবনে ভারতীয় বৌদ্ধ লামাগোষ্ঠীরা এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাখত, এবং নিজেরা লাসানগরীর সাংস্কৃতিক অনুশাসন মেনে চলত। সে যাই হোক, বালতিস্তানের উত্তরের অগণিত হিমবাহ থেকে সংখ্যাতীত নালাপ্রবাহ ও নদী নেমে এসেছে দক্ষিণে আর পশ্চিমে। যেগুলি বিশেষভাবে প্রশস্ত ও খরতর তাদের মধ্যে মহাসিন্ধু নদ, শিয়োক, শিগার, দ্রাস, সুরু, ব্রালদু, বাশার, হুশে

শালতরো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সমগ্র বালতিস্তানকে খান খান করে চিরেছে। ইংরেজি 'স্কার্দু' জনপদকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, 'আস্কার্দু'। এই জনপদটি বালতিস্তানের বৃহত্তম পার্বত্য জনপদ। এটি মহাসিন্ধুনদের পশ্চিম পারে অবস্থিত। এখানকার কতকটা অঞ্চলে মহাসিন্ধু পূর্বোত্তর-প্রবাহী। কিন্তু এই নদের ওপারে বহু দূর বিস্তৃত ভূখণ্ড অনধ্যুষিত এলাকা, মানব-বসতিচিহ্নহীন। স্কার্দুর পশ্চিমে দেবশাহী পর্বতমালা, উত্তরে ও পূর্বে মহাসিন্ধুর ওপারে হিমবাহলোক, দক্ষিণে লাদাখ ও জাস্কারের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। চারিদিকেই উচ্চ প্রাকার, মাঝখানে স্কার্দুর যেন চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে গিয়েছে!

স্কার্দু এবং সুদূর উত্তরের অপর একটি জনপদ 'রন্দু',—এই দুই সিন্ধু উপত্যকার বিস্তৃত প্রান্তর বালু-পাথর-কাঁকরে পরিপূর্ণ। এদের আশেপাশে নদীলগ্ন যে গ্রামগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি সুবিস্তীর্ণ মরুপাথরলোকে এক একটি শ্যাওলার ছোপের মতো। গরু বা বলদের বা মহিষের জন্মসংখ্যা একেবারেই কম—সেই কারণে প্রায় বহুক্ষেত্রে 'মানুষ-জন্তু'কে লাঙ্গল টানতে হয়। বালতিস্তানে মধ্যযুগের কয়েকটি ব্যবস্থা অদ্যাবধি প্রচলিত। তার মধ্যে একটি হল জবরদস্তি মেহন্নৎ আদায় করা, যেটির কুখ্যাত ইংরেজি তর্জমা হল, 'forced labour।' স্কার্দু তহশিলে এই রেওয়াজটি বেশি রকম প্রচলিত বলেই এটি চক্ষুপীড়াদায়ক। বালতিস্তান লাদাখেরই অন্তর্গত, কিন্তু বালতিস্তানের সঙ্গে লাদাখের একমাত্র পার্থক্য এই যে, উত্তর বালতিস্তানের প্রায় সমস্ত অধিবাসী ধর্মে মুসলমান! বৌদ্ধদের সংখ্যা অল্প—তাদের প্রায় সবাই কার্গিলের অধিবাসী। সে যাই হোক, মধ্য বালতিস্তানে স্কার্দু তহশিলের মধ্যেই মহাসিন্ধুর উপত্যকায়—যেখানে দুই হেমাঙ্গিনী নদী এসে গলাগলি করেছে, তারই অদূরে চতুর্দিকব্যাপী তৃণলতাশূন্য বালু-পাথরী ভূভাগের ঠিক মাঝখানে বালতিস্তানের চিরবিস্ময়ের মতো একটি সুন্দর ও মনোরম হরিৎসুশ্যাম এবং অতিশয় ফলবান জনপদ বর্তমান। এটির নাম 'খাপালু।' সমস্ত বালতিস্তানের মধ্যে এটি যেন মুক্তার মতো টলটল করছে ফলে, ফুলে ও ফলনে। সমস্ত বছরের মধ্যে বৃষ্টির পরিমাণ একান্তই সামান্য, কিন্তু বায়ুর সঙ্গে সাগুদানার মতো তুষারকণা মিশ্রিত থাকে প্রায় প্রতি সময়ে এবং দিবারাত্র। মাথার উপরে অতি স্বচ্ছ সুন্দর নীলাকাশ, ঝলমল করছে সূর্যালোক,—জুলাই বা আগস্টে বালু-পাথরী ময়দানে প্রচণ্ড উত্তাপ—কিন্তু তারই ভিতরে তুষারের দানা বৃষ্টির মতো ঝরছে চারিদিকে! করুণ মেঘের সজলতা কচিৎ এক আধবার দূর আকাশে দেখা যায়, কিন্তু সে টুকরো মাত্র। কখনও দুচার ফোঁটা, বড় জোর কোনও মাসে একটা ঝাপটা, হঠাৎ হয়ত বা শোনা গেল মেঘের গর্জন—কিন্তু তারপর আগাগোড়া সমস্তটাই মিলিয়ে গেল দুরাশার মতো! সুতরাং বৃষ্টি অপেক্ষা

তুষারের দানাগুলি গাছপালা ইত্যাদিকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখে। এখানে বলা উচিত তুষারপাতের প্রকৃতি সর্বত্র ঠিক একরূপ নয়। তুলোর মতো হাওয়ার মধ্যে ওড়ে এবং ঝুরঝুরিয়ে নামে—সে এক রকম, কিন্তু যেগুলি সাগুদানার মতো কতকটা ওজনসমেত বর্ষিত হয়—সে অন্য রকম। বালতিস্তানের আবহপ্রকৃতি সর্বত্র এইরূপ।

চারিদিকের নগ্নকান্ত ধূসর এবং ঊষর পর্বতমালার তলায় তলায় শুধু চোখে পড়ে স্বচ্ছ সুন্দর জলের সহস্র ধারা অবিরাম গতিতে কুলুকুলু আওয়াজ করে চলেছে। কিন্তু দৃষ্টি যেদিকে যতদূর চলে, বিরাট পার্বত্য মরুপাথরের স্নেহশূন্য, কীর্তিশূন্য, জনশূন্য একটা নির্দয় অর্থহীন জগৎ—যেন সৃষ্টিলোকের প্রকাণ্ড অপচয়। এরই মাঝে মাঝে মহাসিন্ধুনদের আনাচে-কানাচে শৈবালগুচ্ছের মতো এক একটি জনবসতি—কিন্তু সেইটুকু হরিৎক্ষেত্রে কিলবিল করছে চিরকালের ক্ষুধার্ত নরনারী! এরা ছিল সুপ্রাচীন বন্য ও পার্বত্য। ইতিহাসের প্রথম কালে এরা হয় বৌদ্ধ। পরবর্তীকালে এই 'ভোট্টা'রা হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। এরা যখন শিয়া-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয় তখন থেকে এদের স্ত্রীলোকরা একই কালে বহু স্বামী গ্রহণ (polyandry) করার রেওয়াজটি বর্জন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু মেয়েরা যখন বহুভর্তৃক হওয়া বন্ধ করতে লাগল, পুরুষরা তখন বহুপত্নীক হতে থাকল। ফলে, জন্মসংখ্যা বাড়ল প্রচুর। এই জনসংখ্যার প্রাচুর্যের ফলে বালতিস্তানের সামান্য ক্ষেতখামারগুলিতে এখন প্রতি বর্গ মাইলের লোকসংখ্যা কম-বেশি দুই হাজারে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বহু লোককে দেশ ছেড়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়। পেটের ক্ষুধা ধর্ম মানে না! সেখানে মুসলমান, বৌদ্ধ বা হিন্দু শুধু নামে মাত্র। বালতিস্তানীরা শুধু মজদুরির আশায় গিলগিট, চিলাস, বালতিং, আষ্টোর আস্কোল, এমন কি চিত্রল ও হাজারা বা কুর্দিস্তান অবধি চলে যায়। সম্প্রতি এই অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটেছে। স্কার্দু তহশিলের অন্তর্গত পার্বত্য 'ব্রালদা, কিরিস, পারকুট্টা, তোল্তি, চোর্বত' প্রভৃতি এলাকায় সামরিক কর্মতৎপরতা, বিমানঘাঁটি, রাস্তাঘাট, ছোট ছোট কাজকারবার, মোটর ট্রাক, জীপ প্রভৃতি বস্তুর আমদানি ইত্যাদি ব্যাপারে বাল্তিরা এখন কাজ পেয়েছে প্রচুর। শত শত মাইল মোটরপথ নির্মাণ, পাহাড় কেটে কেটে বাড়িঘর তৈরি, অফিসারদের জন্য বাংলো এবং বাগান রচনা, ভেড়া ও ছাগল সরবরাহের জন্য ঠিকাদারি, ছোট ছোট সব্জীর ক্ষেতখামার—ইত্যাদি বহুবিধ কাজে ওদের ডাক পড়েছে। স্কার্দু তহশিলে যে জীবনযাত্রার চেহারা ছিল আদিম—যেমন ওরা জমিতে সার দেবার জন্য শুধু জন্তুর নয়, মানুষের দেহনিঃসৃত মলরাশি সযত্নে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে এসেছে চিরকাল এবং জমিগুলির মধ্যে বিছিয়ে দিয়েছে ("As winter approaches earth is stored on the house tops and mixed with the dung of cattle and human

excrement. The latter is always collected in small walled enclosure . . . carried out in the spring in baskets and spread quickly over the land: Imperial Gazetter of India, Oxford, 1908)—সেই জীবনের একালে রূপান্তর ঘটেছে অনেকটা। এক্ষেত্রে আমেরিকান দাক্ষিণ্য কাজ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমেরিকার এই দাক্ষিণ্য পৃথিবীর যে কোনও ভূখণ্ডেই গেছে, সেখানেই রাজনৈতিক জটিলতার সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছে।

বাল্‌তিদের মূল রক্তধারা মিশ্রিতভাবে দার্দ ও মঙ্গোলীয়। দুদিকের গালের হাড় একটু উঁচু, নাক চাপা, চোখ দুটো দুদিকের দু'পাশে। প্রথম এক বাল্‌তিকে দেখে অবাক হয়েছিলুম! মাথার সামনেটা কামানো। কানের পাশ থেকে ছোট ছোট চুলের গোছা; ওই ঝুঁটিগুলোয় ফুল বেঁধে বেড়ায় শুনলুম। স্বাস্থ্য অতিশয় ভালো—দেখলে ভয় করে। হিংস্র একেবারেই নয়, বরং তার বিপরীত। পায়ে কাঁচা চামড়ার জুতো, পরনে রুক্ষ কম্বলের কোট আর পাজামা, মাথায় চাঁদিটুপি। টুপির পাশ থেকে চুলের ঝুঁটি বেরিয়ে আসছে। বালতিস্তানী কখনও স্নান করেছে, অথবা পরিচ্ছন্ন চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, এটি কোনও শতাব্দীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় নি!

শোনা যায় কোন্ এক কালে জনৈক ধর্মপরায়ণ ফকিরের প্রভাবে বালতিরা ইসলামে দীক্ষিত হয়। বালতিস্তানের সর্বপ্রসিদ্ধ 'গিয়াল্‌পো' ১৬শ শতাব্দীর শেষ দিকে এখানে রাজত্ব করতেন, এবং তিনি লাদাখ জয় করে এসে স্কার্দুর একটি পাহাড়ের কোলে একটি দুর্গ রচনা করেন! এই গিয়ালপো গোষ্ঠীর সর্বশেষ রাজা ছিলেন আহমেদ শাহ। বালতিদের দেশে 'সুলতান, নবাব, আমীর'—এই ধরনের শব্দগুলি প্রচলিত নয়।

বালতিরা রাজভক্ত সন্দেহ নেই। রাজার ক্ষমতা আধুনিককালে কতটুকু সে হিসাব না রেখেই তারা শ্রদ্ধাশীল। রাজপুরুষরা অত্যাচার করলেও তারা শ্রদ্ধেয়। আবার এর মধ্যেও আছে শ্রেণীবিচার। রাজগোষ্ঠী, সৈয়াদগোষ্ঠী, 'ক্রকৃপা' গোষ্ঠী এবং শেষকালে রইল জনসাধারণ। জনসাধারণ মানে তারা, যারা কথা বলেনি ভাষার অভাবে! গিয়াল্‌পো, সৈয়দ, ক্রকপা,—এরা পথে বসাচ্ছে বালতিদেরকে, আবার এরাই তাদের মুখপাত্র! আজকের অবস্থা কিছু উন্নত। যদিও লুঠ করছে পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণী, কিন্তু স্কার্দু তহশিলে মজদুরির ভাবনা আর নেই! উত্তর বালতিস্তানীরা ওতেই খুশী।

অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্যের আমলে বাল্‌তিস্তানের ভোট্টাদের প্রবল প্রতাপের কথা শোনা যায়। ইতিহাসের কোনও এককালে তিব্বতীরা পশ্চিমদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পায়। সম্রাট ললিতাদিত্য এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ

করার চেষ্টা পান। তৎকালীন মধ্যভারতের রাজা যশোবর্মণের সহায়তায় তিনি তিব্বতীদের পাঁচটি অভিযান-পথ অবরুদ্ধ করেন। অতঃপর ললিতাদিত্য তাঁর রাজদূতকে পাঠান চীন সম্রাটের দরবারে। তখন চীনদেশে টাং বংশের রাজত্বকাল। এই টাং সম্রাটের সঙ্গে তৎকালে বালতিস্তানের সংলগ্ন প্রদেশে, (সম্ভবত লাদাখে) চীনা ও তিব্বতীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ বাধে, এবং চীনারা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে ও তিব্বতীদের হটিয়ে দেয়। সম্রাট ললিতাদিত্য চীনাদের এই জয়লাভে উদ্দীপ্ত টাং সম্রাটের নিকট দুই লক্ষ সৈন্য চেয়ে পাঠান এবং মহাপদ্ম সরোবরের (উলার হ্রদ) তীরে তাদের তাঁবু ফেলার প্রস্তাব করেন। বুঝতে পারা যায় তৎকালের সম্প্রসারণবাদী তিব্বতীরা টাং বংশীয় চীন সম্রাট এবং কর্কট বংশীয় সম্রাট ললিতাদিত্য—উভয়েরই ঘোরতর শত্রু ছিল! সে যাই হোক, টাং সম্রাট পূর্বোক্ত রাজদূতের বিশেষ অভ্যার্থনার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সম্রাট ললিতাদিত্যের প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। ঐতিহাসিক কল্হন তাঁর ঘটনা-বিবরণীতে বলেছেন, 'ক্ষুদ্র তিব্বতে'র ভৌট্টারা অতঃপর ললিতাদিত্যের আমলে অথবা তার পরবর্তীকালে কাশ্মীর আক্রমণ করেনি!

ঠিক এইভাবেই কাশ্মীরোত্তর পার্বত্য প্রদেশগুলিতে উপজাতীয় দার্দরা ইতিহাসের প্রথমকাল থেকে ইংরেজ আমল অবধি প্রবল প্রতাপে বারম্বার কাশ্মীরবাসীদের উপর হানা দিয়েছে। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্যই প্রথম কাশ্মীরোত্তর প্রদেশগুলি আগাগোড়া অধিকার করে দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয় দার্দ জাতিকে এবং ভৌট্টাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও পদানত করেন। অতঃপর ললিতাদিত্যের রাজত্বকালের পর দেবশাহী পর্বতমালা এবং তার বিভিন্ন উপত্যকায় পুনরায় দার্দ জাতির অভ্যুত্থান ঘটে এবং বারবারই কাশ্মীরীদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ বাধে। দার্দরা আজও আছে কাশ্মীরের উত্তর পর্বতমালার প্রায় সর্বত্র, তবে এযুগে তাদের প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জরোয়ার সিং জম্মুর রাজা গুলাব সিংয়ের তরফ থেকে নূতনকালে ও নূতন করে লাদাখ জয় করেন। জাস্কার ও কারাকোরম—এই দুই বৃহৎ গিরিশ্রেণীর মাঝখানে যে ভূভাগ, সেটিকেই জরোয়ার সিং তৎকালীন লাদাখ মনে করে নিয়েছিলেন। এই ভূভাগের পূর্বদিকে কারাকোরম লেহ্ তহশিলের বিশাল প্রাচীরের কাজ করছে। যাই হোক, লাদাখ বিজয়কালে বালতিস্তানের রাজা আহমেহ শাহ লাদাখীদের পক্ষ নেন এবং সম্ভবত জরোয়ার সিংহের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন এবং লাদাখের খানিকটা অংশ কেড়ে নেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালতিস্তান আক্রান্ত হওয়ার মূলে বোধ করি এই কারণটিই বড় ছিল। জরোয়ার সিং স্কার্দু'র দুর্গ অবরোধ করেন এবং আহমদ শাহ তাঁর হাতে বন্দী হন। ১৮৪১-এ জরোয়ার সিং যখন তিব্বত আক্রমণ

করেন তখন এই আহমেদ শাহ তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য হন। পরের ঘটনা কিছু শোকাবহ। তিব্বতের এই যুদ্ধ তিব্বতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধের কালে আহমেদ শাহ চীনা ও তিব্বতীদের হাতে ধরা পড়েন এবং লাসা নগরীর নিকটবর্তী এক কারাগারে 'বার্ধক্য ও নৈরাশ্যে'র ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে জরোয়ার সিংহের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তিনি বা তাঁর সৈন্যদল কেউই আর জম্মুতে ফেরেন নি।

কাশ্মীরোত্তর প্রদেশগুলিতে একালে সুন্দর কয়েকটি মোটরপথ নানাদিকে ঘুরে বালতিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পেশাওয়ার থেকে বেরিয়ে উত্তরে আব্বটাবাদ হয়ে যে-মনোরম উপত্যকা পথটি বরাবর চিলাসের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেখানে দুদিকে দুই অমর্ত্যলোক দৃষ্টিগোচর হয়—একটি হল পশ্চিমের 'তিরিচ মীর,' অন্যটি নাঙ্গার গগনবিজয়ী শীর্ষলোক—সেটি পূর্বের। এখানে কাশ্মীরের অপরাজেয় নিসর্গ শোভা কেমন যেন একটি উদার গম্ভীর অনাদ্যন্তকালের দুই প্রহরীস্বরূপ দুই দিকে দণ্ডায়মান। এখানকার বিশালকায় দেওদার বনশ্রেণীর কেমন যেন একটি ত্রিকালজয়ী সৌন্দর্য নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে পৃথিবীর সকল দেশের পরিব্রাজককে আকর্ষণ করে আনে। মহাসিন্ধুনদের দুই পাশে ভয়াল অরণ্যলোক এবং বিভীষিকাময় গিরিখাদের তলায়-তলায় বনপুষ্পমালঞ্চের আশেপাশে চিরকালের কাব্য যেন বিষণ্ণ বিধুর শ্বাস ফেলে চলেছে। ক্বচিৎ কখনো দু'একটি আফগান রমণী, কখনও দু'চারটি নামহারা পরিচয়-হারা যাযাবর, কখনো মেষপালের সঙ্গে পাঠান পালক, কখনও বা এক আধজন চিলাসী 'বেওপারী'—তারপর সেই পার্বত্যলোক, সেই বনলোক, সেই উপলমুখরিতা গিরিগাত্রবাহিনী নির্ঝরিণীর দল—সব যেন নিঃঝুম! এদেরই ভিতর দিয়ে মোটরপথ এঁকে বেঁকে দূরদূরান্তে 'বাবুসর' গিরিসঙ্কটের দিকে মিলিয়ে গেছে। এই পথ চলেছে আষ্টোর ও বুনজি হয়ে মহাসিন্ধুনদ পেরিয়ে গিলগিটের দিকে। কিন্তু উত্তরে গিলগিটের দিকে না গিয়ে কেউ যদি দক্ষিণ-পূর্ব পথ ধরে বালতিস্তানে যেতে চায় তবে সে প্রবেশ করুক দার্দ জাতির প্রধান কেন্দ্রে। আষ্টোর থেকে দক্ষিণে যে প্রাচীন পথটি 'দাস', 'মিনিমার্গ' হয়ে উলার হ্রদের দিকে নেমে গেছে সেই পথে দাস হল দেবশাহী উপত্যকার অন্তর্গত। সুতরাং পথ চলে গিয়েছে দাস পেরিয়ে এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে দূর পর্বতশীর্ষে 'বুর্জিল' গিরিসঙ্কটের দিকে। বুর্জিলে গিয়ে উঠে দাঁড়ালে (১৩,৬৯০) সেই প্রাচীন পৃথিবী আবার যেন আপন আশ্চর্য অভিনবত্বকে প্রকাশ করে! দাঁড়িয়ে আছি হিমালয়ে, পিছনে দেখছি বিশাল নাঙ্গার মহাভাগ এবং সুদূর উত্তরে হিন্দুকুশ। সামনে দেখছি কারাকোরমের হিমবাহ দল,—যার সঙ্গে হিমালয়ের যোগ কিছু কম। দেবশাহী এবং কারাকোরমের মাঝখানে নীচের

দিকে লক্ষ্য করছি সেই সেকালের চীন পরিব্রাজক ঔ-কুং বর্ণিত 'পো-লিউ' প্রদেশ—সাম্প্রতিক ইতিহাসে যার নাম হয়েছে বালতিস্তান! 'বুর্জিল' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে বালতিস্তান বা স্কার্দু'র পথটি এককালে ছিল দুঃসাধ্য এবং দার্দরা এখানে নানাবিধ অনাচার করে এসেছে চিরকাল। কিন্তু ইংরেজ আমলে গিলগিট এজেন্সির পরিচালনায় এখান থেকে স্কার্দু'র পথটি প্রশস্ত ও কতকটা নিরাপদ হয়। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরোত্তর প্রদেশগুলির সুশৃঙ্খল শাসন পরিচালনার আগে ইংরেজ ছিল চতুর্ভুজ। প্রথম হাতে জরীপ ও মানচিত্র রচনা; দ্বিতীয় হাতে হুনজা ও দার্দ সম্প্রদায়কে আয়ত্তে আনা ও পার্বত্য পথঘাটকে সুগম করা; তৃতীয় হাতে নূতন জনপদ বসানো এবং বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা; চতুর্থ হাতে ভারত সাম্রাজ্যসীমানা রক্ষার জন্য সর্বত্র সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ এবং গিলগিট এজেন্সির মারফৎ বিরাট গোয়েন্দা বাহিনী (Intelligence) সৃষ্টি। ১৮৫০ থেকে ১৯৪০ অবধি উত্তর কাশ্মীরকে নিয়ে ইংরেজের চোখে ঘুম ছিল না!

পেশাওয়ার থেকে চীন-সিনকিয়াং অঞ্চলে পৌঁছবার পক্ষে একটি সুপ্রশস্ত ও সুন্দর পথ ইংরেজ নির্মাণ করে রেখেছে অনেক আগে—যেটি গিলগিট এবং হুনজা-বালতিৎ হয়ে সোজা উত্তরে গিয়ে পৌঁছেছে 'কিলিক দাওয়ান' এবং 'মিনটাকা' গিরিসঙ্কটে। এই পথটি চীন-পামীর (তাগ্‌দুম্বাস) হয়ে সিনকিয়াংয়ে ঢুকেছে। সম্প্রতি সিনকিয়াংয়ের এই পশ্চিমাঞ্চলে সোভিয়েট ইউনিয়নের কল্যাণে প্রচুর উন্নতি ও আধুনিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে—ইংরেজ আমলে যে সংবাদ কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাব থেকে একটি অতি প্রাচীন পথ 'লুহুলে'র ভিতর দিয়ে 'কেলং' (১৬,৫০০) অতিক্রম ক'রে লাদাখে ঢুকেছে। এই পথটি লেহ্‌ এবং শিয়োক নদী পার হয়ে উত্তরে কারাকোরম গিরিসঙ্কট (১৮,০০০) অতিক্রম ক'রে সিনকিয়াংয়ে কুন্‌লুন্‌ উপত্যকায় গিয়ে নেমেছে! মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশের এই পথটি হ'ল প্রাচীনতম। ইংরেজদের ধারণা, এই পথেই আসে একদিন চেঙ্গিস খান।

সম্প্রতি পাকিস্তানের সহায়তায় চীন থেকে বাল্‌তিস্তানে ঢোকবার আরেকটি পথ নির্মিত হতে চলেছে! এটি স্কার্দু থেকে খাপালু হয়ে 'সাসের' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে 'দেপসাং' উপত্যকার উত্তরে গিয়ে কারাকোরম গিরিসঙ্কটে মিলবে, এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চল অতিশয় দুস্তর ও দুর্গম। তুষারের নিত্যঝঞ্ঝা, বিগলিত তুষারশিলার সহস্র ধারা, ক্রোড়চ্যুত দ্রুতগতি হিমবাহের (Avalanche) সর্বক্ষণ আশঙ্কা, জনপ্রাণীশূন্যতা এবং কঠিনতম ঠাণ্ডা,—এইগুলি এই পথ-নির্মাণের পক্ষে কঠিন বাধা। তবুও এই পথ যাঁরা নির্মাণ করবেন বলে মনে হয়, তাঁদের পক্ষে ভারতের শান্তিবাদ, অহিংসা এবং বৈদান্তিক ঔদাসীন্য কাজে লাগতে পারে!

বালতিস্তানের বহু নদী স্বর্ণকণা বহন করে। এর মৃৎপাথরের প্রকৃতি তিব্বতের সঙ্গে মেলে। তিব্বতের অপর নাম 'স্বর্ণভূমি,' এবং সেখানে ভ্রমণকালে কয়েকটি স্বর্ণখনিচিহ্ন লক্ষ্য করেছি। একথা স্বীকৃত, চীন সাম্রাজ্যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং ব্রহ্মদেশে সোনা খুবই সুলভ। বালতিস্তানের বিভিন্ন নদীতে স্বর্ণকণা-সংগ্রহ ভোট্টাদের পক্ষে একটি প্রধান পেশা। কোনওকালে এদের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম কিছু ছিল না। দেশী উপায়ে নদীবিধৌত বালুপাথর কণিকার সঙ্গে মিশ্রিত স্বর্ণরেণু উদ্ধার করাই ছিল এদের কাজ। এই সোনা থেকেই তারা রাজস্ব দিয়ে এসেছে চিরকাল। সংগ্রহ যাদের বেশী ছিল তারা এককালে মাত্র বার্ষিক দশ টাকারই লাইসেন্স নিয়ে কাজ করতে পারত। নদীর দুই পারে বাল্‌তিরা বালুর স্তূপ জমিয়ে তার থেকে সোনার কণাগুলি ছাঁকতে বসত। স্কার্দু অপেক্ষা বালতিস্তানের দ্বিতীয় তহশীল কার্গিলে এই প্রকার স্বর্ণসংগ্রহশিল্পের প্রাধান্য বেশী। কার্গিল থেকে 'দ্রাস' হয়ে সোনামার্গ অবধি যে ছোটবড় গিরিনদীগুলি এসেছে, সেগুলিও প্রচুর স্বর্ণকণিকা বহন করে। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে বসলে কী পরিমাণ সোনা উদ্ধার করা যায় তার নানাবিধ চেষ্টা সম্প্রতি চলছে।

উত্তর বালতিস্তান প্রধানতই ইসলামে দীক্ষিত, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা কোনওদিনই কিছু ছিল না। নাম ও সংখ্যায় তারা মুসলমান, কিন্তু পবিত্র কোরাণের এক বর্ণও তারা জানে না। রমজানের মাসে তাদের দিবা-উপবাস নেই, ঈদের প্রার্থনা বা উৎসব কাকে বলে জানে না। সৌরবিশ্বে ঈদের চাঁদ নামক কোনও পদার্থ আছে তা তারা কখনও চোখেও দেখেনি! নমাজ পড়েনি তারা বংশ পরম্পরায়। বালতিদের নামকরণের মধ্যে মুসলমান সংজ্ঞা একান্তই কম। ভাষা তাদের মিশ্রিত তুর্কি, দারু এবং পাহাড়ি, কিন্তু কান পেতে তাদের কথা শুনলে আরবী-পারসিক ফোড়নের ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়।

উপ-মহাদেশ ভারতবর্ষের সমতলভূভাগে বালতিরা কখনও আসেনি রৌদ্রতাপের ভয়ে। উত্তর ভারতে, কাশ্মীরের উপত্যকায়, লাহুলের পাহাড়ে,—ইত্যাদি অঞ্চলে বালতি ভিখারী, বালতি যাযাবর বা বালতি মেষপালকরা মধ্যে মাঝে ছটকিয়ে আসত। কিন্তু নিম্ন সমতলে তারা নামতে ভয় পেত। প্রখর রৌদ্রে রোগগ্রস্ত হয়ে মরত, আর নয়ত এদিককার ভাষা না জানার ফলে শুকিয়ে মরত! সে যাই হোক, সমতল ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ ঘটেনি। কিন্তু বহুকাল থেকে দুইটি পথে এদের সঙ্গে যোগ ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের। এরা কার্গিল-জোযিলা-সোনামার্গ হয়ে উলারের দক্ষিণে বরামূলার পথ ধ'রে হাজারায় যেত রুজি-রোজগারের আশায়. আর নয়ত স্কার্দু থেকে বুর্জিল গিরিসঙ্কট পেরিয়ে আস্টোর

এবং গিলগিটের দিকে যেত। একালে এদের সঙ্গে মিলেছে 'ক্রুকপা' সম্প্রদায়—যারা দার্দিস্তানের অধিবাসী। মুসলমানদের পক্ষে যে সকল মাংস অভক্ষ্য এবং নিষিদ্ধ সেগুলির সম্বন্ধে এদের কিছুমাত্র রুচিবিকার নেই। অর্থাৎ মাংস মাত্রই ভক্ষ্য। এইরূপ 'উদার নীতি' ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেও ইদানীং দেখা যাচ্ছে! প্রাচীন যুগ তার সমস্ত পুরনো রুচি এবং অভ্যাসের তল্পিতল্পা গুটিয়ে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে।

কিন্তু উত্তর হিমালয়ের এই মানব বংশ পরম্পরার ভিতরে-ভিতরে ছোটখাটো নিত্য পরিবর্তনের বাইরে যে উদার বিশাল দিগ্‌দিগন্তজোড়া পার্বত্য কাশ্মীর—সে যেন এক আদিম বিশ্বপ্রকৃতির সুপ্রাচীন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রৌদ্রদীপ্ত নীলকান্ত আকাশে, চীর-পাইন-চেনার-দেওদারের গহন মহারণ্যে, সূর্যালোকোজ্জ্বল স্বর্ণরেণু-বাহিনী কাচ-স্বচ্ছসলিলা গিরিধারায়, চিরতুষারকিরীট দানবপ্রতিম পর্বতশীর্ষে—এদের মধ্যে কোথাও পরিবর্তন নেই! আপেল-আনারের বনে, রক্তকমলদল-প্রস্ফুটিত প্রাচীন 'মহাপদ্ম' সরোবরে, পুষ্পকাননপ্রচ্ছায় 'লোলাবে,—তেরু, গুপিস, গুরেজ, তোলতি, মিনিমার্গ,' অথবা পরমাশ্চর্য 'সিয়ারি'তে—প্রাকৃত সৌন্দর্যের কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। যে-পথ চলে গিয়েছে বিবাগিনী চন্দ্রভাগায় আর কৃষ্ণগঙ্গায়, ইস্কুমানের তলা দিয়ে ঘোড়সওয়ারের দল বহুবর্ণাঢ্য পুষ্পাস্তরণকে অশ্বক্ষুরাঘাতে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে যে পথে চ'লে যায় শেরকিলা থেকে কোহিস্তানের দিকে, 'দাস' পেরিয়ে যে আঁকাবাঁকা দস্যুপথ গিরিরহস্যের দিকে মিলিয়ে যায়, সেইসব পথে আজও কচিৎ বসন্তের মায়াকান্না করুণ পুষ্পগন্ধে ফুঁপিয়ে ওঠে! কিন্তু সব ছাড়িয়ে কে যেন কোথা থেকে ডাক দিয়ে যায় সুদূর কোন্ বৈকুণ্ঠের আনন্দলোকে—। এই আনন্দলোকের যিনি প্রথম নামকরণ করেছিলেন 'ভূস্বর্গ', তিনি রাজসিংহাসন অপেক্ষাও কাশ্মীরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর!

॥ ৬ ॥

দেবশাহী-সোনামার্গ-বলতাল-জোযিলা

পায়ে হাঁটা পথ ছাড়া ভ্রমণ সিদ্ধ নয়; প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে স্পর্শ করা,—সেইটিই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। পা চলে এবং মন তার সঙ্গে কাজ করে। গতি যত ধীর, বিশ্রামের ছেদ যত বেশি, ভ্রমণ ততটাই সার্থক। যত বেশি পরিমাণ দেখা, তত বেশি দর্শন। যত জানা তত জ্ঞান। পৃথিবীর অপর কোনও দেশে ভারতের মতো পরিব্রজ্যা নেই। 'সাধু' সকল দেশেই আছে, দেশ ভেদে তাদের খাদ্য ও পোশাকও ভিন্ন, কিন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথে ভারতের পায়ে-হাঁটা পরিব্রজ্যা কাজ দিয়েছে বেশি। রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুর বাইরে এসে যখন শেষরাত্রে তাঁর ঘোড়াটি ছেড়ে দিলেন, তারপর থেকে তিনি অপর কোনও যান-বাহন ব্যবহার করেছিলেন কিনা সেকথা 'ইতিহাস' বলে নি। তুলনাটা বেমানান হবে জানি, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় পরিব্রজ্যার একটা আধুনিক আভাস পাই আচার্য বিনোবা ভাবের পদযাত্রায়। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। তাঁর সঙ্গে অনেকের মতে না মিললেও পথে মেলে।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উপত্যকা-কাশ্মীরের ধানকাটা শেষ হয়। এক-এক দেশে এক-এক রকমের ব্যবস্থা। চাষীরা এখানে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে যতটা তুষারপাতের জন্য, ততটা বৃষ্টির জন্য নয়। কাশ্মীরের প্রধান বৃষ্টি বৈশাখের ক'টা দিন—তারপর মাঝে মাঝে। কিন্তু পার্বত্য বা উপত্যকা-কাশ্মীর কামনা করে প্রচুর তুষারপাত। ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী,—এগুলি বরফ পড়ার মাস। এর পর সেই বরফ গলবে,—সেই জল ছুটবে নালায়, প্রণালায় এবং বিতস্তা ও শাখাসিন্ধুর বিভিন্ন খালবিলে। অতিশয় তুষারপাত মানেই প্রচুর ধান। মহারাজা রণবীর সিংয়ের রাজত্বকালে (১৮৭৭) এরই বিপরীত প্রকৃতি-বিপর্যয়ের ফলে কাশ্মীরে ঐতিহাসিক অন্নাভাব ঘটে, এবং সেই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের কালে কীটপতঙ্গের মড়কের মতো হতভাগ্য কাশ্মীরীরা হাজারে হাজারে মরে। উপত্যকা-কাশ্মীরের পার্বত্য-প্রাকার সমেত যে সমতল ভূভাগ,—সেটির প্রধান খাদ্যই হ'ল ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল! এ দুটোই ওখানে প্রচুর। মাংস হ'ল খাদ্যবিলাস।

পাহাড়ে-মাঠে-গ্রামে ফলবান ঐশ্বর্য যেন ঝলমল করছে। আশ্বিনের সুস্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে উদার গম্ভীর বনস্পতির এখানে-ওখানে। গ্রামে-গ্রামে সেই নিরীহ জীবনযাত্রা,

—তেমনি মন্থর আর নির্লিপ্ত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে গ্রামের এখানে ওখানে কিছু কিছু দোকানপাতির সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাশ্মীরের উন্নতির পক্ষে চিরদিন বাধাস্বরূপ।

ধানের সঙ্গে অপর তিনটি ফসল একই সময়ে ওঠে আশ্বিন মাসে। সেগুলি ভুট্টা, 'কাংনি' এবং 'আমারন্থ'। কাংনির জন্য একটু শুষ্ক ভূমি এবং মধ্যেমাঝে বৃষ্টির দরকার। এগুলি ভাতেরই মতো। 'আমারন্থ' অতি সুস্বাদু দানা,—দুধ-সহযোগে অধিকতর উপাদেয় হয়ে ওঠে। কাশ্মীরী পণ্ডিতরা বিশেষ ক'রে এইগুলি খেয়ে 'একাদশী' পালন করেন। এই সঙ্গে ব'লে রাখতে পারি, কাশ্মীরের হতভাগ্য পণ্ডিত বা হিন্দুসমাজ কাশ্মীরে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নেই বললেই হয়। এই মূল কারণটির দ্বারাই কাশ্মীরের সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে!

একটির পর একটি মেষপাল পেরিয়ে যাচ্ছে এপাশ ওপাশ দিয়ে। ছাগলের সংখ্যা অপেক্ষা ভেড়ার সংখ্যা বেশি। এক একটি পাল নিয়ে যাবার জন্য তিন, চার বা পাঁচজন রাখাল সঙ্গে থাকে। এদের দেখলেই চিনি। শুধু স্বাস্থ্যকায় নয়,—সুশ্রী, সৌম্য ও দীর্ঘাঙ্গ। এদের সৌজন্য এবং মিষ্টি ব্যবহার জম্মু ও কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ। এরা 'গুজর' সম্প্রদায় এবং জাতিতে এরা মুসলমান। এদের প্রধান কাজ ছিল মেষপালন, কিন্তু ইদানীং অন্যান্য কাজেও এরা মন দিচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর মিলিয়ে এদের বর্তমান সংখ্যা হয়ত বা দাঁড়াবে কমবেশি লাখ তিনেক। এদের স্বভাবপ্রকৃতির শুচিতা সর্বত্র সমাদর লাভ ক'রে থাকে। কথিত আছে, অমরনাথ গুহায় প্রাকৃতিক খেয়ালখুশিতে মাঝে মাঝে যে তুষার শিবলিঙ্গটি চৌবাচ্চার ভিতর থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায়, সেটি প্রথম আবিষ্কার করে এক গুজর মুসলমান। সেইজন্য অমরনাথের গুহার ভিতরে পূজাকালে মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। রাজনীতির সম্বন্ধে গুজরদের কোনও দিন কোনও ঔৎসুক্য নেই। সেই কারণে আধুনিক কালের ছোট-বড় হুজুগ যেগুলি ঘটে—প্রধানত শ্রীনগরে, সেগুলির দিকে তাকিয়ে এরা কৌতুক বোধ করে। এরা যে ভাষায় বা 'বোলিতে' কথা কয়, সেটির নাম 'পরিমু।' এরা গরু-মহিষও পালন করে এবং পাহাড়ে-পাহাড়ে ভুট্টারও ক্ষেত বানায়।

'গন্দারবল' পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেলুম। বন-বাগান, অধিত্যকা, শাখাসিন্ধুর বহু নালাপথ—সব পিছনে ফেলে উত্তর পথে অনেকটা এগিয়ে চললুম। গন্দারবলকে কেউ বলে 'গান্ধারবল', কেউ বা 'গান্ধর্ববল'। এই সকল উচ্চারণের মধ্যে হিন্দু মনের একটি যেন পুলক-শিহরণের ভাব আছে। যদি বলি, 'জাফ্‌রান' ফলন কাশ্মীরে প্রচুর এবং জাফরানের ভিন্ন নাম হল 'কাশ্মিরা'—তাহলে হিন্দুমন বিরূপ হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের সঙ্গে অনৈতিহাসিক কাশ্যপমুনির নামের যোগটি থাকলে আমারও মন যেন

সুখী থাকে! 'রাজতরঙ্গিণী'র অনুবাদক অরেল স্টাইন প্রমুখ অনেকেই এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু চীন-সিনকিয়াংয়ের অন্তর্গত আধুনিক 'কাশগড়' শহরটি পুরাকালে 'কাশ্যপগড়' ছিল কিনা, এটি নিয়ে কেউ কথা তোলেননি।

চেনার বনের তলা দিয়ে আরও দুটি ভেড়া-ছাগলের পাল পর পর পেরিয়ে গেল। ওদের গা থেকে লোম কেটে নেবার কাল হ'ল চৈত্রমাসের শেষ দিকে—যখন গরমের আভাসে বসন্তকাল নামে, পাহাড়ের দিকে তুষার গলে। ওরা শীতপ্রধান দেশের জন্তু, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ওরা তুষারপাত, তুহিন হাওয়া ইত্যাদির থেকে আত্মরক্ষা করে ওই লোমেরই সহায়তায়। কিন্তু ঠিক সময়ে লোম কেটে না নিলে অথবা শীতের প্রাক্কালে লোম কাটলে ওরা বাঁচে না। কিন্তু এই 'ক্লিপিং' করার বিশেষ যন্ত্র, পদ্ধতি এবং সময় নির্দিষ্ট করা আছে। যে-ভূভাগ যত বেশী শীতপ্রধান, সেখানকার ভেড়া-বা ছাগলের লোম তত বেশি ঘন ও দীর্ঘ। বিশেষ শ্রেণীর ঋব্বু, চমরী, কুকুর, পাহাড়ি ভল্লুক বা হরিণ, বিশেষ শ্রেণীর ঘোড়া, গর্দভ বা অশ্বতর—এরা অল্পবিস্তর লোমশ। কিন্তু সর্বপ্রকার জন্তুর মধ্যে একমাত্র ভেড়া ও ছাগলের লোম প্রয়োজনের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। 'মেগাটন-১০০' নামক বোমার দ্বারা পৃথিবীকে হয়ত বা ধ্বংস করা যায়, কিন্তু একটিমাত্র লোমশ মেষশাবকের মুখে যদি ভাষা থাকত, সে চীৎকার ক'রে বলতে পারত, আমি পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের রক্ষাকর্তা! সভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনও বস্ত্রাবরণ অদ্যাবধি প্রস্তুত হয়নি যেটি মানুষের দেহকে কোমল ও মধুর উত্তাপের দ্বারা কঠিনতম ঠাণ্ডার মধ্যে সঞ্জীবিত রাখতে সমর্থ হয়। সেটি ভেড়ার লোম! যার ভিন্ন নাম পশম!

এই গুজরদের গায়ে-গায়ে মিলিয়ে থাকে অপর একটি সম্প্রদায়, তাদেরকে বলা হয় 'গাদ্দি।' এরা পাহাড়ে-বনে-নগরপ্রান্তে যেখানে-সেখানে ঘর বাঁধে, আবার ঘর ভাঙে। এদের সংসারযাত্রায় বিশেষ শৃঙ্খলা নেই। পথে-পথে এই গাদ্দিরা অনেকটা জিপসিদের মতোই সন্তান পালন করে, মজুরি খাটে, শীতকালের আগে কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে, নিজেরা কম্বল বুনে নেয়, মেয়েরা নানাবিধ অলঙ্কার ও রঙ্গীন ঘাগরা বানায়, এবং পাহাড়ে-পাহাড়ে আবার বেরিয়ে পড়ে। এরা সভ্য জগতের ধার ধারে না, সভ্য জগৎ এদের ভালমন্দর খোঁজও রাখে না। এরা প্রধানতই হিন্দু সম্প্রদায়। সমগ্র কাশ্মীরে হিন্দু বা মুসলমান—এ একটা চেতনা মাত্র। জীবনের সঙ্গে এই চেতনার প্রাত্যহিক বা ব্যবহারিক যোগ নেই! সমতল ভারতের সঙ্গে উচ্চভূম কাশ্মীরের বিপুল ব্যবধান এইখানে। ভারতে তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা যেখানে উগ্র, কাশ্মীরে সেই চেতনা আপন ঔদাসীন্যে কোমল। সেই কারণে উপমহাদেশ ভারতবর্ষের প্রখর সাম্প্রদায়িক ইতরতা কাশ্মীরে কোথাও অদ্যাবধি দানা বাঁধে নি।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই, পাকিস্তান-অধিকৃত 'আজাদ-কাশ্মীর' এলাকায় যাঁরা 'কাশ্মীরী শাসক', তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তানী শাসকদের আগাগোড়া বনিবনা ঘটে নি। বার বার 'আজাদ-কাশ্মীরে' নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটেছে, বারম্বার পাকিস্তানের হাতে 'আজাদ কাশ্মীর' লাঞ্ছিতও হয়েছে, কিন্তু আপন স্বভাব-ধর্মকে কেমন ক'রে বিসর্জন দিতে হয়, এটি কাশ্মীরী মুসলমান আজও শেখে নি। 'যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা'র ওপার থেকে যারা গুলি ছোড়াছুড়ি করে, তাদের মধ্যে জাত-কাশ্মীরী ক'জন আছে, আঙুলে গুণতে ইচ্ছা করে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান যখন ঘোষণা করলেন, 'হজরৎবাল মসজিদ থেকে পয়গম্বরের যে পবিত্র কেশ চুরি হয়েছে সেটি কখনই মুসলমানের কাজ নয়', তখন কাশ্মীরী মুসলমান জনসাধারণ পথে-পথে দল বেঁধে বেরিয়ে ঘোষণা করল, 'পবিত্র কেশ যেই নিয়ে থাকুক, আমরা সাম্প্রদায়িক লড়াই করব না! ওটা ঘৃণ্য।' বলা বাহুল্য, কাশ্মীর সেদিন উৎকণ্ঠিত ভারতের সম্ভ্রম বজায় রেখেছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত "Imperial Gazetteer of India: Kashmir and Jammu" বইটি থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না: "Islam came in on a strong wave . . . But close observers of the country see that the so-called Mussalmans are still Hindus at heart. Their shrines are on the exact spots where the old Hindu "sthans" stood . . . The Kashmiris do not flock to Mecca, and religious men from Arab and other countries have spoken in strong terms of the apathy of those tepid Mussalmans. In social sphere there are no changes from old times."

সে যাই হোক, হজরৎবাল মসজিদ পরিদর্শনকালে এর বাকি আলোচনাটুকু করার ইচ্ছা রইল।

'চন্দ্রভাগা' নদী পার হয়ে গেলুম। এটিও শাখাসিন্ধু, কিন্তু নামটি ভিন্ন। একই নদী, কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তার নাম। অমরনাথ গুহাপথে পৌঁছবার কিছু আগে যেখানে শাখাসিন্ধুর পাঁচটি বিভিন্ন ধারা একত্র হয়, সেটির নাম 'পঞ্চতর্নী।' অর্থাৎ কোলাহই, কোহিনুর, ঝুনকুন প্রভৃতির কাছাকাছি যে হিমবাহগুলি বর্তমান,—এই ধারাগুলি তাদেরই। এগুলি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে শ্রাবণের শেষ দিকে যখন এদিকে তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আকস্মিক বন্যার তাড়নায় দুই হাজার তীর্থযাত্রীর জীবননাশ হয় এই পঞ্চতর্নীর সঙ্কটে। ফলে, পরবর্তী দশ বছরের

মধ্যে বহু যাত্রী ওপথে যেতে সাহস পায় নি। অমরনাথের নীচে যে নদীটি অমরাবতী বা অমরগঙ্গা নামে পরিচিত, সেইটি এখানে এসে নাম পেয়েছে 'চন্দ্রভাগা।' এই চন্দ্রভাগা দাল হ্রদের পশ্চিম পার দিয়ে নেমে গিয়ে বিতস্তায় মিলেছে।

দক্ষিণ থেকে এতক্ষণ উত্তরপথে যাচ্ছিলুম। উত্তরের এই পথ উলার হ্রদের পূর্বপার দিয়ে দূর দূরান্তরে চলে গেছে পাহাড়ের তলায় তলায়। সোনামার্গের এই পথটি অতি প্রাচীন! চন্দ্রভাগা বা শাখাসিন্ধু এখানে হিমালয়ের দুই বৃহদাকার দানবকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। একটি হল হরমুখ, অন্যটি কোলাহই। এই দুই উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষের ঠিক মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বোত্তরে পথ চলে গিয়েছে সোনামার্গ হয়ে জোযিলার দিকে। অন্য পথটি গেছে পশ্চিম থেকে উত্তর গিরিলোকের ভিতর দিয়ে। হরমুখের পশ্চিমে গুরেজ ও 'লোলাব' উপত্যকা পেরিয়ে এই উত্তরমুখী দূর দূরান্তের পথ এক সময় কৃষ্ণগঙ্গার গভীর গিরিখাদ অতিক্রম করে 'বুর্জিল' গিরিসঙ্কটের দিকে চলে গেছে। এই পথেরই মাঝখানে পড়ে বড় রকমের পার্বত্য জনপদ 'মিনিমার্গ।' এই পথ অতি সুন্দর এবং অরণ্যময়! এটিকে উপত্যকা বলে বারম্বার বর্ণনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু এটি আগাগোড়া পার্বত্য। দার্দ বা বম্বাস জাতির মধ্যে যে সম্প্রদায়টি প্রশাসনিক শৃঙ্খলার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নি, এ অঞ্চলে তাদের ক্রিয়াকলাপ অল্পবিস্তর আজও অব্যাহত রয়েছে। এর চারিদিকের বৃহৎ ভূভাগটি 'দার্দিস্তান' নামে পরিচিত। ইদানীং কৃষ্ণগঙ্গার উত্তর সীমানা থেকে বুর্জিলের মধ্যে পাঠান এবং পাখতুনরা ডেরা বেঁধেছে অনেক। দার্দরা হ'ল জাত-পাহাড়ী এবং শক্তিশালী। সেই জন্য তাদের স্বার্থে ঘা লাগার ফলে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে ওঠে। পৃথিবীর সকল দেশের রাজনীতি হ'ল অর্থনীতিকেন্দ্রিক। যেখানে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদির নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে স্বার্থত্যাগ, দেশানুরাগ, জাতীয়তাবাদ —এগুলি বাতুলের প্রলাপ মাত্র। দার্দ অথবা পাঠানদের যখন একথাগুলি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়, তারা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তখন উভয় পক্ষেরই উপর গুলিচালনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে, 'আজাদ কাশ্মীর' এলাকার মধ্যেও শান্তি নেই।

'বুর্জিল' সঙ্কট অতিক্রম ক'রে এই পথটি গিয়ে নামল দেবশাহী উপত্যকায়। এখানে প্রথম যে দার্দ জনপদটি পাওয়া যায় সেটির প্রাচীন নাম ছিল 'দাহ', এখন হয়েছে 'দাস'। অতিশয় প্রাচীন এবং বন্য ও আদিম জীবনযাত্রার সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা চিরদিন অভ্যস্ত। এর চারিদিকে অনধ্যুষিত পার্বত্য এলাকা—যেটি কাশ্মীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অরণ্য-অটবীর বিশাল গম্ভীর শান্তি যেন কল্প-কল্পান্তকালের একটি ধ্যান-মৌন স্তব্ধতার মতো এখানে নিত্য বিরাজমান। ছোট জনপদটি পার হয়ে গেলে কেউ কোথাও নেই,—মানববসতি-শূন্য। অরণ্য ও তৃণভূমি নীলাভ। চারিদিকে নুড়িপাথর

ও শিলাখণ্ড পরিকীর্ণ ক'রে রেখেছে অধিত্যকাভূমি—যেখানে শস্যের ফলন কল্পনাতীত। এর একদিকে গগনচুম্বী নাঙ্গা, অন্যদিকে বিশাল দেবশাহীর পর্বতমালা। এদেরকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে উত্তর ও পশ্চিম প্রবাহী আরণ্যক মহাসিন্ধুনদ। এই দুইটি পর্বতমালার একদিকে চিলাস, অন্যদিকে বালতিস্তানে পৌঁছবার পথ। 'দাস' জনপদটি 'গিলগিট ওয়াজারতের' এলাকায় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে দেবশাহী উপত্যকার প্রারম্ভ থেকেই সমগ্র উত্তরভাগ 'গিলগিট এজেন্সি'রই এলাকা। কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার পর থেকে মহাসিন্ধুনদের উত্তরভাগে হুনজা জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করেছে। হুনজার মীর বা আমীরের সঙ্গে 'আজাদ কাশ্মীর' কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ প্রায় নিত্যকার ঘটনা। অনেকে মনে করেন সিনকিয়াংয়ের চীনবিরোধী গুপ্ত বিদ্রোহী দলের সঙ্গে হুনজার আমীরের যোগ রয়েছে। পার্বত্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দার্দ, চিলাসী, হুনজা, নাগর, বালতি, ইয়াসেনী—এদের প্রকৃতি বৈরী-নাগাদলের মতো উগ্র আত্মকেন্দ্রিক। এরা কোনকালেই অপরের প্রভুত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। ইদানীং এদের আশেপাশে মিলেছে সিনকিয়াংয়ের চীনা-বিরোধী আমীরের জাতীয়তাবাদী দল। এ ছাড়া হুনজার উত্তরে পামীর এলাকায়—যার সাধারণ উচ্চতা ২০ হাজার ফুট—সেখানে তাগদুমবাস অঞ্চলে সম্প্রসারণবাদী নূতন চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিসম্বাদ এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। চীনের বিশ্বাস, প্রাচীন পূর্ব-তুর্কিস্তান বা সিংকিয়াং-এর পশ্চিম প্রান্ত—হুনজা, নাগর এবং সোভিয়েট তাজিক, কিরগিজ ও কাজাখস্তানের মধ্যেও প্রসারিত। বিগত ৪০ বৎসরকালের মধ্যে সিনকিয়াং-এর বৃহৎ একটা অংশ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুব্যবস্থার সঙ্গে সংলিপ্ত। সোভিয়েট এলাকাভুক্ত পশ্চিম সিনকিয়াং বা তুর্কিস্তান নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে এই দীর্ঘকালের মধ্যে। শত শত বছরের স্বাধীনতায় মধ্যে এরা প্রতিপালিত। পূর্ব সিনকিয়াং চিরকাল আত্মনিয়ন্ত্রণশীল পৃথক রাষ্ট্র,—যেমন তিব্বত। চীন সম্রাটের নিকট এদের আনুগত্য ছিল শুধু নামে মাত্র। মূল চীন ভূভাগের সঙ্গে এদের কোনও যুগেই পরিচয় ঘটে নি। এককালে যখন রাজনীতিক সীমানা নিয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না, তখন মঙ্গোলিয়া ও সিনকিয়াং ওরফে তাকলা-মাকান্ মরুপথে চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা এই মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়েই প্রবেশ করত গৌতম বুদ্ধের পুণ্যভূমিতে। ভারতীয় রাজতোরণ তাদের জন্য অবারিত থাকত কারাকোরম বা কৃষ্ণপর্বতমালার গিরিসঙ্কটে, এবং বিগত আড়াই হাজার বছরের মধ্যে যার সীমানা নিয়ে কোনও তর্ক ওঠে নি!

সোনামার্গে এসে পৌঁছলুম, তখন অপরাহ্ণকাল। এ যেন এক নিঃঝুম নূতন পৃথিবী।

চন্দ্রাভাগার দক্ষিণ পারে কোলাহই পর্বতের ভীমপ্রাকার নদীর সীমানা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে উঠেছে ১০ হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আছে শুধু কৃষ্ণবর্ণ মধ্যকায় ভল্লুক—যারা বাগে পেলে পাহাড়ি নিরীহ ঘোড়াকে আক্রমণ করে। হিমালয়ের ভল্লুকরা গুহাবাসী। কোলাহইয়ের উত্তরে সোনামার্গ, দক্ষিণে পহলগাঁও, পূর্বে অমরনাথ এবং পশ্চিমে শ্রীনগর এলাকা। কোলাহই-র উচ্চতা ১৮ হাজার ফুট; এবং শ্রীনগর থেকে সোনামার্গের দূরত্ব মোটর-পথে ৫৩ মাইল।

সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহ। টুরিস্টের মরশুম যদিও এখনও শেষ হয় নি, তবুও এদিকে লোকে আজকাল কমই আসে। পশ্চিমের দিকে শাখাসিন্ধুর আশেপাশে টুরিস্টদের ভ্রমণ বিহারের একটি বিস্তীর্ণ অবকাশ আছে। অনেকে তাঁবু নিয়ে আসে। কেউ কেউ রাত্রিবাসও ক'রে যায়। দিনমানে কচিৎ কখনও কাননকুঞ্জে ছায়াবীথির তলায়-তলায় বন্যপাখীর কূজন-গুঞ্জরণের সঙ্গে অনুরাগরঞ্জিত প্রলাপ-কণ্ঠও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে নির্জন বনতলের পুষ্পবিছানো তৃণপথ ধরে হয়ত বেরিয়ে এল এক নতুন কালের দম্পতি! হয়ত বা নদীতীরবর্তী তাঁবুর ভিতর থেকে মিশ্রিত কলকণ্ঠের গদগদ হিন্দি কোলাহল শুনে বিবাগী পরিব্রাজককে থমকিয়ে যেতে হল। পৃথিবী সেই প্রাচীন—সেই নিত্য নবীন!

আসবার সময় 'কংগন, গুন্দ, ওয়াংগৎ' প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ পেরিয়েই এসেছি। কিন্তু আগেকার সেই সব ছোট ছোট গ্রাম এখন বড় হচ্ছে, নাম পালটাচ্ছে। মোটরপথ উন্নত হবার ফলে অনেক স্থলে ব্যবধানেরও তারতম্য ঘটছে। এ ছাড়া সম্প্রতি মোটর বাস এবং ব্যবসায়ীদের মালবাহী ট্রাক কাশ্মীরের বহুদূরবর্তী জনপদগুলিরও চেহারা বদলিয়ে দিয়েছে। ঘরদোরের চেহারা ফিরেছে, মাঝে মাঝে দোকান বাজার বসেছে, বিভিন্ন শাকসব্জির আমদানি হচ্ছে এবং প্রায় বহু ক্ষেত্রে জনসাধারণের পোশাকের পারিপাট্যও এনেছে। আধুনিককালের নাগরিক উপকরণসম্ভার কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছে প্রচুর। শ্রীনগরের 'লালচৌকে'র সঙ্গে কলকাতার মুর্গিহাটার পার্থক্য আছে কিনা ভাবতে হয়। পাঠানকোট থেকে এখন মালবাহী ট্রাক ছাড়ে অগণ্য,—তারা সামগ্রীসম্ভার পৌঁছিয়ে দিচ্ছে শত শত মাইল দূরের দুস্তর পার্বত্য এলাকায়,—বিশ বছর আগেও কাশ্মীরে যা ছিল স্বপ্নবৎ।

সোনামার্গ জনপদটির এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে শীতটি বেশ জমজম করে ওঠে। উত্তর-পূর্বলোক বৃহৎ পার্বত্য প্রাকারবেষ্টিত, এপাশেও তাই। দুইদিকে দুই শ্রেণী,—নীচের দিকে সোনামার্গ। জোযিলা থেকেই একপ্রকার পশ্চিম নদীপথে আজও স্বর্ণরেণুকণা সংগ্রহের কাজ চলে। পশ্চিমের এই পথ দেবদারু, চেনার ও আখরোটের নিবিড় ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেছে উলারের দিকে। এই অঞ্চলের হরমুখের

হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণগঙ্গার ধারা। পার্বত্য বনলোকের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণগঙ্গা উত্তর পশ্চিমে গিরিখাদ রচনা করতে করতে গেছে। লোলাব, গুরেজ এবং শারদাস্থান পেরিয়ে দুটি শহরের তলা দিয়ে সে যাবে মুজাফ্ফরাবাদের দিকে। এ দুটির একটি শহর প্রসিদ্ধ। সেটি 'তিথওয়াল।' অন্যটি প্রাচীন 'কর্নাহ।' এখন এ অঞ্চলটি পাক-ভারত 'যুদ্ধবিরতি সীমানা।'

কংগন ছেড়ে সোনামার্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেই বুঝতে পারা যায় পথ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে—দুই দিক থেকে গিরিশ্রেণী গায়ে-গায়ে এসে লাগছে। খোলা মাঠ আর নেই, ফসলের ক্ষেতগুলি হারিয়ে যাচ্ছে, সমতল ভূভাগের আর দেখা মিলছে না। কাশ্মীরের জগৎপ্রসিদ্ধ সমতল উপত্যকা সোনামার্গের নদীপ্রান্তে এসে শেষ হয়ে গেল। বর্গমাইলের হিসাব ধরলে এই উপত্যকা দুই হাজার মাইলের চেয়ে আর কতটুকুই বা বেশি? কিন্তু এইটুকু ভূভাগের পরমাশ্চর্য ভৌগোলিক স্থিতি পৃথিবীবাসীর পক্ষে চিরকালের আকর্ষণ। সোনামার্গে পৌঁছবার মাইল দুই আগে একটি উচ্চ মালভূমিতে পৌঁছানো যায়, সেটির নাম 'থাযওয়াজ।' থাযওয়াজের আরণ্যক ও পার্বত্য সৌন্দর্য অতি মনোরম। এখানে সুবৃহৎ একটি হিমবাহ তুষার নদীর আকারে স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কোলাহইকে ঘিরে রয়েছে শাখাসিন্ধু বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ধারায়, এই কারণে কোলাহইয়ের চতুর্দিকব্যাপী অধিত্যকা অঞ্চলের নাম হয়েছে 'সিন্ধু-উপত্যকা' বা 'সিন্ধু-ভ্যালী।' প্রত্যেক নদ বা নদীর সঙ্গে একটি ক'রে 'ভ্যালী' সংযুক্ত। বিতস্তা চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, মহাসিন্ধু (Indus) প্রত্যেকের সঙ্গেই 'ভ্যালী' বর্তমান। পহলগাঁও 'লিডার' উপত্যকায় হলেও এই মনোরম পাইন সমাকীর্ণ জনপদটি সিন্ধু-উপত্যকার অন্তর্গত। এই উপত্যকার উপর দিকে পার্বত্য অবক্ষয়ের আশেপাশে ঈগলপাখীর বাসা এবং কস্তূরী হরিণের সন্ধান পাওয়া যায়। লিডারের অপর নাম নীলগঙ্গা।

এদিককার গিরিশ্রেণীর উচ্চভাগে তুষার-চূড়ার আশেপাশে কতকগুলি জলাশ বর্তমান। অমরনাথ, ভৈরবঘাটি, হরমুখ,—এদের একেকটিতে অতি সুন্দর নীলাভ জলরাশি নিয়ে যে হ্রদগুলি বর্তমান সেগুলির নাম সোমসায়র, জ্ঞানসায়র, নাগবল, রাজবল, নাঙ্গাবল, গঙ্গাবল ইত্যাদি এবং সবগুলিই ১২ থেকে ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে। আগষ্ট বা সেপ্টেম্বরে এগুলি দেখবার সুবিধা। হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণের পক্ষে এই দুটি মাসই শ্রেষ্ঠ কাল। তিব্বতেও আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসই ভ্রমণের পক্ষে উপযুক্ত সময়।

সোনামার্গের এই পথটি সুপ্রাচীনকাল থেকে মধ্য এশিয়ার দিকে যাবার পথ।

এ পথ ঐতিহাসিক। মানব বংশপরম্পরা বুদ্ধের বাণী বহন ক'রে নিয়ে যাবার কালে এই সকল পথে ভ্রমণের ক্লান্তি যাতে দূর করতে পারে, তার জন্য এই প্রথমকালের রাজশক্তি অগণিত সংখ্যক 'বিশ্রামবিহার' নির্মাণ করেন এবং তাদের প্রত্যেকটি হ'ল বৌদ্ধবিহার। আজ যে সকল পথ দিয়ে আসছে রক্তমুখী হিংস্রতা, ঠিক সেই পথ দিয়েই ভারত পাঠিয়েছিল অহিংসা আর করুণার কালজয়ী বাণী। সোনামার্গের এই পথেরই এক গ্রামান্তে একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের জীর্ণাবশেষ আজও তার অপূর্ব স্থাপত্যকলা নিয়ে বর্তমান। এগুলির কাছাকাছি দুটি গিরিনির্ঝ'র নেমে এসেছে। এই ধরনের বৌদ্ধ স্থাপত্য ছড়িয়ে রয়েছে চিলাসে, চিত্রলে, আফগানিস্তানে, সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায়, পামীরে, সিনকিয়াং এবং মঙ্গোলিয়ায়,—এমন কি কোরিয়া ও জাপানেও! 'দেবতাত্মা হিমালয়' নামক গ্রন্থে বলেছি, তাকলা-মাকান্ মরুলোকে 'মাসারতাগ' ও 'দান্দান্ কিলিক' প্রভৃতি কয়েকটি ওয়েসিস অঞ্চলে ভারতীয় বৌদ্ধস্থাপত্যকীর্তির বিরাট জীর্ণাবশেষ অদ্যাবধি মরুপাথারের মধ্যে হারিয়ে যায় নি! এগুলির সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা ক'রে গেছেন সেকালের বহু পর্যটক। সেইসব নিত্য স্মরণীয় অসাধ্য-সাধকদের মধ্যে আল্‌বেরুনি, বার্নিয়ের, ফরস্টার, মুরক্রফট, ভিগনে, হিউগেল, জ্যাক্‌য়েমণ্ট, স্কনবার্গ, ফ্রেডেরিক, ড্রু, গ্রাউজ, নাইট, সোয়েন হেডিন, ইয়ংহাসব্যাণ্ড প্রভৃতি আরও বহু ব্যক্তির নাম মনে আসে। ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে কয়েকটি পথই প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে প্রচলিত। কয়েক বছর আগে মধ্য এশিয়ায় ভ্রমণকালে আমি এই পথগুলির একটা মোটামুটি হিসেব নিয়েছিলুম। তাজিক থেকে তুর্কমেনিস্তান অবধি মধ্য এশিয়ার পশ্চিম ভূভাগ এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের এলাকা এবং এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি রিপাবলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ।

সোনামার্গ থেকে যাচ্ছিলুম জোযিলা গিরিসঙ্কটের দিকে। 'জোযিলা' শব্দটি 'শিবজী লা'র অপভ্রংশ। শিবজী, শিয়োজি, শোযি, সর্বশেষ জোযি। এটি শাখাসিন্ধু উপত্যকার প্রান্তভাগ। যেটি ছিল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, একালে সেটিকে বৃহৎ এবং প্রশস্ত করা হয়েছে। লাদাখ বিজয়ের পরে জরোয়ার সিংয়ের লোকরা এই পথটিকে নতুন ক'রে নির্মাণ করেন। এটি কাশ্মীর উপত্যকার প্রধানতম এবং প্রাচীনতম তোরণদ্বার। সেই কারণে এই জোযিলার নির্বিঘ্ন নিরাপত্তার অন্য অর্থ হ'ল, কাশ্মীর তথা ভারতের সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই গিরিপথটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে কাশ্মীরোত্তর কয়েকটি ভারতীয় অঞ্চল, যেমন লাদাখ ও তৎসংলগ্ন প্রত্যেকটি এলাকা। সোনামার্গ থেকে উত্তরপূর্ব গহন পার্বত্যলোকে অগ্রসর হবার কালে ইংরেজ বা মহারাজা হরি সিংয়ের আমলে বিনা অনুমতিপত্রে জোযিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা নিষিদ্ধ ছিল। অনুমতি পাওয়া গেলে অনেকে কার্গিল এবং স্কার্দু পর্যন্ত যেতে পারত। তৎকালে বালতিস্তানের

দক্ষিণ তহশিল ছিল কার্গিল। শ্রীনগর থেকে কার্গিলের দূরত্ব ১৫০ মাইলের কিছু বেশি, এবং শ্রীনগর থেকে তখন স্কার্দু যেতে হলে ভীষণাকৃতি পার্বত্যপথে জোযিলা ছাড়াও অপর একটি গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে হ'ত, সেটির নাম 'চর্বৎ' গিরিসঙ্কট জোযিলা অপেক্ষা সেটি ৫ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। এই 'চর্বৎ' সঙ্কট-এর উপরে এসে দাঁড়ালে দূরবীক্ষণযোগে যে আশ্চর্য এক পৃথিবীর পরিমাপটি করা যায়, সেটি সুপ্রাচীন কাশ্মীরের চতুঃসীমানা। 'চর্বৎ' হল কাশ্মীরের মধ্যবিন্দু, সুতরাং সমান দূরত্বে প্রকৃত কাশ্মীর তথা ভারতের প্রকৃত উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমানা নির্ভুলভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে কারাকোরম ও হিন্দুকুশ ; পশ্চিমে নাঙ্গা, শিউয়ালিক ; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পীরপাঞ্জাল এবং জাস্কারের বিভিন্ন গিরিপ্রাকার ; দক্ষিণ-পূর্বে জাস্কার ও লাদাখের অন্তহীন গিরিদল ; পূর্বে কুনলুন বা কুয়েনলান এবং উত্তর-পূর্বে প্রসারিত ওই একই কারাকোরম। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকা—এই চারটি মহাদেশের অন্তর্গত কোনও ভূভাগে এমন নির্ভুল, সুনির্দিষ্ট, ভূ-প্রকৃতির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত এবং আন্তর্জাতিক মানচিত্রের দ্বারা সুনির্ণীত ও সর্বত্র স্বীকৃত ভৌগোলিক সীমানা অন্য কোনও দেশে নেই।

সোনামার্গ থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটি পথ নেমে গিয়েছে 'বলতাল' নামক ছোট্ট জনপদে শাখাসিন্ধুর নিরিবিলি তটপ্রান্তে। এখানে এই নদীটি পূর্ব দিক থেকে এসে কোলাহইকে বেষ্টন করে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে। 'বলতালে' স্থায়ী বসবাস নেই, আছে শুধু 'চৌকি।' এমন নিঃসঙ্গ, জনবিরল ও আনন্দদায়ক স্বাস্থ্যাবাস কাশ্মীরে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। এটি জলাশয় প্রান্তবর্তী নিম্ন অধিত্যকা,—মনোরম আরণ্য শোভায় সমৃদ্ধ। চারিদিকের ভয়াল ভীষণাকার দৈত্য-রাক্ষস দলের প্রহরার মাঝখানে একটি সুন্দরী শিশুবালিকা যেন নীলনয়না নদীকূলে ব'সে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আপন মনে পুষ্পমাল্যহার গেঁথে চলেছে! নিঃশব্দ ও নিঃঝুম 'বলতাল' সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একক। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অঞ্চলটুকু দুইটি ভারতীয় ভূভাগের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। একটি কাশ্মীর, অন্যটি লাদাখ। জোযিলার গিরিসঙ্কট এখানে দুটি পথের সুবিধা লাভ করেছে। উপর-পাহাড় অতিক্রম করে মোটরপথ জোযিলা পার হয়ে (১১,৬০০) 'দ্রাস'-এর দিকে গেছে, কিন্তু মধ্যপথে 'মাচই' নামক জনপদে এসে মিলেছে 'বলতালে'র পাশ কাটিয়ে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অপর একটি সঙ্কীর্ণ পথ।

কাশ্মীরের এই অন্তহীন গিরিশ্রেণীর রহস্যলোকের অন্তরালে এই সঙ্গোপন নিভৃত লোকে 'বলতাল'কে দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিলুম। আজকে যে নতুন ঘরগুলি লক্ষ্য করছি, কয়েক বছর আগে এগুলি ছিল না। এটি লোকালয়ের কাছাকাছি নয়, খাদ্যসামগ্রী বা বাজার কোথাও নেই, রাত্রের ভরসা একমাত্র মোমবাতি, খাঁ খাঁ

করছে অন্ধকারে শাখাসিন্ধু, প্রেতচ্ছায়ার মতো কয়েকটা গাছ, আর এদেরই মাঝখানে সাজসজ্জাহীন একখানা যেমন-তেমন পাথরের দরিদ্র ঘর, কাঠের মেঝে হয়ত, পুরনো কাঠের কড়ি-বরগায় ও লতাপাতায় ছাওয়া সেই ঘরটির ছাদ—বাহান্ন বছর আগে সেই ঘরে হয়ত কোন কোনও রাত্রে দশ মাইল দূর থেকে চৌকিদার এসে ঢুকত তুষারপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু সেইকালে এই অমরাবতীর (এখানে শাখাসিন্ধুর আঞ্চলিক নাম) তীরে কোনও এক জ্যোৎস্না রাত্রে সেই দরিদ্র পাথরের ঘরে এসে উঠেছিলেন এক সদ্যবিবাহিত তরুণ 'কবি', সঙ্গে তাঁর নবোঢ়া বধূ! নির্জন পর্বতপাদদেশে বনপুষ্পবিছানো এই মায়াকানন মধুযামিনী যাপনের পক্ষে ছিল উপযুক্ত স্থান। সেদিনের সেই তরুণ কবিও ছিলেন কাশ্মীরি এক পণ্ডিত। কিন্তু তিনি এই অমরাবতীর অমর্ত্য মহিমার থেকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য যে-মন্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, সেই অমোঘ মন্ত্রটি পরবর্তীকালে নবভারত রচনার কাজে লেগেছিল। সেকালের সেই তরুণ 'কবির' নাম ছিল জওয়াহরলাল নেহরু এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী কমলা।

'বলতালের' খাতায় আজও তাঁদের নাম স্বাক্ষরিত রয়েছে!

ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। বাঁক দিয়ে ঘুরছি। আবার উঠছি চড়াই ধ'রে উপর থেকে উপরে। গাছপালা, তৃণপথ—সব মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে নিচের দিকে। আশপাশের পর্বত চূড়ারা এগিয়ে আসছে যেন কাছাকাছি—যেন পাশাপাশি! গত রাত্রে প্রবল তুষারপাত ঘটেছে চূড়ায়-চূড়ায়। সেই নরম দুগ্ধশুভ্র তুষারের উপর প্রখর রৌদ্র দপ দপ ক'রে জ্বলছে—সেদিকে চোখ রাখা যায় না। বৃক্ষলতা বা হরিৎবর্ণের চিহ্ন নেই কোথাও—চারিদিকে শুধু নগ্নকায়, কৃষ্ণবর্ণ এবং রাক্ষসরূপী দৈত্যদল তুষারভূষণসহ দাঁড়িয়ে। এ যেন এক ভিন্ন জগতের দ্বার খুলছে আমার সম্মুখ পথে।

জোযিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিলুম।—

উপর থেকে এবার দেখা যাচ্ছে, সুদূর গভীর নিচের দিকে 'বল্‌তালের' পাশ দিয়ে সেই অমরাবতী ভৈরবঘাটির তলায়-তলায় চলে গেছে অমরনাথ গুহা পর্বতের দিকে—যেদিকে অভিনব এক বিশ্ব প্রকৃতির খোলা দ্বার আমাকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে অজানা থেকে অজানায়। কিন্তু আশ্চর্য, এই তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যেও পথের পাশে-পাশে বহু বর্ণাঢ্য পুষ্পসমারোহ এখনও শেষ হয় নি। একই বৃন্তে বিভিন্ন বর্ণের ফুল—হিমালয় ছাড়া এ আর কোথায় পাব? এ যেন আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'বায়ুযান' আর 'মহাগুনাসের' সেই তুহিন উপত্যকার পুষ্পসমারোহ।

সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। কিন্তু সেই পথ রৌদ্র-প্রতিফলিত তুষার-আলোকে সমুজ্জ্বল। মাথার উপর জোযিলার গিরিশীর্ষ ১৬ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। ডানদিকে

গিরিপ্রাকার হিমবাহে সমাকীর্ণ। তারই এক একটি ফাটলের ভিতর দিয়ে নামছে দুগ্ধধারার মতো গিরিনির্ঝর। নিচের দিকে চেয়ে দেখছি কোথাও কোথাও হিমবাহকে বিদারণ ক'রে একটির পর একটি জলপ্রপাত আপন প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপ দিচ্ছে পাথরের উপর চূর্ণ বিচূর্ণ হবার জন্য। এ যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা কোন্ পাগলিনীর দল সাংঘাতিক আত্মতাড়নায় নিচের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করছে!

না, তাড়া নেই। থমকিয়ে গেলুম পথের পাশে। কিছু বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল মনে। যেখানে পর্বতের বর্ণবৈচিত্র্য দেখি, সেটি সূর্যের দীপ্তি বা বাতাবরণের সহযোগে সৃষ্টি হয় কিনা, একদা এটি ভাবতে আমার সময় লেগেছিল 'লিপুলেক' গিরিসঙ্কটের উপর দাঁড়িয়ে। রামধনুর বর্ণ, দিনান্তের মেঘের বর্ণ, নীলকান্ত আকাশ বা সমুদ্রের ঘননীল বর্ণ,—জানি এগুলি হয়ত দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু প্রত্যক্ষ পর্বত চূড়ার নগ্নরূপ দৃষ্টিবিভ্রম নয়। পাঞ্জাবের ধওলাধারের অনেকটা অংশ নীলাভ; কুমায়ূনে নন্দাদেবীর কাছাকাছি দুই তিনটি চূড়া নীল ও রক্তিম গৈরিক; উত্তর হিমাচলে এক একটি চূড়া ঘন হরিৎ,—এগুলি চোখের ভ্রম নয়। গহন হিমালয়ে—দৃষ্টিপথের অতীত লোকে ভূপ্রকৃতির রহস্যতন্ত্রের কতটুকু জেনেছি; কতটুকু জানতে পেরেছি সেই রহস্যতন্ত্রের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা কবে কখন্ একেকটি পর্বতের শিলাবর্ণকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে?

ঘন নীলাভ সেই সুদূর পর্বত চূড়া থেকে চোখ নামিয়ে এবার চেয়ে দেখলুম নিচের দিকে সেই একই নদীর ধারা, কিন্তু দুই বিপরীত পথে তার গতি—উত্তরে ও দক্ষিণে। গিরিসঙ্কটের এইটি হ'ল মধ্য সীমারেখা—এইটি 'ওয়াটার-শেডের' গতিনির্ণয়ের সংযোগস্থল। এটির স্থানীয় নাম, 'কানীপাত্তি।'

সামনের দিকে এগিয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকালুম। এতক্ষণ অবধি যে-স্থলটিতে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, গিরিসঙ্কটের সেই সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র পরিসর অঞ্চলটির সঙ্গে সেদিনকার একটি ছোট্ট সামরিক ইতিহাস জড়িত। ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রান্ত হবার কালে ঠিক এই অঞ্চলটিতে উভয় পক্ষের মধ্যে যে মরণপণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়, সেই সময়ে ভারতীয় সেনাদল ১২ হাজার ফুট উঁচুতে এই গিরিসঙ্কটে তাঁদের ট্যাঙ্ক বাহিনীকে তুলে আনেন, এবং তার ফলে অন্য সীমানার মতো জোযিলা-যুদ্ধেও ভারতীয় পক্ষ জয়লাভ করেন। পৃথিবীর বহু দেশে এই সংবাদটি প্রচার ক'রে বলা হয়, এইরূপ সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে ট্যাঙ্কচালনা এবং এই যন্ত্রদানবকে ওই সরু জায়গাটুকুর মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিংস্র হানাহানির মধ্যে আপন আয়ত্তাধীনে রাখা,—ট্যাঙ্ক যুদ্ধের ইতিহাসে নাকি এটি অভিনব ঘটনা! যাই হোক, এর পর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে আকস্মিক 'যুদ্ধ বিরতি চুক্তি'র ফলে ভারতীয়

সেনাদলের এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বটি এক প্রকার মাঠে মারা যায়! ভারতীয় যুদ্ধ একটু নতুন ধরনের। যখন জয়লাভ ঘটছে তখন 'যুদ্ধবিরতি' কামনা, আর যখন পরাজয় লাভ ঘটছে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি!

হঠাৎ এসে দাঁড়াল ছোট ছোট একদল মেঘ। দেখতে পেলুম কেমন ক'রে হিমবাহের তলায় নদীর ধারে ওদের জন্ম হ'ল! জলপ্রপাতগুলির কণ্ঠলগ্ন হয়ে ওরা একে একে স্তন্যপান করল। অতঃপর পাখা গজালো ওদের। ধীরে ধীরে ভেসে উঠল উপরে। সূর্যকিরণে এতক্ষণ যে গিরিপথ ঝলমল করছিল, হঠাৎ সে-অঞ্চল আচ্ছন্ন করল মলিন শ্রাবণের সকরুণ অভিমান। গিরিপথের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মাঝখানে পৌঁছে নিঃসঙ্গ ও নিরাবলম্ব অবস্থার মধ্যে যারা কখনও দাঁড়ায় নি, তারা বুঝবে না এই অভিমানের সঙ্গে দুর্ভাবনা কেমন ক'রে ভয় পাওয়ায়!

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের প্রারম্ভে রৌদ্রে যতদিন উষ্ণতা থাকে, ততদিন অবিধ হিমবাহের পক্ষে বাঁধন ছেঁড়ার কাল! চৈত্র ও বৈশাখের অল্প কয়েকদিন জোষিলায় ঘটে এবং মার্চ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি কাল অবধি এই গিরিসঙ্কটের সরু পথটির সঙ্গে একটি দুর্ভাবনা জড়িয়ে থাকে। এই পথটিতে বিনা নোটিশে অভাবনীয় আকস্মিকতার সঙ্গে পর্বতক্রোড়চ্যুত হিমবাহ (avalanche) প্রবল বজ্রনিনাদে ঘূর্ণিবেগে উপর থেকে ছুটে আসে চক্ষের নিমেষে এবং যা কিছু পায় তার গতিবেগের মধ্যে—ক্যারাভান, ভেড়া-ছাগলের পাল, মালবাহী ট্রাক বা বাস—সমস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে গাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই হিমবাহগুলি নিজ নিজ উত্তুঙ্গ পর্বতলগ্ন হয়ে জোযিলাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে চারদিক থেকে—যেমন হরমুখ, দেবশাহী, কোলাহই, গগনগিরি, ভৈরবঘাটি এবং সাধারণভাবে জাস্কার গিরিমালা। সুতরাং এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করার আগে বিগত দুদিনের এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহ-সংবাদ ও পূর্বাভাস খুঁটিয়ে জানা দরকার। গ্রীষ্মকালে পর-পর দুইরাত্রি যদি আকাশ তারকা-খচিত থাকে তবে কেবলমাত্র মধ্যরাত্রে দ্রুতগতিতে পেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।

বেশিক্ষণ দেরি হল না। তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেল। বাতাস উঠল এখানে ঈষৎ বেগবান হয়ে। দুই গিরিশ্রেণীর এটি মধ্যপথ, এটি 'এয়ার প্যাসেজ', সুতরাং বাতাস এখানে মেঘ-মালিন্যের সঙ্গে প্রবলতর। এই তুষারপাত, তুহিন বাতাস, তার সঙ্গে মেঘদলের নিঃশব্দ চক্রান্ত,—এদেরই মধ্যে পথের নিশানা অদৃশ্য হতে থাকে। এক সময়ে নিজেকেও যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না! এমনতরো ঘটনা একঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পর-পরই ঘটতে থাকে। এখানে চঞ্চল হতে নেই।

বুঝতে পারা যাচ্ছে আবহ প্রকৃতির পূর্বাভাস। আর দেরি নেই। হয়ত সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই নিয়মিত তুষারপাত সুরু হবে। সেই তুষার ছয় মাসের আগে আর

গলবে না এবং ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে। সেই দুর্যোগকে সাহায্য করবে তুহিন ঝটিকা সগর্জনে এবং সেই বরফ উঁচু হতে থাকবে ৫০ থেকে ৭০ বা ৮০ ফুট পর্যন্ত। তখন ভূপ্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্য কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নদী, প্রপাত, জলাশয়, গিরিপথ, পথের নিশানা,—সমস্ত স্থলচিহ্নগুলিকে গ্রাস ক'রে দাঁড়িয়ে উঠবে একটি সর্বব্যাপী নিরেট, কঠিন, দুস্তর ও দুষ্কর তুষার স্তূপের জটলা —যেটিকে ভেদ ক'রে কোনও মানুষ, কোনও প্রাণী বা জন্তু, কোনও প্রকার যানবাহন চলাচল করতে সমর্থ হবে না, এবং এ পথ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে পাঁচ-ছয় মাস কাল। তখন কেবলমাত্র ভরসা বিমানপথ। ওই তুষারপাতের মাঝখানে দাঁড়িয়েই অনুভব করছিলুম কুড়িটি আঙুলের আর নাসিকার ডগা একটু একটু ক'রে অচেতন হচ্ছে ওই কঠিন তুহিন ঠাণ্ডা হাওয়ায়। না, আর দেরি নয়।

জোযিলা গিরিবর্ত্ম এক সময় অতিক্রম ক'রে ওপারে এসে পৌঁছলুম। সম্মুখে অস্পষ্ট মেঘল তুষার সমাকীর্ণ এমন একটা উপত্যকা—যেটার সঙ্গে সাধারণ ভারতীয় মনের পরিচয় কম। এই নূতন বিশ্বভুবনে বর্ণ, গন্ধ, রূপ, দিকচিহ্ন, বৃক্ষলতা, তৃণপুষ্পদল —কোনটা সঠিক চোখে পড়ে না। সম্মুখে কুয়াশা, কিংবা কুহেলিকা, কিংবা সুদূর বালুধূসরতা,—এ যেন নির্দিষ্ট ক'রে বুঝবার উপায় নেই। ওপার এবং এপারের মাঝখানে মাত্র ৫।৭ মাইলের ব্যবধান মাত্র, কিন্তু দৃশ্যমান জগতে এমন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, যেটি কতক্ষণের জন্য বিস্ময় স্তব্ধতা আনে। প্রভাতকালে যে-পৃথিবীর কোমল কুসুম-তৃণদল শয্যায় শয়ান ছিলুম, মধ্যাহ্নকালে এক ভিন্ন পৃথিবীর তুহিন প্রান্তরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিচ্ছেদের বেদনায় মন যেন হাউ হাউ ক'রে উঠল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চারিদিকে তুষারের শ্বেতবর্ণ সাম্রাজ্য এবং তুষার সমাকীর্ণ সেই বিরাট পাহাড়গুলিকে এখন নিতান্তই অনুচ্চ মনে হচ্ছে। ১২ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমির সমতল ভাগে এসে পৌঁছে দেখি এক কালের দুরারোহ পর্বতমালা বর্তমানে যেন সহজসাধ্য! কাশ্মীরের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দেখলে যে-তুষার চূড়াগুলিকে আপন বৃহৎ গৌরব মহিমায় সমুজ্জ্বল মনে হয়, এখানে এসে পৌঁছলে তাদের সেই মহিমাই যেন খর্ব হয়ে যায়। নিচের থেকে যাদের দেখলে ভয়, উল্লাস, দুর্ভাবনা এবং উদ্দীপনায় মোহাবিষ্ট হতে থাকি, এখানে তাদেরকেই যেন কৌতুকের পাত্র মনে হয়। সেই বিশালকায় দৈত্য-দানবের দল এখান যেন নিরভিমান নাবালকের মতো কাছে এসে দাঁড়ায়!

এ অঞ্চল জাস্কার গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত মালভূমি, এবং বালতিস্তানের দক্ষিণ প্রান্তভাগ। আমি যাচ্ছিলুম প্রাচীন বালতিস্তানের দ্বিতীয় তহশীল কার্গিলে,—'চর্বৎ' গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ ভাগে।

এই মালভূমির পথ ধূ ধূ করছে চিরকাল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই পথে মহাপ্রাচীরে স্বাক্ষর রয়েছে। এই পথ দিয়েই এসেছে যুগ-যুগান্তের সেই সব ক্যারাভান —যখন রাষ্ট্রনীতির নিগূঢ় কূটিলতা মানুষের মনে এসে পৌঁছয় নি। প্রাচ্যের দিকে কৃষ্ণগিরি তোরণ (কারাকোরম পাস) অবারিত রেখেছিল ভারত—এই পথ দিয়েই ভারততীর্থপথিকের দল দূর প্রাচ্যের থেকে এসে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে চিরদিন।

শীতলশ্বাস একটি মলিনবর্ণ ভূখণ্ড। বাঁ দিকে একটি তুষার নদী হিমবাহ সমাকীর্ণ। চারিদিকে প্রচুর ঠাণ্ডা। তারই সামনে কয়েকটি পাথরের ঘর কাঠের ছাদ দিয়ে ঢাকা। এটির নাম 'মাচই' বাংলো ও ডাকঘর। এখানে থমকিয়ে গেলুম।

॥ ৭ ॥

দ্রাস-পুরিক-কার্গিল

ভৈরবঘাটি আর গগনগিরিচূড়া পিছনে রেখে এলুম অনেক দূরে। আরেকবার বালতিস্তানে এসে পড়েছি। এটি বালতিস্তানের দক্ষিণ সীমানা। দেশটি বড় নয়। এর উত্তরাংশ কারাকোরমের হিমবাহলোক, মধ্যাংশ স্কার্দু তহশিল, দক্ষিণাংশ কার্গিল। এই ভাবে এই দেশটি সুস্পষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে এসেছে ইংরেজ আমলে ১৯০৮ সালের কিছু আগে। কিন্তু ওখানেই শেষ হয় নি। বালতিস্তান ও লাদাক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক দিক থেকে একপ্রকার অভিন্ন বলে ইংরেজ এই দুটি ভূভাগকে একই সূত্রে বেঁধে দেয়, এবং তখন থেকে বালতিস্তান লাদাকের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্কার্দু তহশিল এখন পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকা।

'মাচই' থেকে অগ্রসর হয়ে চলেছি। তুষার সমাকীর্ণ প্রান্তরের ভিতর দিয়ে প্রায় এক হাজার ফুট নেমে গেলুম। এটি মালভূমি। আমরা যাচ্ছি উত্তর-পূর্ব পথে। এবার ক্বচিৎ পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য স্বচ্ছ জলধারা এবং সেই সব ধারার আশেপাশে একটু-আধটু সবুজের সামান্য ছোপ। ঠাণ্ডা প্রচুর এবং সে-ঠাণ্ডা রুক্ষ। ছোট বড় যে পাহাড়গুলি পেরিয়ে যাচ্ছি, সেও রুক্ষ। তাদের গায়ে কোথাও-কোথাও দু-চারটে কাঁটালতা, আর নয়ত দু-চারটে জুনিপারের গুল্ম, ওর বেশি কিছু নেই।

সর্বাপেক্ষা যেটি স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, সেটি হ'ল আগাগোড়া আমূল পরিবর্তন। 'মাচই' থেকে আন্দাজ মাইল দশ বারোর মধ্যে যেদুটি জনবসতি দেখতে পাওয়া গেল, সে-দুটির চেহারা, গঠন ও চরিত্রের সঙ্গে আমার চোখ এবং মন অভ্যস্ত নয়। ঘর-দোরের নির্মাণকলায় ভারতীয় বা কাশ্মীরি ছাঁচ নেই। বিরাট এক-একটি দুর্গ-প্রাকারের মতো দেওয়াল, এবং তার শীর্ষের দিকে ছোট ছোট একপ্রকার জানালা—যার পারিপাট্য ভারতীয় চক্ষে অপরিচিত। এগুলি গোম্ফা বা গুম্ফা। এই ধরনের গোম্ফার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে থাকে পারিপার্শ্বিক সংসারযাত্রা। প্রত্যেক গোম্ফাই লামাদলের এক-একটি ঘাঁটি। গোম্ফাই গ্রামের অভিভাবক। উঁচু পাহাড়ি পাথুরে ঢিপির উপর এক-একটি গোম্ফা নির্মিত হয় - যেখান থেকে দৃষ্টি রাখা চলে দূরদূরান্তরে। একে একে 'মাতায়ন' ও 'পানদ্রাস' নামক দুটি জনপদ ছাড়িয়ে চললুম।

কুহেলি-আবহ এখনও পেরিয়ে যাই নি, সুতরাং দুচার ফোঁটা বৃষ্টি সপসপিয়ে চলে

যাবার পর তাদেরই বদলে ঝরতে লাগল হাল্কা তুষার হাওয়ায় ওড়া। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম যে-কুয়াশাচ্ছন্ন তুহিন পার্বত্য প্রান্তরে—সেটির নাম 'দ্রাস।' নামটি যখনই শুনতুম, তখনই চমক লাগত। দ্রাস-এর ঠাণ্ডা হাওয়া উত্তর-মেরুলোকের সঙ্গে যুক্ত। 'দ্রাস' হল তুহিনশ্বাস। বহু লোকের ধারণা, দ্রাস পৃথিবীর কঠিনতম ঠাণ্ডা দেশগুলির মধ্যে নাকি দ্বিতীয়। প্রথম বুঝি 'আলাস্কা।' 'দ্রাস' যে-হাওয়াটায় কাঁপতে থাকে সেটি অবারিত পথে ছুটে-আসে কারাকোরমের কয়েকটি বিশালতম হিমবাহর উপর দিয়ে,—সেগুলির নাম বাটুরা, হিস্পার, বিয়াফো, বল্‌তোরো, সিয়াচেন ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটিই কারাকোরমের উচ্চতম শিখর 'কে-২' এবং দিস্তেগিল, কানজুৎ, মাসেরব্রুম, হরমোশ প্রভৃতির কণ্ঠলগ্ন। 'দ্রাস' শীতকালে তুষারসমাধিলাভ করে এবং অন্য সময়ে ঠকঠক করে কাঁপে। আর কিছু দিনের মধ্যেই 'দ্রাস'-এর মৃত্যু ঘটবে! আমি এই বছরের শেষ পর্যটক।

কিন্তু প্রকৃতির এই সাংঘাতিক চেহারার কাছে দ্রাস পরাজয় স্বীকার করে নি। লোকসমাগম এখানে প্রচুর, এবং এই তুহিন উপত্যকার এখানে-ওখানে একাধিক গ্রাম বা জনপদ দেখতে পাচ্ছি। দ্রাসের উচ্চতা ১০,১২০ ফুট। উত্তর পথে ঢালু মালভূমির দিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি বিশাল বিস্তৃত ময়দান এবং হরিৎ-শ্যাম ভুট্টা ও যবের ক্ষেত। পাশ দিয়ে চলেছে কুলকুলিয়ে 'দ্রাস নদী'। দূরে একটি পুরনো দিনের শিখদুর্গের জীর্ণাবশেষ। রাস্তার উপর ডান দিকে একটি টিলা ছোট্ট পাহাড় সিন্দুর-লেপা. 'শিবতারা' মন্দিরে পরিণত হয়েছে। এটি বৌদ্ধ মন্দির। এই ধরনের এক-একটি বিশাল দেবমূর্তি পাহাড় খোদাই ক'রে তৈরি হয়। যেমন কার্গিলের কাছাকাছি শঙ্খো উপত্যকায় চম্পা দেবমূর্তি। তারা, কালীতারা, অর্জুন, কার্তিকেয়, লক্ষ্মণ,—এগুলি এই নামেই বৌদ্ধ জগতে পরিচিত। পুরাকালে দ্রাস ছিল লাদাখের অঙ্গভূমি। কিন্তু এখানকার অধিবাসী ও তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে লাদাখের অনেকটা অসামঞ্জস্য থাকার জন্য ইংরেজরা দ্রাস এবং কার্গিলকে বাল্‌তিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করেন। বর্তমানে দ্রাস ও কার্গিলকে ভারত সরকার পুনরায় লাদাখের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

'দ্রাস' ময়দানের ভিতর দিয়ে যে-পথটি ধরে যাচ্ছি তার ঠিক পশ্চিমে 'গুরমুখ' এবং উত্তরে 'দেবশাহী' গিরিমালার প্রান্ত। 'দ্রাসে' পৌঁছিয়ে শুনলুম, জোযিলার সঙ্কট পথে কিছুক্ষণ আগে নাকি দুর্যোগ দেখা দিয়েছে! কথাটা শুনে চমকিয়ে উঠেছিলুম, কারণ কিছুক্ষণ আগে ওখান থেকে নাটকীয় ভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছি নিরাপদ 'মাচই' ময়দানে। সে যাই হোক, দ্রাসের এই ময়দানের উত্তরে একটি পথ পাহাড় পর্বতের ভিতরে-ভিতরে চলে গেছে 'মিনিমার্গের' দিকে। কিন্তু 'মিনিমার্গ' জনপদটি বোধ করি 'যুদ্ধবিরতি' সীমারেখার ঠিক উত্তরে পড়েছে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের সম্মতি

ছাড়া এখন আর ওদিকে যাওয়া চলে না। মিনিমার্গের সোজা পথ শ্রীনগর থেকে উত্তর পথে হরমুখের তলা দিয়ে কৃষ্ণগঙ্গা পেরিয়ে। মিনিমার্গ হল 'বুর্জিল' গিরিসঙ্কটের প্রবেশ পথ। সোনামার্গ থেকে যেমন জোযিলা।

আমাদের পথ সুদূর উত্তর-পূর্বে। ময়দানের ভিতর দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করা যায়, 'দ্রাস-ভ্যালীর' জনবৈচিত্র্য। ইদানীং একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় বাইরের লোকের আনাগোনা বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা ছাড়াও যারা স্থায়ীভাবে এই উপত্যকায় বাস করে তাদের অনেকেই গিলগিট এবং উত্তর বালতিস্তানের প্রাক্তন অধিবাসী—এরা এসে এখানে সহজেই জায়গা পেয়েছে। এদের মধ্যে হুনজা, ইরানি, বালতি—ইত্যাদি সব মিলিয়ে রয়েছে।

এরপর একে একে তুটি নদী আমরা পাই। একটি দ্রাস, অন্যটি সুরু। এ তুটি নদীই চলেছে কার্গিলের দিকে। আমাদেরও পথ চলেছে পূর্বোত্তরে। জলধারার পাশে পাশে সবুজ মাঠের অংশ বিশেষে তু' একটি গরু দেখা যাচ্ছে। মহিষকেও দেখছি, কিন্তু আকারে তারা বড় নয়। ঝব্বু ও চমরী মধ্যে মাঝে দেখছি বৈ-কি। এখানে 'শীতকাল' আসছে, সুতরাং যব ও ভুট্টাদি ঘরে উঠছে। চাষীসমাজের ঘরদোরগুলি কাঁচামাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু সেই মাটিতে ভাগীরথী-গঙ্গার পলি-মৃত্তিকার স্নেহকোমলতা নেই। সেই মাটির অনেকটাই রুক্ষ, এবং বড় বালুদানা বা পাথর-কাঁকর মিশ্রিত। সেই ঘর দোর তুষার ঝঞ্ঝায় নড়ে না, জলের ধাক্কায় গলে না। কোন কোনও গ্রামে কিছু কিছু বাগান বানানো হয়েছে। কয়েকটি পপলার বা সবেদা, তু'-চারটি আপেল বা খুবানি, এবং হয়ত খুঁজলে পাওয়া যায় তু' একটি দেশী জমি। বছর কালের মধ্যে বৃষ্টি নেই বললেই হয়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা এমনি যে, মৌসুমী বায়ু বা করুণ মেঘদলের আনাগোনার পথ নেই। আরবসাগর বা ভারত মহাসাগর পৃথিবীর কোন্ দিকে—এরা আজও তার খবর পায় নি। এদের সঙ্গে পরিচয় শুধু ধুলো, বালু, পাথরের নুড়ি, কঠিন এবং কঠোর ভূপৃষ্ঠ, বরফ এবং আনগ্ন নিরেট তরুলতা-চিহ্নহীন অত্যুচ্চ পাহাড়শ্রেণী। আমরা হিমালয়ের মেরুদণ্ড, অস্থিপঞ্জর এবং তার শাখাপ্রশাখা ছেড়ে এমন একটা বিচিত্র ভূমিপথ ধরেছি, যেটার সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারা, কল্পনা—এমন কি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার যোগ নেই বললেই হয়।

'পুরিক' উপত্যকার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এক-একটি নদী পার হয়ে যাচ্ছি—যেগুলির নাম 'ওয়ানলা, কাঞ্জি, ওয়াকা' ইত্যাদি। এই প্রাচীন পথটির সংস্কার, প্রত্যেক নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং আগাগোড়া রক্ষণাবেক্ষণ—এগুলি একদা করেছিল জরোয়ার সিংয়ের বাহিনী। তবু এ যেন আশ্চর্য অপরিচয়। ঠিক বন্য নয়, আরণ্যকও নয়, কিন্তু আধুনিক সভ্যজগতের গন্ধ এখানে স্বপ্নবৎ অবিশ্বাস্য! এ একটা

আদিম পৃথিবী—যেটা স্থাণু, পরিবর্তনের ধারা কোনও চিহ্ন যেখানে রাখে নি। ছ' হাজার বছর আগে যে পাথরের টুকরোটি পথের ধারে ঠিক যেখানে পড়েছিল আজও ঠিক সেইখানেই সেটি পড়ে রয়েছে! দশ হাত মাত্র চওড়া যে নদীটির ধারা এই প্রান্তরের ভিতর দিয়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে ঠিক যে-পথটি দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সেটি কোনকালের কোনও ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক কারণে তার গতিপথ বদলায় নি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সম্রাট অশোকের আমলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গিরিজলধারার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জন্তু-জানোয়ারের পান-ভঙ্গীতে যেভাবে জল খেত, আজও তাদের সেই জলপানভঙ্গী অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে। শত শত বছরের মধ্যে কারও পরিচ্ছদের লেশমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। সেই ছিন্ন ভিন্ন পশমের পোশাক, জন্তুর চামড়ার সঙ্গে পশম মিলিয়ে টুপি, জন্তুর ছালের সঙ্গে ভুট্টা বা যবের খড় দিয়ে তৈরি জুতো—ঠিক সেই একই পোশাক, একই রুক্ষ অস্নাত বেণী, কোমরের সেই বাঁধন এবং আলখেল্লার মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রীর টুকিটাকি—যার পরিবর্তন ঘটে নি কোনও যুগে! আদিম সৃষ্টিতত্ত্বের মূল নিয়ম এখানে গতিবেগহীন একটা অচল নিরুদ্বেগ শান্তিতে বিরাজমান।

এই বালুপাথরের নিষ্ফলা প্রকৃতির বিপুল-বিস্তার অপচয়ের ভিতর দিয়ে যাবার কালে ক্ষণে ক্ষণে আপাদমস্তক ধূলিধূসর হচ্ছিলুম। মাঝে মাঝে এক বালুপাথরময় পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ছুটে যাচ্ছে ধূলির ঝাপট। কোনও কোনও পাহাড়ে কিছু কিছু কাঁটালতা, কিছু গাছপালা, কিছু বা সুশীতল ছায়াদল। এদেরই ভিতর দিয়ে সুদূর দুস্তর পার্বত্যপথ অতিক্রম করে যখন 'ঘুংরি' নামক অতি ক্ষুদ্র এক জনপদের সীমানায় এসে পৌঁছলুম, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পাওয়া গেল, আমরা 'যুদ্ধবিরতি' সীমানার কাছাকাছি এসে পড়েছি। পথ রুক্ষ, কর্কশ, ধূলিময়, রৌদ্র অতি প্রখর বাঁ-দিকে উপসিন্ধুর ধারা ঘুরে গেছে উত্তর ভাগে,—তার ঠিক ওপারে পাকিস্তান-অধিকৃত পার্বত্য এলাকা। উভয়ের মাঝখানে উপসিন্ধুর খদ, এবং ব্যবধান খুবই সামান্য। 'ঘুংরিতে' পৌঁছবার ঠিক আগে আমাদের রৌদ্রপ্রখর পার্বত্য পথের ঠিক মাঝখানে দেখি এক স্বর্ণিলবর্ণ ঈগল পাখির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এরূপ তাড়কাপক্ষীর আকার দেখি নি!

'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' কাশ্মীরোত্তর পার্বত্য ভূভাগের ভিতর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বালতিস্তান বা উত্তর লাদাখ দিয়ে কারাকোরমের হিমবাহলোকে মিলেছে। এগুলি বৃহত্তর কাশ্মীর প্রশাসনের মধ্যে থাকলেও মূল কাশ্মীরের বহির্ভাগীয় অঞ্চল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রণবীর সিংয়ের আমলে তাঁর এলাকাভুক্ত যে কাশ্মীর রাজ্য—সেটির একটা মোটামুটি জরীপ করেন তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের

কাশ্মীর ছিল ছোট, এবং তার আয়তন মাত্র ২৫ হাজার বর্গমাইল (Charles Ellison Bates, Survey Major, Bengal Staff, 1873, Central Asia, Part II)

ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান সৃষ্টি উপলক্ষ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন কাশ্মীরের চতুঃসীমানা একটু জেনে রাখা দরকার। কাশ্মীরের পূর্বে তিব্বত, উত্তরপূর্বে সিনকিয়াং, উত্তর আফগানের শীর্ণাঞ্চল ওয়াখান এবং পশ্চিমে ইংরেজ আমলে যা ছিল তাই। অর্থাৎ ১৮৭৩-এর এর ৭৪ বছরের মধ্যে বৃটিশ ভারত কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরের উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব সীমানার পুনর্গঠন করেন। এই ৭৪ বছরের মধ্যে চিলাস, চিত্রল, আস্টোর, গিলগিট, হুনজা, নাগর, ইয়াসেন, বাল্‌তিস্তান এবং লাদাখ ও তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মানুগ রাষ্ট্র সংহতি লাভ করে। ইংরেজরা নিঃশব্দে এই ভূভাগগুলির পুরনো ছাঁচকে ভাঙ্গে, কেননা এদের তোড়জোড় সবই ছিল আল্‌গা। এদের সকলেরই পূর্বানুগত্য ছিল কাশ্মীরের কাছে, কিন্তু গ্রন্থিগুলি মজবুত ছিল না। এটি লক্ষ্য করবার বিষয়, জম্মু রাজ্যের পক্ষ হয়ে জরোয়ার সিং লাদাখ ও বালতিস্তান 'জয়' করেছিলেন (১৮৩০-৪০), এবং এটি পরবর্তীকালে ১৮৭৩ সালে প্রত্যক্ষভাবে মহারাজা-শাসিত এলাকা বলেই স্বীকৃত হচ্ছিল।

সে যাই হোক, 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' যাঁরা চিহ্নিত করেছেন তাঁদের মনে সম্ভবত পূর্ব ইতিহাসের কথাগুলি মুদ্রিত ছিল। সুতরাং সীমারেখা চিহ্নকরণের কালে বোধকরি একটি বিশেষ নীতি মোটামুটি ভাবে পালন করা হয়। সেটি হল, উত্তর কাশ্মীরের যে অঞ্চলগুলি গিল্‌গিটের ইংরেজ রেসিডেন্সির আমলে নূতনতর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়, প্রধানত সেইগুলি 'আজাদ কাশ্মীর' বা পাকিস্তানের অধিকারের (occupation) মধ্যে আসে! আরেকটি বিবেচনা সম্ভবত এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল। সেটি চিত্রল সম্পর্কিত। কুনার নদীর উপত্যকাবর্তী এই বৃহৎ ভূভাগটি একটিমাত্র রাজগোষ্ঠীর দ্বারা বিগত দুই হাজার বছর থেকে শাসিত হয়ে আসছে একই উপাধিতে। উপাধিটির নাম 'শাহ কাটোর।' রাজার নাম বদলায়, 'শাহ কাটোর' বদলায় না। প্রাচীন কাবুল উপত্যকায় ইন্দো-গ্রীসীয় রাজগোষ্ঠীর এঁরা উত্তর পুরুষ। কথিত আছে, এঁরা সম্রাট আলেকজান্দারের বংশধর। এই চিত্রল ছিল সম-স্বাধীন রাজ্য এবং কাশ্মীর দরবারের কাছে ছিল তার আনুগত্য। তার ভৌগোলিক অবস্থান হল, উত্তর ও পশ্চিমে আফগান রাষ্ট্র, পূর্বে গিলগিট, সোয়াট কোহিস্তান বা ইন্দাস কোহিস্তান ও হাজরা, দক্ষিণে পাকিস্তান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আফগান রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ ক'রে চিত্রল, হাজারা, চিলাস, গিলগিট, হুনজা, আস্টোর, বুন্‌জি, উত্তর বালতিস্তান—এগুলি সমস্তই শিয়া ও সুন্নি মুসলমান-প্রধান অঞ্চল এবং এদের পারস্পরিক আসন্নতার (contiguity) মধ্যে কোথাও দুস্তর ব্যবধান নেই। ১৯৪৭ সালের ২২

অক্টোবর তারিখে উপজাতীয় পাঠানের দল বর্তমান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহোদর মেজর জেনারেল আকবর খানের (ইনি তখন পাঠান ছদ্মবেশী 'জেনারল তারিক') নেতৃত্বে যখন কাশ্মীর আক্রমণ করেন তখন পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলির সামরিক প্রশাসনের যে অংশটি মুসলমান,—সেই অংশের কাশ্মীরী অফিসারগণ উপজাতি পাঠান দস্যুদের পক্ষ নেন। এই ঘটনার মাত্র ৯ দিন পরে গিলগিটে ইংরেজ দলের সহায়তায় 'বিদ্রোহীরা' একটি সরকার গঠন করেন। অ-মুসলমান অধিবাসী যারা—যারা সময় মতো পাহাড়-পর্বতে পালাতে পারে নি তারা 'লিকুইডেটেড' হয়, এবং পরবর্তী ৪ নবেম্বর তারিখে ইংরেজ অফিসার মেজর ব্রাউন বিশেষ উৎসব-সমারোহের মধ্যে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানের একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট গিলগিটে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেন! (The story of the Integration of the Indian States: V. P. Menon)

'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' চিহ্নকরণের মধ্যে ভারতের একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সম্ভবত বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৪ বছর পরে সেই পরিকল্পনাটির মুখোমুখি হন উভয়পক্ষ। ১৯৬৩ সালে আমেরিকা ও ইংরেজের মধ্যস্থতায় পর পর ছয়টি পাক-ভারত বৈঠক বসে। কিন্তু বৈঠকের আগাগোড়া আলোচনা আমার জানা নেই।

এই 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা'র পাশ দিয়েই আমি যাচ্ছিলুম। 'সীমানা পাহাড়' শ্রেণী রয়েছে বাঁ দিকে, আমাদের পথ চলেছে নীচে দিয়ে। মাঝখানে কেবল নদীর খদ। উভয়পক্ষের সীমানা এত গায়ে গায়ে, এটি যেন একটু অভিনব। আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে উভয়পক্ষের মাঝখানে ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি 'নির্মানব ভূ-ভাগ' (no-man's land) থাকার কথা। এখানে সেটি নেই। তার ফলে যখন-তখন যে সকল ছোট বড় ঘটনা ঘটতে থাকে, উভয়পক্ষের সামরিক কর্তৃপক্ষ সেগুলির মুখোমুখি হন। 'সীমারেখা'র এমন একেকটি স্থল আছে যেখানে উভয়ের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র ৫০০ থেকে ১০০০ গজের মধ্যে। ভারত পক্ষের যে সকল লোকজন বা যানবাহন এই পথে আনাগোনা করে, তারা অনেক সময় অপর পক্ষের অনুকম্পার উপর নির্ভর ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে 'গুলী বিনিময়' যে হয় না তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে উভয়পক্ষের মধ্যে 'শুভ কামনা বিনিময়ও' ঘটে থাকে, এই সরস সংবাদটিও কানে এল!

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মান গ্রন্থকার এরিখ মেরিয়া রেমার্কে যে জগৎ-প্রসিদ্ধ বইটি রচনা করেন (All Quiet on the Western Front), সেটির এক স্থলে পড়েছিলুম এক গভীর রাত্রে যুদ্ধের মাঠে এক জার্মান ট্রেঞ্চের মধ্যে রণক্লান্ত এক ফরাসী শত্রু সৈন্য অতিশয় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছুটে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেই ট্রেঞ্চে

ছিল জার্মান সৈন্ত। ওর মধ্যে একজন দেশালাইর কাঠি জেলে দেখে, শত্রু! উভয়-পক্ষে হত্যা হানাহানির বদলে একজন আরেকজনের মুখে তখন একটি সিগারেট গুঁজে দিল, কিন্তু অতঃপর আরেকবার দেশালাইর কাঠি জেলে সিগারেটটি ধরিয়ে দেবার সময় দেখা গেল, সিগারেটটি যে ব্যক্তি টানবে, ইতিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে গেছে!

যুদ্ধ বাধায় যারা, তারা যুদ্ধ করে না! যুদ্ধে প্রধানত যারা মরে তারা চিরকালের নিরীহ—তারা দেশের জনসাধারণেরই অংশমাত্র! ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে চীন যখন প্রথম লাদাখে ভারতীয় প্রহরীদেরকে আক্রমণ করে সেইকালে মিঃ খ্রুশ্চভ এমনি একটি কথা বলেছিলেন চীনকে লক্ষ্য ক'রে, "আর যাই হোক, যে কয়জন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ গেল, তাদের জীবন আর ফিরবে না!"

উপসিন্ধুর তলায়-তলায় দেখতে পাচ্ছি মুসলমান অথবা বৌদ্ধ গ্রাম। ওরা প্রায়ই গায়ে-গায়ে মিশে থাকে—যেমন থেকে এসেছে চিরকাল। রাষ্ট্রের বিবাদে ওরা নেই —যেমন থাকে নি কোনওকালে। পৃথিবীর খবর ওদের কাছে যুগ যুগান্তকালে পৌঁছয় কিনা সন্দেহ। যদি কখনও ক্যারাভান যায়, ভিনদেশী ঘোড়সওয়ার যদি কখনও এই পথ দিয়ে পার হয়, ওরা তখন হয়ত শোনে টুকরো সব খবর—যার অর্ধেকটায় কিছু সত্য, বাকি অংশে হয়ত আজগুবী মিথ্যা। কিন্তু সেই ঘোড়সওয়ার বাইরে থেকে এখন আর আসে না এবং সেই ক্যারাভানও বহুদিন থেকে বন্ধ। মধ্য এশিয়া থেকে কাশ্মীর বা হিমাচল বা পাঞ্জাবের পথ এখন অবরুদ্ধ। শুনলুম এখন বুঝি তৃতীয় পথটি সম্প্রতি খোলা হয়েছে,—যেটি সিন্‌কিয়াং থেকে 'মিন্‌তাকা' গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে হুন্‌জা, গিলগিট, চিলাস ও হাজারা হয়ে পেশাওয়ার বা রাওয়ালপিণ্ডির দিকে গেছে। হুন্‌জা ও গিলগিট অঞ্চল পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকা হলেও সরকারীভাবে ওগুলি ভারতীয় এলাকা। সম্প্রতি চীন কর্তৃপক্ষ হুন্‌জা ও গিলগিটে এবং কারাকোরমের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা দাবি ক'রে জানিয়েছেন, এই অঞ্চল তাগতুমবাস-পামীরের অন্তর্গত, সুতরাং এটি সিনকিয়াং-এরই অংশমাত্র! এই অঞ্চলে চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি প্রত্যক্ষ বিরোধের সংবাদ অনেকেই জানেন। বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্টালিন আমলের সোভিয়েট ইউনিয়ন কার্যত সিনকিয়াং ওরফে তুর্কিস্থান এলাকার একটি অংশ নিজ আয়ত্তের মধ্যে (Virtual Control) আনেন এবং সেইটি লক্ষ্য ক'রে ভারত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য তৎকালীন বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের হাত থেকে সমগ্র গিলগিট এজেন্সি বা মহকুমা এলাকা খাস বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্টের দখলে নিয়ে আসেন। কাশ্মীর ষ্টেটের সঙ্গে একটি ৬০ বছরের চুক্তিতে বলা হয় যে, এই সময় অবধি সীমানা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করবেন (V. P. Menon)।

চীন-সোভিয়েটের এই বিরোধের মীমাংসা আজও হয় নি। এর মীমাংসার জন্ত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটি চেষ্টা হতে বাধা, কারণ চীনের এই দাবির সঙ্গে পাকিস্তান ও সোভিয়েট ইউনিয়ন—উভয়েই সংযুক্ত। যাঁরা মনে করেন চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের কেবলমাত্র আদর্শগত বিরোধ দেখা দিয়েছে, তাঁরা ভ্রান্ত। জমি-জায়গা নিয়ে বিরোধ চলে পুরুষানুক্রমিকভাবে,—সেখানে সম-আদর্শবাদের সম্পর্ক একটু ঠুন্‌কো। বলা বাহুল্য, বর্তমান চীন দাঁড়িয়ে উঠেছে প্রায় দেড় হাজার বছরের রুদ্ধ আক্রোশ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা নিয়ে। সে চায় তারই কল্পনাপ্রসূত মানচিত্র অনুযায়ী 'লুপ্ত' সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার! সে উদ্ধত, অবুঝ, আত্মাভিমানী এবং আক্রমণশীল। কেননা, তার ধারণা, তার অসাড়তা এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ছদ্মবেশী 'বান্ধব' দল তারই সাম্রাজ্য সীমানাকে ধীরে ধীরে লেহন ক'রে নিজেদের খুশি মতো দলিল বানিয়ে রেখেছে। তার বিশ্বাস, যে-জাতি তার দলভুক্ত নয়, সে-জাতি তার বিরুদ্ধবাদী, এবং সে শত্রু ছাড়া অন্য কিছু নয়। বান্দুং সম্মেলনে গিয়ে সে ১৯৫৪-তে 'পঞ্চশীলে' সই করল জেনে শুনে, এবং 'আকসাই-চিনে' ১৯৫৬-৫৭-তে প্রথম রাস্তা বানিয়ে বলল, "কই না, 'পঞ্চশীল' থেকে এক পাও ত আমরা নড়ি নি। ও অঞ্চলটা ত' বরাবরই আমাদের! অব্যবহৃতভাবে এতদিন পড়ে ছিল মাত্র! 'পঞ্চশীল' আমাদের কাছে অতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু!"

পথ বিপজ্জনকভাবে কোথাও-কোথাও সঙ্কীর্ণ। তবু ভারত গভর্নমেন্ট পুরা-ঐতিহ্যবাহী সেই ক্যারাভান পথটি সম্প্রতি যথাসম্ভব সংস্কার করার চেষ্টা পেয়েছেন। সঙ্কীর্ণ পথকে প্রশস্ত করার জন্য পার্বত্য ভূ-ভাগে কি-কি উপকরণ কি-কি প্রকারে ব্যবহার করতে হয় এটি জনবিদিত। শুধু পথ সংস্কার নয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারত গভর্নমেন্ট সমগ্র লাদাখে অনেকগুলি নূতন রাস্তা এবং সাঁকো নির্মাণ করেছেন। পথের পাশে উপসিন্ধুর খদ যথেষ্ট গভীর এবং পার্বত্য পথের বাঁক বা বেণ্ড্ অগণিত সংখ্যক। যেমন রানীক্ষেত থেকে আলমোড়ার পথ, সোলন পেরিয়ে যেমন শিমলা, যেমন মণ্ডি থেকে সুলতানপুর (কুলু)। কিন্তু তাদের সঙ্গে এ পথের তফাৎ এই, এটি সঙ্কীর্ণ, প্রস্তর সমাকীর্ণ এবং খদের দিকে বাঁধন কিছু নেই—যেমন থাকে সচরাচর। কোনও বেণ্ডের কাছে দুই বিপরীতগামী গাড়ি যদি ঈষৎ মাত্র অসতর্ক বা অন্যমনস্ক থাকে তবে দুর্বিপাক অবশ্যম্ভাবী। সেই দুর্বিপাকের বিভীষিকা এ যাত্রায় দেখতে হয়েছে বৈ কি!

আমরা শীতার্ত, কিন্তু অতিশয় ধূলিধূসরিত। উপরে রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশ। উপসিন্ধুর উপর দিয়ে যে-ধূলির ঝাপটা থেকে-থেকে গর্জন ক'রে চলেছে, যে ঘূর্ণি দিচ্ছে ধূলিপাথরের অধিত্যকায়, সেটি ঠাণ্ডা এবং অতিশয় শুষ্ক। আমরা দ্রুতগতিতে কার্গিলের

দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। বেলা অপরাহ্ণ।

কয়েক ঘণ্টা আগে দেখেছিলুম, ঈগলপাখির মৃতদেহ। এখন হঠাৎ দেখি, পথের মাঝখানে একটি ঘোড়ার তাজা রক্তাক্ত মৃতদেহ ধূলিশয়ান। ঘোড়াটাকে কেউ হিঁচড়িয়ে টেনে থাকবে পঁচিশ গজ দূর পর্যন্ত এবং রক্তের ধারা ততদূর অবধিই ছড়ানো। স্পষ্টত, এটিও অপমৃত্যু—কিন্তু কারণটি দুর্বোধ্য! এটির সঙ্গে যে ঘোড়সওয়ার ছিল তার খোঁজ পাওয়া গেল না! আগাগোড়া রহস্য!

হিমালয়ের অন্তর্গত জাস্কার গিরিশ্রেণীর উত্তরভাগের অস্থিপঞ্জর এ অঞ্চলে এবার শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু জোযিলার পর থেকে' এই সর্বশেষ গিরিশ্রেণীর চেহারা ছিল উলঙ্গ সর্বহারা সন্ন্যাসীর মতো। উপবাসী তপস্বী যেন অনশন ব্রতধারী—ধীরে ধীরে তার মেদ-মাংসমজ্জা-রক্ত—সমস্ত একে একে শুকিয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তার মূল কঙ্কাল! সেই ঐতিহাসিক নিষ্প্রাণ কঙ্কালের মাথার উপর শুধু রয়েছে তুষারের জটা। সে-তুষার গলে না, নড়ে না,—মাঝে মাঝে তারই উপরে ছুটে আসে মধ্যএশিয়ার দিক্‌বিদিকব্যাপী ধূলিঝঞ্ঝা,—সূর্যদগ্ধ সেই নির্মেঘ নীলাকাশের নীচে সেই অগ্নিকণিকা একটি ধূসরবর্ণ 'আঁধি' সৃষ্টির দ্বারা ওই কঙ্কালকে মাঝে মাঝে ছায়াচ্ছন্ন করে দেয়। সেই কর্কশ, কৃষ্ণাভ, তৃণ তরুলতাশূন্য, আদিম একদল রাক্ষসরূপী গ্র্যানিট-হিমালয়ের শেষ প্রশাখাব্যূহের তলায়-তলায় আমি একালের এক ক্ষুদ্র মানবক বীজমন্ত্র জপ করতে করতে চলেছি। এই হিমালয় সে নয়, সেই যাকে সুদূরে পূর্বলোক থেকে দেখতে দেখতে এসেছি। যাকে দেখেছি নামচা-বারোয়ায়, ভুটানের ভিতরে-ভিতরে, কবরু আর চুম্বীর দুই পাশে, উত্তর সিকিমের তলায়-তলায়, তিস্তা-রঙ্গীতের আশেপাশে, অন্ধকার বাগমতী-কোশী-কালী-শারদা-সরযূর তীরে-তীরে, যাকে দেখে এসেছি গৌরীগঙ্গা আর ভাগীরথী-গঙ্গায়, মন্দাকিনী-বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকানন্দায়,—সেই ব্যাঘ্রচর্মাসন ভূজঙ্গভূষণ চীরবাসা মহাজট এখানে নেই,—এ যেন অন্যরূপী ভৈরব, এ যেন যোগতন্দ্রা-সমাহিত মহাস্থবিরের কর্কশ কঙ্কাল শ্মশানশয্যায় শায়িত। সর্বাঙ্গ তার মধ্য এশিয়ার চিতাভস্মমাখা।

পেরিয়ে এলুম 'তাসগাঁও', অর্থাৎ পাথরের দেশ। যাচ্ছিলুম পূর্বপথে বিশাল একটা ধূসরজগতে হিমালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে। এর পর শূন্য একটা মরুব্যাদান। তারপর একটা পীতবর্ণ দিগন্তজোড়া ভূভাগ—যেখানে ছোট ছোট মৃন্ময় বালুপাহাড় আপন পেলব কোমলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে—যাদের উপর হরিৎ-এর লেশমাত্র আবরণ নাই। এই মৃন্ময়তা সম্পূর্ণ নিষ্ফলা,—এবং তাদের গায়ে গায়ে যেন মাছের আঁশ বা অভ্রের টুকরো ছড়ানো। এই মাটি ও বালুর থেকে সামান্য হাওয়ায় যে ধুলো ওড়ে এবং পাহাড়তলী যেভাবে সেই ধুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, সেটি পশ্চিম রাজস্থানের কুখ্যাত বালুঝঞ্ঝারই

সমতুল্য। আমরা পাক্‌সিম নদী তীরের জনপদটি ছাড়িয়ে গেলুম।

সূর্যাস্তের কিছু আগে এসে পৌঁছলুম কার্গিলে। কার্গিল একটি ক্ষুদ্র শহর এবং তহশীলের প্রধান কেন্দ্র। এখানে এসে আশেপাশে মিলেছে পাঁচটি নদী, এবং 'পুরিক' উপত্যকার ভিতর দিয়ে সবগুলি নদী একটি সঙ্গমে পরিণত হয়ে বয়ে চলেছে মহাসিন্ধু নদে মিলিত হবার জন্য। এ নদীগুলি একটির পর একটি এসেছে দেবশাহী, হরমুখ, জোযিলা, সুন-কুন এবং জাস্কার থেকে। এগুলির অধিকাংশের উৎস হল হিমবাহ, সুতরাং এগুলির ধারা অব্যাহত। সবগুলি নদীর জল একত্র হয়ে কার্গিলের মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে 'চাং' গিরিসঙ্কটের (১৬০০০) নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। সেই সন্ধিস্থলটি উত্তরমুখী মহাসিন্ধুর একটা ভয়ভীষণ খদ, যার চারদিকের ছায়াচ্ছন্ন থমথমে উপত্যকা কেবল তৃণতরুশূন্য মানবপদচিহ্নহীন একটা বালুপাথরের ভূভাগ ছাড়া আর কিছু নয়। সেই বিজন ভীষণ উপত্যকার উত্তরপারে দানবাকারে স্থানীয় ভূমিতল থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে মহাপ্রাচীরের মত ১০ হাজার ফুট উঁচু বাল্‌তিস্তানের পর্বতমালা, এবং তারই মাঝখানে 'চর্বং' গিরিসঙ্কট,—যার তুষারাচ্ছন্ন নালীপথে গিয়ে দাঁড়ালে মুখোমুখি উত্তরে কারাকোরমের প্রত্যেকটি হিমবাহ এবং 'কে-১' থেকে আরম্ভ ক'রে 'কে-৩২' পর্যন্ত প্রায় সবগুলি চূড়া লক্ষ্য করা যায়। এই অতলস্পর্শ মহাসিন্ধুখদের সুনীল, সুন্দর ও স্বচ্ছ জলোচ্ছ্বাসের আশেপাশে স্বর্ণরেণুসংগ্রহীর দল মাঝে মাঝে এসে পৌঁছয়। কেননা পূর্বোক্ত পাঁচটি নদী—দ্রাস, সুরু, পাস্কিম, ব্রালদু ও বাসার—এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণরেণু বহন করে! এটি দেখতে পাওয়া গেছে, উত্তর কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত নদী এবং মহাসিন্ধুনদের প্রায় প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখা এবং উপনদী প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণরেণুসহ প্রবাহিত হয়। এই স্বর্ণসংগ্রহীর দল যখন চলে যায়, তখন এই সর্বশূন্য জলা-উপত্যকায় যারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে তারা হল বৃহদাকার পার্বত্য ইঁদুর (murmot), যাদের দেহের আয়তন খরগোস অপেক্ষাও বড়। এ ছাড়া উড়ে বেড়ায় একপ্রকার হিংস্র পতঙ্গ, যারা জন্তুর রক্তপান করে। আর যদি কখনও বেরিয়ে আসে হঠাৎ দু'একটি ভল্লুক—এ ছাড়া আর কিছু নেই।

কার্গিলে এসে পৌঁছলে চোখ দুটো যেন কিছু বিশ্রাম পায়। শহরটি দ্বিভুজ, অর্থাৎ সোজা এসে বাঁদিকে বেঁকে আবার দূরান্তে চলে গেছে। একটিমাত্র অপ্রশস্ত রাজপথ,—দূরদর্শিতার অভাবে যেটি এখনও প্রশস্ত হয় নি! কার্গিলের উত্তর এলাকার সঙ্গে 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' একেবারেই একাকার। এর কারণ, কার্গিল তহশিলের অধিকাংশই এখন পাকিস্তানের অধিকারে। পাহার-পর্বত ডিঙ্গিয়ে—যেমন এতকাল ধরে চলে এসেছে—এপার-ওপারে লোক চলাচলের পক্ষে বাধা বিপত্তি সামান্যই। র‍্যাডক্লিফ্‌ অ্যাওয়ার্ডের ইতর চাতুরী যেমন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মাঝখানে অশান্তি

ও মারপিটকে কায়েমী করে রেখেছে, এই দূর দেশেও 'সীজ্‌ ফায়ার লাইন্‌' ঠিক তেমনি দুষ্ট মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এর ফলে দ্রাসের পূর্ব সীমানা থেকে কার্গিলের পূর্বপ্রান্তবর্তী মহাসিন্ধু নদ অবধি এমন একটা কানাকানি, চাপা চাপা ষড়যন্ত্র, ইশারা ইঙ্গিত, গোয়েন্দা চলাচল, এবং হানাহানির ঘটনা ইত্যাদি আছে—যেগুলি রাজনীতিক অগৌরব, অপরিণামদর্শিতা এবং অযোগ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর বা লাদাখের সঙ্গে ভারতের মন-জানাজানি হবার সুযোগ দেয় নি। ফলে, বিগত ১৫০ বৎসর কাল অবধি কাশ্মীর ভারতের নিকট বহুলাংশে অপরিচিত। লাদাখের পথ, গিলগিট, চিলাস, হুনজা বা বালতিস্তানের পথ —এগুলির সঙ্গে ভারতবাসীর সংযোগ ছিল কম। কাশ্মীরের রাজগোষ্ঠী বা শাসকমহলের সঙ্গে ইংরেজের যে বুঝাপড়াটা ছিল, সেটি পীর পাঞ্জালের বাইরে আসে নি। ভারতের সংবাদপত্রাদি, ভারতের জাতীয়তাবাদী সাহিত্য, ভারতীয় রাজনীতিক নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ, ভারতীয় বেতারের সংবাদ, চলচ্চিত্রাদি, এগুলির প্রবেশ ও প্রচার কাশ্মীরে নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে যে সকল সামন্ত রাজা, এমন কি নিজাম পর্যন্ত—বড়দিনের কালে কলকাতায় এসে বড়লাটের চতুঃসীমায় ঘুরতেন—তাঁদের মধ্যে কাশ্মীরের মহারাজার দেখা পাওয়া যেত না। কেননা, অন্যান্য সামন্ত রাজার মতো কাশ্মীর বড়লাটের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নি। হায়দরাবাদের নিজাম অপেক্ষা কাশ্মীরের মহারাজার 'সভারেন রাইটস্‌' ছিল বেশি পরিমাণ, এবং ইংরেজের রক্ষণশীল শাসকচক্রই কাশ্মীরকে ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকার করতে দেয় নি। উত্তর কাশ্মীরে সাম্রাজ্য-সীমানা রক্ষার জন্য ইংরেজ যে সকল ব্যবস্থা করেছিল, সেগুলি ছিল ভারতের সম্পূর্ণ অগোচরে, এবং 'সুখী উপত্যকা' কাশ্মীরে ওখানকার রাজ-দরবার যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতেন, তার সঙ্গে বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্টের কিছু সামান্য যোগসাজস থাকলেও বিশেষ কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। নিজামের ছিল সশস্ত্র রক্ষীদল, কিন্তু কাশ্মীর মহারাজার ছিল সশস্ত্র সামরিক বাহিনী। এর কারণ, মাহারাজা গুলাব সিংয়ের আমল হল তদানীন্তন সাম্রাজ্যলোভী এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল—যার প্রধান কেন্দ্র ছিল সুদূর কলকাতায়, এবং যখন রেলগাড়ি, মোটর প্রভৃতি দ্রুতগতি যানবাহন সৃষ্টি হয় নি। সেই কালের ইংরেজ এবং তখনকার গুলাব সিং—উভয় পক্ষই ছিল প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত; তখন মহারাজা রণজিৎ সিং বা গুলাব সিংয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবলতর হয়ে দাঁড়ানো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু মহারাজা রণবীর সিং (১৮৬০) থেকে আরম্ভ করে মহারাজা হরিসিং (১৯২৫) অবধি ইংরেজের অনস্বীকার্য প্রায়-একচেটিয়া প্রভুত্বকে কাশ্মীররাজ স্বীকার করে নিতে বাধ্য ছিলেন। মহারাজা হরি সিংয়ের আমলে

কাশ্মীরে 'টুরিজম্' উৎসাহ লাভ করে এবং তার ফলে কাশ্মীরে রাজনৈতিক চেতনা এসে পৌঁছয়।

এর পর কাশ্মীরকে জানবার আগেই কাশ্মীর ও লাদাখ প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয়। 'জুন প্ল্যান্' (জুন ৩, ১৯৪৭) প্রকাশের পর এবং স্বাধীনতালাভের ১৬ দিন আগে একটি ষড়যন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইংরেজরা তাদের অধীন মুসলমান কর্মচারীসহ গিলগিট এজেন্সি ছেড়ে যে অঞ্চলে গিয়ে ওৎ পেতে থাকেন,—১৫ দিন পরে সেই ভূভাগটিই 'পাকিস্তান' নামে পৃথিবীবাসীর নিকট বিঘোষিত হয়। কাশ্মীরোত্তর গিলগিটে ৩০ জুলাই, ১৯৪৭ তারিখ থেকেই আক্রমণের ভূমিকা প্রবল অশান্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। ভারতবাসীকে এই ঘটনা জানতে দেওয়া হয় নি।

সমুদ্র সমতা থেকে কার্গিল উপত্যকা ৮ হাজার ফুট উঁচু। কার্গিল তহশিলে ভারতীয় অংশে পড়েছে মোট ২২টি জনবসতি। বর্তমানে তার লোকসংখ্যার অধিকাংশ হল বৌদ্ধ এবং তাদের ধর্মগুরু হলেন দলাই লামা। কার্গিলে বরফ পড়ে কম এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ প্রখরতর হবার জন্য ফলন হয় বেশী। যব হল প্রধান ফলন ; এ ছাড়া আপেল, আঙুর, জাম ইত্যাদির বাগান অনেকগুলি। এই সব বাগান এবং চাষের ক্ষেতগুলিকে শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উচ্চাকার পাথরের প্রাচীর প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কার্গিলে এসে পৌঁছলে প্রথমেই মনে হতে থাকে চারিদিকের দিগন্ত জোড়া মরুপাথর জগতে এ যেন প্রথম করুণ শ্যামলিমার চিহ্ন। আমরা সেই একই পথে চলেছি যেটি মধ্যএশিয়ায় যাবার সুপ্রাচীন পথ। এই পথে চিরদিন ক্যারাভানও যেমন এসেছে, দস্যু দলও তেমনি এই জনপদকে আক্রমণও করেছে। কিন্তু কার্গিলের সেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় জনপদ একালে রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষুদ্র এক শহরে। এখন মধ্যযুগীয় চেহারাও যেমন নেই, তেমনি সেকালের অপেক্ষা ব্যবহারিক পরিবর্তনও একালে ঘটেছে। বাড়িঘর, বসবাস-ব্যবস্থা, দোকানপাতি, আধুনিক সামগ্রীসম্ভার, পোশাক-আশাকে চলতি কালের পারিপাট্য—এগুলি নতুন কালের সঙ্কেত জানাচ্ছে। অলিগলি, বাজার এবং আশেপাশে এখানে ওখানে ঘুরে দেখতে পাওয়া যায়, পাঞ্জাবী এবং মারোয়াড়ি বণিক দু'চারজন এসে আগেভাগে বসে গেছে। এতে যে নাগরিক জীবনের উন্নতি কিছু ঘটে নি তা নয়। একালে কার্গিল বহির্জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তার সামাজিক পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক। সামরিক বিভাগের লোকজনের আনাগোনা, রসদসম্ভারের চলাচল, নতুন নতুন কর্মসংস্থান, নানাবিধ আধুনিকের ঢেউ, জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণের আমদানি—এগুলির সম্মিলিত ফলাফল সাধারণের মনের উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করে, কার্গিল তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু যে কারণেই হোক, কার্গিলের হাওয়ার মধ্যে একটি অনিশ্চয়তার আভাস আছে। কেমন যেন একটি সন্দেহ বা সংশয় ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। কোনও গুপ্ত দলের চক্রান্ত এখানে আছে কিনা সঠিক বোঝা যায় না বটে, কিন্তু একশ্রেণীর লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি এবং কার্যকলাপের সংবাদ মাঝে মাঝে শোনা যায়। আমার মনে হয়, 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখার' অতি নৈকট্যই কার্গিলকে এই অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। কার্গিলের 'লাইফ লাইনকে' কেটে দেওয়া পাকিস্তানের অন্যতম যুদ্ধনীতি।

ছোট শহরটি ছাড়িয়ে গেলেই আবার ধূলি ও বালুর জগৎ। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম এক বিস্তীর্ণ বালুপ্রান্তরে। এটি 'পাস্কিম' ও 'সুরু' নদীর অপর পারে। সন্ধ্যা তখন আসন্ন। এখানকার অপরিচিত আকাশ একপ্রকার ধূমাচ্ছাদিত চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—যার নীচে অনন্ত ধূলিরাজ্য ও বালু-পাহাড় ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই প্রান্তরের অদূর উত্তর পারে 'সীজ্ ফায়ার লাইন', এবং পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে পূর্বোক্ত বিভিন্ন নদীপথ এমন ছায়াচ্ছন্ন রহস্যলোকের দিকে চলে গেছে যেদিকে আমার ঔৎসুক্য, কৌতূহল এবং সর্বাপেক্ষা অবাস্তব বস্তু কল্পনাও পৌঁছয় না!

কোন্ পাহাড়ের অন্তরালে ছমছমে সন্ধ্যার ছায়ায় ক্ষুদ্র কার্গিল শহর তার ছোট ছোট সবুজ বনবাগান আর ফসলের ক্ষেতগুলিসহ হারিয়ে গেল দেখতে পেলুম না। একটা বিশাল বালুপ্রান্তরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখি দূরে দূরে পাণ্ডুবর্ণ পাহাড়ের শীর্ষগুলি তুষারসমাকীর্ণ এবং কোথাও কোথাও নীচের দিকে নদী তীরের আশেপাশে দু'একটি শীর্ণকায় পপলার দলছাড়া হয়ে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। পৃথিবী এখানে সর্বসম্পদশূন্য, সর্বহারা। চারিদিকে শুধু নিঃসীম শূন্যতা আর শ্রীহীন, রিক্ত, দরিদ্র পাহাড়ের দল নগ্ন-ধূসর প্রেতচ্ছায়ার মতো মহাকালের প্রহরীর স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেই শীতার্ত ভৌতিক প্রান্তরে পাহাড়তলীর পাশে ধীরে ধীরে কখন যেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তারকাখচিত নির্মেঘ আকাশ থেকে নেমে এল কেমন একটা অনৈসর্গিক আলোকাভা—সেই আভা ছড়িয়ে পড়েছে কার্গিলের সেই সংশয়াতুর মায়াচ্ছন্ন লোকে। চেয়ে দেখছি একটা বিজন বিশ্বের দিকে—যেটা নিশ্চুপ, ভাবাহীন। চেয়ে দেখছি এটা উত্তর ভারতের পূর্ব তোরণদ্বার—যেখানে এসে দাঁড়ালে সুদূর মহাপ্রাচ্যের দিকে চোখ পড়ে। এই তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে একদা প্রাচীন ভারত যে ভাষায় বাহির বিশ্বকে ডাক দিয়েছিল, নতুন ভারতের

মুখে সেই ভাষা এসে পৌঁছবার আগেই দেখা দিল চারিদিকের অন্তহীন জটিল বৈরিতা! একাকী সেই অন্ধকার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যে ভাবনাটা সেদিন পেয়ে বসেছিল, সেটা ভারতের জনবহুল কোন এক কোলাহলমুখর নগরের রাজপথে দাঁড়িয়ে ভাবতে গেলে নিজের কাছেই কতকটা কৌতুকজনক বা অবাস্তব মনে হত।

কার্গিলের ভৌগোলিক অবস্থান একটি সঙ্কটসন্ধিস্থলে—যেটির সংবাদ সমতল ভারতবাসীর নিকট অনেকটা অস্পষ্ট। সামরিক বিভাগ ছাড়া কার্গিলের নিত্যক্ষণের উৎকণ্ঠা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইংরেজের 'লাইফ লাইন' ছিল দক্ষিণ স্পেনের জিব্রাল্টার, সুয়েজ ও এডেন। কাশ্মীর ও লাদাখের 'লাইফ লাইন' হল প্রাচীনকালের সেই মধ্যএশিয়ার ক্যারাভান পথ—অর্থাৎ সোনামার্গ, বলতাল, জোযিলা, দ্রাস ও কার্গিল দিয়ে যে পথ গিয়েছে লাদাখে।

কিন্তু আরও দুটি পথ অবশ্যই ব্যবহার করা যায়। একটি হল জম্মুর অন্তর্গত ওয়ারওয়ান উপত্যকাপথ—যেটি একদা জরোয়ার সিং তাঁর সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যবহার করেছিলেন। অন্যটি লাহুল উপত্যকার ভিতর দিয়ে। এই দুটি পথে লেহ্ নগরীতে পৌঁছতে সময়ও অল্প লাগে।

কার্গিল তহশিলের মাঝখান দিয়ে গেছে 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা'। মাত্র এক মাইল থেকে দুই মাইল দূরবর্তী এই সীমারেখা, এবং এই রেখার ওপারে দাঁড়িয়ে এপারের সামরিক কার্যকলাপ, গতিবিধি, যানবাহন চলাচল, রসদাদির আনাগোনা—সমস্তই অনায়াসে পর্যবেক্ষণ করা চলে। চীনা আক্রমণের সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই একই পথে। সর্বাপেক্ষা বিরক্তিকর, কার্গিল ও তার আশেপাশে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, এবং সাম্প্রদায়িক ইতরতা। ১৯৬৪ সালে এই অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের তালিকাটি বেশ দীর্ঘই। এর মধ্যে স্ত্রীলোকের কর্ম-তৎপরতার কথাও শোনা যায়। এখানে বলাই বাহুল্য, সেই অন্ধকার তুহিন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নিজেই অনুভব করছিলুম, গুপ্তচরবৃত্তির দূষিত হাওয়ায় সমগ্র পশ্চিম লাদাখ একপ্রকার জরো জরো।

কিন্তু কার্গিলে পদার্পণ করামাত্র যেটি প্রথমেই উপলব্ধি করা যায়, সেটি হল এই,—বৈদান্তিক ভারত গভর্নমেণ্ট বোধ করি এখন আর তথাকথিত অহিংসাবাদে জীর্ণ নন। স্বাধীনতা লাভের পরে এই প্রত্যাশা ছিল, জাতীয় চরিত্রের নির্মলতার নূতন উজ্জীবন ঘটবে, এবং সমগ্র জাতির নির্ভয় পৌরুষ বীর্যবান হয়ে উঠবে আপন কঠোর প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু তা হয় নি। নব-ভারতের সম্পদ্ এবং কর্মশক্তি বেড়েছে অনেক, কিন্তু তার চেয়েও বেড়েছে জাতীয় চরিত্রের ভীরুতা এবং অসাড়তা, এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে চিত্তের দৌর্বল্য।

কার্গিলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এর ব্যতিক্রম। নিত্য উৎকণ্ঠার মধ্যে কার্গিল বাস করছে বটে, কিন্তু এখানে যাদেরকে দেখছি তাদেরকে দেখি নি এতদিন! ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের যে-অংশটা আজ লোভে ও স্বার্থ-চক্রান্তে জরো জরো—এরা তাদের কেউ নয়। এরা অন্য বস্তু, অন্য প্রাণ। এরা বংশপরম্পরায় চিরকাল দেশের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মবলি দিয়ে এসেছে নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে!

যুদ্ধের বাঁশী শোনবার জন্য কার্গিলের 'ব্রিগেডিয়ার্স ক্যাম্প' সর্বক্ষণ প্রস্তুত। এখানে জীবনযাত্রার সকল প্রকার কঠোরতার মধ্যেও সামরিক ব্যক্তিরা যেরূপ আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছেন, সেটি বিশেষ উৎসাহজনক। আমি তাঁদের সেই আনন্দ-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একক নয়। আমি তাঁদেরই। চলুক সেই উৎসব সমস্ত রাত।

মধ্য এশিয়ার বিরাট শূন্য প্রান্তর বাইরের অন্ধকারে তখন থমথম করছে।

। ৮ ॥

লাদাখ-ফতুলা-লামাউরু-খালাংসে

বালতিস্তান নামটি আঞ্চলিক, মূলত এটি লাদাখেরই অংশ। ইংরেজ আমলে লাদাখকে সরিয়ে বালতিস্তানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কেন, ইংরেজ যাবার আগে সেটি স্পষ্ট বলে যায় নি। বিগত কয়েক বছর থেকে এই অঞ্চলটির অন্তর্গত কয়েকটি এলাকা প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। সেগুলির নাম সোডা প্লেনস্, আকসাই চিন, লিংজিটাং, চ্যাংচেন্‌মো, এবং কারাকোরম গিরিসঙ্কটের দক্ষিণবর্তী 'দেপসাং' উপত্যকা। যতগুলি এলাকার নাম করলুম, এগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে বর্তমানে নামেমাত্র পরিচিত, এবং এটিও এখন সুবিদিত যে, এই এলাকাগুলির উচ্চতা মোটামুটি ১৭ থেকে ১৮ হাজার ফুট। চ্যাংচেন্‌মোর উচ্চতা ১৮ হাজার ফুটেরও বেশী। বুদ্ধিমান ইংরেজ কারাকোরমের দক্ষিণ-পূর্ব পার নিয়ে মাথা বিশেষ ঘামায় নি, কারণ ওদিকে শাঁস ছিল কম! সে যাই হোক, এই বিশাল মরুপাথরের 'চাটান' এলাকায় আকসাইচিন্ হল একটি বৃহৎ মালভূমিমাত্র—যেখানে নেহরুজীর ভাষায় "একটিমাত্র মানুষের বসবাস নেই এবং একটিমাত্র তৃণফলকও যেখানে জন্মে না।" পুরাকালে গ্রীকদের (Ptolemy ও Pliny) বর্ণনায় আকসাই-চিনকে বলা হত, "আখাস্‌সা রেজিয়ো" অর্থাৎ পাথুরে মুলুক। আ-খাস্‌সার সঙ্গে 'চিন্' শব্দটি যোগ করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'পাথরকন্দ্'। 'কন্দ্' হল ভারতীয় অর্থে 'খণ্ড'। যেমন, ভূখণ্ড, কেদারখণ্ড, মনসাখণ্ড ইত্যাদি। খণ্ড অর্থে ভাগ। মধ্যএশিয়ায় তাসকন্দ্ শহরের অর্থ পাথরের দেশ ; আকসাই-চিনের অর্থ, পাথর খণ্ড।

লাদাখের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ক্যারাভান রুট্ ধরেই আমি পূর্ব-দক্ষিণ পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম। কার্গিল পর্যন্ত হিমালয়ের যে সুদূরবর্তী আভাস ছিল, এই পথ দিয়ে যাবার কালে সেই আভাস এক সময় কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। দূর থেকে দূরে অজানা মধ্যএশিয়ার কোনও একটা ভূখণ্ডের দিকে কেমন যেন লক্ষ্যহীনভাবে চলে যাচ্ছিলুম। প্রান্তর কোথাও ফুরোয় না, দূরান্তরের বালুপাহাড় এবং তাদের শীর্ষলোকে তুষারগুলিরও শেষ নেই। রৌদ্রে সেগুলি হীরকচূর্ণের মতো দপদপ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে শুষ্ক তুহিনবাতাস উঠছে, এবং তারই ঝাপটে যে ধূলিরাশি আমাদেরকে আক্রমণ করছে, সেই মিহি ঘন ধুলো বিহার রাজ্যে অথবা

বালিয়া জেলাতেও দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না। আমরা যেন মাখন বর্ণের পাউডার মাখতে মাখতে একসময় ভৌতিক চেহারায় পরস্পরকে দেখে ভয় পাচ্ছিলুম! মুখের সামনে কারও আয়না ছিল না, কিন্তু একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারাটি অনুমান করে নিচ্ছিল! হাসবার উপায় ছিল কম, কথা বলাটা অসুবিধা-জনক,—কারণ মুখে রুমাল চাপা দেওয়া সত্ত্বেও রুমালখানাই ধুলোয় বিবর্ণ হচ্ছে।

রৌদ্র প্রখর, কিন্তু তাপ নেই এ সময়ে। শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া প্রতি পলকে যেন আমাদেরকে শুকিয়ে দিচ্ছে। নরম পাঁপর যেন শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে! হাড়-পাঁজরা-মজ্জার সমস্ত রস শুকিয়ে যাচ্ছে। জন্তুর শবদেহ এখানে পচে না,তারা শুকিয়ে শোলার মতো নীরস ও ঝাঁঝরা হয়ে যায়! নীরেট কঠিন পাথরের পাহাড়—তারা শুকোচ্ছে কাল-কালান্ত ধরে। তারা ছিদ্রময় হতে থাকে ধীরে ধীরে—তাদের ভিতরের শাঁস শুকিয়ে তিল তিল করে ঝরে যায়! দু'চারটে রোগা ঢ্যাঙ্গা পপলার অথবা অল্প স্বল্প সবুজের চিহ্ন যদি চোখে পড়ে তবে বুঝতে হবে ওখানকার মাঠের তলা দিয়ে জলধারা চলেছে! মাঝে মাঝে দূর-দূরান্তরে জনবসতি-বিন্দু যেন মস্ত আকারের একখানা হলদে রংয়ের কাগজের উপর এক একটি সবুজ কালির ফোঁটা! ওই ওদের সীমা,—সব খেলার শেষ, সকল কীর্তির অবসান। মাঝে মাঝে ওদেরই মধ্যে চোখে পড়ছে একেকটি শ্বেতবর্ণের গুম্ফা—যার শীর্ষদেশ হল চতুষ্কোণ। ওর মধ্যে যে সকল সামগ্রী আছে তা জানি। কয়েকটি রঙীন মূর্তি বিভিন্ন নামে, কয়েকখানা পট আর রঙীন রেশমী কাপড়ের জীর্ণ টুকরো,—জরির পাড় দিয়ে সেলাই করা। কয়েকটা জলভরা কাঠের বা পাথরের বাটি, দু'একটি বজ্ররাক্ষসের বিগ্রহ, নয়ত তান্ত্রিক কালীতারা। ওগুলি সাজানো রয়েছে কতকাল—সময়ের হিসাব নেই। ওর মধ্যে অন্ধকার কক্ষে পুঁথি আছে, মণিচক্র আছে, আছে মণি দেওয়াল,—আছে মুখে মুখে বীজমন্ত্রপাঠ। চারিদিকে মধ্যএশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গুম্ফার অন্ধকারের ভিতর থেকে অবলোকিতেশ্বরের দুটো অতন্দ্র নির্মল অর্ধনিমীলিত চোখ—যার উপর দিয়ে চলে গেছে এক একটা কাল, ইতিহাস, যুগযুগান্ত, মানববংশপরম্পরা, কল্প থেকে কল্পান্ত। রক্তপতাকা উড়িয়ে কতবার এই পথে ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল চলে গেছে, ধুলির ঝাপটের ভিতর দিয়ে, 'মার মার' আওয়াজ উঠেছে মরুলোকে, হিংস্র রক্তের ধুলিমলিন ধারা গিয়ে মিলেছে ওই 'পাস্কিমের' ঠাণ্ডা জলে, ইতিহাস বদলিয়ে গিয়েছে বালুপাহাড়ের তলায় তলায়, ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে গুম্ফা, চূর্ণবিচূর্ণ অবলোকিতেশ্বর ছড়িয়ে পড়েছে বালু ও ধুলিরাশির মধ্যে রক্তাক্ত মৃতদেহের আশেপাশে। কিন্তু তারপর আবার উঠেছে ওই চতুষ্কোণ মন্দির, আবার ওই পরমসহিষ্ণু বৌদ্ধপিপীলিকার দল তিল তিল করে সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করেছে, বীজমন্ত্রপাঠ করেছে আপন

ধ্যানতন্দ্রায়, আবার এক অন্ধকার কক্ষমধ্যে চর্বির প্রদীপের সামনে শান্ত, নির্বাক, নিমেষনিহত পদ্মসম্ভবের অতন্দ্রচক্ষু কী যেন রহস্যলক্ষ্য নিয়ে জেগে উঠেছে !—

ভারত এখানে মধ্যএশিয়ার ভিতরে প্রসারিত—যার আঞ্চলিক নাম হয়েছে লাদাখ। সমগ্র লাদাখের উচ্চ মালভূমি উচ্চতর গিরিমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই অঞ্চলের উত্তরে ও পূর্বে তিনটি বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। বিশ্বসৃজনের আদি কাল থেকে ভারতীয় সীমানাকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণীত করে রেখেছে। এই তিনটির নাম কারাকোরম, আঘিল, কুনলুন। এই তিন পর্বতশ্রেণীর উত্তর ও পূর্ব পার হল সিনকিয়াং এলাকা—যেখানকার জনপদের নাম কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোতান ইত্যাদি। সিনকিয়াং এলাকায় কয়েকটি ভারতীয় অঞ্চল এখনও বিদ্যমান। যেমন গুমা, কিলিয়ান, চিড়া, নাইয়া বাজার প্রভৃতি। এ অঞ্চলের বহু ভূ-সম্পত্তি ভারতীয় এবং মোগল আমলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রায় এখানে যে কয়েকটি জনপদ সৃষ্টি হয়, সেগুলি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ 'বাজার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিব্বতীয় হুনদেশ এবং কৈলাসগিরি অঞ্চলে ভারতীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে মীনসার বা মীনসায়র, তীর্থাপুরী, জ্ঞানীমণ্ডি, রাবণ হ্রদ, মানস সরোবর, গুরুমান্ধাতা, খেচরনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কৈলাস অঞ্চলে পাঁচখানি গ্রাম অদ্যাবধি ভূটানের নিজস্ব অঞ্চল। তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে লানচৌ যাবার পথে ইয়াংসি নদীর তীরে যে ভারতীয় এলাকাটি অদ্যাবধি বর্তমান, তার নাম 'জয়কুণ্ড !' এর বিপরীত ক্ষেত্রে আবার দেখি, ভারতের মধ্যে তিব্বতী ও চীন এলাকা। কলকাতার চীনা অঞ্চলে চীনাদের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি! নৈনিতালে, বুশাহরে, মানা গিরিসঙ্কটের এপারে ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চলে চীনাদের ভূ-সম্পত্তি ও জমিদারির কথা আগে বলেছি। নৈনিতালের জলাশয়ের ধারে 'চায়না পীক'-এর কথা সবাই জানে। চীন-সম্প্রসারবাদের দিকে সন্ত্রস্ত লক্ষ্য রেখেই সম্ভবত ভারতের কর্তৃপক্ষ বুশাহরের রাজধানীর নামটি বদলিয়ে দিয়েছেন। 'চিনির' বদলে এখন তার নাম হয়েছে 'কল্পা'। বছর পাঁচেক আগে দিল্লীবাসী দু'জন হাঙ্গেরীয় ও চেকোস্লোভাক সাংবাদিক আমাকে নিয়ে কলকাতার চীনা পল্লীতে ভ্রমণ করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেন। তাঁদের পক্ষে এটি অবিশ্বাস্য ছিল, ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে চীন কর্তৃপক্ষ কেমন করে তাঁদের নাগরিকদের এ দেশে রাখতে সাহসী হন। ভারতবর্ষই বা কেমন বিচিত্র দেশ !

বন্ধু দুটিকে বোঝাবার সময় পাই নি, ভারতের এই বৈচিত্র্য এবং তার coexistence এর নীতি বিগত তিন হাজার বছর ধরে এইভাবেই চলে আসছে।

লাদাখের ভারতীয় সীমানা সম্বন্ধে যে কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করলুম তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় সেকালের জনৈক ইংরেজের মুখে। ইনি ছিলেন একজন পশু-চিকিৎসক এবং বিলাত ও ফ্রান্স থেকে পাস করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের নাম উইলিয়ম মুরক্রফ্‌ট্। তাঁর আমলে ভারতের কোথাও ঘোড়া অথবা ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া দ্রুততরগতি যান-বাহন ছিল না। তিনি নূতন ধরনের অশ্ব-উৎপাদনের জন্য বিশেষ শ্রেণীর ঘোড়া সংগ্রহ ও পশম ব্যবসায় চালু করার উদ্দেশ্যে 'নিষিদ্ধ' তিব্বতে প্রবেশ করেন। সঙ্গে তাঁর অপর একটি বন্ধু ছিল। তাঁর নাম হিয়ারসী। তাঁরা নৈনিতাল জেলার রামনগর থেকে ছদ্মবেশে তিব্বত অভিমুখে রওনা হন (১৮১২)। একজনের নাম হয় 'মায়াপুরী' সন্ন্যাসী, অন্যজন হন 'হরগিরি'। এঁরা দুজন রামগঙ্গা নদী ধরে অগ্রসর হন। অতঃপর একে একে অলকানন্দা, কর্ণপ্রয়াগ, যোশীমঠ এবং নিতিসঙ্কট পেরিয়ে তিব্বতের হুনদেশে গিয়ে পৌঁছন। সেখানে তাঁরা ধরা পড়েন। বহু লাঞ্ছনা, হায়রানি এবং বিবিধ প্রকার উৎপীড়নের পর দুজন ভোটিয়ার সাহায্যে একদল ছাগলের পালক হিসাবে গোপনে তাঁরা আবার ভারতে পালিয়ে আসেন। অতঃপর তিব্বতে পুনরায় যাবার আশা ত্যাগ করে মুরক্রফ্‌ট সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে লাহুল ও স্পিতির পথ দিয়ে লাদাখে আসেন এবং দু বছর লাদাখের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করেন। তাঁর সেই কালের ডায়েরীগুলি একত্র করে একখানি বই ছাপা হয় (১৮২৫)। তার থেকে কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"Ladakh is bounded on the north-east by the mountains (Kun-Lun) which divide it from the Chinese province of Khotan, and on the east and south-east by Rudokh and Chanthan, dependencies of Lassa. On the south by the British province of Bushahir and by the hill-states of Kulu and Chamba. The latter also extends along the south-west till it is met by Kashmir, which, with part of Balti, Kartakee and Khafalun complete the boundary on the west and north-west. The north is bounded by the Karakoram mountains and Yarkand. The precise extent of Ladakh can scarcely be stated without an actual survey ; but our different excursions and the information we collected, enabled us to form an estimate, which is probably not far wide of the truth." (Residence in Ladakh, Chap. II, 1819, by William Moorcroft.)

এই সময় কাশ্মীর ভূভাগ মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের অধিকারে ছিল, এবং লাদাখেও তিনি তাঁর আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু লাদাখের নিজস্ব একটি শাসনব্যবস্থা বজায় ছিল বরাবর এবং এর শাসনকর্তা সম্পূর্ণই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ছিলেন। লাদাখের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক এবং অধ্যাত্ম বিষয়ক যোগ চিরকাল ধরে অচ্ছেদ্যভাবে চলে এসেছে, কিন্তু লাদাখের উপর তিব্বতের রাজনৈতিক আধিপত্য, প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা কর্তৃত্ব ইতিহাসের কোনও যুগে বিন্দুমাত্রও ছিল না! ভারতের সঙ্গে তিব্বতের কিংবা তার ছত্রধারক চীনের বন্ধুত্ব কতকালের, সে আলোচনা নতুন করে না করলেও চলবে। কিন্তু ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের প্রথম আমল থেকেই তিব্বত তার সকল দরজা একটির পর একটি বন্ধ করে দেয়! তিব্বতের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কোনও কালে মুসলমান জাতিকে বা ইসলামকে অথবা তাদের প্রশাসনিক অধিকারকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখে নি! এই অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা এত প্রবল ছিল যে, তিব্বতীরা তাদের নিজদেশে একটিমাত্র মুসলমান পরিবারকেও বরদাস্ত করে নি, এবং সিনকিয়াং, পামীর, হুনজা, বা বালতিস্তানে তারা কখনও পদার্পণও করে নি! বলা বাহুল্য, এর প্রধান যুক্তি ছিল এই, ওগুলি মুসলমানশাসিত এলাকা। সিনকিয়াংয়ের চিরকালকার 'স্বাধীন' মুসলমান মীরদের শাসনের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বিগত পাঁচশ' বছরের মধ্যেও বালতিস্তান, হুনজা প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান ভিন্ন অপর কোনও জাতির শাসনকর্তারও আবির্ভাব ঘটে নি। সকল কালেই দেখা গেছে, প্রজাদের অধিকাংশই,—হুনজা, গিলগিট এবং উত্তর বালতিস্তান ছাড়া—বৌদ্ধমতাবলম্বী, কিন্তু শাসনকর্তারা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান।

কাশ্মীর ও লাদাখের মধ্যকার প্রাণসূত্র পথ ধরেই চলেছি। অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনা নিয়ে পিছনে পড়ে রইল কার্গিল। পথ আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব। পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান এবং নদীর গতিপথ—এইগুলি পার্বত্য পর্যটনকে নির্ণয় করে। হিমাচলে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, লাদাখে—যে গিরিশ্রেণীগুলিকে আমরা দেখি, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি গিরিশ্রেণী দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিমে প্রসারিত। শিউয়ালিক বা শিবলিঙ্গ, পীর পাঞ্জাল, দেবশাহী, জাস্কার—এগুলি সবই হিমালয়ের অস্থিপঞ্জর এবং শাখাপ্রশাখা—এবং এদের প্রত্যেকের অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম। আরও আছে। লাদাখ, কারাকোরম, আঘিল, কৈলাস—এবং 'দক্ষিণ ভূভাগ' নেপালের 'মহাভারত' গিরিশ্রেণীর ভৌগোলিক অবস্থানও সেই দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম। আমরা জাস্কার অতিক্রম করে লাদাখ গিরিশ্রেণীর অন্তহীন বালুপাথর জগতে প্রবেশ করছিলুম!

উপরের আকাশ ধূলিধূসর, এবং তার নীচে ধূলিপাথরের ঊষর, বিবর্ণ, নির্জীব একটা

পার্বত্য নৈরাজ্য। এ অঞ্চলে পাহাড়ী ঘোড়া পেরিয়ে যাবার পক্ষে ৪।৫ ফুট পথ এককালে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু চাকার গাড়ি চলছে একালে—বড় বড় 'শক্তিমান' ট্রাক, বড় বড় যাত্রীবাস,—এদের জন্য পথ না কাটলে চলবে কেন? এই শত শত মাইল পথে যেখানে সম্ভব সেখানে জলনালাপথ কাটতে হচ্ছে আগাগোড়া। তারপর রয়েছে খর রৌদ্রের কাল। রাত্রে যেখানে তিনখানা কম্বল জড়িয়েও ঠক ঠক করে কাঁপতে হয়, দিনের বেলা সেখানে রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আগাগোড়া! ছায়াদানের পক্ষে একটি গাছও যে অঞ্চলে জন্মায় না, একটিমাত্র তৃণদল-ভূমি যেখানে পথচারীর মন ভোলায় না,—সেখানে আশ্রয় নির্মাণের কল্পনা শুধু স্বপ্নমাত্র। সুতরাং পায়ে-হাঁটা বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া বন্ধই হয়ে গেছে। এ পথে আনন্দ অপেক্ষা বিস্ময় ও উদ্বেগ মনকে নাড়া দিতে থাকে।

পার্বত্য ঢালুপথ কোথায় যেন নেমে এল নীচের দিকে। অবশেষে একটি জলধারা-পথের ধারে এসে পৌঁছলুম। নদীর নাম 'ওয়াখা' এবং যে কয়টি ধুলোমাখা পপলার আর উইলো ওই জলধারাটির আশায় অদ্যাবধি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই কয়টিকে ঘিরেই একটি ক্ষুদ্র জনবসতি। এরই পিছনে যেটি মস্ত উঁচু বালুপাথরের পাহাড়, তারই চূড়ার দিকে এক পুরা দুর্গের ঐতিহাসিক অবশেষ। কবে যেন কোন্ রাজা এই 'পাস্কিমে' ছিল এবং সে নজরানা দিত লাদাখকে। এমনি করে দেখতে দেখতে এলুম একদল কালো পাহাড় পেরিয়ে একটি বৌদ্ধ জনপদে, তার নাম 'শার্গোল'। এই শার্গোলের অন্তর্গত 'মুলবে' গুম্ফায় প্রথম যখন কয়েকজন বিচিত্র-দর্শন লামাকে দেখলুম ওখানকার গাছ-পালা আর ক্ষেত-খামারের ছায়ায়, তখন আরেকবার বিশ্বাস করলুম, ভূপ্রকৃতি এখনও সর্বশূন্য হয় নি! চারিদিকের অন্তহীন মরুলোকে এরা যেন একেকটি ছোট ছোট স্নেহচ্ছায়ার মতো। মুলবে গুম্ফা লাদাখের একটি স্থলচিহ্নের মতো।

এটি পার হয়ে চললুম আবার ধূসর সেই 'শূন্যলোকে'। আমাদের সর্বদেহ ধুলোয় শাদা। হঠাৎ দেখি পথের পাশে পাহাড়ের গা কেটে এক বৌদ্ধমূর্তি। কোনও এক কালের কোনও ভক্ত ভাস্করের দল এটি কুঁদে বানিয়েছে—যেটি মহাকালের জরাকে অস্বীকার করে আপন গৌরবে দাঁড়িয়ে। এটিকে পার হয়ে আবার চললুম উপর দিকে, এবং দেখতে দেখতে যে শীর্ষলোকে পার হয়ে চললুম, সেটির নাম 'নমিকালা', এবং অনেকে এখন এটিকে বলে, 'নিম্‌টিলা'। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চারদিকে কেমন একটা চূণাবালু পাথরের স্বাভাবিক কোমলতা—যার উপর দিকে কেমন একটা আঁইশের চাদর মুড়ি দেওয়া! এই স্থলের উচ্চতা ১৩ হাজার ফুটের কিছু কম। এখান থেকে একটি শাখাপথ ঘুরে গেছে কতকটা নীচের দিকে। সেখানে একটি গিরিনদী নিজের পথ কাটতে কাটতে চলে গেছে মহাসিন্ধুনদের উদ্দেশে। এই পথের একস্থলে ডান দিকে

ঘুরে গেলে প্রসিদ্ধ গুম্ফা 'বুধখর্ব্।' একটি একটি করে অনেকগুলি গুম্ফা পেরিয়ে এলুম। 'তাসগাঁও, সিম্‌সে, ঘুংরি'—একটির পর একটি। এক সময় 'সিংগো' নদী পার হয়েছিলুম।

অপরাহ্নকাল সমাগত। 'বুধখর্বুর' পর আবার সেই তৃণশূন্য, প্রাণীশূন্য বালু-পাথরের পার্বত্য পথ সামনে প্রসারিত হল—যার দূর দূরান্তর শুধু লাদাখ গিরিশ্রেণীর দ্বারা আবেষ্টিত। কিন্তু 'নিমটিলা' ছাড়বার পর থেকে আমরা একটা বিপজ্জনক প্রস্তর সঙ্কুল এবং অতিশয় সঙ্কীর্ণ বালুধসা গর্জ-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। পাথুরে 'চাটানে' ভাঙ্গন ধরেছে অনেক, পথ কর্কশ অসমতল। গর্জ-এর নীচের দিকে সাধারণত থাকে নদীপ্রবাহ, কিন্তু এখানে সেটি শুষ্ক স্থলভূখণ্ড—যার অগাধ নীচে মানুষ বা জন্তুর পায়ের চিহ্ন পড়ে নি কোনও যুগে। কিন্তু আমাদের এই সংকীর্ণ পার্বত্য চূড়াপথের লিকলিকে কিনারা দিয়ে মাত্র কয়েক বছর আগেও যাতায়াত করত ভারতীয় এবং ইয়ারকন্দি ব্যবসায়ীরা। এদিক থেকে যেত বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, চামড়া, সূতিবস্ত্র ইত্যাদি, এবং ওদিক থেকে আসত অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে অতিশয় মূল্যবান মাদক বস্তু—যার নাম চরস। চরস অতিশয় উগ্র মাদক পদার্থ—এটি নরম, এবং ভস্মবর্ণ। সামান্য চরসের ধূমপান মস্তিষ্ককে বিকল করার পক্ষে যথেষ্ট। গঞ্জিকা অপেক্ষা চরস অধিকতর শক্তিশালী। সিনকিয়াং বা চীন তুর্কিস্তানে এক শ্রেণীর বাউণ্ডুলে ঘুরে বেড়ায়, যাদেরকে বলা হয়, চরসের পাগল! 'তাজিক পামীরের' কবি ওমর খৈয়াম চরস সেবন করতেন কিনা জানি না, কিন্তু এই নেশা কবি-কল্পনাকে সর্বাপেক্ষা অবাস্তব স্বপ্নলোকে পৌঁছিয়ে দেয় এবং অধ্যাত্ম ভাবনাকে নাকি চৈতন্যবিন্দুর আকারে আকাশস্বর্গস্পর্শী করে তোলে! সেদিন পর্যন্ত এই চরস প্রচুর পরিমাণে ভারতে আমদানি হত, এবং ভারতের বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা এই বস্তুটি সুনিয়মিতভাবে সেবন করতেন। চরস ছাড়া ইয়ারকন্দ থেকে আসত জমাট পশমের নাম্‌দা এবং আরও দু' একটি সামগ্রী। চরস বন্ধ হবার ফলে ইদানীং নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যা কিছু কমেছে!

আমরা 'ফতুলা' গিরিসঙ্কট (১৩,৪০০) অতিক্রম করে যাচ্ছিলুম। নীচের দিকে বহু দূরে মানব বসতির ছোট ছোট চিহ্নের সঙ্গে কিছু কিছু গাছপালার ইশারা দেখতে পাচ্ছিলুম। শীর্ণ দু'একটি গিরিনদী তাদের আশেপাশে বয়ে চলেছে। কিন্তু নীচের থেকে চোখ তুলে উপর দিকে সুদূর দিগন্তে যখন দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে, তখন দেখছি বিশ্বের দিকে আরেক মায়াচ্ছন্ন লোক,—সেটি পার্বত্য প্রকৃতির একটি বহুবর্ণাঢ্য চিত্রপট —যেখানে নীলাভ, হরিৎ, রক্তিম, পীত, কৃষ্ণ এবং গৌররক্তিম পর্বতরাজি পথচারীর দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করছে। একই দিগ্বলয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি চূড়া কেমন করে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, সেটি ভূ-তত্ত্ব বা প্রাকৃত-তত্ত্বের মূল রহস্য। কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে

সৃষ্টির আদি রহস্যের সঙ্গে যে বিস্ময়-বিমূঢ়তা—আমি যেন সেটির প্রথম স্পর্শ পাচ্ছি আমার দুই অবাক চোখে। আমার অজ্ঞান আত্মাভিমান এতক্ষণ ধূলিবালুর ঝাপটা সরিয়ে এবং সর্বব্যাপী অনুর্বরতাকে ছাড়িয়ে দেখতে পায় নি, এখানেও সেই একই আদিম প্রকৃতি বিভিন্নরূপিণী। ভাবতে ভুলে গিয়েছিলুম, "স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা।" হিমালয় অতিক্রম করে লাদাখের মধ্যে প্রবেশকালে মহাকবির কণ্ঠ এতক্ষণ কানে বাজে নি যে, "অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।"

অত্যন্ত শীতল সেই অপরাহ্ণ। তারই উপরে এল সহসা কঠিন এক ঠাণ্ডা প্রবাহ। কিছু ভাববার সময় দিল না, এবং পরমুহূর্তে বিনা মেঘে বিনা বর্ষণে উপরের ধূসর শূন্যলোক থেকে প্রবলবেগে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেল। ততক্ষণে ফতুলা ছাড়িয়ে বহু দূর চলে গেছি পাহাড়ের পর পাহাড় এবং গিরিখাদ পেরিয়ে দূরান্তরের 'নিচি সঙ্কটের' দিকে (১২০০০)। দেখতে দেখতে সেই ক্ষণমর্জি ঘন তুষার বর্ষণ কখন যেন থেমে গেল, এবং মলিন রক্তিম রৌদ্র আবার পাহাড়ে আভাসিত হল। বিগত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায় আজও সেটি অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী ৯০ বছরের মধ্যে একটি নূতন ঘর ওঠে নি, মড়ক-ব্যাধি-মহামারী দেখা দেয় নি, এবং একটি দানাও অধিক ফসল ফলে নি। কিন্তু এই 'গতিহীন' ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক চেহারার মধ্যেও :

"Every object is awe-inspiring. Indus gorges, the wall formations of cliffs, speak of a strange and unknown world. Then on and on, yet again to unknown, through n. thing, passing along by huge mountains, and roads, rough and extremely dusty . . . then" . . . "a depression in soft shaly rock between mountains of lime stones. Then down we come to a stream, then turn right and we follow the stream upwaids . . . then go to barren and barren, no birds, no greens, no habitations,—go to the east . . . the ground is smooth, waste on all sides, rocky limestone hills, then a slope 2000 feet down, and then at last we come to Lamayuru—the Buddhist centre of culture." (Frederic Drew—1875).

'লামউরু' নামক সুপ্রাচীন বৌদ্ধমঠের কথা বহুকাল আগে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একখানি বইতে পড়েছিলুম। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি অশ্বারোহণে লাদাখ ভ্রমণ করেন এবং সুদূর 'হেমিস গুম্ফায়' উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি তৎকালে

রাষ্ট্রসীমানা সম্বন্ধে অতটা সচেতন ছিলেন না, সেই কারণে তাঁর গ্রন্থখানি একটি ভ্রান্ত শিরোনামাসহ প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর বইটি একদা আমাকে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বইখানি তাঁর সহচরের দ্বারা অনুলিখিত ও সম্পাদিত হয়েছিল।

লামাউরুর প্রবেশপথে পাকা গাঁথুনির যে তোরণদ্বার নির্মিত রয়েছে সেটি অতি বৃহৎ। এই প্রকার পাকা তোরণ কয়েকটি বৌদ্ধ জনপদ ও গুম্ফায় দেখে এসেছি। এগুলির নাম 'কাগানি।' লামাউরুর এই সুবৃহৎ কাগানি অতি প্রসিদ্ধ। এর তলা দিয়ে আনাগোনা করতে হয়। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও মূর্তিও খোদিত থাকে।

দুটি দুরারোহ পর্বত শীর্ষের (cliff) মাঝখানে ছায়াচ্ছন্ন যে খদ বা নালী-পথ—তারই উপর 'লামাউরু গুম্ফা' দণ্ডায়মান। একটি সম্পূর্ণ গুম্ফার অর্থ একটি সম্পূর্ণ জনবসতি! তারই মধ্যে তার সমাজ, প্রশাসনব্যবস্থা, তার প্রাণযাত্রার বিবিধ উপকরণ, তার মন্দিরাদি এবং তার জন্ম মৃত্যুর সীমানা। কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্ভবত এই বিশাল পর্বতে যে ফাটল ধরে এবং নীচের দিকে যে জলধারা আপন পথ কেটে চলে যায়, সেই ছায়াময় ফাটলের মধ্যে এই 'লামাউরু' প্রতিষ্ঠিত। এই সুবৃহৎ গুম্ফানগর গভীর নীচেকার খদের থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে উপর দিকে—যেদিকে আকাশ, আলো আর হাওয়া। এই বিস্তৃত ফাটলের দুই দিকে দুই পর্বতচূড়া এই গুম্ফাকে মধ্যএশিয়ার ধূলির ঝাপট এবং মেরু-বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এর প্রবেশপথ এমন একটি জটিল জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত যে, বহিঃশত্রুরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলেও তারা এর ভিতরকার বৃহৎ গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে সমূহ বিপদে পড়তে পারে। এই গুম্ফারাজ্যের সম্মুখ-দৃশ্যের মধ্যে এমন একটি বৃহদাকার মহিমা, এবং এমন একটি রহস্যাচ্ছন্ন বিস্ময় ও অনৈসর্গিক বস্তু কল্পনা জড়িয়ে রয়েছে যে, পর্যটকের সমগ্র সত্তাকে কিছুকালের জন্য যেন অভিভূত, বিমূঢ় এবং মন্ত্রস্তব্ধ করে রাখে। এটির দিকে অগ্রসর হবার আগে নিজেকে অনেকটাই যেন চলৎশক্তিহীন মনে হয়। আমার চোখ ফেরে না, মন সরে না, পা চলে না। এই সাম্প্রতের ছায়া যেন মিলিয়ে যায় চারিদিকের ধূসর মধ্যএশিয়ার অপরাহ্নে! ধীরে ধীরে আমার নিগূঢ় উপলব্ধির রহস্যরন্ধ্রপথ দিয়ে নেমে যায় কী যেন একটা অতিবৃদ্ধ বনস্পতির মূল শিকড়ের মতো অতল গূঢ় অন্ধকার নীচের দিকে,—যেখানে লামাউরুর গোপন গুহালোকে সেই ত্রিকালজয়ী মহাস্থবিরের দুই উজ্জ্বল মণিরত্নচক্ষু জল জল করছে নিত্যকালের করুণায় এবং অসীম ক্ষমায়। সেই ঘনকৃষ্ণ প্রস্তরাকীর্ণ গুপ্ত গুহার মধ্যে বন্য পাথরের এক নিগূঢ় প্রাচীন গন্ধের শ্বাসরোধী অন্ধকারে হাতড়িয়ে পাওয়া যায় বহু শতাব্দী আগেকার ময়লা

সোনার বিচিত্র অলঙ্কার, বিবর্ণ মণিরত্নমালা, স্ফটিক-প্রবাল-নীলা-চুনি-পান্না-গোমেদের জড়োয়া, প্রাচীন রক্তিম চীনাংশুকের জরাজীর্ণ অবশেষ, হাজার-দু' হাজার বছর আগেকার পুরনো আখরোট কাঠের জলপাত্র আর দস্যুরাক্ষস মেলানো মহাপদ্মসম্ভবের সুপ্রাচীন বহুবর্ণাঢ্য অস্পষ্ট পট—চর্বির প্রদীপ ধরে যেগুলি খুঁটিয়ে দেখতে গেলে বোধিসত্ত্বের স্ফটিক-চক্ষুর উজ্জ্বল চাহনি সর্বশরীরকে কণ্টকাকীর্ণ করে। তখন এই রুদ্ধশ্বাস রন্ধ্ররহস্য আপন সম্মোহনী শক্তির দ্বারা নিঃশব্দে যে-তাড়না করে,—তার ছমছমে ছায়া যেন পর্যটকের পিছু পিছু বাইরে আসে, এবং অতঃপর সেইটি যেন বহুধাবিভক্ত প্রেতচ্ছায়াদলের মতো এই মারীচপ্রান্তরে ধূলি ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে অট্টহাসির ভৌতিক রঙ্গে মেতে ওঠে।

লামাউরুর মন্দিরের চূড়া পর্বতশীর্ষ স্পর্শ করে রয়েছে। কিন্তু এর গাম্ভীর্যমহিমা যেন মহাকালের সকল শাসনকে উপেক্ষা করে আপন গৌরবে দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল, বৌদ্ধপতাকা ও বৃহদাকার এক মণিচক্র সুশোভিত। এই মন্দির বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের পীঠস্থান, এবং এখানে দণ্ডায়মান বৌদ্ধ মূর্তি, বিশালাকার বজ্রতারা ও অবলোকিতেশ্বর অতি প্রসিদ্ধ। দুই শতাধিক বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী এখানে নিত্য 'আত্মনিগ্রহশীল!' তাঁরা ২৫০টি বৌদ্ধ বিধি পালন করে থাকেন নিত্য নিয়মিত এবং জনচক্ষুর অন্তরালে একপ্রকার নির্জন 'কারাবাসে' জীবন যাপন করেন। এই প্রকার অবস্থায় তাঁদের ১২ বছর এবং ১২ দিন অতিবাহিত না হ'লে 'লাসা' থেকে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমোদন পাওয়া যায় না। 'লাসার' অনুমোদন পাওয়া গেলে তবেই তাঁকে 'কুশক' বা জগৎগুরুর পদবী দেওয়া হয়। তখন তিনি বহু মূল্যবান পোশাক, নানাবিধ অলঙ্কার এবং স্বর্ণমণ্ডিত শিরোভূষণ লাভ করে গুরুপদবাচ্য হন। লামাউরু মঠে বহু পুঁথি সুপ্রাচীন কাল থেকে সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন মঠ প্রাচীন পুঁথির জন্যই প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যেক গুম্ফা বা মঠ বড়ই হোক বা ছোটই হোক—আপন আপন গ্রন্থাগারকে সযত্নে রক্ষা করে। এগুলি সমস্তই তিব্বতী ভাষায় লেখা, যার প্রথম বর্ণমালা,—বাঙ্গলা অক্ষরের সঙ্গে যার প্রচুর মিল আছে,—ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কথিত আছে ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা গাম্‌পো দুই নেপালী ও চীনা স্ত্রীর অনুরোধে তাঁর প্রধানমন্ত্রী 'থুমি সম্বুদ্ধকে' ভারতে পাঠান, এবং সম্বুদ্ধ ভারতে এসে এক বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীঘোষের নিকট একটি বিশেষ বর্ণমালা শিক্ষা করেন ও সেই বর্ণমালা অনুসরণ করেই বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়ে তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। লাদাখের লক্ষ লক্ষ পাথরের টুকরোয় সেই লিপি খোদিত করে রেখেছে লাদাখের বৌদ্ধবংশপরম্পরা। অপর একটি সংবাদে বলা হয়েছে, পূর্বোক্ত শতাব্দীতে সম্বুদ্ধ কাশ্মীর থেকে নিয়ে যান দেবনাগরী বর্ণমালা এবং তিনি দুটি বর্ণমালাই তিব্বতে

প্রবর্তিত করেন। 'কাশ্মীরিয়' এই বর্ণমালা লাদাখে এবং তিব্বতে অদ্যাবধি অপরিবর্তিত-রূপেই বর্তমান।

লামাউরুর মঠে ও মন্দিরে বহু মূর্তির পূজা করা হয়। পূজার মন্ত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটে নি, বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যাও বদলায় নি, এবং নূতনের গতিশীলতাকে কেউ স্বীকারও করে নি। সেই কারণে পাঁচশ' বছর আগে লামাউরুর যে চেহারা ছিল—যে-নীতি, বিধান, প্রশাসন, নির্দেশ ও নিগ্রহরীতি ছিল—আজও তাই অব্যাহত রয়েছে। সমস্তটা স্থাণু, অচঞ্চল, স্থবির,—মহাকাল এখানে গতিরুদ্ধ। রাজনীতির ঝঞ্ঝা এখানে পৌঁছয় না, বিজ্ঞানতত্ত্ব এ অঞ্চল স্পর্শ করে না, আধুনিক শিক্ষার সংবাদও কেউ রাখে না। শুধু যুগযুগান্ত ধরে অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে চর্বিপ্রদীপের সামনে রয়েছে শাক্যস্থবির, পদ্মসম্ভব, তারা, আর বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্তি। অন্ধকারে ময়লা জরির আর জীর্ণ রেশমের বিবিধ সজ্জা ওই মলিন আলোয় পিতল ও সোনামূর্তির সঙ্গে ঝিকমিক করছে জন্মজন্মান্তরে। চারিদিকে অগণিত সংখ্যক স্বর্গ, নরক, দৈত্য, পিশাচ ও ত্রিপিটকের বর্ণিত বুদ্ধের বিভিন্ন দশার রঙ্গীন পট ঝোলানো। সমস্ত লামাউরুই ধর্মকেন্দ্রিক, কিন্তু জীবনকেন্দ্রিক নয়। জীবনের যে দাবি আছে, গতি আছে, ব্যঞ্জনা আছে, সংগ্রাম ও সংস্কৃতি আছে, বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে জীবনের যে প্রত্যক্ষ যোগ আছে, আজ নবজীবনের ডাক সমস্ত সভ্যতাকে যে নাড়া দিচ্ছে,—কোনও বৌদ্ধ মঠ বা গুম্ফায়, বৌদ্ধ দর্শনে বা অনুষ্ঠানে, বৌদ্ধ জীবনে বা আচরণে, বৌদ্ধ চিন্তায় বা পরিকল্পনায়—সেটি কোথাও স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়। হিন্দু সংস্কৃতি যেমন নব নব তরঙ্গাঘাতে সঞ্জীবিত হয়েছে, যেমন তার সমাজ ও জীবন-চেতনা বদলিয়েছে, যেমন সে তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একের পর এক মহাপুরুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছে আপন অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতে, বৌদ্ধ দর্শন সেই গতিশীল জীবন সাধনায় বসে নি কোনওদিন। ইসলাম, খৃষ্টান, হিন্দু—প্রত্যেকটি সংস্কৃতির প্রভাবকে এড়াবার জন্য সে দেওয়ালের পর দেওয়াল তুলেছে নিজের চারিদিকে। বাইরের আলো হাওয়া, স্বর-স্বর-শ্লোগান, সঙ্গীত, ধ্বনি, শিল্প, সাহিত্য, চারু ও ললিতকলা,—সমস্তকে সে অবরোধ করেছে নিজকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। সে মন্ত্রকে স্বীকার করে, কিন্তু মানুষকে স্বীকার করে না! মন্ত্রপাঠ করতে করতে সে তন্দ্রায় ঢুলছে শুধু কোনও এককালে নির্বাণলাভের আশায়! সে ঢুকতে চায় কেবল অন্ধকারে, গোপনে, গুহায়, পর্বত গহ্বরে, অজানা মরুলোকে,—যেদিকে জীবনের প্রবাহ পৌঁছয় না! তার ধারণা, সমগ্র পৃথিবী প্রেত-পিশাচ-দৈত্য-রাক্ষস ও নরককুণ্ডে ভরা,—এবং সে নিজে পৃথিবীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সেই নারকীয় পিশাচের দলকে অহরহ বিতাড়িত করার চেষ্টা পাচ্ছে ছেঁড়া ন্যাকড়া ও পতাকা উড়িয়ে!

এই স্থবিরতা এবং গতিহীনতা যে একটি বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি করে, এবং এই বায়ু-শূন্যতা যে ডেকে আনে ঝড়, বজ্রপাত এবং প্রলয় সঙ্কেত, সেটি আগে অনুমান করে নি এই লামাধর্ম। আজ অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে তার দুর্ভাগ্য, সেই কারণে তার প্রায়শ্চিত্তের যুগ শুরু হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, খদের তলদেশে শস্যের খামার এবং গুম্ফার উপরভাগ দিয়ে সে অংশ ঢাকা। তারও নীচে যে গিরিনদী বয়ে চলেছে, সেটির উৎসের নাম 'ওয়ান্‌লা'। এই গিরিনদী উপর থেকে ঘুরে আসছে নীচের দিকে, কিন্তু এই প্রণালী-পথের দুই পারে পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠেছে এই গুম্ফাগ্রাম, এর দৃশ্যটি অভিনব। এ যেন নদী ও খামারের দুই পার ধরে উপর দিকে ছাদ বানানো এবং এই ছাদের দুই পাশ দিয়ে দুই বৃহৎ পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে উঠেছে। এই বিশাল গুম্ফায় বাস করে বহু শত লামা, কিন্তু বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। 'উরু' শব্দটি 'গুরু'-র অপভ্রংশ শুনলুম, এবং এটি একপ্রকার বৌদ্ধ গুরুকুল। এখান থেকে যারা সকল বিদ্যা ও তপশ্চারণে সিদ্ধ হয় তারা বোধ করি 'লাসায়' গিয়ে দীক্ষিত হয়ে আসে। 'লামাগুরু' তখন বোধিসত্ত্বের প্রতীক। এখানকার আনুষ্ঠানিক কঠোরতা সর্ববিদিত, এবং অধ্যাত্মজীবনে যত বেশি কঠোর আত্মনিগ্রহ ততই নাকি তার মাহাত্ম্য! জীবনধারণের মূল অর্থই অধ্যাত্ম-ভাবনা ও দর্শনচর্চা। বিদ্যা মানেই অধ্যাত্ম বিদ্যা, অন্য বিদ্যা স্বীকৃত নয়। অন্য জ্ঞান, ভিন্ন বিদ্যা, বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কার, প্রাকৃত তত্ত্ব, বিশ্ববৈচিত্র্য, সভ্যতার নিত্য পরিবর্তন, রাজনীতির রূপান্তর, নব নব সংস্কৃতির জয়যাত্রা,—এগুলি আগাগোড়া অর্থশূন্য। এই খণ্ড ক্ষুদ্র পৃথিবী চারিদিক থেকে পার্বত্য প্রাকার বেষ্টিত,—আর তার অবরোধের মধ্যে যুগযুগান্ত ধরে বসে লামারা যোগতন্দ্রায় ঢুলছে, জপ করছে 'মণিচক্র' ঘুরিয়ে লক্ষ লক্ষ বার, পাথরের শতসহস্র টুকরোয় শুধু খোদাই করে চলেছে বৌদ্ধ মন্ত্র,—আর তাদের চোখের সামনে রয়েছে প্রদীপের অকম্প শিখা, হৃদয়ে রয়েছে অকম্প একমাত্র ভাবনা, এবং সামনে রয়েছে দিব্য দীপ্ত অবলোকিতেশ্বরের অপার করুণার অকম্প চাহনি।

লামাউরু গুম্ফা সমগ্র বৌদ্ধ জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সন্দেহ নেই, সমস্ত লাদাখ আগাগোড়া বৌদ্ধ। বৌদ্ধ যারা নয় তারাও মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। জীবনযাত্রা, পোশাক, আহার্য, ভাষা,—সমস্ত একাকার। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা কম, মেয়ে তাই এখানে বহুভর্তৃকা। মেয়ের বড় যত্ন এদেশে। একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটলে বহুজনের জীবন ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। এমন ঘটনা বিচিত্র নয়, যেখানে পাঁচ বছরের একটি পুরুষশিশু তার বড় ভাইয়ের পঁচিশ বছর বয়সের স্ত্রীকে নিজের 'স্ত্রী' বলে ভাবতে শেখে। একই স্ত্রীকে নিয়ে বহু পুরুষের সংসার

যাত্রায় বিরোধ নেই। এই প্রথাই যোগাচ্ছে সেখানে ভাবনার অভ্যাস, আবাল্যের শিক্ষা, চিরাচরিত সংস্কার, বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য,—এদের থেকে মনের বিশেষ গঠন ঘটেছে। মেয়ের পক্ষেও তাই। সঙ্কোচ নিয়ে সে বড় হচ্ছে না, সহজাত সংস্কারবশত বহুর মধ্যেই দেখছে একককে,—সেখানে তার মন উৎপীড়িত বোধ করছে না। একদিকে নিজের উপর বহুর অধিকারকে সে স্বীকার করে নিচ্ছে, এবং বহুর উপর নিজের অধিকারকে সে প্রসারিত করে রাখছে। সুতরাং মেয়ে সেখানে নিতান্ত ক্রীতদাসী নয়, সেখানে সে কর্ত্রীর গৌরবে সমাসীন। প্রকৃতির আদি নিয়ম অনুসারে বহুভর্তৃক নারী সন্তান ধারণ করে কম সংখ্যক, সেই কারণে স্বল্প পরিমাণ ভুট্টার ক্ষেতগুলির ফসল নিয়ে কাড়াকাড়িও হয় কম, এবং ক্ষেতগুলিও বহুধা বিভক্ত হয়ে দরিদ্র দেশকে দরিদ্রতর করে তোলে না।

কিন্তু লাদাখের যে-অংশটার নাম উত্তর বালতিস্তান—সেখানে বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত হবার পর পুরুষরা বহুবিবাহের প্রথা বেছে নিল। সেখানে মেয়ের সংখ্যা কম নয়, কেননা ভূপ্রকৃতির দাক্ষিণ্য সে-অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উদার। অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্ভবত সেই দেশেই বেশি জন্মায়, যে-দেশ শস্যশ্যামলা এবং মলয়জশীতলা! উত্তর বালতিস্তানে মেয়ে বেশি, সন্তানজন্ম বেশি, সেই কারণে জমির ভাগাভাগি প্রচুর। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা যেমন উচ্ছেদ করেছিলেন, তেমনি তিনি যদি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন ক'রে যেতেন, তাহলে আজকের অনেক রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।

পাহাড়ে প্রান্তরে সন্ধ্যার ছায়া ছমছমিয়ে নেমে এল। এ অন্ধকার অন্যপ্রকার। অরণ্য পর্বত সমাকীর্ণ কুমায়ুনের অন্ধ আকৃতি দেখেছি, ভুটানের দক্ষিণে রায়ডাক বা দমনপুরের উত্তর অরণ্যের অন্ধকারে ঘুরে মরেছি,—কিন্তু এর আকৃতি অন্যরূপ। এ যেন দেখা যায় সব, কিন্তু সমস্তটা অস্পষ্ট। চারিদিকের অনুর্বর নগ্নকায় যে সব ধূসর ও নিষ্প্রাণ পাহাড় দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়েছে দুই চোখ, সেইসব নিদ্রিত নিশ্চেতন পাহাড় পিছনের ধূসর ও অস্পষ্ট পটভূমির উপরে যেন ধীরে ধীরে বেঁচে ওঠে, যেন দানব দলের চক্রান্ত ফিসফাস ক'রে পরস্পর কথা বলতে থাকে। স্পষ্ট কিছু চোখে পড়ছে না, কিন্তু যেন সবটাই বুঝতে পারছি! পথের নীচের দিকে নদী বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে বৌদ্ধবসতি পাওয়া যায়, কিন্তু তারা মিলিয়ে থাকে নদীর তলার দিকে, দিনের বেলায় মধ্যে মাঝে তাদের চোখে পড়ে।

জাস্কার গিরিশ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। উপরে তারকাখচিত পরিচ্ছন্ন

আকাশ। নীচে মহাসিন্ধুনদের পার্বত্য উপত্যকা। এ অঞ্চল লাদাখের হৃৎকেন্দ্রলোক। দক্ষিণ থেকে এসেছে প্রশস্ত এক পার্বত্য নদী,—সেই নদী মিলিত হয়েছে মহাসিন্ধুনদের জঠরে। অন্ধকারে আমরা সিন্ধুর সাঁকো পার হয়ে এলুম। অতঃপর দেখতে দেখতে যেন ভৌগোলিক চেহারা কতক্ষণের জন্য বদলিয়ে গেল। জীপ-গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিত পরম রমণীয় দৃশ্য। অর্থাৎ বন, বাগান, গাছপালা, পুষ্পলতা সমারোহ এবং জনবসতি। সামনে এ-পাহাড় যেন সে-পাহাড় নয়। এ যেন সেই আমাদের কবেকার বিস্মৃত হিমালয়ের সঙ্গচ্যুত এক বন্ধু অন্ধকারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল! বাঁ দিকে মস্ত এক তোরণ,—অনেকটা যেন বাগান বাড়ির ফটক। ক্রমশ দেখতে পাওয়া গেল, আলো জ্বলছে এখানে ওখানে, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জনসমাগমের আভাস দেখছি। যানবাহনের চলাচলও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা সভ্যসমাজের কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম বটে, কিন্তু বলাই বাহুল্য. আমাদের চেহারা এবং পরিচ্ছদ ভদ্রসমাজের সামনে অযোগ্য। আপাদমস্তক ধুলোয় সাদা, অতিশয় রুক্ষ তুহিন হাওয়ায় মুখখানা পুড়ে খোসা উঠেছে, হাতের আঙুলের মাংসগুলি শুকিয়ে প্রায় হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অপরিসীম ক্লান্তির সঙ্গে তন্দ্রা ঘিরে রয়েছে আমাদের। কিন্তু সে তন্দ্রাই, নিদ্রা নয়। আমরা সমতলের লোক, উচ্চবাসে অনভ্যস্ত। উপত্যকা কাশ্মীরে ঘুম বরং আসে—কারণ তার উচ্চতা ৫,২০০ ফুট মাত্র, কিন্তু পশ্চিম লাদাখ ১১ থেকে ১৪ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি—সুতরাং নিদ্রা এখানে অতিশয় তরল। এর উপর আমরা তিনদিন ধরে জীপগাড়িতে আছি। অতঃপর ক্ষুৎপিপাসার কথা তোলাটা অভব্যতা। শুধু আমার প্রাচীন অভ্যাসবশত প্রত্যেকটি নদী এবং ঝরণার জল পান ক'রে যাচ্ছিলুম।

অন্ধকারেই আবার আমরা অগ্রসর হয়ে চললুম। প্রশ্ন করব না, কোথায় আমাদের রাত্রিবাস। সমস্ত রাত ধরে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তবুও কৌতূহল প্রকাশ করব না। শুধু শুনতে পেলুম, যে-জনপদটিতে আমরা এসে একটু আগে পৌঁছলুম, এটি অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভূমি। এর নাম 'খালাৎসে।' সাধারণ লোক বলে, 'খাল্‌সি বা কাল্‌সি।'

কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে গেল বন-বাগানের সেই কোমলতা। এল আবার বালুপাথর পাহাড়ের রুক্ষপথ। পথ এবার নামল পাহাড়ী দেওয়ালের পাশ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে নীচের দিকে—অনেক নীচে—যেন তলিয়ে যাচ্ছি রসাতলে! দৈবদুর্বিপাক যদি ঘটে এই অন্ধ পর্বতের গোলকধাঁধায়,—যেমন এদিকে ঘটছে যখন তখন,—তবে মহাসিন্ধুর গ্রাসে হয়ত নিশ্চিত মৃত্যু!

এঁকে বেঁকে আবার উঠলুম পাহাড়ের উপরতলায়। ক্রমশ দেখতে পেলুম সামনে

বিশাল প্রসারিত ধূ ধূ এক প্রান্তর। আকাশের তারকাদল যেন নেমে এসেছে সেই শূন্য প্রান্তরে। কিন্তু ঠাণ্ডায় সমস্তটা যেন অসাড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। দূরদূরান্তরে আলো দেখা যাচ্ছিল। আমাদের জীপ সেই সমতল প্রান্তরের বালুপাথর মাড়িয়ে এবং ধুলো উড়িয়ে যে স্থলে এসে এক সময় দাঁড়াল, সেটাকে বলতে পারা যায় এক তাঁবুর সম্মুখ-ভাগের মস্ত প্রাঙ্গণ। ভৌতিক আঁধারে সেই প্রাঙ্গণ থমথম করছিল।

যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা পোশাকপরা সামরিক বিভাগের লোক। তাঁদের সেই সতেজ প্রফুল্লতা এবং বলিষ্ঠ উদ্দীপনা মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই জানিয়ে দিল, এই উষর ধূসর মরুপাথরের অন্ধকার প্রান্তরের আধুনিক আতিথেয়তার সর্বপ্রকার উপকরণ হাতের কাছেই প্রস্তুত। তাঁদের পোশাকের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-সুন্দরটিকে পাওয়া গেল, সেটি ভারতীয় আতিথেয়তার প্রতীক। সেটি সহজলভ্য নয়।

কিন্তু এঁদের সঙ্গেই আশে-পাশে ঘুরছিলেন একজন অতি অমায়িক তরুণ যুবা। তিনি এক ফাঁকে এগিয়ে এসে হঠাৎ যে-ভাষায় মিষ্টকণ্ঠে সম্ভাষণ করলেন, সেই ভাষাটি যেন ভুলতে বসেছিলুম কিছুদিন থেকে! সেটি বঙ্গভাষা! তিনি বললেন, আমি আগে থেকে ওঁদের বলে রেখেছি, আপনি এসে আমার ক্যাম্পে থাকবেন! আপনার হয়ত অসুবিধা হবে—

আমার মন চিরকাল সর্বভারতীয়। কিন্তু এই বাঙ্গালী যুবককে দেখা মাত্রই বুকের ছাতি ফুলে উঠল! কাছে ডেকে নিয়ে সানন্দে প্রশ্ন করলুম, নাম কি?

লেফটেনাণ্ট ডক্টর দাস। আমি সম্প্রতি এখানে এসেছি।—

॥ ৯ ॥

খালাৎসে-সাসপোল-রূপশু

জাস্কার গিরিশ্রেণী মহাসিন্ধুনদের পশ্চিম পার অবধি এসে গতকাল রাত্রে আমাদের কাছে বিদায় নিয়েছে। আমরা সেই নদ পেরিয়ে লাদাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার প্রধান জনপদ 'খালাৎসে' বা 'খালসি'র এক প্রান্তরে রাত্রিযাপন করেছি। নদের পশ্চিম পার জাস্কার, আমরা এখন পূর্বপারে। আমাদের পথ এখনও বহুদূর বাকি। পশ্চিমে মাইল-দেড়েক দূরে সিন্ধু তীরবর্তী গাছপালা এবং বৌদ্ধগ্রাম চোখে পড়ছে। আমরা এবার প্রকৃত সিন্ধু উপত্যকায় বিচরণ করছি। প্রান্তরের তিন দিকে বৃহৎ লাদাখ গিরিশৃঙ্গ দল আপন আপন নিটোল, মসৃণ এবং যেন হাত-দিয়ে-লেপা মোলায়েম আকারগুলি নিয়ে দণ্ডায়মান। সমস্ত পাহাড় বালি-পাথর-চুণা-মাটিতে গঠিত। কিন্তু সে-পাথরের একটি টুকরোও গ্রানিট্ বা গ্রানাইট্ নয়। প্রকৃতির কোন্ রহস্য এ ধরনের সজ্জা এই ভূভাগের পাহাড়ে-পাহাড়ে এনে দিল বুঝিনে। হিমালয় পার হয়ে এলে সমস্তটাই অচেনা এবং অনেকটাই যেন অবাস্তব! আমি এখানে যেন আগাগোড়া বেমানান—নিজকে নিজের কাছে এমন অপরিচিত আর কোথাও মনে হয়নি। আমি যেন খাপছাড়া, প্রক্ষিপ্ত, উল্কার মতো ছিটকে এসে পড়েছি ভিন্ন গ্রহে। এ পৃথিবী আমার নয়।

প্রভাতের প্রচণ্ড শীতের পর খররৌদ্র তপ্ত হয়ে উঠল ধুলোয়-ধুলোয়। আমাদের গাড়ি প্রান্তর পেরিয়ে একটা রুক্ষ পাথুরে পথে গতরাত্রির সেই শঙ্কাজনক পার্বত্য খাদের জটিলতা পেরিয়ে খালাৎসে গ্রামের বৃক্ষলতার ছায়ায় আরেকবার এসে পৌঁছল। আশেপাশে দু-তিনটি দোকান—এবং আশ্চর্য, মুদি, মনোহারি, মসলাপাতি ও কাপড়-চোপড়ের দোকান। কিছু ফল, কিছু সব্‌জি কিছু বা আমিষ! পথের পাশেই পাহাড় চড়াই—সেখান দিয়ে উঠে ঘুরে যেতে হয় বৌদ্ধগ্রামে। এই গ্রামের গুম্ফার শ্বেত চূড়াটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে ছোট্ট গ্রামের অলি-গলির শীর্ণ-সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালুম এক মন্দিরের চত্বরে। সম্পদের মধ্যে কেবল গাছপালা, যব ও ভুট্টার মৃন্ময় ক্ষেতখামার, পাহাড়ের দু-একটি ঝরণা, কয়েকঘর লাদাখী গৃহস্থ। মন্দিরের সংলগ্ন একটি পাঠশালা – সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মাতৃভাষা লাদাখীর সঙ্গে শিখছে হিন্দী। এসব ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্ট এ অঞ্চলে অর্থ ব্যয়

হয়ে থাকেন! বইপত্রাদি ছাপা হয়ে আসে বাইরের থেকে। এ গ্রামে ডাকঘর এবং একটি মিশনারি কেন্দ্র বর্তমান। বিগত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন জার্মান মোরাভিয়া থেকে ফাদার হাইড নামক এক পাদরি সিনকিয়াং যাবার চেষ্টায় লাদাখে আসেন, কিন্তু কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা (সম্ভব) প্রতাপ সিং তাকে সিনকিয়াং যেতে না দেওয়ায় তিনি লাদাখেই একাধিক খৃষ্টীয় মিশন স্থাপন করেন। মোরাভিয়ান্ রিপাবলিক এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত।

চারিদিকের দুঃস্থ ঘরকন্নার মাঝখানে একটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন এক লামার বাসস্থানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। এ'টি গুম্ফা। ভিতরে কয়েকটি মূর্তি। আগগোড়া সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই সুপ্রাচীন কাল যেন কবে এসে পৌঁছেছিল মধ্যযুগে, তারপর আর এগোয়নি। আশেপাশে দেখা যাচ্ছে পাথরের প্রাকার, কবেকার যেন কোন্ রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ। এখানে নাকি তাঁর প্রাসাদও ছিল ৮০০ বছর আগে। অতঃপর সেই মধ্যযুগে যুদ্ধ বাধিয়ে তুলল নাকি একদল মঙ্গোলীয় এই পথ দিয়েই এসে—এবং এ রাজার রাজত্ব ভেঙেচুরে গেল সব। এই গুম্ফা নাকি তারও অনেক আগেকার। হিসাবে পাই, এক হাজার বছর হ'তে চলল।

হাজার বছর মাত্র? থমকিয়ে গেলুম। এ যেন অনেক কম! চারিদিকে চেয়ে দেখছি, সর্বত্র যেন ছড়িয়ে রয়েছে হাজার-হাজার বছর! একটি পাথর নড়েনি, একটি নতুন ঘর ওঠেনি, একটি অভ্যাসও বদলায়নি, একটি মানুষও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি! মরুপর্বতচারী কোনও পশু যদি কোথাও মরে, তার শবদেহ শুকোয় ধীরে ধীরে—না আসে শবভক্ষী অন্য কোনও জন্তু, না আসে কোনও পক্ষী! একটি একটি করে লামারা যখন মরে তখন তাদের শবদেহ শুকোয়—পচে না। ধীরে ধীরে খোলা ঠাণ্ডায়, শুকনো হাওয়ায়, খর রৌদ্রে শুকোয়। অবশেষে একদিন সেই বিশুষ্ক নীরস রুক্ষ কঙ্কালটিকে ভেঙে যে-পাথরের সমাধিটি হয়, সেটির নাম 'চোর্তেন'। শত-শত লক্ষ-লক্ষ 'চোর্তেন' লাদাখের সর্বত্র। হয়ত 'পিতার' মৃত্যু এই আমলে ঘটল, 'সন্তানের' আমলে সেটি শুকলো, নাতির আমলে সেটি ঢুকল পাথরের তলায়। একই ধুলো হাজার-বছর ধ'রে ঘুরছে অল্প পরিসরের মধ্যে—এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। মন্দিরের মূর্তির একই সেই রেশমি পোশাক, একই পাথরের বা কাঠের বাটি, একই ঝুলনো চিত্রপট, একই সোনা-রূপোর ছাতাপড়া অলঙ্কার—এদের পরিবর্তন ঘটেনি হাজার বছরে। একটা সর্বব্যাপী গতিহীন নিশ্চলতা লাদাখকে অসাড় ক'রে রেখেছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলুম চত্বরের উপর। গুম্ফার লামা বেরিয়ে এলেন একটি ছাঁচমূর্তি নিয়ে। ভিতরে যে-মূর্তিগুলি রয়েছে, এটি তাদেরই একটি ছাঁচ। সন্দেহ নেই, এটি শিল্পকৃতিত্ব। এটির উপকরণ হ'ল চাউল, যব এবং ভুট্টার চূর্ণ, একপ্রকার

বন্যলতার রস, ঈষৎ মেটে রং, এবং একটি মন্ত্র। সব মিলিয়ে ছাঁচটি তৈরি।

মন্ত্র? —শুনে বিস্মিত হলুম! লামা বুঝিয়ে দিলেন, সেই বিশেষ মন্ত্রটি ছাড়া এই ছাঁচ দানা বা জমাট বাঁধে না! মন্ত্রপাঠ না করলে এটি নাকি এলিয়ে ভেঙে পড়ে! এটি যদি আপনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন তবেই এই ছাঁচ অক্ষত অবস্থায় আপনার দেশে গিয়ে পৌঁছবে!

ছাঁচমূর্তিটির আয়তন ইঞ্চি-ছয়েক। প্রধান লামার কাছ থেকে সেটি উপহাররূপে গ্রহণ করলুম। কলকাতায় ফিরে এসে লক্ষ্য করেছিলুম, ছাঁচটির নীচের দিকে সামান্য একটু চোট লেগেছে মাত্র।

পাহাড় থেকে নেমে এলুম পথে। সেই পথ—যার আদি অন্ত পাইনে। এটি মহাসিন্ধুর উপত্যকা-পথ। উচ্চতায় ১৩০০০ ফুটেরও বেশি। কিন্তু দক্ষিণ-পথে না গিয়ে যদি এই উত্তর-পথে সিন্ধুর তটে-তটে চ'লে যাই তবে 'চর্বৎ সঙ্কট' পেরিয়ে যে পথটি ধরব সেটি গিয়েছে 'তোল্‌তি' হয়ে স্কার্দুর দিকে। স্কার্দু থেকে রন্দু, রন্দু থেকে গিলগিট—অর্থাৎ উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিমে। কিন্তু অজানা পথ একান্তই অনধিগম্য। সেই ভূখণ্ড এখন নিষিদ্ধ।

কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে পুনরায় সেই মরুরুক্ষ ধূলিরাজ্যে প্রবেশ করার আগে এই পথেরই পাশে আমার জন্য একটি কৌতুক অপেক্ষা করেছিল। সামনেই একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং এটি সামরিক বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত। ভিতরের চিকিৎসক মহাশয় দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে যেভাবে সানন্দে এবং উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা করলেন পরিষ্কার বঙ্গভাষায়, তা'তে বুঝতে পারা গেল তিনি আমার নাড়ি নক্ষত্র প্রায় সবই জানেন। তাঁর নাম মেজর ডক্টর চ্যাটার্জি।

"চিনিনে? কী বলছেন মশাই? কাকে না চিনি আগাগোড়া? আপনি ত জানেন আমাদের সতীশ মাস্টারকে,—কাশীর কে না জানে তাঁকে? ওই যে তিল-ভাণ্ডেশ্বর দিয়ে বেরলেই ডানহাতি রেউড়িতলায়—"

একটু যেন থতিয়েই গিয়েছিলুম।—এ যেন গতজন্মের স্বপ্নকথা!

"ওই রাস্তার কাছেই থাকতুম। সেই অনেককাল থেকে আপনাকে চিনি বৈকি! আপনার সঙ্গে থাকতেন কালী মাস্টার আর কেদার মুখুজ্যে, আর নৈলে আমাদের প্রফুল্লদা—। মনে পড়ছে অপূর্ব ভট্টাচার্যি আর পোস্টমাস্টার ননীদাকে?"

তাঁর উচ্চকণ্ঠ উচ্চতর হ'ল, এবং তিনি ভিতরে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলেন এক সময়ে। তারপর কতক্ষণ আমরা জমিয়ে বসলুম। মাঝে মাঝে তাঁর হাস্যে ছোট ঘরটি মুখর হয়ে উঠছিল। এক সময় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "বলবেন গিয়ে—অবিচার হ'তে দেবো না—অন্যায় সইব না! কে বললে আমরা দুর্ভাগ্য? মিথ্যে কথা! চেয়ে দেখুন

বেকার বসে আছি, একটিও রুগী নেই! তবু আপনাকে বলে রাখছি · কিছু বিশ্বাস করিনে! একটি কানাকড়িও স্বীকার করিনে! বলবেন গিয়ে—অবিচার, আগাগোড়া অবিচার—"

ভদ্রলোকের কথা অনেকটাই বুঝতে পারিনি। কা'কে গিয়ে বলব, কী বলব, তাঁর এইসব নাটকীয় মন্তব্য কা'র জন্য—সমস্তই আমার কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু ভদ্রলোকটির ব্যবহার খুব ভাল লেগেছিল। সামরিক বিভাগে তাঁর মতো কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখলে উৎসাহ বোধ করি। পরে খবর পেয়েছিলুম, বাঙ্গালী ডাক্তার অনেকে আছেন লাদাখে। তাঁরা বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান।

খররৌদ্রপথে দ্রুতগতিতে পেরিয়ে যাবার কালে যখন ধুলোয়-ধুলোয় আবার ধূসর হতে থাকলুম, তখন সম্মুখের মধ্য এশিয়ার ওই বিশাল মরুলোকে ধূলিমাখা এক একটা দৈত্য-পর্বত যেন আমাকে বার বার শাসিয়ে মেজর চ্যাটার্জির অসংলগ্ন কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করছিল! তাঁর নির্ভয় মন্তব্যগুলি শুনে আমার চমক লেগেছিল।

লাদাখ গিরিশ্রেণীর ধার দিয়ে আমাদের দক্ষিণ পূর্বমুখী পথ। আমরা সিন্ধু উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম। অদূরে মহাসিন্ধুনদ বয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। ছোট ছোট সাঁকোর তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গিরিনদী, কিংবা ঝরণা। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে গাছপালা, তাদের ফাঁকে ফাঁকে বৌদ্ধবসতি। গিরিশ্রেণীর তলায়-তলায় আমাদের পথ চলেছে এঁকে বেঁকে। শীত, রৌদ্র, ধুলো এবং বালুপাথর—এর বাইরে অন্য কিছু নেই। তবু ওরই মধ্যে চোখের তৃপ্তি কিছু ঘটছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কোথাও কোথাও মানুষের হাতের চিহ্ন। হরিৎবর্ণ যবের ক্ষেত, তার পাশে হয়ত কয়েকটি দীর্ঘকায় পপলারের ছায়া, কোনও কোনও পাহাড়ের মৃৎকোমলতা, অদূরে হয়ত দুটি চমরী গাই, নয়ত নুড়িপাথর দিয়ে তৈরি 'চোর্তেনে'র গায়ে লাল রং করা, নয়ত বা জাফরি-কাটানো ছোট্ট জানলা বসানো কোনও এক অখ্যাত গুম্ফা—এগুলি সব মিলিয়ে যেন মানুষের করুণ স্নেহের ইশারা। সিন্ধু যেন আপনার করুণার চিহ্ন রেখে চলেছে তার পথের দুই পারে। পথ যেন এবার অনেকটা সহনীয় মনে হচ্ছে।

অনেক দূর চলে এসে পাওয়া গেল এক গিরিসঙ্কট। পথ এবার উপরে উঠল, এবং মহাসিন্ধু প্রবাহ রইল অনেক নীচে। ধূসর ও ঊষর গিরিশ্রেণীর নীচের দিকে বন্য, গর্জমান, প্রবল-প্রবাহ সুনীল সিন্ধু যেন দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে গেল। আমরা 'নুরলা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে এসে তার জনপদের ধারে দেখি, বজ্রতারার বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের বর্ণ রক্তিম। এটি নাকি তন্ত্র সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র। বৌদ্ধক্ষেত্রে তন্ত্রসাধনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এক ভারতপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী, তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকায়। তিনি ১০ম শতাব্দির শেষে দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং

১১শ শতাব্দীতে প্রায় সমগ্র ভারত ও সিংহলে বৌদ্ধশাস্ত্র ও তন্ত্রমত শিক্ষা ক'রে ধর্মপ্রচারের মানসে তিব্বতে যান। তিনি ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ, শক্তিসাধক এবং অতি উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে তিব্বতের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রথম যোগ সাধন করেন দীপঙ্কর। তিব্বতে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করেন, এবং তিব্বতীরা অদ্যাবধি তাঁকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী অবতার ব'লে জানে। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা-নগরীর এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'দেবতাত্মা হিমালয়ে।'

সম্ভবত অতীশ দীপঙ্করের বিপুল অবদানের ফলে তিব্বতে সেই কালে এক পুনরভ্যুত্থান ঘটে। সেটি বৈপ্লবিক। তিব্বত সেই মধ্যযুগে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বিবিধপ্রকার ভৌতিক ও পৈশাচিক সংস্কার নিয়ে থাকত। অতীশ দীপঙ্কর এই ধরনের ধর্মমতকে বিতাড়িত করেন, এবং তাঁর মতবাদ থেকেই 'লামাধর্মের' সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী কালে জেঙ্গিস খাঁর বংশধর কুবলাই খাঁ ১২শ শতাব্দীতে তিব্বত জয় করেন এবং নিজে লামাধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তিব্বতে ডেকে নিয়ে যান। তিব্বতের বর্ণমালা, ধর্মসাহিত্য ও সংস্কৃতি, তিব্বতের শিক্ষা ও সভ্যতা এবং তিব্বতের সর্বপ্রকার উন্নতির পথে ভারতবর্ষের অবদান অনেক বড় ছিল। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে ইসলাম সভ্যতা বিস্তারের ফলে তিব্বতের সকল দ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

মহাসিন্ধু নদকে পাবার পর থেকে পথের চেহারা কিছু কিছু ফিরছে। দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে কাঁটালতা, কিছু কিছু বন্য ফুল, কিছু ঘাস, কিছুবা শ্যাওলা। বর্ণ সমারোহ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। সর্বাপেক্ষা স্বস্তি, মানুষ দেখছি, এবং মেয়ে দেখছি! সব মেয়ের মাথায় লাদাখী উঁচু টুপি, তার দুদিকের 'কান দুটো' বাঁকানো। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার এবং আগাগোড়া পোশাক দিয়ে ঢাকা। এ জীবনে তারা স্নান করেছে কবার, এবং একেবারেই করেছে কিনা—ওদের ডেকে জানতে ইচ্ছা করে।

আমাদের দুদিকের সব পাহাড়ের চূড়াই প্রায় বরফ ঢাকা, সুতরাং গিরিগাত্র থেকে জলধারার অভাব নেই। যে অঞ্চল মৃন্ময় (alluvial), সেখানে ক্ষেতখামার দেখা দিয়েছে, ফলের গাছ উঠেছে, পপলারের ছায়া পড়েছে সেখানে। আবার কোথাও চোখে পড়ছে, তুষারনদী নিচে নামতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে তুষারে পরিণত হয়ে থমকিয়ে গেছে,—ধুলো পড়েছে তাদের গায়ে। তাদের ভিতর থেকে নেমে আসছে শীর্ণ জলের ধারা। আমরা সেই একই পথের উপর দিয়ে চলেছি। সেই চিরকালের পথ। শত শত বছরের মধ্য কোনও কালে এ পথের কেউ সংস্কার করেছে কিনা খবর পাওয়া যায়নি। এখানে রাজস্বের পরিমাণ কম, ফলনের পরিমাণ নেই বললেই হয়, মানুষের ক্রয়শক্তি অতি সামান্য, শ্রমের সঙ্গে খাদ্যের বিনিময়ের ব্যবস্থা আরও কম

সুতরাং লাদাখ এবং লাদাখীরা চিরদিন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। কাশ্মীররাজ কাগজপত্রে অথবা তাঁদের রাজস্বের খাতার মারফৎ জানতেন, লাদাখ অঞ্চল তাঁদের কাছে আনুগত্য স্বীকার ক'রে রয়েছে, নজরানাও কিছু কিছু পাওয়া যায় বছর-বছর।

অন্যদিকে নিরীহ, সজ্জন, ধর্মনিষ্ঠ লাদাখের জনসাধারণের সামনে আজ একটি জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত, সেটি রক্তিম চীনের আতঙ্ক। চীনের নূতনকালের শাসকবর্গ লামাধর্মে বিশ্বাসী নন। তাঁরা ভেঙ্গে দিচ্ছেন বৌদ্ধ ধর্মনীতির পুরাতন ব্যবস্থাপনা। গুম্ফা, মঠ, ইত্যাদির সম্বন্ধে তাঁদের মোহ কম। তাঁদের রাজনীতিক মতবাদ, সমাজ, ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির চেহারা লক্ষ্য করে লাদাখীরা আতঙ্কিত। পলাতক তিব্বতীরা—যারা ধর্মপ্রাণ—তাঁ'রা লাদাখে পালিয়ে এসে এমন সব সংবাদ দিয়েছেন যেগুলি বীভৎস। লাদাখের বহু সংখ্যক লামা—যাঁরা দ্বাদশ বৎসর কাল অবধি বহু কৃচ্ছ্র সাধনার পর 'লাসা নগরীতে দীক্ষা নেবার জন্য গিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানে নাকি বন্দী, এবং চীন কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁদেরকে 'লাদাখ-বিভাগের' গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছেন! বলা বাহুল্য, যে সকল দেশের নির্ভুল সংবাদ জানবার কোনও উপায় নেই, সেই সকল দেশের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার মন্দ সংবাদগুলি একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, লাদাখের অতি বৃহৎ সংখ্যক বৌদ্ধ এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলমান—যারা মনে-প্রাণে-চিন্তায় এবং জীবন ব্যবস্থায় একাকার,—তারা উভয়েই আতঙ্কপাণ্ডুর দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে রয়েছে কম্যুনিস্ট চীনের প্রতি, এবং অন্যদিকে সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সেই পুরাতন বৈরী জম্মু, পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের প্রতি! এই দুই প্রাণ-সমস্যার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট। একাগ্র এবং একান্ত দৃষ্টিতে আজ লাদাখীরা ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্যেকটি আচরণ লক্ষ্য করছে খুঁটিয়ে। আমার বিশ্বাস, তাদের ভয় ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে।

দেখতে দেখতে কখন 'মুরলা' গ্রাম ছাড়িয়ে এসে পড়েছি 'সাসপোল' নামক এক প্রসিদ্ধ জনপদের সীমানায়। অল্পস্বল্প মেয়ে ও পুরুষ দেখা যাচ্ছে। দেশভেদে মানুষের মুখের গঠন ও গরুর দেহের গঠন কিছু বদলায়। উত্তর বিহারের মোতিহারীর গরু আর দক্ষিণের মহীশূরের গরুর চেহারা এক নয়। এ অঞ্চলে মেয়ে-পুরুষের মুখের চেহারা কিছু বদলেছে। এখানে রক্তের ধারায় সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাশ্মীরি, ভোট্টা, তিব্বতী এবং মঙ্গোলীয়,—এখানে এক হয়ে মিলেছে। সিনকিয়াংয়ের দিকে আনাগোনা করেছে পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, অন্যদিক থেকে ইয়ারকন্দিয়া এসেছে এই পথে। বহুকাল অবধি আরেকটি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল লাদাখ আর সিনকিয়াংয়ের মধ্যে। উভয় অঞ্চলেই সাময়িক কালের জন্য 'মেয়ে' কিনতে পাওয়া যেত। সিনকিয়াং-এর জনপদ

'কাশগড়, খোতান, উরুমচি, ইয়ারকন্দ, তাসকুর্গন, ইয়াঙ্গিহিস্সার' প্রভৃতি অঞ্চলে 'বেওপারী'-দের পক্ষে যাওয়া, বাণিজ্য করা এবং ফিরে আসা—এটিতে লেগে যেত প্রায় এক বছর। সিনকিয়াংবাসীদের পক্ষেও তাই। সুতরাং এই কালের মধ্যে দুশ' চারশ' স্ত্রীলোক বেচাকেনা চলত একটি বিশেষ সময়ের জন্য। সেসব স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয়ে পড়লে কোনও অমর্যাদা ঘটত না, স্ব স্ব সমাজে সন্তান সহ তা'রা জায়গা পেয়ে যেত। এসব ক্ষেত্রে বর্ণ, জাতি বা ধর্ম কোনও বাধা ঘটায়নি। তা'রা বলত, মেয়ের কোনও আলাদা জাতি বা পৃথক ধর্ম নেই,—যা আছে সে কেবল নারী জাতি, এবং নারী-ধর্ম!

'সাসপোলে'র কাছাকাছি এলে যাদেরকে দেখা যায়, তাদের কারও বর্ণ মেটে, কেউ কৃষ্ণাভ, কেউ বা সুগৌর। বহুকাল ধরে লাদাখে মিলেছে বহুবর্ণ। হুন্জা ও গিলগিট অঞ্চল থেকে এখানে এসেছে দার্দ জাতি, উত্তর ভারত বা কাশ্মীর থেকে এসেছে মন্ জাতি,—এরা উভয়ই আর্যজাতির বংশ। কিছু পাঞ্জাব ও হিমাচলের লোক। তাদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় যাযাবর। যাদের গালের হাড় উঁচু, চোখ দুটো দুই প্রান্তে,—ব'লে না দিলেও চলে,—তা'রা মঙ্গোলীয়। বড় চোখ, কালো চুল, সুন্দর নাসা,—ধ'রে নিতে পারো কাশ্মীরি। পিছনে বেণী ঝুলছে মাথায় লাদাখী টুপি, দাঁড়ি-গোঁফ গজাতে চায় না,—এরা লাদাখের আদিবাসী। এরা সবাই এখানে এক হয়ে মিলে কাজ করছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এদিক ওদিক পাহাড়তলী আর গিরিনদীর কোলে-কোলে শস্যখামারগুলি থেকে যবকাটা হয়ে গেছে। মেয়ে বা পুরুষ ঘাস কেটে নিচ্ছে। জড়ো করছে কাঠিকুটি আর মরা ডাল—এগুলি শীতে কাজে লাগবে। গরু-লাঙ্গল নেই, নিজেরাই মাটি কাটে, এবং বরফ গলা জল। মোট ৪ মাসে ফসল পেকে ওঠে। জুন-জুলাই খররৌদ্রের কাল—ওই দু'মাসেই পাক ধরে। সব্জি কিছু জন্মাতে পারলে ত' কথাই নেই। কিছু খাওয়া, কিছু শুকিয়ে রেখে দেওয়া। অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষ—সমগ্র লাদাখ সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া। তখন শুধু বরফ সিদ্ধ ক'রে জল খাওয়া, আর বরফ কেটে ঘরে ঢোকা! তখন কাজের মধ্যে ভেড়া বা ছাগলের লোম পাকিয়ে চলা, ঘোড়ার ল্যাজ পাকিয়েও 'ছুট্‌কা' বানানো, বা দড়ি পাকানো। এর মধ্যে যদি অসুস্থ হও, লামাবৈদ্যকে ডাকো। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জড়িবড়ি, আর নয়ত চারিদিকের পিশাচ দলকে তাড়ানো! রোগী যদি মরে তাহলে শবদেহকে নিয়ে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। রোগী মারা যাবার পর দেহ মধ্যে আত্মা বন্দী। সুতরাং ছুরিকার দ্বারা তার দেহের উপরভাগে কোনও একটি অংশে একটি 'জানলা' কেটে দেওয়া! আত্মা সেই পথ দিয়ে উড়ে' গিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়! অর্থাৎ খাঁচা কেটে পাখি ছেড়ে দেওয়া!

উৎরাই পথে নেমে একটি গিরিজলধারা পার হচ্ছিলুম। পথের বাঁক ফিরতেই দেখি, প্রায় ৩০টি লাদাখী মেয়ে একটি সাঁকো নির্মাণের কাজে লেগেছে, এবং তাদের কাজ বুঝে নিচ্ছেন উত্তর প্রদেশী এক ভদ্রলোক—তাঁর বাড়ি কাশীতে। মেয়েগুলির কাজ হ'ল এক একখানা পাথরের টুকরো গজ পঞ্চাশেক দূর থেকে সংগ্রহ করে এনে ঠিক জায়গাটিতে বিন্যাস ক'রে দেওয়া। এই কাজটির জন্য প্রত্যেক মেয়ের মজুরি দৈনিক ২ টাকা ৭৫ পয়সা। কাজের টাইম সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা। মাঝখানে ১ ঘণ্টা খাবার ছুটি।

এখানে থমকিয়ে গেলুম। কাজটির মধ্যে পরিশ্রম আছে কিন্তু কপালের ঘাম ছোটে না। এক একখানি পাথরের ওজন পাঁচ সাত সেরের বেশি নয়। গল্প-গুজব হাসি-তামাসার মধ্যে র'য়ে-ব'সে কাজ চলছে। পারিশ্রমিকের ব্যবস্থার মধ্যে কর্তৃপক্ষের উদারতা দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের কল্যাণে এরা কয়েকটি বিশেষ সুবিধা লাভ করে, যার জন্য মেয়েদের মুখে চোখে এত হাসিখুশি। প্রকৃতপক্ষে লাদাখে পদার্পণ করার পর থেকে এই প্রথম দেখলুম, সাধারণ মেয়েদের স্বাস্থ্যশ্রী কি প্রকার বলিষ্ঠ এবং সতেজ। এদের পায়ে জুতো, অলঙ্কার প্রচুর, আপাদমস্তক ভালো পোশাক, মাথায় বড় টুপি। এদের দেহের গঠনভঙ্গীর সঙ্গে স্বাস্থ্যের এমন একটি কাঠিন্য প্রকাশ পাচ্ছে যেটি দুর্লভ। পোশাক পরিচ্ছদ এদের ধূলিমলিন বটে, কিন্তু বর্ণ সুগৌর সুশ্রী। ভিনদেশী লোক দেখে ওরা সোৎসাহে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল। আমি বলছি ভাঙ্গা হিন্দি, ওরা বলছে হেসে-হেসে পরিষ্কার লাদাখী। কেউ কারোকে বুঝতে পারছিনে। কিন্তু হাস্যোদ্দীপনার ভাষা একটু অন্য প্রকার,—সে তার নিজস্ব ব্যঞ্জনা বহন করে। সে-ভাষাটি দুর্বোধ্য নয়।

সম্রাট শের শাহ একদা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেছিলেন বাঙ্গলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত। সে-পথ দিয়ে যেত ঘোড়া বা ঘোড়া ও গরুর গাড়ি। এখন সেই পথে যে ধরনের যান-বাহন বা লোক চলাচল ঘটছে, সেটি শের শাহর কল্পনায় থাকলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সর্বক্ষেত্রে অন্তত একশ' ফুট চওড়া হত ১৯৫৫ বা ৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাদাখে যে-ক্যারাভান পথটি প্রচলিত ছিল, সেটি সম্ভবত সম্রাট অশোকের বা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আমলের, অথবা তারও আগেকার!

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধীরে ধীরে শত শত বছরের চেষ্টায় সুশ্রী হয়েছে। লাদাখ-সিনকিয়াং রোড কোনও কালে ইংরেজ বা কাশ্মীরের হাতে চলনসই হয়নি! জরোয়ার সিং এ পথের কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন মাত্র। অতঃপর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাদাখের ইংরেজ জয়েণ্ট কমিশনার সাহেব যখন লেহ্ শহরে আসতেন, তখন তাঁর জন্য থাকত

শ্রেষ্ঠ বেবি অষ্টিন, নয়ত শ্রেষ্ঠ 'ওয়েলার' ঘোড়া, নয়ত বিমান, নয়ত বা আমেরিকান জীপ একালের। কিন্তু তখনও এপথের চেহারা সামান্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফেরেনি! আন্দাজে অনুমান করতে পারি, এ পথ নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে ১৯৫৯ থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙ্গলা, বিহার ও আসামে আমেরিকান টাকায় অগণিত সংখ্যক বিমানঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং এক-একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণ করতে মাত্র এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগেনি। সেখানে আমেরিকার নিজস্ব 'বড় মানুষীর' বেপরোয়া ভাবটি ছিল। কিন্তু লাদাখে ভারত গভর্নমেন্ট বরাবর আছেন একা আপন মধ্যবিত্ত অবস্থা নিয়ে। এখানে 'দুই হাজার বছরের বন্ধুত্ব' রাতারাতি পদদলিত হবার পর অদ্বৈতবাদী এবং শান্তপ্রকৃতি ভারতকে 'বন্ধুর' হাত থেকে অপমান সহ্য ক'রেও সময় নিয়ে ভাবতে হয়েছে, ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন করাটা ভারতস্বভাবের সঙ্গে মিলবে কিনা! বিগত এক হাজার বছরের মধ্যে সঠিকভাবে ভারতবর্ষ যুদ্ধ করেনি এবং যুদ্ধে সাড়া দেয়নি। যুদ্ধ করেছে মোগল-পাঠান, যুদ্ধ করেছে ইংরেজ এদেশের ভিতরে ও বাইরে কয়েকজন সামন্ত নরপতির সঙ্গে। কিন্তু ভারতের মনের সঙ্গে সেসব যুদ্ধের' যোগ ছিল না। শুধু মাত্র একশ' বছরের মধ্যে দুইবার ভারতীয় 'ঐরাবত' গা ঝাড়া দিয়েছিল মাত্র! প্রথম ১৮৫৭-য়, এবং দ্বিতীয় ১৯৪২-এ। দু'বারই তা'র হাতে উপযুক্ত অস্ত্র ছিল না এবং অস্ত্র ধার করার জন্য সে রাশিয়া-আমেরিকাতেও ছোটেনি। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সব জাতি দুবারই জেনেছিল, সেই রুষ্ট রুদ্র 'ঐরাবতের' মূর্তি ছিল কী সাংঘাতিক!

এখানে এই মধ্য এশিয় লাদাখে দুই হাজার বছরের বন্ধু যখন মাত্র একরাত্রির মধ্যে শত্রু হয়ে উঠল (অক্টোবর ২১, ১৯৫৯), তখন এখানে কিয়ৎকালের জন্য সেই সুপ্রাচীন ঐরাবত একবার চুপ ক'রে থমকিয়ে দাঁড়াল! সমগ্র লাদাখের কোথাও উপযুক্ত পথঘাট নেই,—যে সকল পথ দিয়ে বড় বড় গাড়ি যেতে পারে রসদ নিয়ে। বছরে ছয়মাস বরফের জন্য এই বিশাল প্রদেশ একপ্রকার অদৃশ্য হয়ে থাকে অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত। একফোঁটা জল নেই কোথাও, সমস্তটা কঠিন তুষার! কোথাও উদ্বৃত্ত সামান্য খাদ্য নেই,—আশ্রয়ের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। লাদাখের প্রতি বর্গমাইলে ২ থেকে ৩ জন মাত্র লোকসংখ্যা, অর্থাৎ লোকবলও নেই। মৃন্ময় ভূমি নেই খাদ্য ফলাবার! ভারতের সমতল থেকে যারা আসবে, তা'রা এখানকার প্রাকৃতিক আবহের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়,—ফলে তাদের সর্বাঙ্গে দেখা দিচ্ছে তুষার ক্ষত, এবং তার থেকে গ্যাংগ্রীন। অস্ত্রোপচার করলে হাত, পা, কান—সমস্ত কেটে নিতে হয়! এই মরু-তুষার লোকে অক্সিজেনের এত অভাব যে, অধিকক্ষণ ধ'রে হাঁটা বা প্রয়োজনমতো পরিশ্রম করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। এই রুক্ষ উচ্চদেশের আবহের সঙ্গে

সমতলবাসীদের দেহমনকে মিলিয়ে (acclimatized) নিতেও সময় লাগে অনেক। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এটি কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি যে, ১২ হাজার ফুটের ওপরে অতি সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ঘটছে; ১৮ হাজার ফুটের ওপরে—যে মরুপাথর ও তুষারকীর্ণ ভূভাগে অক্সিজেন নেই,—সেখানে বিমানযোগে নামছে ভারতীয় জওয়ান! শত্রু সেখানে একমাত্র চীনের রক্তিম শাসকবর্গ নয়,—আজ আমি এখানে এই 'সাসপোল'-এর কাছে দাঁড়িয়ে দেখছি,—শত্রু অগণন! এখানে সর্বব্যাপী অন্নাভাব, তুষারপাত, আশ্রয়শূন্যতা, অনধিগম্য দুস্তর ও বিপজ্জনক পথ, জনহীনতা, এবং বিমান চলাচলের পক্ষে শঙ্কাজনক পর্বতপ্রাকার।—এরা সবাই সম্মিলিতভাবে সাংঘাতিক শত্রু! কিন্তু বিপক্ষ দলের এ ধরনের অসুবিধা নেই। তারা দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর 'ছাদের' ওপর,—যেটি ১৫ থেকে ১৭ হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানরা প্রায় সমুদ্র সমতা থেকে সেই 'ছাদের' উপর উঠছে হামাগুড়ি দিয়ে! যেখানে শত্রুপক্ষের সর্বপ্রকার সামরিক আয়োজন রয়েছে হাতের কাছে, অর্থাৎ পূর্বে ও দক্ষিণে রুদক, রাওয়াং তাসিগং, গারটক, এমন কি সুদূর বর্থা পর্যন্ত, এবং উত্তরে সিনকিয়াংয়ের প্রত্যেকটি সমৃদ্ধ জনপদে,—এগুলি তাদেরকে যোগাচ্ছে নিয়মিত রসদ। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতকে যেতে হচ্ছে অন্তহীন কঠোরতার ভেতর দিয়ে। সেই কারণে এখানে দাঁড়িয়েই বিচার ক'রে দেখছি বীরত্ব দুই প্রকার! শত্রুর সামনে নির্ভয় হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো বা জন্মভূমির গৌরবরক্ষার জন্য বারম্বার হাসিমুখে রক্তস্নান করা,—সে এক চিরকালের বীরত্ব সবাই জানি; কিন্তু বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে পদে-পদে পলে-পলে যে সাংঘাতিক সহনশীলতার সংগ্রাম, কেবলমাত্র প্রাণধারণের জন্য যে নিত্য নিয়মিত কঠিন দ্বন্দ্ব,—সেই বীরত্ব অতিমানবিক! চিরস্থায়ী বৃষ্টিহীনতা, ধূলিবালুর অন্ধ ঝাপট, তাজা খাদ্যসামগ্রী বা সব্জির দারিদ্র, তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে অনলস কর্মতৎপরতা, বায়ুশীর্ণতা, জনবিরলতা, এই প্রকার বৈরী-প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলছে অবিরাম! চারিদিকে কেবল হরিদ্রাভ নগ্নপাণ্ডুর পাহাড়, অন্তহীন সর্বশূন্য বালুপাথরের প্রান্তর,—এদেরই মাঝখানে একটা সুকঠোর জীবন যাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া, এর মধ্যে একটি অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের কথা আছে! লাদাখ যেন ভারতীয় মনোবল এবং আত্মশক্তির মস্ত পরীক্ষার ক্ষেত্র।

'সাসপোল' জনপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম। সবুজবর্ণ দেখবার জন্য নিজেরই অগোচরে একটি নিঃশব্দ ক্ষুধার জন্ম হতে থাকে। 'সাসপোলের' সবুজ বৃক্ষলতা, বনপ্রাঙ্গণ, তৃণভূমি,—এগুলি যেন অপরিসীম চোখের স্বস্তি! এটি প্রসিদ্ধ এক বৌদ্ধগ্রাম ও গুম্ফা। পাথুরে বাংলা, ডাকঘর, পাথুরে ধর্মশালা, এবং লামাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, দেবদেবীর গুহামন্দির,—এগুলির আকর্ষণে বহু লোক এখানে আনাগোনা

করে। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দিতে এখানকার স্থানীয় বৌদ্ধ শাসনকর্তা দু একটি মঠ নির্মাণ করেন, কিন্তু কোনও এক যুগের ইন্দো-এরিয়ান মুসলমানগণ সেই মঠ আক্রমণ করে। পাহাড়ের ওপর দিকে তাদের ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো রয়েছে। অপর একটি পুরনো গুম্ফা সিন্ধু সীমানায় চোখে পড়ে। এইটির মধ্যে অতি প্রাচীন একটি বৌদ্ধ পাঠাগার এখনও বর্তমান! এ ছাড়া পুরাকালে কাশ্মীরে তৈরি কাঠের ও পশমের বহু কারুকার্য করা সামগ্রীসম্ভার রক্ষিত আছে।

এক সময়ে 'সাসপোল' ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম আবার দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকার পথ ধরে। মরুভূমি, অরণ্য, পার্বত্যলোক এবং সমুদ্র—এদের মধ্যে পথ হারালে ফেরে না কেউ! পেছনে যে সকল পথের চিহ্ন ফেলে আনছি পেছন দিকে তাকিয়ে তার রেখা পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিনে। বালুপাথরে, পাহাড়ে এবং রুক্ষ উপত্যকায় কোথায় যেন তা'রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অজানা এবং অনামা দিগন্তের থেকে একটি যেন মূঢ় ও দুর্বোধ্য আকর্ষণ আমার ঝুঁটি ধ'রে টানছে একটির পর একটি অনধিগম্য ভূভাগে। প্রখর সূর্যালোক, নীলোজ্জ্বল আকাশ, মরুপ্রবাহী মহাসিন্ধু, প্রাণীচিহ্নহীন বিশাল আদিম উপত্যকা, তৃণলতা শূন্য বৃহৎ বালুকাস্তার,—সৃজনের প্রথম পর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে অদ্যাবধি যেন জীবজন্ম ঘটেনি! সমস্ত দিনমান আকাশপথে চেয়ে থাকা,—যদি একটি উড্ডীন পথিক পাখীর সন্ধান মেলে! কিন্তু মেলেনি। উৎসুক আকুল চক্ষু চেয়ে থাকে সকলখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা,—যদি একটিমাত্র মানুষেরও সাক্ষাৎ মেলে! কিন্তু মেলেনি। এ যেন অবাস্তব একটা প্রেতলোক,—এখানে কে জানে, হয়ত অশরীরী আত্মারা ঘোরে শূন্যে শূন্যে! যা দৃশ্যমান নয়, চর্মচক্ষে যা দেখিনে, সে কি একান্তই অস্তিত্বহীন?

হিমালয়ের পরে ধরেছিলুম জাস্কার গিরিমালা। এবার মহাসিন্ধুনদ পার হয়ে লাদাখ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেছি। এই পর্বতশ্রেণী উত্তরে বালতিস্তান থেকে সুদূর দক্ষিণে ভারতীয় 'রূপসু' প্রদেশে প্রসারিত হয়েছে। 'রূপসুতে' প্রবেশ করার ঠিক আগে পর্যন্ত মহাসিন্ধুনদ পশ্চিম তিব্বতে 'সেংগে খাম্ব-অব' নামে পরিচিত। উৎপত্তিস্থল মানস-সরোবর ও কৈলাসের কাছাকাছি। আমরা দক্ষিণ পথে যাচ্ছিলুম। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে গিয়ে জাস্কার এবং লাদাখ এই দুই গিরিশ্রেণী মিলেছে কয়েকটি নদীর এপারে-ওপারে। তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল দুটি,—মহাসিন্ধু এবং হান্‌লে। এখানে তিব্বতের কাছাকাছি ভারতীয় শেষ জনপদটির নাম হল, 'দেম্‌চক।' দেম্‌চকের দক্ষিণে ভারতীয় গিরিসঙ্কটের তোরণ দ্বারটির নাম হল, 'চারদিংলা।' এই তোরণের উচ্চতা ২০ হাজার ফুটেরও বেশী। রূপসু প্রদেশটির দক্ষিণ ও পূর্বভাগ

তিব্বতের থেকে অতি সুনির্দিষ্টভাবে উচ্চতর পর্বতপ্রাকারের দ্বারা পৃথক। এই প্রদেশে ভারতীয় কয়েকটি গিরি-তোরণদ্বারে দাঁড়ালে পাঁচ হাজার ফুট নীচে তিব্বতের হ্রদদেশ এবং রুদকের সমগ্র উপত্যকাটি দেখা যায়—নেপালের চন্দ্রগিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে যেমন থানকোট থেকে সমতল কাঠমাণ্ডু চোখে পড়ে! দক্ষিণ রূপস্থ যেন অনেকটা ভারতীয় ছিটমহলের মতো দাঁড়িয়ে আছে—যার তিনদিকে তিব্বতের নিম্নভূমি। কিন্তু পাহাড়ের বিরাট চক্রবেড় প্রাচীর এই ভূখণ্ডকে ভারতীয় এক দুর্গে পরিণত করেছে। এর থেকে বাহির হবার যে চারটি গিরিতোরণ পথ, তাদের নাম 'কিউংজিংলা (পশ্চিমে), ইমিসলা (দক্ষিণে), চারদিংলা (দক্ষিণ পূর্বে), এবং চাংলা ও যরালা (পূর্বে)।

বর্তমান লাদাখ পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। উত্তর ও দক্ষিণ বালতিস্তান, নুবরা উপত্যকা, জাস্কার, রূপস্থ এবং লেহ্‌। এর মধ্যে উত্তর বালতিস্তান এখন পাকিস্তান-অধিকৃত, উত্তর নুবরা অর্থাৎ দেপসাং-এর একটি অংশ চীন-অধিকৃত (যার মধ্যে পড়ে কারাকোরম গিরিসঙ্কট), এবং লেহ্‌ তহশিলের বৃহৎ পূর্বাংশ—অর্থাৎ চ্যাংচেনমো, লিংজিটাং, আকসাইচিন, সোডা প্লেনস্‌, ডেরা কম্‌পাস, শুকপা কুন্‌জাং, খুর্নাকদুর্গ,—এগুলির প্রত্যেকটি বর্তমানে চীন অধিকৃত কিনা এটি সম্পূর্ণ জানবার কথা আমার নয়,—যদিও আমি এদের অতি নিকটে বাস করেছিলুম।

মহাসিন্ধু প্রবাহের বিপরীতমুখী দক্ষিণ উপত্যকার ভিতর দিয়ে আনগ্ন পাহাড়-পর্বতের তুষারশীর্ষ একটির পর একটি পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। এখানে কোনও মানুষের গল্প নেই, জীবনের কোনও কাহিনী নেই, ইতিহাসের ঘটনাবলীর তালিকা নেই। অতি বৃষ্টি, বন্যাপ্লাবন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দাবদাহ, মহামারী,—এর ইতিবৃত্তও কিছু নেই! 'তোগলুং' বা 'থুলুং' গিরিসঙ্কটের (১৭,৫০০) তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে চেয়ে দেখো, বিশ্বসৃষ্টির আদিকাল থেকে পড়ে রয়েছে এক অতিকায় মহাসরীসৃপের শবদেহের মতো দীর্ঘলম্বী একটি ভূভাগ—দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝামাঝি—যে-ভূভাগটির দৈর্ঘ্য হল ৯০ মাইল, এবং প্রস্থ ৬২ মাইল। এই প্রাণস্পন্দনহীন ভূ-ভাগটির নামই 'রূপস্থ।' এই প্রদেশের সাধারণ উচ্চতা ১৫,৫০০ থেকে ১৬,০০০ ফুট। এর চতুর্দিক বেষ্টন করে যে পর্বতপ্রাকার একে তিব্বতের থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে তাদের সাধারণ উচ্চতা ২০ থেকে ২১ হাজার ফুট। শুধু দূর দক্ষিণ-পর্বত থেকে উত্তর পথে 'হান্‌লে' জনপদের উপর দিয়ে 'হানলে' নদী এসে মিলেছে মহাসিন্ধুনদে। অতঃপর এই সিন্ধু বেঁকেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে 'নিয়োমারাপ' নামক জনপদের উত্তর পার দিয়ে।

দক্ষিণ লাদাখে সিন্ধুতীরবর্তী বৌদ্ধ জনপদ 'উপসি' ছাড়িয়ে জনহীন পার্বত্যপথে বহু চড়াই ভেঙ্গে 'থুলুং' সঙ্কট অতিক্রম না করলে 'রূপস্থ' পৌঁছনো যায় না। এটি রূপস্থর

প্রাকৃতিক অবরোধ। কিন্তু এটি চিরকাল ধরে অতিক্রম করেছে ভারতের এবং সিন-কিয়াংয়ের অধিবাসীরা। এর আগে বোধ হয় বলেছি, মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের সমতলে পৌঁছবার তিনটি প্রধান বাণিজ্যপথ আবহমানকাল থেকে এই সেদিন অবধি অবারিত ছিল। প্রথম পথটি পেশাওয়ার, হাজারা মুজাফ্‌ফরবাদ, সোনামার্গ, জোযিলা ও কার্গিল হয়ে লেহ্‌, এবং তারপর তিনটি গিরিসঙ্কট একে একে পেরিয়ে সিনকিয়াং-এ পৌঁছানো। লেহ্ শহরের নিকটবর্তী যে সঙ্কট সেটির নাম 'খার্দংলা' (১৮,৩৮০), তারপর 'মুজতাগ' কারাকোরমের প্রথম সঙ্কট 'সাসেরলা' (১৭,৫০০) এবং তৃতীয়টি খোদ কারাকোরম গিরিসঙ্কট (১৮,৩০০)। দ্বিতীয় পথটি এই আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে। এটি আসছে পূর্ব-পাঞ্জাবের পার্বত্যপথের ভেতর দিয়ে লাহুলের অন্তর্গত কেলং জনপদ এবং 'বড়ালাচা গিরিসঙ্কট' (১৬,০৪৭) অতিক্রম করে। এ পথটি জাস্কার প্রদেশের 'সুতক' জনপদের ওপর দিয়ে আসছে 'উপসি', এবং 'উপসি' হয়ে যাবে লেহ্-র দিকে। তৃতীয় পথটি আসছে বহু দূরবর্তী 'লাসা' নগরী থেকে। এই পথটি লাসা নগরীর দক্ষিণে নেমে 'সাংপো' বা 'ব্রহ্মপুত্র' নদ পার হয়ে 'গিয়ানৎসি'তে এসে চুম্বিকালিম্পংয়ের পথটির সঙ্গে মিলেছে। তারপর এই দুটি পথ একত্র হয়ে পুনরায় উত্তর পশ্চিম দিকে 'সিগাৎসি' জনপদে 'সাংপোর' ধারে এসে পৌঁছেছে। অতঃপর ওই সাংপো বা ব্রহ্মপুত্রের দুই পারের উপত্যকা পথে পশ্চিমে প্রায় ৮০০ মাইল পেরিয়ে মানস সরোবরের উত্তর জনপদ 'তোকচেন'-এ এসে এই পথ উত্তর দিকে চলে যায়। কৈলাস গিরিশ্রেণীর পশ্চিম উপত্যকা এবং হুনদেশ অতিক্রম ক'রে সিন্ধুনদের তীরে-তীরে এই পথ ভারতীয় এলাকা 'দেম্‌চক্' অঞ্চলে প্রথম প্রবেশ করে। অতঃপর এই পথটি উত্তরে 'চুসুল' ও 'শিয়োক' নামক দুটি জনপদ ছাড়িয়ে 'শিয়োক' ও 'নুবরা' নদীর তীরে-তীরে পূর্ব বর্ণিত দুটি পথের সঙ্গে মেলে। শেষের অঞ্চলটি 'চিপ-চাপ' নামে পরিচিত।

শেষের এই তৃতীয় পথটির সমস্যা থেকেই ভারত-চীনের আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বেধে ওঠে। এই পথটি সমস্ত তিব্বত পেরিবে সিনকিয়াং পৌঁছবার আগে ভারতীয় এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, এই প্রশ্নের থেকে চীনের নূতন শাসকবর্গের মনে একটি বিদ্বেষের জন্ম ঘটে! সেই কারণে প্রাচীন 'চীন সাম্রাজ্যের' অতি পুরনো মানচিত্র-গুলির প্রচার বন্ধ ক'রে তাঁরা নূতনকালের কয়েকটি মানচিত্র চীনের নিরীহ অধিবাসি-গণের মধ্যে প্রচার করেন। এই মানচিত্রগুলি দেখে শুধু ভারত নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন, উত্তর মঙ্গোলিয়া, বর্মা, আফগানিস্তান, এমন কি সেদিনের পাকিস্তান অবধি বিস্ময়াবিষ্ট হন। চীন সাম্রাজ্য অনেকটা 'রূপকের' মতো। কেননা চীনের মূল ভূভাগের বাইরে যারা থাকে তাদের সঙ্গে চীনের না আছে সদ্ভাব, না কোনও কায়িক সংযোগ। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষা, বর্ণমালা, সমাজনীতি, জীবন যাপন

পদ্ধতি,—এগুলি বিবেচনা করলে চীনের সঙ্গে তিব্বতের, তিব্বতের সঙ্গে সিনকিংয়াং-এর, সিনকিয়াং-এর সঙ্গে চীনের,—কোথাও কিছুমাত্র মিল নেই! বহু প্রাচীনকালে অর্থাৎ ৭ম শতাব্দিতে চীন দেশে ট্যাং বংশের আমলে চীনের কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। জেঙ্গিস খাঁর গোষ্ঠী চীন জাতি নয়। তৈমুর লঙ্গ চীন আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন নিজবলে অধিকৃত এলাকার ভেতর দিয়ে। কম্যুনিজমের মধ্যে যেটুকু গণতন্ত্রভাব আছে সেটুকু যদি মানতে হয় তবে সিনকিয়াং, তিব্বত, আন্তঃ-মঙ্গোলিয়া—এরা চীনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ভারতীয় পুরাণে এবং প্রাচীন তিব্বত ও চীনের মানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় হিমালয় ও কৈলাস গিরিশ্রেণীর (কৈলাস শিখর সহ) মাঝখানে শতদ্রু নদীর সম্পূর্ণ উপত্যকাভূমি ভারতের অংশস্বরূপ ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে ছিল খেচরনাথ, গুরুমান্ধাতা, জ্ঞানীমণ্ডি, তীর্থাপুরী, থুলিঙ্গ মঠ, জম্বু রাক্ষস ও মানসসরোবর, গার্টক, মীনসায়র তাসিগং এবং এদেরই সঙ্গে ছিল পাঁচখানা ভূটানী গ্রাম। ভারত এগুলি ধীরে ধীরে ছেড়ে এসেছে।

সে যাই হোক, চীনের এই 'রূপক' সাম্রাজ্যের সীমানা কোথায়-কোথায় এবং কি-কি অছিলায় টানতে হবে, এই প্রশ্নটি ছিল রক্তিম চীনের শাসকবর্গের মনে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করার পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দেই তাঁরা তিব্বতে 'মুক্তিফৌজ' পাঠান। অর্থাৎ অসতর্ক, নির্বিরোধ, মূঢ় ও প্রাচীন একটি আত্মনিয়ন্ত্রণশীল বৌদ্ধরাজ্যকে তাঁরা অকারণে আক্রমণ করেন! ১৯৫৬ সালে চীনের রক্তিম শাসক দিল্লীতে এসে ভারতের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না' নামক তিনটি নাড়ি (বায়ু, পিত্ত ও কফ) উত্তমরূপে টিপে জেনে গেলেন, জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক মায়াবাদ আজও ভারতীয় মনকে নিঃসাড় করে রেখেছে। সুতরাং অবিলম্বে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে লাদাখের পূর্বদিকের 'মুণ্ডটি' তাঁরা নিঃশব্দে কেটে নিলেন,—পৃথিবীবাসী কেউ জানল না!

কেন নিঃশব্দে কাটলেন, এবং অত বড় একটা ভদ্র জাতির প্রতিনিধি হয়ে কেন এমন ক্ষুদ্রতার পরিচয় তাঁরা দিলেন, সেটি এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি! তিব্বত থেকে সিনকিয়াং যাবার অন্য পথে দুরারোহ পর্বতমালা—নিয়েনচেনটাংলা, কৈলাস ও কুনলুনের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, অগণিত সংখ্যক হিমবাহ, শত শত লবণাক্ত ও বিস্বাদ জলাশয়, হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী নিষ্ফলা ভূমি; যাযাবর, ধর্মান্ধ এবং অতি হিংস্র ছলীয় ও খাম্বা সম্প্রদায়; স্বচ্ছন্দচারী ও নৈরাজ্যবাদী পার্বত্য উপজাতি, এবং সম্মিলিত চীন বিরোধী বৌদ্ধসমাজ,—এই সকল সমস্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে সিনকিয়াং থেকে সুগম পথে তিব্বতের মধ্যে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রবেশ করা দরকার। সেই সুগমপথটি একমাত্র ভারতীয় এলাকা, অর্থাৎ পূর্ব লাদাখ।

যে 'মুণ্ডটি' তাঁরা কেটেছেন, সেটি ১৮ থেকে ১৯ হাজার ফুট উঁচু একটা কঠিন

নিরেট মৃৎচিহ্নহীন সমতল প্রস্তর ভূমি। সেখানে আছে কয়েকটি নদী, হিমবাহ এবং লবণাক্ত জলাশয়। ইতিহাসের কোনও যুগ থেকে অদ্যাবধি সেখানে 'একটি মানুষও বাস করেনি এবং একটি মাত্র তৃণফলকও জন্মায়নি।' ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে শান্তি-বাদী নেহরু প্রস্তাব করেন, "উভয়পক্ষের যুদ্ধ সীমানা থেকে উভয়পক্ষের সৈন্যদলকে সরিয়ে নেওয়া হোক এই শর্তে যে, আকসাইচিন রোড দিয়ে শুধু 'অসামরিক' (চীন-পক্ষের) চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।" "(with the proviso that the Chinese would be permitted to use the Aksai Chin road for civilian purposes)"

চীনের নূতন শাসকবর্গ সম্ভবত এই প্রস্তাবটি শুনে মনে মনে হেসেছিলেন, কেননা এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ—চীন সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটানো! 'আকসাইচিন রোড' বর্তমান চীনের প্রধান প্রাণসূত্র পথ। এইটি এখন একমাত্র যোগাযোগের পথ, যেখান দিয়ে সমর-সম্ভার পৌঁছয় নেপালের 'মাস্তাং' পর্যন্ত! এই পথের সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ তিব্বতের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত। সুতরাং আকসাইচিনের কঠিন ভূমিতে কঠিনতরভাবে বসে বসে নেহরুর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার কালে তাঁরা প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই অনুকরণ করেছিলেন। অর্থাৎ এইটি বিশ্বাস করেছিলেন যে "Possession is nine-tenth."

॥ ১০ ॥

রূপস্থ-লিকির-বাজ্‌গো-নীমূ-ফিয়াং-পিতুক

প্রকৃতি সুন্দর হয় আপন ঐশ্বর্যসম্পদে। শ্যামলিমায় সে মনোরম। অরণ্যের শোভায়, পুষ্প সমারোহে, বৃক্ষ-বনস্পতি ও তৃণগুল্মে, পাখির কূজন-গুঞ্জনে, আলোকে ও মেঘের বিভিন্ন বর্ণমালায়—সে অপরূপ। প্রকৃতি সেখানে আনন্দময়ী। কিন্তু সমস্ত লাদাখে সেই প্রাকৃত পৃথিবী অতি হিংস্রতার চেহারা নিয়ে মরুচারিণী হয়েছে। দগ্ধ, রুক্ষশ্রী, নির্ভূষণা, মস্তক-মুণ্ডিতা ও নিরাবরণা,—তাকে দেখলে ভয় করে!

'রূপস্থ' প্রদেশ হল সেই ভয়ভীষণা আনগ্না পৃথিবী। এটি লাদাখেরই অংশ। 'তোগলুং' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে যাবার কালে মরু পার্বত্য লোকের সর্বশূন্যতার মাঝখানে চোখে পড়ে একটি বৃহৎ নীল হ্রদ,—যেটির জল অতি কুস্বাদ (brackish)। শীতের দিনে এই হ্রদ বরফে জমে যায়,—এর ওপর দিয়ে পেরিয়ে যায় ঘন বৃহৎ লোমযুক্ত ভেড়া ও ছাগলের পাল। যারা তাদের চরিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদের নাম 'চাম্পা।' এরা স্থানীয় অধিবাসী। বালুর মধ্যে কীট যেমন ঘোরে এই স্বল্পসংখ্যক 'চাম্পার' জীবন-যাত্রাও অনেকটা সেই প্রকার। এককালে এরা সম্মিলিত হ'ত একটি স্থলে, যেখানে পাথরের ছোট ছোট কয়েকটা গুহাকক্ষ, যেখানে জন্তুর চামড়া দিয়ে বানানো তাঁবু; আর নৈলে এক প্রকার ঝোপড়ার আশ্রয়—যার মধ্যে ঢুকলে বরফানি বাতাস ও বালুর ঝাপটা থেকে কোনও মতে আত্মরক্ষা করা চলে। এই পথ দিয়ে যখন পাঞ্জাব বা ইয়ারকন্দের সওদাগররা লাহুল বা স্পিতির দিকে আনাগোনা করত—তখন চাম্পাদের দিন মন্দ যেত না। তাদের ক্যারাভানে থাকত উট বা পাহাড়ী ঘোড়ার দল, সঙ্গে থাকত প্রচুর বাণিজ্য সম্ভার ও খাদ্যসামগ্রী। তাদের সেবায় লাগলে ছিটে ফোঁটা বকশিস জুটে যেত এবং ভেড়া ছাগলের মাংস যোগাতে পারলে গম, যব বা ভুট্টার দানাও মিলে যেত। যে স্থলটিতে এইরূপ বিনিময় ব্যবস্থা চলত এবং যেটি ক্যারাভানের বিরতিকেন্দ্র বলে পরিচিত সেই কেন্দ্রটির নাম 'গাইয়া, (Gya)। এই ধরনের বিরতি-স্থল শুধু লাদাখ বা কাশ্মীরেই নয়,– এককালে পাঞ্জাবে, হিমাচলে, তিব্বত ও নেপালে, আফগান বা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, বেলুচিস্তানে বা মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে শত শত সংখ্যক ছিল। এইগুলিরই রাজ-সংস্করণ হল 'সরাই।' উত্তর ভারতে এমন 'সরাই' এখনও অনেক আছে।

চারদিকের এই ভীষণা প্রকৃতির উগ্র রুক্ষতার মধ্যেও এক নতুন রস পাচ্ছিলুম। একটি তৃণফলক যেখানে মাথা তোলেনি, একটি সামান্য ফুল কোনও যুগে যেখানে দোলেনি, একটি পাখি কখনও যেখানে কলকণ্ঠে ডাকেনি, একটিমাত্র বৃক্ষ যে দেশে স্থলচিহ্নস্বরূপ কখনও দাঁড়ায়নি,—সেখানে অদ্ভুত একটা রস আছে বৈ কি! শুকনো হাওয়ার ঝলক পলকে-পলকে শুকিয়ে দিচ্ছে এখানকার "বর্জিত সৃষ্টি অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে"। এ যেন আমারও হাড়পাঁজরা সমস্ত শুকিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। চোখ, চুল, আঙুল—একে একে শুকিয়ে যেন ঝুনো হচ্ছে। অনাদিকাল থেকে পাহাড় পর্বত ঝাঁঝরা হচ্ছে ঝামার মতো,—তার শাঁস বেরিয়ে আসছে শুকনো খড়ি-পাথর হয়ে! কে বললে রস নেই 'রূপস্থতে?'

রূপস্থুর এই অনড় অতিকায় সরীসৃপের মৃতদেহ ধুলোর মধ্যে প'ড়ে রয়েছে আবহমান-কাল। হাজার হাজার বছরের সেই প্রাগৈতিহাসিক 'সরীসৃপের' ধুলি ধূসরিত মৃত কঙ্কাল সহসা আজ নাড়া খেয়েছে সীমান্ত সংঘর্ষে। আজ রুক্ষপাথর ঢাকা 'অগণ্য বিস্মৃতির' স্তর সরিয়ে আমি এসে তার 'শববক্ষে কান পেতে' শুনতে চাইছি তার নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন আজও ধুকধুক করছে কিনা! জানি তা'র রসরক্তের তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই, জানি এটি ভারতেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও একটি তারিখও খুঁজে পাইনি, যে-তারিখে এই অঙ্গ পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গিয়েছিল! এই মানহারা ক্ষুধাতুরা স্নেহবঞ্চিতা রূপস্থ আপন বুকের জ্বালায় হাহাকার করেছে চিরকাল রুক্ষ হাওয়ায়,—আমি এসে দাঁড়িয়েছি এক নগণ্য ভারত-পথিক চারদিকের সর্বশূন্যতার সাক্ষ্য হ'তে।

রূসস্থুর লবণ হ্রদ 'সোকার' একটি উপত্যকায় অবস্থিত। এই উপত্যকা ৫ মাইল চওড়া এবং ১৩ মাইল লম্বা,—এবং এটির উচ্চতা প্রায় ১৫ হাজার ফুট। রূপস্থুর দক্ষিণ পথে অনেকগুলি পার্বত্য জলধারা বালুপাথরের ভেতর দিয়ে বয়ে আসে, সেগুলিকে নদীও বলা চলে। এদের কয়েকটি গেছে নীচেকার তিব্বতে, কয়েকটি গেছে লাহুলের মধ্যে, কোনটা সুদূর শতদ্রুর মধ্যে গিয়েও মিলেছে। এই নদীগুলির মাঝামাঝি একটি উপত্যকার নাম 'ফির্সা', এবং দ্বিতীয় আরেকটির নাম 'রুকৃচিন' বা রুক্ষদেশ! এই দুই উপত্যকার মাঝামাঝি যে বিশাল ও 'কুস্বাদ' নীল হ্রদ, সেটির নাম ইদানীং সংবাদপত্রে বিদিত 'সো-মোরারি'। এই হ্রদের চতুর্দিকেই কয়েকটি তুষার গলিত মিষ্টি জলধারা নেমে আসছে। কিন্তু অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে আগাগোড়া সমস্ত জল ও জলাশয় তুষারস্তূপে পরিণত হতে থাকে। সো-মোরারির দৃশ্য যেন আদিম জগতের বিস্ময় উদ্রেক করে। চারদিকে মরু-পার্বত্যলোকের মাঝখানে এই ৭৫ বর্গমাইল ব্যাপী বিশাল জলাশয়টি যখন সুনীল বর্ণ বিকীর্ণ করে তখন এটিকে দ্বিতীয় মানস সরোবর ব'লে মনে

হ'তে থাকে। ইতিহাসের কোনও পর্বে এ অঞ্চলে মানববসতির একটি চিহ্নও দেখা যায়নি, কিন্তু পারিপার্শ্বিক খড়ি পাথরের পাহাড়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তিন প্রকারের পাখি এসে এর নরম গা কুরে' কুরে' ডিম পাড়বার ব্যবস্থা করে! একটি ঈগল, দ্বিতীয়টি সুদূর বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক শ্বেতপক্ষী (sea-gull) এবং তৃতীয়টি যাযাবর বনহংসী। শীতের প্রারম্ভে এই বনহংসীর দল হিমালয় পার হয়ে দক্ষিণের গাঙ্গেয় সমতলে গিয়ে যখন নামে, তখন আমরা এদের জন্মস্থলের কথা কল্পনাও করিনে! এই পাখিরা কখনও মানববসতির কাছাকাছি বাসা বাঁধে না। এরা দুরারোহ, অনধিগম্য ও প্রাণীশূন্য পার্বত্যলোক খুঁজে বেড়ায়, ও এই ভাবেই 'কোটর-কূট' খোঁড়ে এবং নিজের ডানা থেকে পালক খুলে বিছানা প্রস্তুত করে।

'সো-মোরারি' ছাড়াও যে কয়টি সুস্বাদ জলাশয় দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটির নাম 'সো-কিয়াঘার।' কিন্তু এদের মধ্যে একটি ছোটখাটো পানীয় জলের দিঘিও পাওয়া যায়, সেটিকে বলে, 'পানবুক।' এ অঞ্চলের বাতাস অতি শীর্ণ ও শুষ্ক। সেই কারণে এখানে বোঝা কেউ বহন করে না,—পাছে বায়ুশীর্ণতা এবং অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুস ফেটে যায়। বোধ করি শ্বাসপ্রশ্বাসের উপযুক্ত বায়ুর অভাবেই এখানকার যাযাবর গোষ্ঠী বছরের মধ্যে বারম্বার বাসস্থান বদলিয়ে বেড়ায়। সমগ্র শীতকাল এই ভূভাগ একটা বৃহৎ মানবশূন্য ও প্রাণীশূন্য এলাকায় পরিণত হয়। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই, শীতকালেও এরা গরমের (!) ভয়ে কাশ্মীরে যায় না পাছে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। যায় লেহ্ অঞ্চলে—কেননা রূপস্থুর তুলনায় সেখানে কম ঠাণ্ডা !!

উত্তর লাদাখের সিয়া মুসলমানগণ বহুপত্নীক, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্বের লাদাখবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ, এবং তাদের মেয়েরা বহুভর্তৃকা। সুতরাং এদিকেও চেয়ে দেখেছি মেয়ের সমাদর প্রচুর। পাঁচজন পুরুষে তার জুতো বানিয়ে দিচ্ছে, শিশুকে বহন ক'রে নিয়ে ফিরছে পুরুষ, নিজেরা লবণের পুঁটলি বা দানার ঝুলি বয়ে বেড়াচ্ছে,—কথায়-কথায় মেয়ের উপর বোঝা চাপাচ্ছে না। একটি সন্তান হ'লে পাঁচজন তার দায়িত্ব নিচ্ছে, এবং মেয়ের কাছে প্রশ্ন করছে না, নবজাতকের প্রকৃত জনক কে! মহাভারতের দ্রৌপদী জানতেন কোন্‌টি কার। বোধ হয় দু'একবার তিনি কোথায় যেন এটি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু লাদাখের মেয়েরা সে সম্বন্ধে চুপ। সে যাই হোক, এই কারণটির জন্যই বোধ করি বহুভর্তৃকার গর্ভে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম হয়নি। কিন্তু এ ধরণের আলোচনায় আমার অধিকার কম।

তবু চারদিকের এই পাণ্ডুর পর্বতশ্রেণী এবং বালু পাথরে আকীর্ণ নিষ্ফলা ও তৃণলতাচিহ্নহীন রূপস্থুরও একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র বর্তমান,—সেটি হ'ল একটি বৌদ্ধ

গুম্ফা! নাম 'কারজোক।' এই গুম্ফার আভ্যন্তরীণ কারুকর্মের অজস্র সম্ভার দেখে বিস্মিত হতে হয়। সমস্ত কাঠ এসেছে পাঞ্জাবের জঙ্গল থেকে। একজন ইংরেজ বলেছেন, "..how they were carried from great distances! It is only devotion which inspires" কালক্রমে এই গুম্ফায় মণি, রত্ন, সোনা, পিতল, স্ফটিক, মূর্তি, শিল্পচিত্র, রেশম, বিভিন্ন রৌপ্যসজ্জা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। কারজোকের এই গুম্ফাভবন ছাড়াও কয়েকখানা পাথুরে গুহাকক্ষ বহুকাল থেকে যেন বালু পাথরের মাঝখানে ভগ্নাবশেষের মতো এখানে ওখানে ছড়ানো। গুম্ফায় থাকে কয়েকজন লামা, কিন্তু পাঞ্জাবী বা ইয়ারকন্দি সওদাগররা না এলে ওই পাথরের বেষ্টনীঘরগুলি শূন্যই পড়ে থাকে। এই গুম্ফার আশেপাশে একটু আধটু মৃন্ময়তার চিহ্ন দেখা যায়—সেখানে লামারা যবাদি ফলাবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সওদাগররা এসে পৌঁছলে এ অঞ্চলে একটা বিকিকিনির ব্যাপার চলতে থাকে। 'কারজোক' গুম্ফার ঠিক সম্মুখেই বৃহৎ উর্মিমুখর 'সো-মোরারি'র জলাশয়। এই জলাশয়টি সমুদ্র সমতা থেকে ১৫ হাজার ফুট উঁচু এবং এর পূর্ব-পর্বতের অধিত্যকাপথ ধ'রে আন্দাজ ১৫ মাইল গেলে যে নদীটির ধার পাওয়া যায় সেটির নাম 'হান্‌লে'। নদীর পূর্ব পারে 'হান্‌লে' নামক বৌদ্ধ জনপদ। এই সেদিন পর্যন্ত এই ভারতীয় পণ্যকেন্দ্রটির সঙ্গে পশ্চিম তিব্বতের স্বাভাবিক কাজ-কারবার চলত। রাষ্ট্র সীমানার কথা সেদিন পর্যন্ত ওঠেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যটা ছিল অনেকটা আত্মীয় সম্পর্কের মতো। হিমাচল রাজ্যের অন্তর্গত 'সিপকি' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে ভারতীয় বণিকের দল তিব্বতীয় জনপদ 'লুক ও ডুঙ্কার' হয়ে 'গার্তক' বাণিজ্য-কেন্দ্রে এসে পৌঁছত। ভেড়ার লোম, লবণ, তিব্বতী 'কিউরিয়ো' ইত্যাদির বিনিময়ে তিব্বতীরা কিনত চাউল, যবের আটা, চিনি, সজ্জি, সোডা ও সাবান এবং মনোহারী সামগ্রী। পুরঙ্গ উপত্যকায় এবং হুন দেশে প্রত্যেক ১৫ মাইল অন্তর এক একটি বাজার বসত ৩।৪ মাসের জন্য এবং পশ্চিম তিব্বতীরা এদেরই ভরসায় থাকত। তাকলাকোট থেকে রূপসুর নিকটবর্তী তাসিগং, এমন কি আরও উত্তরে 'রুদক' পর্যন্ত এই বাজার প্রসারিত হত। চীন শাসকবর্গের নির্দেশের ফলে ইদানীং এ সকল বাজার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

রূপসুর দক্ষিণে 'চুমার' নদীর ধারেও যে বৌদ্ধ জনপদ, সেটিও 'চুমার'। এরই নিকটবর্তী সীমান্ত জনপদ 'দেম্‌চকের মতো এটিও ভারতের প্রান্তিয় এলাকা। এ অঞ্চলে শতদ্রুর উপনদী 'চুমার' ও সিন্ধু উপত্যকার মাঝামাঝি এক গিরিসঙ্কট 'ফলোকঙ্কা-র' (১৬৫০০) গভীর গিরিখাদটির নাম 'রং'। কিন্তু এ সকল অঞ্চল চিরদিনই জীবশূন্য। দিনের বেলাতেও এদিকে পর্যটন করতে গেলে গা ছমছম করে। এখানে বিশাল গিরিশ্রেণী তিব্বতের সীমানাকে নির্দেশ করছে। এই পর্বতমালার

ভেতর দিয়েই দক্ষিণ পথে তিব্বতের ভেতরে নেমে গেছে 'চুমার নদী', তারপর সেটি ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল 'কউয়িরিক' হয়ে 'সিপ্‌কি গিরিসঙ্কটের কাছে 'নামগিয়া' জনপদে শতদ্রু নদীর সঙ্গে মিলেছে। শতদ্রুর মূল উৎস মানস ও রাবণ হ্রদ এলাকায়।

জাস্কারের পার্বত্য প্রদেশটিতে দাঁড়ালে উত্তরে নুন-কুনের দুইটি আকাশস্পর্শী চূড়া দেখা যায় (২৩,৪১০)। দুটি চূড়ারই প্রায় সমান উচ্চতা। কিন্তু কাশ্মীরের নুনকুন থেকে লাহুল অবধি অবিচ্ছিন্ন হিমবাহশ্রেণী একটির পর একটি। তাদেরই জলাবতরণ ভূমি হল জাস্কার গিরিপ্রদেশ। এরই ভেতর দিয়ে জাস্কার নদী অপর একটি উপনদীর সঙ্গে মিলে পূর্বপথে মহাসিন্ধুর দিকে চলে গেছে। নদীর সংখ্যা জাস্কার প্রদেশে কম নয় এবং প্রত্যেক জলধারা পথই তাদের দুই পারে মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ এবং গাছপালা সৃষ্টি করে চলেছে। গাছপালার সঙ্গে কিছু কিছু যবের ক্ষেত মানেই এক ফোঁটা জনবসতি, এবং জনবসতির আয়তন অনুযায়ী এক একটি ছোট বা বড় বৌদ্ধ গুম্ফা বা মঠ। এখানে প্রধান জনবসতিগুলির নাম হল আত্রিং, পদম, চের, সুতক প্রভৃতি। ক্যারাভান-পথে এগুলি সরাইখানার কাজ করত। মানব জন্মের ঋণ শোধ ভিন্ন এসব জনবসতির অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। এরা বৌদ্ধ। কিন্তু সভ্যতার থেকে বিচ্ছিন্ন। জাস্কার প্রদেশটি লাদাখের একটি কনিষ্ঠ ভূখণ্ড, এর আয়তন ৩ হাজার বর্গমাইল এবং এর উচ্চতা প্রায় ১৩২০০ ফুট। জাস্কার হল 'জাংস্কারের' অপভ্রংশ। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ, শ্বেততাম্র বা পিতল। সমগ্র লাদাখের বর্ণই পাণ্ডুর পিতল। আমরা বালু পাথর ও জনশূন্য পার্বত্য লোকের ভিতর দিয়েই অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিলুম।

কোথায় দক্ষিণ পথে প'ড়ে রইল সেই 'উপসি' জনপদ। আমরা মহাসিন্ধু নদের ওপারে দক্ষিণ উপত্যকার ভেতর দিয়ে লাদাখের রাজধানী লেহ্‌র দিকে যাচ্ছিলুম। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু এ পথ অতটা ধু ধু করছে না। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে গুল্মগুচ্ছ ও কাঁটালতা। কোথাও কোথাও শুকনো ঘাস বা 'জুনিপারের' ঝোপ। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে গিরিগাত্রের জলধারা, কোথাও বা সেটি তুষারে পরিণত। কচিৎ পাওয়া যাচ্ছে যবের ক্ষেত, হয়ত গোটাকতক ফলের গাছ, আর নয়ত বা দু'একজন মেয়েপুরুষ। একটু ঠাওরে মেয়েপুরুষের পার্থক্য নিরীক্ষণ করতে হয়। কারণ মাথার পাকানো বেণী, টুপি, পোশাক, চাহনি— অনেকটাই উভয়ের এক। পুরুষের গোঁফ-দাড়ি নিরুদ্দেশ। মেয়েছেলে সামনে এসে দাঁড়ালে সর্বাঙ্গের বিশেষ বিশেষ চিহ্নগুলিও খুঁজে পাইনে!

একটি শাখাপথ চলে গেছে পশ্চিমে। এটি গিয়েছে সোজা পাহাড়ের ওপরে। ওরই মধ্যে এ যেন একটা বিবাগী পথ একেবারে উঠে গেছে চড়াই ধ'রে। আন্দাজে

অনুমান করা যায় দুই থেকে আড়াই হাজার ফুট চড়াই। ওপরে একটি ক্রোড় পর্বতের শীর্ষে ছবির মতো যে গুম্ফাটি দেখা যায় সেটির নাম 'লিকির।' এই গুম্ফাটি একটি দুর্গের মতো এবং দূর নীচের থেকে যারা আসে, তারা যেই হোক—এখানকার সতর্ক প্রহরী তার দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। পাহাড়ের দিকে কিছু সামান্য ক্ষেতখামার এবং জলধারাপথ। এটি ওই লিকির গুম্ফারই শাসনাধীন একটি বৌদ্ধগ্রাম। গ্রামের আশেপাশে কয়েকটি চূণ মাখানো চোর্তেন ও একটি মন্দির বর্তমান। ওখান থেকে আন্দাজ মাইল দুই পথ এঁকে বেঁকে উঠেছে অনেক উঁচুতে—যার উচ্চতা লাদাখের এই সমতল থেকে ২ হাজার, অর্থাৎ সমুদ্র সমতা থেকে ১৪ হাজার ফুটের কিছু বেশি। কিন্তু এই ক্রোড়পর্বতের পেছনে চলেছে লাদাখের গিরিশ্রেণী,—তার উচ্চতা ২৫ হাজার ফুটের কম কি না আমি জানিনে। কিন্তু লিকির গুম্ফার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে দূর দিগন্তলোক যে আলোকের এবং আকাশের সিংহদ্বার খুলে দেয় সেটি এক অনাদি-অন্তকালের উদার মহিমা! সেই ক্ষণকালের উপলব্ধির মধ্যে মহাকাব্য যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। চারিদিকে দিগ্‌ দিগন্তব্যাপী অনন্ত পর্বতমালা আকাশের নীচে যেন থৈথৈ করছে। রক্তিম, পীত, নীলাভ, গৈরিক, কৃষ্ণাভ—সমগ্র পর্বতরাজ্যে বর্ণ-বৈচিত্রের আশ্চর্য সমাবেশ। মেঘ, বর্ষা শ্যামলিমা, অরণ্য ঐশ্বর্য,—না কোথাও কিছু নেই! আছে ওপরে নির্মেঘ, নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ, আর আছে—দৃষ্টি যেদিকে যতদূর যায়,—শুধু তুষারস্তরের সমাবেশ। এইখানে দাঁড়িয়েই অবাক চোখে দেখা যায় সুদূর উত্তরে কারাকোরমের চূড়া এবং সুদূর দক্ষিণে কৈলাসের সেই আশ্চর্য শিরোমুকুট।

গুম্ফার চারদিকে মস্ত উপত্যকা। গাছপালা ক্ষেতখামারসহ এখানেও দু'চার ঘর লামা বাস করে। তাদের সঙ্গে ভেড়া ছাগল এবং তাদের পাহারা দিচ্ছে লোমশ কালো কয়েকটি কুকুর। এখানে ওখানে পাথরের দেওয়ালে অবরুদ্ধ, তার মাঝে মাঝে প্রবেশ পথ। কিন্তু প্রবেশ পথে ঢুকলেও গুম্ফায় পৌঁছতে গেলে বহু সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়। বায়ুশীর্ণতা এখানে কথায় কথায় অতিশয় ক্লান্তি আনে।

এ গুম্ফা বিশেষ সম্পদশালী বলেই একে পাহারা দিতে হয়। ভেতরটা একটি বড় কক্ষ-সমান। কিন্তু যে-কোনও গুম্ফায় প্রবেশ করা মাত্র যেমন ছায়াছন্ন ভিতরের বন্ধ ধূপের গন্ধে একটা প্রাচীনের আভাস ও সংকেত লক্ষ্য করা যায়, এই গুম্ফায় সেই প্রাচীন যেন আরও বেশী রহস্যময়। প্রাকস্বাধীনতা আমলে বনময় 'অজন্তা' যেমন ছিল, যেমন ছিল খাজুরাহোর কন্দর্পনারায়ণ', বোম্বাই সমুদ্রের হস্তী গুম্ফা,—সেই সব স্থলের প্রাচীন অতীত যেন চুপি চুপি ভৌতিক ভাষায় ফিসফাস করত। এই গুম্ফার আভ্যন্তরীণ চেহারাও তাই—এর নিমীলিতনেত্র স্বর্ণবুদ্ধ বসেছে স্বর্ণ সিংহাসনে। এখানে বজ্রতারা আর বজ্রপাণি, পাশে সেই অবলোকিতেশ্বর মঙ্গোলিয় ছাঁচে ঢালা, এখানে বুঝি

লোকেশ্বরী,—কাছে ধারে এক একটি দন্তরাক্ষস। মূর্তি অসংখ্য। চারদিকে অলঙ্কার, চীনাংশুকের বিভিন্ন গালিচা, অসংখ্য রঙীন ছবি এবং আঁকাজোকা, দালাই লামার পোটালা প্রাসাদের পট,—চারদিকে বিচিত্র চারুকলা ও শিল্পচাতুর্য। মূর্তিগুলির কোলের কাছে অগণিত সংখ্যক জলপাত্র সাজানো— যেমন প্রত্যেক গুম্ফায় দেখা যায়। দিনে দুইবার এই জল বদলানো হয়। একদিকে শিঙ্গা, ডমরু, ডঙ্কা ও বৃহদাকার মৃদঙ্গ। নির্দিষ্ট কয়েকটি তিথিতে—যেমন শিব চতুর্দশীর রাত্রে, অথবা বৌদ্ধ পূর্ণিমায়—যখন মধ্য এশিয়া নিথর ও নিশ্চুপ হয়ে থাকে, তখন এখানকার 'লামাউরু' শিঙ্গাধ্বনি ও মৃদঙ্গের গুরু গুরু নাদে ডাক দেয় দিগ্‌দিগন্তে। বোধ হয় সেই লগ্নে শাকাথুব্বার (শাক্যস্থবির) অপার করুণাময় স্তিমিত দুই নয়নে সচেতন দিব্য বিভা ঝলকিত হয়!

শাকাথুব্বা ও মঞ্জুশ্রীর মূর্তি একটি অন্ধচ্ছায়াকক্ষে বিরাজমান। পাশেই পুঁথির আড়ং—যেমন হয়। গুরুলামা জানেন, কী আছে ওই রাশি রাশি পুঁথির মধ্যে। আছে কি লাদাখের ভবিষ্যতের কোনও সঙ্কেত? আছে কি মধ্যএশিয় জীবনের কোনও নতুন ব্যাখ্যা? নতুন ভাষ্য আছে কি এই অনড় অচল বৌদ্ধ দর্শনের? এই বালু জগতের তলায়-তলায়, এই নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন গিরিশ্রেণীর অন্দরে-কন্দরে আছে কি সেই বিপুল প্রাণসজ্জা,—যেখান থেকে উঠে আসবে প্রকাণ্ড এক দৈব হিংসা, ছারখার করবে চারদিকের এই প্রাচীন জড়তা, এই অলস তন্দ্রা,—ভেঙ্গে দেবে আগাগোড়া যা মানুষকে মূঢ়, দুর্বল, নিত্য আত্মরক্ষণশীল এবং ভয়ভীরু করে রাখে? আছে কি এমন কোন মন্ত্র ওই শুকনো পুঁথির কোনও পাতায়? জানিনে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার আগে এক একটি গুরুলামা কেন রেখে যায় এক একখানা পুঁথি, আর সেগুলি স্তরে স্তরে কোন্ প্রয়োজনে বেড়ে উঠেছে যুগের পর যুগ!—আর কেনই বা তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে এখানকার ক্ষুদ্র সংখ্যক মানব বংশ পরম্পরা! না, কিচ্ছু জানিনে।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, মণিরত্ন খচিত স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমূর্তি বুদ্ধকে রক্ষার জন্য একটি সংগোপন অস্ত্রশালা! অহিংসাকে চারদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে অস্ত্রসম্ভার, ঢাল তলোয়ার, ছোরা, কাঠের চোংয়ের বন্দুক। এটি বিশ্বাস করতে বাধে না, এ গুম্ফায় ধনরত্নের একটি ভাণ্ডার আছে। চারদিকের দরিদ্র ও দুঃস্থ সাধারণকে একপ্রকার শ্রদ্ধাবিমূঢ় ক'রে রাখার জন্য এই প্রকার ধনরত্ন সম্ভারের গুপ্ত প্রদর্শনী ভারতের বহু মন্দিরে ও মসজিদে দেখেছি। জীবনের ক্ষেত্রে যে-ধনরত্ন মানুষের কল্যাণের কাজে লাগে না, তার প্রকৃত সার্থকতা আছে কি না আমি জানিনে।

আবার এসে ধরলুম নিজের পথ। 'খালাৎসে' বা 'বুধখর্বুর' কথা ভুলিনি। সেখানেও পাহাড়ের দুর্গ আর ধনরত্ন রক্ষাভবন। সেখানেও তিন শ' বছর আগে রাজা ছিল,

গুম্ফা ছিল, গুপ্তধন ছিল। কিন্তু তারা কালক্রমে বাঁচেনি। গুপ্তধন-ভাণ্ডার নিজের স্বভাবেই চারদিকে শত্রু সৃষ্টি করে। যক্ষের ধন বাঁচে না, কেননা তার সঞ্চয় আছে, সদ্ব্যয় নেই। বুৎখবু মরেছে, খালাৎসেও বেঁচে নেই, লিকিরের ভবিষ্যৎ জানিনে। গ্রামের পথটি ছেড়ে আবার প্রধান পথটিতে ফিরে এলুম। এই ভ্রমণের প্রথম থেকেই চোখ পড়েছে লাদাখী বৌদ্ধ গুম্ফাগুলিতে আগাগোড়া একটি অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনা ; এরা যেন এদের প্রাণসূত্রটি হারিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্য করছি শুধু লাদাখ নয়, আজ সমগ্র বৌদ্ধ জগৎ মর্মে মর্মে দগ্ধ হচ্ছে 'লাসা তীর্থের' অপমানে! 'পোটালা' প্রাসাদের ছবি প্রতি বৌদ্ধের পূজ্য, যেমন মক্কার ছবি প্রতি মুসলমানের নমস্য। এরা রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্মাচরণ ও তীর্থভ্রমণকে বড় বলে মানে। সেই কারণে গয়া-কাশী-লুম্বিনী-লাসা—এগুলি প্রত্যেক লাদাখী বৌদ্ধের তীর্থযাত্রাপথ। লাদাখের বহু লামাগুরু তিব্বতে গিয়ে বন্দী হয়েছেন এবং সেখানকার বৌদ্ধ সমাজ প্রবলভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে, এরা এটি সর্বক্ষণ ধরে শুনছে। শত শত পলাতক তিব্বতী রেফুজি এসে আশ্রয় নিচ্ছে লাদাখে, তারা সবাই খবর দিচ্ছে তিব্বতের লোমহর্ষক ধর্মোচ্ছেদের কাহিনী। এরা সকল সময়েই শুনছে, চীনের রক্তিম শাসকবর্গ লাসানগরী তচনচ করেছেন বলেই দালাই লামা দেশ ছেড়েছেন।

তা হবে। ওসব আমার জানার কথা নয়। কিন্তু এটি বুঝতে পারি ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শন না থাকলে তিব্বতের দ্বাদশ শতাব্দির পুনরুজ্জীবন ঘটে না। একালে বসে দেখছি সেকালের তিব্বতকে। অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর থেকে মার্কোপোলো, তারপর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সবগুলি ইউরোপীয় মিশনারী এবং সোয়েন হেডিন—এদের সকলের চোখ দিয়ে তিব্বতকে দেখার পর সেখানে নিজে গিয়ে বাস করেছি প্রায় এক মাস। কিন্তু প্রত্যেক সংবাদদাতার প্রায় একই বক্তব্য। তিব্বত এককালে থাকত ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস মন্ত্রতন্ত্র জ্যোতিষ এবং ভয়াবহ আনুষ্ঠানিক কুসংস্কার নিয়ে। কে না বলেছে, তিব্বত সেই সেকালে কুবলাই খাঁর যুগেও বন্য, বাউণ্ডুলে, যাযাবর, বর্বর এবং নরমাংসভোজী ছিল? তিব্বতের এই মূল প্রকৃতিই কি একদা বাঙ্গালীর হাত থেকে তন্ত্র সাধনার নীতি গ্রহণ করেনি?

লাসা নগরী বৌদ্ধ জগতের চোখে পুণ্যতীর্থ। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিই কি এই পুণ্যতীর্থের জনক নয়? তিব্বত ত' ভারতেরই সৃষ্টি! বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সারনাথে দাঁড়িয়ে দেখলুম, স্বয়ং দালাই লামা সেখানে আভূমি নত হচ্ছেন! গয়া ও সারনাথ যে দালাই লামারও তীর্থ!

ধীরে ধীরে পাহাড় সরে যাচ্ছে দুদিকে। পথ প্রশস্ততর হচ্ছিল। মহাসিন্ধুর উপত্যকাপথ ধরে এমন একটি বিস্তীর্ণ সমতলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যার বিশালতা গত

কয়েকদিনে অনুমান করা একটু কঠিন ছিল। সমতল পৃথিবী ভুলতে বসেছিলুম।

সিন্ধুর ধার দিয়েই যাচ্ছিলুম। হঠাৎ এক স্থলে পথের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে "ইন্দাস ভিউ।' দক্ষিণের দুর্গম থেকে একটি বড় নদী এসে মিলেছে সিন্ধুর সঙ্গে। এটি সংযুক্ত নদী। একটির নাম 'জাস্কার' অন্যটি 'মার্খা'। মার্খা নামক জনপদটি দক্ষিণ-পশ্চিম জাস্কার গিরিমালার জটিলতার মধ্যে মিলিয়ে থাকে। সেখানে বাইরের জগতের কোনও খবর পৌঁছয় না।

মালভূমির এক বৃহৎ অংশে পৌঁছে দূর থেকে দেখা গেল, পুরনো কালের 'বাজ্‌গো' শহর। এককালে এই শহরের ওপর দিয়ে গেছে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ। পাহাড়ের একটি চূড়ায় গুম্ফা এবং চিত্রবৎ এই জনপদের অবস্থান-বৈচিত্র্যটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এটি 'নিমু' উপত্যকাভূমি এবং 'নিমু' নামক একটি অবস্থাপন্ন জনপদও চোখে পড়ে।

'বাজ্‌গো' একটি ঘটনাবহুল লাদাখী শহর। এর চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পরিবেশটি মনোজ্ঞ। চারদিককার মরুপাথরের মাঝখানে 'বাজ্‌গো'র মৃন্ময়তা ও সবুজ শস্যক্ষেত্র চক্ষুর পক্ষে এতই স্বস্তিদায়ক যে, মনে হয় একটি গীতি-কবিতার টুকরো ঝলমল করছে পাহাড়ের চূড়ায়। শহরের আশেপাশে ভগ্নাবশেষ,—যেগুলি ১৪শ ও ১৭শ শতকের নানা যুদ্ধ ও অশান্তির কাহিনী বহন করে। পাঠানরা 'বাজ্‌গো' আক্রমণ করে, বহু বৌদ্ধ মুসলমান হতে বাধ্য হয়; লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, দস্যুতা ও উৎপীড়ন চলে লামাদের উপর, দেশ-গাঁ ছেড়ে লোক পালায়—এটি কাশ্মীরের পাঠানরাজ শাহ মীর্জা থেকে সিকান্দার শাহ পর্যন্ত ওই একই কাহিনী। এই যুগ থেকেই ক্রমে ক্রমে কাশ্মীর শুধু আত্মরক্ষার জন্যই ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। আজও কাশ্মীরে শত শত পরিবারে হিন্দু ও মুসলমান দুই আছে। আর লুটপাট ও দস্যুতা? শিখ শাসনের আমল এবং গুলাব সিংয়ের প্রথম আমল,—লাদাখীদের বেশ মনে আছে বৈকি!

১৭শ শতাব্দিতে 'বাজ্‌গোয়' মঙ্গোল ও তিব্বতীদের আক্রমণকালে স্থানীয় বৌদ্ধরাজ সম্রাট শাহজাহানের সাহায্য ভিক্ষা করেন। সম্রাটের সৈন্যাদি নিয়ে নবাব ফতে খাঁ আসেন, এবং মঙ্গোলদের তাড়িয়ে দেন। কিন্তু অতঃপর বৌদ্ধরাজকে এই সাহায্যের যথাযোগ্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। ফতে খাঁর নির্দেশে বৌদ্ধরাজ সপরিবারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর নাম হয় 'মামুদ খাঁ।' কিন্তু মামুদ খাঁ বৌদ্ধই রয়ে গেলেন মনেপ্রাণে! তিনি বৌদ্ধসমাজেরই অনুগত হয়ে জীবনপাত করলেন।

আজও পাহাড়ের ওপরে তাঁদের প্রাসাদটি রয়েছে। শহরের এখানে ওখানে মঠ-মন্দিরাদির সংখ্যা কম নয়। কিন্তু 'বাজ্‌গো'র মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ গুম্ফায় সুবিশাল মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পৃথিবীকে বড় ক্ষুদ্র, বড় দরিদ্র মনে হয়! এই অতি বৃহৎ এবং অতি উচ্চ মূর্তি কি কি উপকরণে নির্মিত, এটি জানবার কৌতূহল

জাগে। শুনলুম এটি দারুমূর্তি, কিন্তু সোনা ও তামার আবরণ দেওয়া। ১৭শ শতাব্দির প্রারম্ভে রাজা 'সেঙ্গে নামগিয়াল' কর্তৃক এই মূর্তিটি নির্মিত হয়। এই রাজার জননী ছিলেন ইসলামধর্মে দীক্ষিতা।

বাজ্‌গো এককালে বৃহৎ শহর ছিল। আজও যা আছে তা কম নয়। এখানে মাটি ও মাঠ, যবের ক্ষেত এবং সব্জির খামার—এগুলির জন্যই নগর সৃষ্টি হয়েছিল। খাদ্যের প্রাচুর্য এবং গুম্ফার ধনরত্ন—এই দুটি চারদিকের অন্নহীনতা ও দারিদ্র্যকে লুব্ধ করেছিল বলেই এখানে ইতিহাসের উত্থানপতন ঘটে।

এবার আমাদের পথ খানিকটা যেন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। যে দ্বিতীয় পথটি খালাৎসে থেকে ভিন্ন দিকে গিয়েছিল, এখানে এসে সেটি আবার মিলল। হরিৎবর্ণ সুন্দর 'নিমু' গ্রামটিকে কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতরক্তিম ফল ধরেছে গাছে-গাছে, বাসন্তী বর্ণের ফুল ধরেছে গোছায় গোছায়—অন্যদিকে কয়েকটি গাছপালার ছায়ার নীচে জলাশয়ের ধারে কয়েকটি লাদাখী মেয়ে গলাগলি করছে ভরাঘট কাঁকালে নিয়ে। সেই প্রাচীন পৃথিবী এখানেও তার ক্ষণকালের সৌন্দর্যকেই আরেক-বার বিস্তার করল। ওদের কৌতূহলী চোখের উপর দিয়ে ভিন্‌দেশী ক্ষণিকের পথিক নিজের পথে চলে গেল!

নিমু উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ লাদাখে প্রসিদ্ধ। এটি কাশ্মীরের বিশ্ববিশ্রুত উপত্যকাকে স্মরণ করায়। চারদিকে অজানা জগৎ, এবং চট করে বুঝতে পারা যায় না, কোন সুদূর একটা অজ্ঞাত পার্বত্যলোকে আমার অবলুপ্তি ঘটেছে! আমার পেছনে আমারই নকল পায়ের চিহ্ন মুছে-মুছে চলে এসেছি ভিন্ন এক পৃথিবীতে। ফিরে যাবার পথ কবে কোথায় কোন্ অজানায় আমার হারিয়ে গেছে।

এই বিশাল প্রান্তর পার হয়ে আবার পাহাড় ঘেঁষে চড়াই উঠে এলুম হাজার ফুটেরও বেশি। এবার সর্বত্র পাথর, পাথরের ঢিল, পাহাড়ে পাথর, সেই পাথরে লক্ষ বছরের অবক্ষয়, সেই পাথরের আকার ও রেখাভঙ্গীর মধ্যেই আছে দন্তরাক্ষসের ভয়াল ভঙ্গী, পিশাচের হাসি, প্রেতের চক্ষু, অতিকায় জানোয়ারের হিংসা,—যেন ওগুলো দেখতে পাচ্ছি গিরিশ্রেণীর রেখায়-রেখায়। সামনে দেখছি একক পাথরের বিশাল অবয়বের শীর্ষলোকে দুটি ঈগলের ছিদ্রলোক। ও দুটো যেন শাক্যস্থবিরের দুটো অকম্প চক্ষু, মাথার ওপরে জট,—দেহে মাংস নেই, কোমলতা নেই—যেন অনাদিকাল থেকে বীজমন্ত্র জপ করছে,—সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ মহাকাল। তারই নীচে পাথরের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে গলিত তুষারের স্বচ্ছ জলস্রোত। সেই জল গিয়ে পৌঁছেছে ছোট্ট একটি জনপদে, নাম 'উম্‌লা'। এর মধ্যে একটির পর একটি 'মণি দেওয়াল' পার হয়ে যাচ্ছি, 'যেগুলি চার ফুটের বেশি উঁচু নয়। কিন্তু এই প্রকার

দেওয়ালের হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ পাথরের টুকরোয় বৌদ্ধমন্ত্রাদি খোদিত। আবার দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে সেই বর্ণবাহার—রক্তিম, পীত, নীল,—কোথাও সে গৈরিক, কোথাও বা তার সঙ্গে মিশেছে হরিদ্রাভ বৌদ্ধবর্ণ। তুষারের চূড়ারা দাঁড়িয়ে আছে পাশে পাশে,—তাদের থেকে উদ্গত সম্পূর্ণ এক একটি জলধারা তুষারে পরিণত হয়ে যেন ভিতরকার স্রোতটির বহিরাবরণের কাজ করছে।

দেখতে দেখতে চলে এলুম আবার অনেক দূর। যবের ক্ষেত, ফলের বাগান, গাছের ছায়া, গ্রামের মায়া,—ওরা সব কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা যেন স্নেহ-লোভাতুর পথিকের কপালে ক্ষণকালের মমতার স্পর্শ রেখে আবার মিলিয়ে গেল দূরদূরান্তর বালুপাথরের পাথার-রহস্যে। কিন্তু আমিও ছুটছি, প্রাণপণে ছুটছি,—আকাশ, পাহাড়, মরুপাথর, গ্র্যানিটের দল, তুষার চূড়ারা,—ওরাও যেন ছুটছে আমার সঙ্গে এই মধ্য এশিয়ার শূন্য থেকে শূন্যে,—ছুটত ছুটতেই পার হয়ে গেলুম 'খারণ' জনপদ, পেরিয়ে গেলুম আরেকটা কোন্ গাছপালার ছায়ালোক।

এই একটা ভৌতিক ভূখণ্ডে পর্যটনকালে কিছু কিছু শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধা বোধ করছিলুম। কিন্তু এ প্রদেশের আবহের সঙ্গে অভ্যস্ত না হওয়া অবধি এটি মাঝে মাঝে একটু যেন মৃত্যুভয়ভীত করে তোলে। সকল সময় ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার ফুট মালভূমির উপরে ভ্রমণ করে ফিরছি, ঠিক সে জন্য নয়,—কিন্তু রুক্ষ মরুপাথর জগতে বায়ুশীর্ণতা অতিশয় প্রবল। রূপসু এলাকায় এটি অধিকতর কষ্টদায়ক এবং ভারতীয় সমতলবাসীর পক্ষে অনেক সময়ে বিপজ্জনক। লাদাখে যাঁরা সামরিক বিভাগের লোক, তাঁদেরকেও এখানে এসে এই বাতাবরণের সঙ্গে রীতিমতো অভ্যস্ত হতে হয়। এই সকল কারণে ইদানীং সর্বত্র এবং প্রায় সকলেরই নাগালের মধ্যে একটি করে অক্সিজেন গ্যাসের চোঙ বা টুকোস থাকেই থাকে! এই চোঙটির গর্তে মুখগহ্বরটি লাগিয়ে শ্বাস টানলে একটি তৃপ্তিদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া বুকের ভিতরটিকে স্নিগ্ধ করতে থাকে। আমার ত্রিসীমানার মধ্যে এখনও অবশ্য এটি রাখিনি।

মালভূমি থেকে চড়াই পথ বহু উঁচুতে উঠে গেছে। ১২ হাজারের পর সেটি আরও প্রায় ২ হাজার ফুট উঁচু। এখানে উঠে আবার দূর দিগন্তলোক! অদূরে লাদাখ গিরিশ্রেণীর শীর্ষলোক মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে,—সেটির নাম 'খাদুং।' খাদুং-এর সীমানা থেকে উঠেছে 'মুজতাগ' বা তুষার পর্বতশ্রেণী কারাকোরম, যার ভারতীয় নাম কৃষ্ণগিরিলোক। এখানে এটি ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে বিস্তীর্ণ সমতল মালভূমি—যার চতুর্দিকে শুভ্রতুষার কিরীট। এই বিস্তীর্ণ সমতল পার হয়ে নীচের দিকে এলে যে সুন্দর জলধারা পথটি পাওয়া যায় সেটির নাম 'ফিয়াং নালা'। এর চারিদিকে বন-বাগান, অদূরে 'ফিয়াং' নামক অতি বৃহদাকার একটি শস্যশ্যামল জনপদ, তার মাঝে

মাঝে ফলফুলের গাছ এবং নানা স্থানে বৃক্ষ জটলা। ফিয়াংয়ের মৃন্ময়তা লাদাখে প্রসিদ্ধ। ওই গ্রামেরই কোল ঘেঁষে উঠেছে বৃহৎ পর্বত চূড়া,—এই চূড়া 'ফিয়াং গুম্ফার জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং উঠে এলুম সেই পাহাড়ের উপর। রুক্ষ কর্কশ পাথরের দীর্ঘলম্বিত একটা পথ ধরে চড়াই পেরিয়ে এসে গুম্ফার প্রাঙ্গণ-সীমানায় পৌছলুম। এ গুম্ফা এখানে নিজের জন্য একটি পৃথক জগৎ রচনা করেছে।

একটির পর একটি 'মণি দেওয়াল' চলেছে আশেপাশে। এর আগে ভাবছিলুম এগুলি কেবলমাত্র গুম্ফার সীমানা প্রাচীর। ইদানীং দেখছি, শুধু কেবল এগুলি প্রাচীরের কাজ করছে না, এর মধ্যে পুণ্যকর্মও বর্তমান। পাতলা যে বালুপাথরের টুকরোগুলি সাজিয়ে-সাজিয়ে এই অনুচ্চ প্রাচীর বানানো হয়েছে—এ শুধু প্রাচীরই থাকেনি, এর প্রতি-পাথরে বিভিন্ন বৌদ্ধমন্ত্রও খোদিত। দেখে মনে হবে শুধু মানুষ নয়—প্রতি পাথরটি যেন সেই আশ্চর্য মন্ত্র জপ করছে! একথাটি নিঃসংশয়ে বলা চলে, মানব-ইতিহাসে কোনও ধর্মভাবনার মধ্যে এই অতিমানবিক ধৈর্য, চিত্ত-স্থিরতা এবং অনুরাগের একাগ্রতা—যেগুলি এই ভাস্কর্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা অপর কোনও জাতির মধ্যে নেই। অপরাজেয় অধ্যবসায়ের এমন চিহ্ন কোনও সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

'ফিয়াংয়ের' মধ্যে প্রবেশ করলুম। কে যেন বলল, পাঁচশ বছরের অনেক বেশি এর বয়স। গুম্ফাটি বৃহৎ, এখানে বহু লামার বসবাস। এরকম একটি গুম্ফার অর্থ, একটি নিজস্ব জগৎ। এর মধ্যে মঠ, মোহান্ত, ব্রহ্মচর্য আশ্রম, প্রশাসন ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের হিসাব নিকাশ, স্থানীয় জনগণের প্রতি বিভিন্ন অনুশাসন, সামাজিক সমস্যার বিচার, খাদ্যোৎপাদনের নীতি, রোগচিকিৎসার ব্যবস্থাদি এবং কর্মবণ্টন ব্যবস্থা —এদের সবগুলিই গুম্ফাকেন্দ্রিক। গুরুলামার নির্দেশ ভিন্ন কিছুই হবার যো নেই! এই কারণে আঞ্চলিক রাজশক্তির উত্থান পতনের সঙ্গে বৌদ্ধগুম্ফা এবং জনপদের মানসিক যোগ কম। লাদাখের ইতিহাসে রাজশক্তির বদল ঘটেছে অনেকবার। কখনও বা এক শক্তি অপর শক্তিকে আক্রমণ করেছে, হেরেছে, মরেছে, কিংবা জয়লাভ করেছে। কিন্তু একথা একবারও শোনা যায়নি, গুম্ফাবাসী বৌদ্ধসমাজ কখনও বিদ্রোহ বা বিপ্লব সাধন করেছে! কখনও শোনা যায়নি, অনাচারী বা লুণ্ঠনকারীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই লামা সম্প্রদায় তরবারী হস্তে 'মার মার' শব্দে নেমে এসেছে পাহাড়-পর্বত থেকে জলপ্লাবনের মতো! শুধু মুখ বুজে মার খেয়েছে, মুখ বুজে লুটেরাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মুখ বুজে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে এবং মুখ বুজে মরেছে! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এদের একমাত্র ভাবনা, নির্বাণলাভ। জীবন সত্য নয়, সমাজ পরিবার এবং আধিভৌতিক যা কিছু সব মিথ্যা। এরা শুধু চায় কেমন একটা

আত্মকেন্দ্রিক সুখ, সাচ্ছল্য ও সাচ্ছন্দ্য। অন্যের সামগ্রীতে লোভ নেই; সমগ্র লাদাখে চৌর্যবৃত্তি, দাঙ্গা, হানাহানি বা রক্তপাত নেই; শিশু হত্যা, নারী হত্যা—এসবের কোনটাই নেই!

("Murder is unknown in the whole of Ladakh and infanticide is undreamt of".—Director of Information. J & K, Govt. 1964).

'ফিয়াং গুম্ফার' স্বল্পান্ধকার মূল মন্দিরে প্রবেশ করলুম। সেই একই ইতিহাস। বজ্রতারা থেকে বজ্রসেন, সেই পদ্মসম্ভব, মঞ্জুশ্রী, সেই অবলোকিতেশ্বর এবং প্রাক্তন গুরুলামার মূর্তি। স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, দারু ও তাম্রময়। চারিদিকে রেশমের সজ্জা আর বর্ণাঢ্য চিত্রাঙ্কন, জলপাত্রগুলি তেমনি স্তরে স্তরে সাজানো। হিন্দুর মন্দিরে ভীড় আছে, আনুষ্ঠানিক আতিশয্য আছে, দর্শনার্থীর কোলাহল আছে, শঙ্খঘণ্টা মন্ত্রাদির সঙ্গে ঢক্কানিনাদ আছে। কিন্তু এখানে সব চুপ। এখানে শুধু চেয়ে থাকা, কথা না বলা, তন্দ্রা না ভাঙ্গা। একপাশে জ্বলছে গন্ধপ্রদীপ, শিখা তার অকম্প—আর তারই সামনে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। মহাস্থবিরের উন্নত ললাটে দিব্য জ্যোতি, দুই নিমীলিত নেত্র অন্তর্মুখী, সেই নেত্রসম্পাতে চির যুগযুগান্তের অপার করুণা বিভাসিত। সে যেন পরমাশ্চর্য প্রসন্ন ক্ষমায় শান্ত ও স্থিতধী। ওই সুন্দর তন্দ্রানিবিড় চক্ষু যদি হঠাৎ দপদপ করে ওঠে, যদি রোষে, ঘৃণায়, প্রতিহিংসায় হঠাৎ ধকধক করে জ্বলতে থাকে—তবে কি লাদাখের ইতিহাস বদলিয়ে যাবে সব? তবে কি এক বিরাট মানুষের সমাজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠবে? শিবনেত্র যদি রুদ্রের করাল কটাক্ষে পরিণত হয়—তবে কি যেখানে যত স্থাণু, সব হবে সচল? যেখানে যত অসাড়তা, যত পঙ্গুতা—সব ভাসিয়ে ছুটবে কোন্ এক ভরা জীবনের জোয়ার?

কিন্তু সমস্ত চিন্তাবিভ্রমকে ছাড়িয়ে বারম্বার চেয়ে থাকতে সাধ যায়, ওই আশ্চর্য দুটি চোখের দিকে! ছম ছম করছে ছায়া গুম্ফার ভিতরে, সেই অনির্বাণ মৃদু দীপশিখা তেমনি জ্বলছে, তার থেকে আসছে একটা নিবিড় নিগূঢ় বন্য পাথরের অনাঘ্রাতপূর্ব গন্ধ—আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে ফিয়াংয়ের উপবনান্তের মন্দারের মাল্যসৌরভ! চেয়ে দেখলুম আরেকবার ওই সম্মোহনী ধ্যানদৃষ্টির প্রতি। ওই দুটি চক্ষু ভারতের—চিরকালের—আদি অনন্তের। মহাকবির দুটি গীতছত্র তখন উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল আমার কণ্ঠে—"চক্ষে জল বহে যায়, নম্র হল বন্দনায় আমার বিস্মিত মনপ্রাণ!"

আরও প্রায় মাইল তিনেক বালুপাথর ও কর্কশ কাঁকরের পথ মাড়িয়ে আমরা সিন্ধু তীরবর্তী একটি জনপদ সীমানায় এসে পৌঁছলুম। এটির নাম 'পিতক বা পিতুক।' কিন্তু এই নামের মূল শব্দটি হল 'স্পিতুক'। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে যদি কেউ সংবাদ দেয়, এখানে বনবাগানঘেরা এবং ফুলগাছ সাজানো ডাকবাংলো আছে তা হলে একটু

থমকিয়ে যেতে হয়। কিন্তু 'পিতুক' গ্রামখানি সিন্ধু এবং তার একটি ক্ষুদ্র উপনদীর সংযোগস্থলে থাকার জন্য কয়েকটি সুবিধা এই গ্রামের আছে। সুতরাং বাগানে-পাহাড়ে-ঝরনায় এবং অদূরবর্তী সিন্ধুশোভায় ডাকবাংলোটিকে সুশ্রীই বলতে হয়। সামনেই একটি পাহাড়ের চূড়ায় পিতুক গুম্ফা এবং তার নীচে এখানে-ওখানে পুরনো কালের লাদাখী ঘরদোর। গুম্ফাটি নির্মাণকালে সম্ভবত শত্রুর বিরুদ্ধে এর প্রতিরোধশক্তি ও নিরাপত্তার কথা মনে ছিল। সেই কারণে গুম্ফার দুদিকে দুটি পাথরের গম্বুজের সঙ্গে দুটি মোটা দেওয়াল জোড়া দেওয়া আছে। নদীসমতল থেকে এটি কমবেশি ১ হাজার ফুট উঁচুতে এবং নীচের থেকে এটিকে খুবই মজবুত দেখা যায়। যত বেশি প্রাচীন তত বেশি উঁচুতে। যতগুলি অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন, তাদের নির্মাণকার্য হয়েছে ক্রমশ নীচের দিকে।

দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিমে মহাসিন্ধুর প্রবাহপথে দাঁড়িয়ে বাজ্‌গো এবং পিতুক। এবার সিন্ধুকে পিতুকের এই পার্বত্য সঙ্কটে বিদায় দিয়ে আমরা একটি ক্ষুদ্রকায়া নদীর ধারাপথে বাঁদিকে বেঁকে যাব। এটি লেহ্ নদী, এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের চোখের সামনেই এ নদীর জন্ম ঘটেছে লাদাখের তুষারগিরি কোলে।

এবার আমরা লাদাখের রাজধানী লেহ্-র কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর মাত্র মাইল পাঁচেক বাকি। পিতুকের পর্বত-চূড়ায় গুম্ফার প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, লেহ্ নগরীর সম্মুখস্থ সুবিশাল সমতল ভূভাগ অনেকটা যেন ত্রিকোণাকার। ধূ ধূ করছে ধূলিধূসর প্রান্তর এবং দূর থেকে নীচের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখা যায়, বিরাট পর্বত-শ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যে এই সমতল উপত্যকা একটা বৃহৎ আন্তর্জাতিক জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে। আমি কেবল তার সঙ্কীর্ণভাগটির শেষ বিন্দুর উপরে স্থির লক্ষ্য নিয়ে দণ্ডায়মান। এবার এসেছি লাদাখের হৃৎপিণ্ডের উপর। এবার সবগুলি আমার অতি কাছাকাছি। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে 'মুজতাগ' কারাকোরম, অদূরে সে দক্ষিণে মিলিয়েছে কৈলাস পর্বতমালার সঙ্গে—যার চূড়াগুলি এখান থেকে সুপ্রকট। পশ্চিম-দক্ষিণের জাস্কার ও লাদাখ গিরিশ্রেণী দক্ষিণে গিয়েছে লাহুল ও রূপসুর দিকে এবং এই দুই গিরিশ্রেণী সুদূর উত্তরে স্কার্দু বা বালতিস্তানে গিয়ে কারাকোরম ও দেবশাহীর সঙ্গে মিলে একাকার হয়েছে। অদূর-পূর্বে কারাকোরম লাদাখ প্রদেশকে ভাগ করেছে দুই খণ্ডে। পূর্ব খণ্ডে সমান্তরাল রেখায় দক্ষিণের পাঙ্গং হ্রদ ও খুর্নাক ফোর্ট এবং উত্তরে শাক্‌সগাম ও কারাকোরম গিরিসঙ্কট। পশ্চিম খণ্ডে পড়ে নুবরা, শিয়োক, লাদাখ ও জাস্কার গিরিশ্রেণী, রূপসু ও বালতিস্তান। বলা বাহুল্য লাদাখের পূর্ব খণ্ডকে বর্তমানে বলা হচ্ছে, আকসাই চিন্—অর্থাৎ পাথরভূমি। চীন-ভারত

বিরোধের সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্নোত্তর মীমাংসার এটি অগ্নিক্ষেত্র! এখান থেকে সিনকিয়াং বিমানপথে মিনিট পনেরো। স্তব্ধ চক্ষে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, একটা নাটকীয় এবং উৎকণ্ঠ অনিশ্চয়তার ছায়া এই দিনান্তকালে সমগ্র উপত্যকায় যেন এক দিগন্তজোড়া কালো ডানা মেলেছে। আমি রণক্ষেত্র সীমানায় এসেছি।

এবার ছাড়তে হল এখানে মহাসিন্ধুকে। সে যেন দক্ষিণ থেকে চলল উত্তর-পথে মুণ্ডিত মস্তক দণ্ডী ব্রহ্মচারী এক বিবাগী সন্ন্যাসীর মতো! সে চলল উত্তর ভারত পরিক্রমায়। তার পথ আরও অনেক দূর। বেদশাস্ত্রীয় রাজনীতিক আচমনীমন্ত্রে তার ষষ্ঠ স্থান।

আমরা চললুম লেহ্ নদীর ধারাপথ ধরে। মাঝে মাঝে ধুলোয় অন্ধকার হচ্ছে পথ। এখানে ওখানে গিরিঝরণা ও জলধারার আশেপাশে লাদাখীদের ছোট ছোট বস্তী। মাঝে মাঝে গাছপালা ও অল্পস্বল্প ক্ষেত খামার। এক সময় আমরা বিস্তৃততর উপত্যকার মধ্যে এসে পড়লুম এবং পিতুকের চূড়া থেকে লেহ্ নগরীর যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদটি পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছিল, সেইটিকে লক্ষ্য করে আমরা বৃহৎ ময়দানের পথ অতিক্রম করে চললুম। প্রান্তরে তখন গোধূলির প্রকৃত চেহারাটি দেখতে পাচ্ছিলুম।

হঠাৎ যেন একটা স্বস্তি! মসৃণ সুন্দর ও প্রশস্ত পীচঢালা পথে এসে নামলুম। এ যেন গত জন্মের কোন্ বিস্মৃত অতীত! এ যেন সহসা মনে করিয়ে দিল, এটি আধুনিক কাল, আমি এই কালের নাগরিক। এখানে ওখানে ট্রাফিক সিগনাল, পথনির্দেশ—পুলিস পাহারা। নিজের দিকে চোখ ফেলে এবার দেখি, আমি যেন ধুলোর বস্তা! আমি গত কয়েক দিন থেকে মধ্য এশিয়ার ধূলিসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলুম। আমার মন, চিন্তা, সংস্কার, পর্যবেক্ষণ—সমস্ত তলিয়ে গেছে মধ্য এশিয়ার মহাধূলিরাশির মধ্যে। আমি ভুলেই গেছি হিমালয়, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সেই নিসর্গ শোভা, ইরাবতী-শতদ্রু-চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে যমুনা পেরিয়ে সেই কোন্ দূরে গাঙ্গেয় পুণ্যভূমি—সে কোন্ গ্রহলোকে, আমি যেন গত জীবনের নিলীন স্বপ্ন চেতনার মতো শুধু ঈষৎ মনে করতে পারি।

আমি লাদাখের সেই সুপ্রাচীন কেন্দ্রবিন্দুটির উপর এসে দাঁড়ালুম, যে বিন্দুটির চির পুরাতন নাম লেহ্ (১১,৫০০)। এটি যেন উর্ণনাভের জাল—এখান থেকে নানাদিকে পথ বিকীর্ণ হয়েছে। এক পথ শ্রীনগরে, এক পথ লাহুল-পাঞ্জাবে, এক পথ রূপস্থ হয়ে মানস সরোবরে, এক পথ সিনকিয়াং এবং আরেক পথ চুসুল, খুর্নাক, পাঙ্গং হয়ে দোমজোড় ও লানক গিরিসঙ্কট। এগুলি সব কাছাকাছি এবং প্রত্যেকটিই নাগালের মধ্যে। লানক গিরিসঙ্কটের পথের বাইরে আকসাই চিন, লিংজিটাং, সোডা প্লেনস্

বা সেখান থেকে দেপসাং—এ সব অঞ্চলে পথ বলতে কিছু নেই। এগুলি কুনলুন বা কুয়েনলান পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভারতীয় এলাকা। বর্ত্তমানে রাহুগ্রস্ত! আরেকটু উঁচুতে দাঁড়ালে একে একে সবগুলি দেখতে পাই।

গাছপালা ও বনবাগানের পাশ কাটিয়ে মিলিটারী মেজর শর্মা সাহেব আমাকে এনে তুললেন লেহ্ নগরীর প্রশস্ত ডাকবাংলোর বারান্দায়। তখন সন্ধ্যা সমাগত। ততক্ষণে শীতের কাঁপুনি ধরেছে।

॥ ১১ ॥

লেহ্ [লাদাখ]

মহাসিন্ধুনদের তট থেকে ধীরে ধীরে লেহ্ শহরের সমতল বালুপাথরের উপত্যকা উঠে এসেছে উপর দিকে প্রায় এক হাজার ফুট। ফলে, সামগ্রিক চেহারাটা হয়েছে ঢালু এবং এটির প্রস্থ হয়েছে ছয় মাইল। সমতল ক্ষেত্রটি পর্বতবেষ্টনীর মধ্যে ত্রিভুজাকার, এবং ত্রিভুজেরই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লেহ্ নগরীর সর্বপ্রধান স্থলচিহ্নস্বরূপ পর্বতচূড়াটির উপরস্থ প্রাসাদের নাম, 'বাদশা মহল।' বিগত পাঁচশ' বছরের মধ্যে লাদাখী ভিন্ন অপর কোনও জাতির 'রাজা' এই বাদশাহ মহলের গদীতে বসেননি। এঁদের কেউ কেউ বলপূর্বক ধর্মান্তরিত মুসলমান রাজগোষ্ঠী, কিন্তু এঁদের মানসপ্রকৃতি বৌদ্ধসংস্কৃতির দ্বারা চিরদিন প্রভাবিত। সেই কারণে বৌদ্ধপ্রধান লাদাখের জনজীবনের সঙ্গে এঁদের বিশেষ কোনও কালে বিরোধ ঘটেনি, এবং রাজা অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের নীতি লাদাখে কোথাও প্রসারলাভ করেনি।

'বাদশা মহলের' প্রাসাদটি প্রায় দশতলা উঁচু। এই প্রাসাদের কোনও বেষ্টনী-প্রাকার নেই, কিন্তু এর নীরেট ও স্ফীত দেওয়ালগুলি দূর থেকে যে বলিষ্ঠতা, কাঠিন্য এবং নিরাপত্তাকে প্রকাশ করে, সেটির একটি নিজস্ব মহিমা আছে। নীচের থেকে এই প্রাসাদকে অতিশয় দুর্ভেদ্য এবং অনধিগম্য মনে হয়। দূরের থেকে এই 'বাদশা মহলের' শীর্ষ ছাড়া লেহ্ নগরীর অপর কোনও চিহ্ন পর্যটকের চোখে পড়ে না। কৌতুকের বিষয় এই, চারিদিকে তুষার চূড়ারা একই চেহারায় আবহমানকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও লাদাখের অন্যান্য অঞ্চলের মতো লেহ্ তহশীলও প্রখর রৌদ্রে ধূ ধূ করে জ্বলতে থাকে—যেমন মরুভূমিতে দেখা যায়। কিন্তু দিনাবসানে এর বিপরীত। রাত্রের দিকে 'সাব-জিরো টেম্পারেচার', এবং শীতের দিনে সেটি নেমে আসে 'বিয়োগ চিহ্নের, ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রিতে! অর্থাৎ ভিজা তোয়ালে, গরম ভাত বা রুটি, এক পেয়ালা গরম চা,—এগুলি মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কঠিন বরফের টুকরোয় পরিণত হয়। আগুন জ্বাললে তার উত্তাপ ১৯০ ডিগ্রির বেশি হয় না, এবং একখানা ঠাণ্ডা হাত কয়েক সেকেণ্ড অবধি অনায়াসে জ্বলন্ত আগুনে রেখে দেওয়া চলে। রাত্রে শোবার সময় গরম বিছানার—(যদি তাকে গরম করে তোলা যায়)—মধ্যে জুতো লুকিয়ে না রাখলে সেই জুতো পরের দিন আগুনে না সেঁকে পরা চলে না! ফুটন্ত

জলের মধ্যে না রেখে ফল-পাকড় খাওয়া যায় না। হাতের কাছে হাতুড়ি না থাকলে মাখনের ডেলায় কামড় দেবার চেষ্টা মিথ্যে। মাংস বা ডাল সিদ্ধ হয় না। পানীয় জল মানেই ফুটন্ত জল। পোশাক পরিচ্ছদ, যে-কোনও খাদ্য সামগ্রী, কাচের বাসনাদি, শয্যাদ্রব্য, - অর্থাৎ জীবনধারণের পক্ষে যা-কিছু প্রয়োজন—শীতকালে সেগুলি আগুনের কাছাকাছি রাখতে হয়। শীতের কালে প্রচণ্ড বরফানি ঝটিকা সমস্ত রাত্রিব্যাপী নরখাদক ব্যাঘ্রের মত বাইরে গর্জন করে উত্তর মেরুলোকের মত। নালা ও ঝরণাগুলি আগাগোড়া কঠিন বরফে পরিণত হয় এবং সিন্ধুনদের উপর দিয়ে জীপগাড়ি আনাগোনা করে। পানীয় জল পাবার জন্য কুঠার দিয়ে বরফ ভেঙ্গে আগুনে দিতে হয়।

এই কঠিন জীবনযাত্রার সঙ্গে লাদাখের জনসাধারণ—যাদের সামগ্রিক জনসংখ্যা হয়ত ১ লক্ষেরও অনেক কম—তারা বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা লাদাখের আয়তন অনেক বড়, অর্থাৎ ৪৪ হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকা স্কার্ডু তহশিল ও চীন-অধিকৃত এলাকা—এই দুই মিলিয়ে হয়তো ৪৪-এর অর্ধেক দাঁড়ায়। লেহ্ তহশিলের ১৫টি এলাকায় ১১০টি জনপদের হিসেব পাওয়া যায় এবং সব জড়িয়ে লেহ্ তহশিলের জনসংখ্যা মাত্র ২৫ হাজার। সেই হিসাবে সমস্ত লাদাখে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২ জন লোক বাস করে।

ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, লাদাখ ছিল সমুদ্রগর্ভে! কিন্তু কেন যে লাদাখ মাথা তুলল সমুদ্রের তল থেকে এবং কেনই বা মাথায় তুষার-কিরীট ধারণ করল—সেটি তাঁরাই জানেন। তবে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং ও লাদাখের বহু লবণাক্ত ও কুস্বাদ জল প্রাক্তন সমুদ্রভাগেরই পরিচয় দেয়। ঠিক এমনি কুস্বাদ জল দেখেছিলুম পূর্ব ইউরোপের কৃষ্ণ সাগর, আজব সাগর এবং মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগরে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এরা সব একই গোষ্ঠীভুক্ত!

ডাকবাংলোয় বসবাসের জায়গা পেয়েছিলুম। এটির মধ্যে গাছপালা, ঘাস এবং ফুলের বাগান দেখতে পাচ্ছি। বাড়িটি পাকা, পুরানো এবং দোতলা। ভিতরের ব্যবস্থাদি মোটামুটি চলনসই। এর পাশেই আছে একটি গেস্ট হাউস, এবং তারপরে প্রাক্তন ইংরেজ জয়েণ্ট কমিশনারের মস্ত পাকাবাড়ি এবং তার মধ্যেই ছিল তাঁর দপ্তর। তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণের মধ্যে এসে ঢুকেছে একটি ঝরণা,—সেটি ফুলবাগানে জল সেচনের কাজে লাগে। বর্তমানে এই বাড়িটিতে কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত মূর্তির মস্ত দপ্তর বসেছে। শ্রীযুক্ত মূর্তি অতিশয় সজ্জন, অমায়িক এবং সুপণ্ডিত। কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে সমগ্র হিমালয়ের প্রত্যেকটি এলাকা—আসাম ও নেফা পর্যন্ত—তাঁর নিকট সুপরিচিত এবং তিনি প্রায় প্রত্যেক এলাকাতে কাজ করেছেন। এখানে তিনি যে দায়িত্বভার নিয়েছেন, সেটি সামান্য নয়। লাদাখের পুনর্গঠন এবং

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্যেক পরিকল্পনাকে নিয়ে তিনি কাজে নেমেছেন। আমার লাদাখ পর্যটনের কথা তিনি আগে থেকে জানতেন. কারণ কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডাঃ করণ সিং আমারই অনুরোধে তাঁকে আগে থেকে জানিয়ে রেখেছেন।

প্রথম রাত্রে বন্ধ ঘরের ভিতরে যখন ঘন বিছানার মধ্যেও শীত ভাঙছে না, সেই সময় যে ভদ্রলোকটি একজন অনুচর সহ ঘরে ঢুকে হারিকেনের আলোর সামনে বসে আলাপচারি করে গেলেন, তাঁর প্রকৃত সৌজন্য এবং বিনীত ভাবটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওঁর কণ্ঠস্বর এবং ইংরেজী বাচনভঙ্গীর মধ্যে একজন প্রচ্ছন্ন বাঙালীর কণ্ঠের আস্বাদ পাচ্ছিলুম। কিন্তু এঁর নাম জানা হয় নি। শুধু শুনলুম উনি কার্গিল তহশিলের শাসনকর্তা। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট ওঁকে এখানে পাঠিয়েছেন অ্যাডিশনাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসাবে। উনি মিঃ মূর্তির সহকর্মী। ওঁর সম্বন্ধে আমার কেমন একটি কৌতূহল রয়ে গেল। যে ব্যক্তি এত বিনীত এবং এমন সৌজন্যশীল ও মিষ্টভাষী, তাঁকে খুব সাধারণ মনে করিনে। যাই হোক, ওঁর কথা ভাবতে ভাবতেই মধ্য রাত্রে এক সময় উঠলুম। না, আমি শীতকাতর নই, এমনভাবে পঙ্গুর মত পড়ে থাকলে চলবে না! বিছানা ছেড়ে উঠে হারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিলুম, কেননা লেহ্‌ নগরীতে এখনও ইলেকট্রিক হয় নি। ডাকবাংলোর খানসামা দুজন পাশের ঘরে নাক ডাকাচ্ছে। না, ওদের ডাকা ঠিক হবে না। বেচারীরা সন্ধ্যা থেকে পরিশ্রম করেছে অনেক। ঘড়ি দেখলুম রাত ১টা বাজে। বাইরে এই মধ্য এশিয়ার ওয়েসিস নগরী যেন মৃত্যুর মত অসাড়। ওই ভদ্রলোকটিকে পেলে সারা রাত জেগে থাকা যেত। নিদ্রা সম্বন্ধে ভয় ঢুকেছিল কেন জানিনে, কিন্তু কী যেন একটা বিপ্লব ঘটেছিল আমার মধ্যে। আমি একটা শারীরিক বিকলনে আচ্ছন্ন হচ্ছিলুম।

অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর এক সময়ে কাচের জানালাটা খুললুম, কিন্তু পলকের মধ্যে বাইরের তুহিন ঠাণ্ডার প্রচণ্ড একটা ঝলক আমার একখানা হাত ও মুখখানাকে সেই ঠাণ্ডায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত করল। ওইভাবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে মিনিট দশেক কেটে গেল। শারীরিক বিকলন হেতু আমার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল।

পরদিন আমার মুখ থেকে এই সংবাদটি শুনে জনৈক অফিসার একটু উদ্বিগ্নভাবে বললেন, আপনি খুবই ভুল করেছেন। খানসামাকে দিয়ে খবর পাঠালে আমরা তৎক্ষণাৎ অক্সিজেন সিলিণ্ডার পাঠিয়ে দিতুম। প্রথম দু'তিনদিন এরকম সকলেরই হয়।

কিন্তু পরের দিন থেকে এই প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকলন আর ঘটে নি।

লেহ্ নগরী প্রাচীনকালের—মধ্যযুগের অনেক আগে। এর ওপর দিয়ে চলে গেছে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশান্তির ইতিহাস। কিন্তু এর কতক পরিমাণ উন্নতি ঘটতে থাকে গুলাব সিংয়ের মৃত্যুর (১৮৫৭) পর থেকে। এই শহরে সর্বাপেক্ষা দুটি মাত্র প্রশস্ত পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হল লেহ্-র বড়বাজারের পথটি, অন্যটি বাজারের থেকে সামান্য দূরে। বাজারের পথটিতে অনেকগুলি দোকান, খাবার ও থাকার দু' একটি হোটেল, ডাকঘর, ফটোর দোকান ইত্যাদি। মোটামুটি প্রায় সব সামগ্রীই আসে কাশ্মীর থেকে মোটর ট্রাক যোগে। পথের দুই পাশের বাড়িগুলি প্রায়ই দোতলা, কিন্তু নীচের তলাগুলি বেশীর ভাগই অন্ধকার এবং সঙ্কীর্ণ। এই বাজারের থেকেই একটি পথ উঠেছে 'বাদশা মহলের' দিকে, একটি গেছে পল্লীর দিকে এবং অন্যগুলি নেমে গিয়েছে ঢালু হয়ে উপত্যকার বিশাল ময়দানের মধ্যে। বাজারের চওড়া রাস্তার দুদিকে যে বাড়িঘরগুলি পুরনো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এগুলি ডোগরারাজের অধিকারের আমলে নির্মিত, এবং বাজারটিই লেহ্ শহরের 'দর্শন-সামগ্রী' (show-piece)! দিনমানের সকল সময়েই লোকজন মেয়ে-পুরুষ এখানে চলাফেরা করে। সমগ্র লাদাখ এখন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত, সুতরাং লেহ্‌র বাজারটি আগের তুলনায় বড়ই হয়েছে। শীতের আনাজপত্র, ভাল মাংস, ডিম, চাল, ডাল, মাখন, নানাবিধ মনোহারী—এগুলি পাওয়া যাচ্ছে। খাদ্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য, কর্মসংস্থান, মৃৎভূমি রচনা ও গাছপালা সৃষ্টি, জ্বালানি কাঠ ও কেরোসিন, নূতন নূতন বসবাস ব্যবস্থা, হাসপাতাল পাঠশালা—সমস্ত লাদাখে এবং বিশেষ করে লেহ্ তহশীলে সরকারী সহায়তায় এগুলির প্রত্যেকটি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে।

বাজারের এই বড় রাস্তাটি কৌতুকজনক। প্রত্যেক সাধারণ মেয়ের মাথায় লাদাখী কানওলা টুপি এবং পিঠের দিকে লোমশ ভেড়ার একখানা সম্পূর্ণ ছাল ঝোলানো! এটি তাদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চার করে এবং এটির উপরেই তাদের শিশু পিঠের সঙ্গে বাঁধা থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে এসে পৌঁছল উটকো একদল ছিন্নভিন্ন পোশাক পরা 'চাম্‌পা'—যাযাবর—তাদের সঙ্গে পরিবার, কয়েকটা ভেড়া, ছাগল, দু'চারটে গাধা, নয়ত বা গোটা দুই লোমশ ঘোড়া। এলো হয়তো দুখানা মোটর ট্রাক, নয়ত একখানা জীপ, কিংবা জনকয়েক পুলিশ পাহারা। ওরই মধ্যে হয়তো পেরিয়ে গেল দু'চারজন সম্ভ্রান্ত মেয়ে-পুরুষ—হয়তো বা তারা 'খালোন' পরিবারের লোক, বাস করে একটু উপর দিকে। কেউ নিয়ে যাচ্ছে মাংসের পুঁটুলি, কেউ গোটাকতক ফুলকপি, কেউ বা এক কোঁচড় শ্বেতবর্ণ আলু। দুধ দুষ্প্রাপ্য, মাছ নেই। যাযাবরদের আলখেল্লার মধ্যে থাকে যবের আটার বড় বড় লবণাক্ত রুটি, ময়লা মাখনের ডেলা, কাঠের বাটি, শুকনো মাংস ইত্যাদি। এরা আসে ঘাস বা জ্বালানি কিছু খুঁজতে

এদের জন্তুদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে এরা জন্তুর সঙ্গেই একত্র বাস করে। জন্তুর চামড়া দিয়ে এরা তাঁবু বানায়, ভেড়া-ছাগলকে নিয়ে একই জায়গায় ঘুমোয় এবং নিজ যবের রুটির টুকরো ওদের মুখে গুঁজে দিয়ে স্নেহ প্রকাশ করে। উভয় উভয়ের ভাষা বোঝে। ভেড়ার বা ছাগলের লোমের বিনিময়ে এরা নিয়ে যায় এদের দরকারি জিনিসপত্র। এদের অনেকেই এখন শ্রমিকের কাজ পাচ্ছে। লেহ্‌ শহরে এখন একজন শ্রমিকের দৈনিক উপার্জন ছয় থেকে দশ টাকা। এরা দৈনিক ৫ থেকে বড় জোর ৬ ঘণ্টা কাজ করে। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী—এদের চাহিদা প্রচুর।

লাদাখীরা দিনে তিনবার করে খাচ্ছে যব সিদ্ধর পাৎলা ঘাঁট গরম গরম। যেমন বাঙালীর শ্রাবণ মাসের খিচুড়ির চেহারা! ওর মধ্যেই আছে মাখন, আনাজের টুকরো, মাংসের কুচি এবং তার সঙ্গেই যদি পারে চা। উপাদেয়! মাংসের দরকার হলে জন্তুকে মারল দম আটকিয়ে নাক মুখ বেঁধে, আর নয়ত তার দেহের কোথাও ফুটো করে সেই তাজা রক্ত ঢাললো যবের ঘাঁটে। তাই গরম গরম—এবং তার সঙ্গে এলো ঈষৎ সাদা ঘোলাটে 'চাং' মদ্য। চমৎকার। দিনে তিনবার এগুলি পেটে পড়বার পর যে আকস্মিক গানের ধুয়ো তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়, সেটি আমি শুনেছি! বাদশা মহলের আশপাশের প্রাঙ্গণে, খররৌদ্রকালের সিন্ধুতটে, ফিয়াং গুম্ফার শস্যক্ষেত্রে, ভেড়া-ছাগল বাঁধা গ্রামের ধারে এবং ডাকবাংলোর সামনে যেখানে নতুন ঘর উঠছে—ওইখানে হঠাৎ ওরা এক ঝলক সুর ধরে আবার চুপ করে যায়। খররৌদ্র মধ্যাহ্নে সেটি যেন 'শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে।' আর নয়ত হঠাৎ "সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান, সমস্ত আকাশে বাজে অনাদিকালের বিরহ বেদনা।"

বোঝা বইছে মেয়েপুরুষ—পঁচিশ তিরিশ সের তার ওজন—পেরিয়ে যাচ্ছে বিশ পঁচিশ মাইল পথ—কিন্তু মুখে সানন্দ হাস্য। বোঝা নামিয়ে আবার হঠাৎ ওই এক ঝলক সুর ধরে থেমে গেল। সেই সঙ্গীতের টুকরোটি যেন রঙীন এক প্রজাপতির মত কিছুক্ষণ রুক্ষ পাহাড়ের আশেপাশে আর বালুপাথরি উপত্যকার কোলে কোলে আশ্রয় খুঁজে এক সময় মিলিয়ে গেল। লক্ষ্য করেছি, কর্মমুখর লেহ্‌ নগরী যখন তখন যেখানে সেখানে এমনি করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক একবার মধুর তান শুনিয়ে দেয়।

লেহ্‌ নগরী লাদাখের একমাত্র শহর, অন্যগুলি ছোট বা বড় জনপদ মাত্র। লেহ্‌ নাকি কয়েক বছর থেকে একটু একটু সুশ্রী হচ্ছে। কিন্তু চাষী বা শ্রমিক বা সাধারণের কেউ মেয়ে বা পুরুষ সামনে এসে দাঁড়াক—গায়ে জন্তুর গন্ধ! অনেকে বলে, এইটি ওদের রীতি যে, বছরে বা দু'বছরে ওরা একবার মাত্র স্নান করে! এ কথা তিব্বত বাস-কালেও শুনেছিলুম। কিন্তু কথাটি এইভাবে ঠিক সত্য নয়। দরিদ্রের কোনও দ্বিতীয়

পরিচ্ছদ নেই! তুষারের দেশে হিমগলা জলে খোলা জায়গায় স্নান সম্ভব নয়। জ্বালানি এমন নেই যা দিয়ে জল গরম হয়। দরিদ্রের এবং দুঃস্থের প্রকৃত অভাব যারা বোঝে না, তারাই ওদের এই সব চিত্র দেখে গিয়ে নানা দেশে সরস কাহিনী রচনা করে। এই সূত্রে মনে পড়ে, বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কাশীর সারনাথে বহু সংখ্যক তিব্বতী এসে সমবেত হয়। সেটি গৌতম বুদ্ধের ২৫০০ বছরের জয়ন্তী সমারোহ কাল। দালাই লামা সারনাথে আসছেন! সারনাথের আমবাগানে রাত্রের দিকে ৪০ ডিগ্রির নীচে ঠাণ্ডা পড়ে। সেই আমবাগানে পড়ে রয়েছে শত শত ইতর সাধারণ তিব্বতী নরনারী। আমিও সেই আমবাগানে স্থানীয় পোস্টমাস্টার কালীপদ চক্রবর্তীর বারান্দাটুকুর ওপর রাত্রের দিকে পড়েছিলুম ওই তিব্বতীদের সঙ্গেই। কিন্তু সমস্ত রাত ধরে সেই সুন্দর আমবাগানটিতে পাওয়া যাচ্ছিল অবিকল জন্তুজানোয়ারদের মত বীভৎস গাত্র-গন্ধ! ময়লা মাখন, নোংরা দেহসজ্জা, কদর্যগন্ধী তল্পিতল্পা, অস্নাত-অধৌত গাত্রাবরণ, সঙ্গে জন্তুদলের কাঁচাকাটা লোম—ওদের সঙ্গে জন্তু-জীবনের পার্থক্য ছিল কম। কিন্তু ওদের পিছনে সমস্ত কারণগুলি ওই একই। লামারাজের জগতে বংশপরম্পরায় ওরা কোনও যুগে সুশ্রী, সচ্ছল এবং পরিচ্ছন্ন জীবনের সন্ধান পায় নি! ওই ধরনের তিব্বতী জনসাধারণ এই শতাব্দীতে ওই প্রথমবারই এসেছিল ভারতে এবং এদেশের 'প্রাচুর্য এবং সর্বাঙ্গীন সচ্ছলতা' দেখে ওরা অভিভূত হয়ে যায়!

শহরে প্রধান দুটি বস্তু নেই। ইলেকট্রিক এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা। যে সকল একক পাহাড়ের চূড়া এখানে ওখানে একটির পর একটি গুম্ফা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলির উচ্চতা ৩০০ থেকে ৫০০ ফুট। এগুলির বাসিন্দারা জল তোলে নীচের থেকে—এটি অমানুষিক পরিশ্রম। শহরের সমতলভাগে কয়েকটি পার্বত্য ঝরণা হাট-বাজারের এপাশ-ওপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে,—এগুলি স্বচ্ছ হিমগলা জলধারা। সুতরাং বলতেই হয় জলের অভাব নেই এবং তোলা জলেই কাজ চলে। পরিপাক শক্তি এদেশে প্রচুর, কিন্তু রান্না জানে না কেউ। এক প্লেট ধেনো ভাত, তিন টুকরো আধসিদ্ধ মাংস এবং এক প্লেট সিদ্ধ আলু—এর দাম তিন টাকা। আমার ধারণা, এ মূল্য লেহ্ শহরের পক্ষে বেশী নয়। খাবার হোটেল অবশ্য একটিমাত্রই।

ছোটখাটো কাজকারবার যারা করে তারা প্রায় সকলেই লাদাখী। জুতোর দোকান, মুদি, মেশিন সেলাই, ওর মধ্যেই গান্ধীভাণ্ডার—যেখানে লুই বা পট্টু বা দেশী কম্বল ইত্যাদি কেনা যায়। টুপির কারবারও ছোট নয়। ওদের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে কাঁচকড়ার খুকি-পুতুল, টিনের মোটরগাড়ি, প্লাস্টিকের লাট্টু এবং কাঠের ঝুমঝুমি। কারবার যারা করছে তাদেরকে দেখলে একটু খট্‌কা লাগে। এক আধজন সর্বাধুনিক ব্যতিক্রম ছাড়া এরা প্রায় সকলেই মিশ্র জাতি (half caste)। এদের পৈত্রিক

পরিচয় অনেক সময় সুস্পষ্ট নয়। এদের জননীরা ভোট্ বা বৌদ্ধ, কিন্তু সমগ্র লাদাখের নারী সমাজ হল বহুভর্তৃক। প্রাক্তন কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা, ডোগরাদের সামরিক গোষ্ঠী, ইয়ারকন্দের তুর্কি সওদাগররা—এদের সঙ্গে মিলেছে বহুভর্তৃকারা। এক পরিবারে একটি স্ত্রীলোকের তিনজন স্বামী বা তিন সহোদর থাকা সত্বেও সেই স্ত্রীলোক বহিরাগত ব্যবসায়ীকে বিবাহ ক'রে তার ঘর গুছিয়ে সন্তান পালন করছে, এর সংখ্যাও প্রচুর। সে স্থলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান এবং অপেক্ষাকৃত সহনীয় জীবনব্যবস্থা—এইটিই ছিল বড়—সেখানে বৌদ্ধ বা মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না। খৃষ্টানের সংখ্যা খুবই কম—কিন্তু একই পরিবারে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানের দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়। লেহ্ শহরে এই বর্ণসঙ্করের (hybrid) সংখ্যা প্রচুর। এদের মধ্যে যারা ডোগরা সৈন্য-দলের গোষ্ঠী তাদেরকে বলা হয় 'গোলামজাদা'। এরা ছিল প্রাক্তন কাশ্মীররাজের ক্রীতদাসের মত। সরকার থেকে খাওয়া পেত বলেই সরকারী কাজ করে দিতে হত। ১৮৭১ সালে কাশ্মীর গভর্নমেন্টের অধীনে লাদাখের ইংরেজ গভর্নর এই ক্রীতদাসগণকে মুক্তি দেন। লেহ্ শহরের বাজারে এবং অলিগলিতে এরা আজও সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। একদা ভারতের অর্থসাচ্ছল্য এবং ভূ-সম্পত্তির প্রাচুর্যের সঙ্গে জনসংখ্যা ছিল অল্প, সেই জন্য বহুপত্নীক পুরুষের 'নারী-বিলাস' মানিয়ে যেত। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে লাদাখের শোচনীয় অনুর্বরতা, দারিদ্র্য ও অন্নাভাব এগুলি মেয়েদেরকে বহুভর্তৃকা হতে সহায়তা করেছে। এর ফলে একটি কৌতুকজনক অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় লাদাখী মেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দচারিণী। মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে মেলামেশা অবাধ। ফসলের খামারে, আনন্দের আসরে, পশমের কারবারে—সর্বক্ষেত্রে মেয়েপুরুষ একত্রে মিলছে। চতুর্থ পুরুষের সঙ্গে বিবাহকালে তিনজন স্বামী উপস্থিত রয়েছে দু'তিনটি সন্তান সহ—এ দৃশ্য বিরল নয়। এটি প্রচলিত প্রথা বলেই এতে সমাজদেহ কাঁপে না। জমির ফলন এবং অর্থোৎপাদন—এ দুয়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীধর্ম সংযুক্ত—এই আপেক্ষিক তত্ত্ব আমি এখনও অনুধাবন করিনি! তবে আমাদের শাস্ত্রে যে 'পঞ্চকন্যা নিত্য স্মরণীয়' হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত সতীশিরোরত্না দ্রৌপদীও অন্যতমা!

লাদাখীরা বাইরে যায়নি কখনও। ওরা জানে না ২০ বা ২৫ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য প্রাকারের বাইরে পৃথিবীর চেহারা কেমন। ওদের ভাষা, রুচি, প্রথা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা—সমস্তই একটা বহুমিশ্রণ এবং বিশেষ একটা ভৌগোলিক অবরোধের মধ্যে সীমায়িত। সিনকিয়াং, তিব্বত, কাশ্মীর বা ভারত—কোনটার সঙ্গে ওদের এ ক্ষেত্রে মিল নেই। জাতিতে হয়তো ধর্মান্তরিত মুসলমান, চেহারায় আর্যদার্দ, নয়ত কাশ্মীরি, নয়ত বা মঙ্গোলীয়, কিন্তু নামে, আচরণে এবং মিষ্টভাষণে ওরা বৌদ্ধ। মেয়ে

বা পুরুষ—কারও মধ্যে জাতিভেদের বিন্দুমাত্রও চেতনা নেই।

বাজারটি ছাড়িয়ে একটু ভিতরে গেলে যে প্রাচীন মধ্য এশীয় চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়, সেটির সঙ্গে ভারতীয় মনের মিল নেই। আমি নিজে সেখানে মূর্তিমান বেমানান। ঘরের দরজা, মেঝে, তৈজস, শয্যা, বসবাস—সমস্তটা ভিন্ন জগতের। আরেকটু চড়াই উঠে গিয়ে 'বাদশা মহলের' সীমানায় এলে একটু রুচিসম্মত এবং পরিচ্ছন্ন চেহারা পাই। এদিকটায় একদা বসবাস ছিল প্রাক্তন রাজকর্মচারীদের—যাদেরকে বলা যেতে পারত সভাসদ বা মন্ত্রী। এরা 'খালোন্' গোষ্ঠী ব'লে পরিচিত। এরা ছিল এককালের শাসক সম্প্রদায়। বাদশা-মহলের প্রাসাদ-পর্বতের নীচে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সর্বাধুনিক লেহ্ নগরী দেখতে পাওয়া যায়। এটি বর্তমানের অভিজাত পল্লী। এদিকে বনবাগান, সব্জি ফলনের বড় খামার, ঘাস-ফুল-জলধারা-লতাপাতা-মৃন্ময়তা, পপলার আর উইলোর ছায়ালোক, হাল আমলের বাংলোর আশেপাশে পুষ্পকুঞ্জ এবং অল্পস্বল্প জলাশয়—একে একে অনেক দূর অবধি দেখতে পেয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ অঞ্চলে থাকেন ভারতীয় বা কাশ্মীরি কর্মচারীরা এবং অভিজাত 'খালোন্' পরিবাররা। এদিককার জমিগুলিতে বালুপাথরের কর্কশ ও রুক্ষ চেহারার বদলে একটি কোমল মৃন্ময়তা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাগান এবং ক্ষেতখামারের ভিতর দিয়ে একটি বড় রকমের তরিতরকারির বাগানে এসে ঢুকলুম। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল লেহ্ শহরে শাকসব্জির ফলন। রুক্ষ ভূভাগে সব্জির ফলন খাদ্যতালিকার একটা বড় আশ্রয় এবং আকর্ষণ। সবুজ বর্ণ চোখের ও মনের তৃপ্তি। সবুজ পাতা, সবুজ শাকলতা এবং যে-কোনও কাঁচা সবুজ ও সজল খাদ্য খাবার জন্য মন ছটফট করে। মাংস ডিম মাছ—এগুলি তখন বিরক্তিকর। কাঁচা যবের এবং মটরের সবুজ ফলক বা শিষ চিবোবার জন্য তিব্বতে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়—যদিও এগুলি মানুষের প্রচলিত খাদ্য নয়।

একটি সম্ভ্রান্ত 'খালোন' পরিবারের তরিতরকারির বাগানের ভিতর দিয়ে এসে তাঁদের বাইরের ঘরে ঢুকলুম। এঁরা স্থানীয় সামরিক লোকজনদের জন্য তরিতরকারি সরবরাহের কাজ নিয়েছেন। এঁরা লেহ্‌র অভিজাত এবং শিক্ষিত পরিবার। প্রকৃতপক্ষে এঁরা নেতৃস্থানীয়। এঁরা বৌদ্ধ।

বাড়ির যিনি বৃদ্ধকর্তা, তিনি অতি নম্র ও শান্ত মিষ্টহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু ভাষা না জানার জন্য তিনি তাঁর বড় ছেলেকে ডাকলেন বাগান থেকে। এঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব্জিখামারের তদারক করেন। কৃত্রিম উপায়ে এঁরা পাহাড় থেকে ঝরণার জল এই বাগানে এনেছেন। অভিজাত 'খালোন' বংশের মেয়েরা বহুভর্তৃকা নন একথাটি কোথায় যেন শুনলুম। যাই হোক, একটি ছোট ঘরে ঢুকে

ফরাসের উপর বসলুম।

বৃদ্ধের নাম চোয়াং রিগজিম খালোন এবং যিনি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিনীত নমস্কার বিনিময় করলেন, তিনি অতি স্বাস্থ্যবান ও বিশালকায়। বয়স আন্দাজ ৪৫ থেকে ৫০। তাঁর নাম রিগজিম নামগিয়াল। এঁর পিতার পিতামহ ছিলেন লাদাখের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং 'স্তোক' নামক স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চলটির রাজা। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জরোয়ার সিং যখন লাদাখ জয় করেন, তখন তিনিই এই খালোনকে স্তোক অঞ্চলটি ছেড়ে দেন।

নামগিয়াল হিন্দী ভাষায় আলাপ করতে বসলেন। এঁর অমায়িক ব্যবহার, সততা ও দেশপ্রীতির জন্য লাদাখে ইনি বিশেষ খ্যাতিমান। আমার সঙ্গে ছিলেন লাদাখের একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী। নাম জিৎ সিং। ইনিও বিশেষ ভদ্র এবং সৌজন্যশীল। ইনি লাদাখের বিভিন্ন জনকল্যাণ-কর্মে লিপ্ত। ডেপুটি কমিশনার মিঃ মূর্তির সকল কর্মের ইনি একজন প্রধান সহায়ক।

আমাদের জন্য লবণ ও মাখন সহ উপাদেয় চা এল। তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ যবের ঘাঁট ও বিস্কুট। আমি খাদ্যরসিক নই, কিন্তু প্রায় আধখানা পৃথিবী ভ্রমণ করার ফলে যে-কোনও দেশের যে-কোনও খাদ্যেই আমার অরুচি নেই। শুধু বর্মা ভ্রমণকালে মান্দালয় নগরে এক বর্মী বন্ধুর বাড়িতে প্রাতরাশের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর (!) 'নাপ্পি' মুখে দেবার সময় একবারটি অলক্ষ্যে আমাকে মুখে রুমাল চেপে ধরতে হয়েছিল !!

নামগিয়ালের মুখে লাদাখের গল্প শুনছিলুম—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লেহ্ এবং লাদাখ উপজাতীয় পাঠান তথা পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখনও সদ্যস্বাধীন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ লাদাখে বা লেহ্‌তে এসে পৌঁছয় নি। এখানকার শাসনযন্ত্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা তার আগেই ভেঙে পড়েছিল। নামগিয়াল পূর্বোক্ত বৃদ্ধ পিতার কঠোর নির্দেশক্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তখন এঁর বয়স প্রায় তিরিশ বছর। মোট সংগ্রহ করলেন ৩৫টি স্বেচ্ছাসেবক এবং ১২টি বন্দুক। খাদ্য কেবল কাঁচা যবের ছাতু আর ঝরণার জল। পাহাড়ে-পাহাড়ে কোথাও তাঁবু নেই এবং রাত্রির আশ্রয় নেই। সে বছর প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা চলছে। নামগিয়াল ডাক দিলেন লাদাখের মুসলমান সম্প্রদায়কে, কিন্তু তারা এল না এবং সাহায্যও করল না। শত্রুপক্ষ লেহ্ নগরী অবরোধ করার জন্য সংগ্রাম করছিল। ফলে, নামগিয়ালের পক্ষের কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। তিনি আরও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক ও কয়েকটি দেশী কাঠের বন্দুক সংগ্রহ করেন। নামগিয়ালের বিশ্বাস, ইংরেজ নানা রকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিছন থেকে পাকিস্তানকে নাকি সহায়তা করছিল। যাই হোক, তিনি চেষ্টা করেন, উল্‌টো

পথ দিয়ে গিয়ে (out flanking movement) তিনি পিছন থেকে বিরোধী পক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করবেন। কিন্তু তাঁর এই গোপন প্ল্যানটি কি প্রকারে আগে থেকে ফাঁস হয়ে যায়। এটি তিনি তদন্ত করতে গিয়ে হঠাৎ সন্দেহ করেন কয়েকজন স্থানীয় মুসলমানকে! তিনি একটি বিশেষ সূত্র ধরে লেহ্-র বাজারে এসে একটি বাড়িতে হানা দেন এবং গিলগিটের ছয়জন মুসলমান পুলিশ অফিসারকে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র সমেত গ্রেপ্তার করেন। এঁরা এখানে ইতিমধ্যে এসে একটি গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় মুসলমানগণকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করাচ্ছিলেন! নামগিয়াল এই কয়েকজনকে লেহ্ নগরীর বাজারে নামিয়ে গুলী করে হত্যা করেন! সেই সময় লেহ্ নগরী পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবকরা তখন দৈনিক মাথাপিছু ১৲ টাকা বেতন পায় বটে, কিন্তু লেহ্ নগরী থেকে সর্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী তৎকালে অদৃশ্য হয়।

প্রশ্ন করে জানলুম, রিগজিম্ নামগিয়াল খালোন্ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠ করেননি। কিন্তু তাঁর কোনও এক কবিতার একটিমাত্র কলি কেমন করে যেন পূবন্ হাওয়ায় মেঘদূতের মতো কৈলাস পেরিয়ে এই লাদাখের পাহাড়ে ছট্‌কিয়ে এসেছিল—
"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

এই প্রতিরক্ষার মধ্যে প্রাণশক্তির যে উন্মাদনা এবং আপন-জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের যে অনুপ্রেরণা, এটি সৃষ্টি করেছিলেন রিগজিম্ নামগিয়াল। স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠেছিল এবং সেই উন্মত্ত সংগ্রামে অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। কিন্তু আধুনিক লাদাখের ইতিহাসে এ কথাটি থাকতে পারে, তাদের ক্ষয় হয়নি! নিঃশেষে, নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃশব্দে তারা মৃত্যু বরণ করেছিল বলেই মৃত্যুকে তারা জয় ক'রে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়েছিল!

এই অনন্যসাধারণ কর্মবীরের কাহিনী শোনামাত্র তৎকালীন কাশ্মীর ডিভিশনের প্রধান সেনাপতি অধুনা পরলোকগত জেনারেল থিমায়া পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিমানযোগে লেহ্ নগরীতে ভারতীয় সৈন্য অবতরণের হুকুম দেন। কিন্তু তখন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল! যদিও কার্গিল ও খালাৎসে অঞ্চলে তখন হানাহানি চলছিল, স্কার্দু এলাকা ততদিনে পাকিস্তানের দখলে আসে।

কিন্তু রিগজিম্ নামগিয়ালের কাহিনী ওখানেই শেষ হয়নি। অবস্থার পরিবর্তনের পর লেহ্ নগরী যখন শান্ত হয়, তখন হত্যাপরাধের জন্য রিগজিমের বিরুদ্ধে একটি বিচারসভা বসে। কাশ্মীরের এবং ভারতের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে তিনি কোন্ অধিকারে পূর্বোক্ত ছয়জন ইংরেজের তথা পাকিস্তানের গুপ্তচরকে হত্যা করেন, এইটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। এই হত্যাকাণ্ড যে রিগজিমের

ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ কোথায় ?

এই বিচারসভায় যে প্রধান দুই ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এই প্রথমবার পদার্পণ করেছেন লাদাখে। একজন হলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যজন তৎকালীন কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী।' রিগজিম নামগিয়ালের সততার প্রশ্ন তুলেছিলেন শেখ আবদুল্লা !

সেই বিচারসভায় উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে রিগজিম জবাব দেন, আমি প্রকৃতই হত্যার অপরাধে অপরাধী ! কিন্তু এই অপরাধ আমার নিজ স্বার্থ বা নিজ পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্য, অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশত করেছি কিনা, আপনারা তদন্ত করুন। নিজ মাতৃভূমিকে, লেহ্ নগরীকে, লাদাখের জনসাধারণকে এবং জাতির গৌরবকে রক্ষার জন্য—এই হত্যাকে আমি সেই নাটকীয় কালে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেছিলুম! আপনাদের তদন্তে যদি এর বিপরীত কথা প্রকাশ পায়, তবে আমি যে কোনও প্রকার শাস্তি শিরোধার্য করে নেবো !

বলা বাহুল্য, তদন্তাদি পূর্ণোদ্যমেই হয়েছিল, এবং রিগজিম্ নামগিয়াল সগৌরবে ছাড়া পেয়েছিলেন !

বৌদ্ধমঠগুলির জন্য লাদাখবাসীরা বাঁচে, অথবা লাদাখীদের জন্য মঠগুলিকে বেঁচে থাকতে হয় - লাদাখে এসে এ সমস্যার মীমাংসা করা সহজ নয়। সমগ্র লাদাখের মন, চিন্তা বা ধ্যানজ্ঞান মঠকেন্দ্রিক। এরা যদি সামান্য চাষবাসের সুবিধা এবং কাছাকাছি যদি পায় গুম্ফা, তাহলে এইটুকুই এদের পরম কাম্য। কিন্তু এই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি আর দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা পাচ্ছে না। লাদাখের উপর এবার এসে পৌঁছেছে আধুনিক কালের ধাক্কা। লাদাখের মরুভূমির উপর দিয়ে মোটরের চাকা ঘুরেছে, বোম্বাই-কলকাতা-মাদ্রাজের নানা সামগ্রীসম্ভার ঢুকছে, বিমানবাহিনী এসে নামছে কথায় কথায়। লাদাখ ছিল পৃথিবীচ্যুত সভ্যতাচ্যুত এবং সমাজচ্যুত। কিন্তু সেই চেহারার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে যে কি প্রকার আগ্রহান্বিত, তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ২০০ সংখ্যক পাঠশালা আর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা, সামরিক বিভাগ, কুটিরশিল্প– প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওরা এগিয়ে আসছে একে একে। হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রসূতি সেবা কেন্দ্র, ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা, রক্তদান কেন্দ্র, নার্সিং শিক্ষা, ধাত্রীবিদ্যা—এইগুলি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে আধুনিক কাল। গুম্ফাশাসিত সমাজ ক্রমশ হয়ে উঠছে যুক্তিপ্রভাবিত সমাজ। লেহ্, কার্গিল, খালসি, সাসপোল, সিমসেখবু, লিকির লামাউরু —এখন আর কেউ বসে নেই ! আধুনিককালে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ বা অনুন্নত ছিল

মধ্যএশিয়া। এই বৃহৎ লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ডের পশ্চিম অংশটায় প্রথম সুশাসন, সমৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে অংশটুকু মধ্যএশিয়ার মধ্যে সেই অংশে কল্যাণকর্ম প্রসারিত করার আগেই দুইটি বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্র ভারতের উপর চাপিয়ে দিল যুদ্ধচিন্তা। এই চিন্তায় ভারতের অর্থনীতি ও প্রগতিবাদ জীর্ণ হচ্ছে। এখানে এই দুস্তর মরুপাথর ও শস্যহীন অনুর্বরতার জগতে দুই বিরূপ রাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আপন-আপন সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী মাঝে মাঝে হামলা করছে। তবু এখানকার ঘোরতর অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নির্ভয় উদ্দীপনা এবং সর্বাত্মক প্রস্তুতির যে চেহারাটি প্রকাশ পাচ্ছে সেটি উৎসাহজনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্নিহিত চিত্তদৌর্বল্য ভারতের সামরিক শক্তিকে যথেষ্ট বীর্যবান ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে এতদিন সহায়তা করেনি। সতেরো বছর পরে সেই চিত্তদৌর্বল্যের প্রায়শ্চিত্তের কাল এবার বুঝি আসন্ন!

ছোট্ট লেহ্ শহরটিতে গান্ধীজির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যে অনুষ্ঠানসূচীটি প্রস্তুত করেছিলেন, সেটি মনোজ্ঞ। লাদাখের বৌদ্ধ বালকবালিকা, লেহ্-র স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী, বৌদ্ধ গুম্ফাগুলির লামার দল. মেষপালক ও দোকানদাররা, শহরবাসীর বিভিন্ন শ্রেণী এবং সামরিক বিভাগের লোকজনের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম', 'জনগণমন' এবং 'রঘুপতি রাঘব'—গানগুলি সুরসংযোগে যে-প্রকার উচ্চারণ ভঙ্গীতে গীত হচ্ছিল, সেটি শুনে অভিনবত্বের আনন্দ পাচ্ছিলুম। ওখানে না আছে 'রামলীলার মাঠ', না আছে সুবোধমল্লিক স্কোয়ার (যার পুরনো নাম 'জলের কলের মাঠ'), না 'কোম্পানীর বাগান' (যার আধুনিক নাম রবীন্দ্রকানন), বা না আজাদ হিন্দ বাগ (যার পুরনো নাম 'হেদুয়া')। এখানে যে জায়গাটিতে সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ মূর্তি প্রমুখ সরকারী কর্মচারিগণ অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলেন, সেটি 'বাদশা মহল' পাহাড়ের নীচে ঠিক বাজার-পথটির শিরোদেশে। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি তাকিয়ে রইল একদল মরুচারী ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদপরা যাযাবর 'চাম্পা', তিব্বতের থেকে তাড়া খাওয়া জনকয়েক ধর্মান্ধ রেফুজি, লেহ্ নগরীর অদূরবর্তী 'চুশৎ' এলাকাবাসী কয়েকজন বালতিস্তানী, এবং একদল বৌদ্ধ দার্দ। এদেরই ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন সম্ভ্রান্ত খালোন গোষ্ঠীর লোকজন, লেহ্-র কয়েকটি টুপিপরা সুশ্রী যুবতী, তাদের সঙ্গে বর্ণসঙ্করজাত গুটিকয়েক দোকানদারের ছেলে মেয়ে, এবং তাদেরই পাশে-পাশে জনকয়েক বহুভর্তৃকা নারী—যারা শ্রমিক গৃহস্থ। কৌতুকের বিষয় ছিল এই, বিভিন্ন শ্রোতৃশ্রেণীর মধ্যে 'বন্দে মাতরম' শব্দ দুটি একদম অর্থবোধক নয়, জনগণমন গানটির তাৎপর্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এবং 'রঘুপতি রাঘব' ব্যক্তিটি কে, কোথাকার

এবং কি বস্তু—সমস্তটাই তাদের কাছে ধোঁয়া। ফলে, আগাগোড়া তারা অবাক হয়ে থাকে একটা সামগ্রিক অর্থশূন্যতার দিকে তাকিয়ে। গৌতম বুদ্ধকে এরা দেবতা বলেই জানে। তিনি মানবদেহধারী ছিলেন—এরা বিশ্বাস করে না। শুধু তাই নয়, মঞ্জুশ্রী অবতার পদ্মসম্ভবের পরে অদ্যাবধি পৃথিবীতে অপর কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার মতো কোনও এক ব্যক্তিকে ভারতের কর্তৃপক্ষ ওখানে খোর-পোষ দিয়ে রাখলে ভাল করতেন। আমার ন্যায় পর্যটকের পক্ষে এ ধরনের অনুষ্ঠান অতিশয় চিত্তগ্রাহী, কিন্তু লাদাখের পক্ষে নিরর্থক।

ক্ষুদ্র লেহ্ নগরীর বাইরে চোখ ফেরাতে ভয় করে। চারিদিকে অন্তহীন মরুপাথার আর পাহাড়ের রৌদ্রতপ্ত রুক্ষতা। মাঝে মাঝে ঘূর্ণীবায়ুর প্রবল ঝাপটে নীচের বালু উপরে উঠে প্রত্যেক পাহাড়কে আক্রমণ করে। পরে এগুলি যখন ঝরতে থাকে তখন দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়গুলি এবং তাদের মধ্যবর্তী 'বায়ুপথগুলি' মসৃণ ও মোলায়েম। দূরের থেকে এমন মসৃণ দেখা যায়, যেন মনে হয় কোনও এক শিল্পী এগুলিকে অতি যত্নে হাত দিয়ে লেপেছে। অপরিচিত সেই বালু-পার্বত্যভূমির প্রকাণ্ড বিস্ময় যেন চারিদিকে নৈবেদ্যর মতো থরে-থরে সাজানো। কিন্তু এই সর্বব্যাপী রুক্ষতার উপর দিকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই লক্ষ্য করছি, প্রতি রাত্রে লাদাখ পর্বতশ্রেণী ও দক্ষিণ কারাকোরমের চূড়ায়-চূড়ায় নতুন তুষারের স্তর জমে উঠছে। দিনমানের প্রখর রৌদ্রে বালুপাথর ধুলো ও বায়ুঝাপটের ভিতর দিয়ে পর্যটনকালে অসুবিধা বোধ করছি,—আবার সন্ধ্যার পর থেকে সেই প্রদেশের আবহ-অবস্থা 'জিরো-ডিগ্রি'র নিচের দিকে নামতে থাকে। রাত্রি দশটার পর দু-একদিন অন্ধকার লেহ্ নগরীর এখানে ওখানে ঘুরে লক্ষ্য করেছিলুম, শুধু যে একটা সর্বাঙ্গীণ নিষ্প্রদীপ নগরী নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে তাই নয়, এমন একটা আগাগোড়া জনচিহ্নহীনতা,—যেটির দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থাকলে গা ছমছম করে!

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, ভারত সম্বন্ধে সাধারণ লাদাখীর বংশপরম্পরাগত অজ্ঞতা। এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের চেহারা এরূপ যে, বাইরের সঙ্গে এদের কায়িক যোগাযোগ কোনওকালে ঘটেনি। এদের প্রকৃতি এরূপ নিরীহ, নিরুদ্যম এবং অনুৎসুক যে, বৌদ্ধ লাদাখের বাইরে যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে সে সম্বন্ধে এদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। শুধু একটিমাত্র দুঃসাধ্য পথের সংবাদ এরা চিরকাল ধরে জেনে এসেছে, সেটি 'রূপসুর' ভিতর দিয়ে হুন দেশ পেরিয়ে মানসসরোবর এলাকা অতিক্রম করে 'লাসার' তীর্থপথ। এই পথটি পায়ে-হাঁটা অথবা ঘোড়ায়-চড়া, কিন্তু দেড় হাজার মাইলের কম নয়। অধিকাংশ যায় হেঁটে, এবং কতকাংশ ফেরে না। রোগ, অনাহার,

বিনাচিকিৎসা, দস্যু আক্রমণ, এইগুলিতেই যারা মরে তাদেরকে বাদ দিয়ে যারা ফিরে আসে—তাদের আনাগোনায় লেগে যায় প্রায় দেড় বছর। লাসার সেই তীর্থপথ সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে।

এরা দেখেছে কাশ্মীরি, ইয়ারকন্দি, তিব্বতী এবং কতকটা উত্তর-পাঞ্জাবী জনতা। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে লাদাখীদের একটি আতঙ্ক আছে। এরা প্রায় প্রত্যেকের হাতে মার খেয়েছে এবং বার বার সর্বস্বান্ত হয়েছে। এদের গুম্ফাগুলিতে বহু যুগের সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য ভাণ্ডার, এবং মণিরত্নসম্ভার লুণ্ঠিত হয়েছে বার বার পাঠান দস্যুদলের হাতে। সুলতান শাহ্ মির্জা থেকে আরম্ভ করে সিকান্দার অবধি (১৩২৪-১৪১৬ খৃঃ) কাশ্মীরের প্রত্যেক শাসকের হাতে এরা লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে। তারা গুম্ফায়-গুম্ফায় আগুন জ্বালিয়েছে, পাইকারী হারে হত্যা করেছে, শত শত বছরের সংগৃহীত পুঁথির রাশি পুড়িয়ে সিন্ধুর জলে ভাসিয়েছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে অগণিত সংখ্যক বৌদ্ধবিগ্রহ। মোগল অধিকারের কালে ১৭শ' শতাব্দীর শেষ দিকে মঙ্গোল এবং তিব্বতী দস্যুর দল ঠিক পাঠানদের মতোই লাদাখের বহু গুম্ফা ছারখার করে এবং হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। এদের এই স্বল্পসংখ্যক লোকসংখ্যার থেকে যখন বসন্ত রোগের মহামারীতে ১৪ হাজার নরনারীর মৃত্যু ঘটে, সেইকালে (১৮৩৪ খৃঃ) জম্মুরাজ গুলাব সিং মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের নির্দেশক্রমে জম্মুর উজীর সেনাপতি জরোয়ার সিং মারফত লাদাখ ও লেহ্ নগরী আক্রমণ করেন। এবং তাঁর আক্রমণের ফলে লাদাখে ডোগরা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পশ্চিম তিব্বতে জরোয়ারের শোচনীয় পরাজয় এবং ঘাতকের হাতে তাঁর শিরশ্ছেদনের পর (১৮৪২ খৃঃ) চীন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তিব্বতীরা পুনরায় পূর্ব ও দক্ষিণ লাদাখ এবং লেহ্ নগরী আক্রমণ করে, কিন্তু তারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। অতঃপর বিশেষ বিশেষ শর্তে উভয়পক্ষে একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লাদাখের বর্তমান পরিস্থিতির দিক থেকে এই ১৮৪২-এর চুক্তিটি বিশেষ মূল্যবান। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কালে ইংরেজের প্রভাব বা প্রতিপত্তি কাশ্মীর, উত্তর-কাশ্মীর, জম্মু বা লাদাখে তখনও এসে পৌঁছয়নি। মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর (১৮৩৯ খৃঃ) পর তখন পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘটনাস্রোতে ভাসছে এবং প্রথম ইংরেজ-আফগান সংঘর্ষ চলছে (১৮৪১ খৃঃ)। তখন পূর্বোক্ত চুক্তির একদিকে ছিল কাশ্মীর ও লাদাখ এবং অন্যদিকে ছিল চীন ও তিব্বত। এই উভয়পক্ষর দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রসংলগ্ন যে দলিল এবং লাদাখের মানচিত্রটি,—এ'দুটি অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। সেটিতে দেখা যায় মুজ্‌তাগ-কারাকোরম এবং কুয়েনলান পর্বতমালার মধ্যবর্তী ভূভাগ—যথা, দেপসাং, সোডা প্লেন্‌স, আকসাইচিন্, লিংজিটাং, চ্যাংচেমো, পাংগংয়ের অন্তর্গত খুর্নাক দুর্গ, এবং

দুর্গপন্থর অন্তত হান্‌লে প্রমুখ পূর্ব দেমচক ও পশ্চিমে চুমার,—এগুলি সমস্তই কুমুরাজের বা কাশ্মীরের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। এক হাজার বছর আগেকার ইতিহাসে লাদাখ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র, এবং সেইটিই ছিল তার সত্য পরিচয়! ভৌগোলিক অবস্থানক্রমে তার রাষ্ট্র সীমানা ছিল অতিশয় নিভুর্ল। এই বিচিত্র ভূখণ্ডটির সঙ্গে সিনকিয়াং, তিব্বত, কাশ্মীর, জম্মু বা ভারত,—কারও কোনও কায়িক সংযোগ ছিল না। লাদাখ তৎকালে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভূমি নয়, এবং এ ভূমি ইংরেজেরও দখলীকৃত নয়। কিন্তু লাদাখ স্বাভাবিক পথ দিয়েই এসেছে ভারতের মধ্যে, যেমন একদা সে এসেছিল সম্রাট অশোকের কালে, এবং ভারত লাদাখকে পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে—যে-সূত্র চীন, তিব্বত, বা হাল-আমলের পাকিস্তান—কারও নেই। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাঁদের 'রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি' তুলে এগিয়ে এসে বলছেন, "স্বীকার করিনে তোমার এই উত্তরাধিকার সূত্র। লাদাখ তোমার নয়, —এ তোমার সেই পুরনো ইংরেজ আমলের সাম্রাজ্যবাদ; সেই সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার সূত্র একালে হয়েছে তোমার সম্প্রসারবাদ। লাদাখের ওপর বিন্দুমাত্র অধিকার তোমার নেই। ছেড়ে দাও লাদাখকে।"

অপমানিত, ধর্ষিত ও ভূপতিত লাদাখ রক্তমাখা অবস্থায় পুনরায় ছট্‌কিয়ে এসে পড়েছে ভারতের কোলের কাছে। এ যেন শরবিদ্ধ সেই মৃত্যুমুখী রাজহংস অজানা আকাশ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে শাক্য সিংহের পদতলে! শরাহত বিহঙ্গকে কোলে তুলে নিয়ে তার অঙ্গবিদ্ধ শরটি তুলে নিলেন রাজকুমার পরম যত্নে। তারপর সকরুণ সেবা ও পরিচর্যার ফলে সেই রাজহংস যখন সুস্থ হয়ে উঠছিল, তখন ধনুর্বাণ হস্তে মারমুখী দেবদত্ত ছুটে এসে হিংস্র কণ্ঠে বললেন, ফিরিয়ে দাও আমাকে ওই পাখি। আমি ওকে মেরেছি। ও পাখি আমার।

পরবর্তীকালের গৌতম বুদ্ধ নির্ভয় স্নেহে সেদিন দেবদত্তের মুখের ওপরেই সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন, নিরীহ ও নিরপরাধ পাখিকে যে হত্যা করে, পাখি তার নয়। কিন্তু যে-ব্যক্তি তার ক্ষতস্থানকে নিরাময় করে, সেবা ও স্নেহে লালন করে, অপমান ও মৃত্যুর থেকে তুলে যে তার নবজীবন দান করে,—এ পাখি তারই।

॥ ১২ ॥

আখাসাই (লাদাখ) ও আকসাই-চিন্

গৌতম বুদ্ধের শেষ জীবনে সম্ভবত শান্তি ছিল না। ক্ষমতার লড়াই, দলগত বিদ্বেষ, পারস্পরিক রেষারেষি ও কলহ এবং বিদ্রোহ ঘোষণা,—এইগুলি তাঁর সঙ্ঘ ও ধর্মচক্রগুলিকে জীর্ণ করে। অথচ এই কালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরে মল্লক্ষত্রীয়রা, তাঁর দেশবাসী ও অগণিত অনুরক্তের দল ছাড়াও দেশ-দেশান্তরের বহু রাজন্য তাঁর শবযাত্রায় যোগদান করেছিলেন। তাঁর চিতাভস্ম সংগ্রহ করেছিল বহু দেশের বড় বড় লোক, এবং অনেকে তাঁর অস্থিও গ্রহণ করেছিল।

লাদাখের তৎকালীন নাম ছিল 'আখাসাই' (টলেমি)। এই আখাসাইর যিনি সেদিনের শাসনকর্তা, তিনিও মহামানব বুদ্ধের পরিনির্বাণকালে কুশীনগরে উপস্থিত হন এবং পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধের দেহাবশেষের একটি অংশ অর্থাৎ একটি 'দাঁত' গ্রহণ করেন। এছাড়া গৌতম বুদ্ধের যে কয়খানি বৃহৎ মৃন্ময় (steatite) ভিক্ষাপাত্র ছিল, তাদের একখানিও তিনি হাতে পান। এই দুটি একান্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার জন্য লেহ্ নগরীর উত্তরে একটি মন্দির এবং 'দাংতেন' নামক একটি নিশ্ছিদ্র স্তূপ নির্মাণ করা হয়। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভিক্ষাপাত্রখানি', এবং স্তূপটির ভিতরে স্বর্ণ ও রত্নখচিত কৌটায় 'সমাধিস্থ' হয় গৌতম বুদ্ধের সেই দাঁতটি! আখাসাই অঞ্চল তৎকালে ছিল বালতিস্তান ও লাদাখ সহ একটি সংযুক্ত প্রদেশ, এবং এই প্রদেশ সমভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তী যুগে সম্রাট অশোকের কালে 'আখাসাই' একটি প্রধান বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্র এবং বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হয়। পূর্বোক্ত মৃন্ময় ভিক্ষাপাত্রের অনুরূপ আরও দুটি ভিক্ষাপাত্র ১৯ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন আলেকজান্দার কানিংহাম ও তাঁর সহকারী লেফটেনাণ্ট মেইজি। একটি পাওয়া যায় মধ্যভারতের অন্তর্গত প্রাচীন বিদিশায় এবং দ্বিতীয়টি প্রাচীন গান্ধার বা বর্তমান আফগানিস্তানে। তিনটি পাত্রের একই বর্ণ, একই আয়তন এবং একই মৃৎপদার্থে তারা নির্মিত। লেহ্ নগরীর উত্তরপথে একটি পার্বত্য গুম্ফায় সেটি অদ্যাবধি বর্তমান।

এর পর দাংতেনের সেই পবিত্র দাঁতটির কথা উঠতে পারে। বৌদ্ধ লাদাখকে

ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে চেষ্টা করা হয়। রক্তমাখা তরবারি নিয়ে ছুটে এসেছে ইয়াসেনী, নাগরী আর হুন্‌জা, ছুটে এসেছে পাঠান আর ইয়ারকন্দি আর পামীরী দস্যুর দল,—লাদাখীদের রক্ত ঝরেছে মরুপাহাড়ের তলায়-তলায়। তারা বারম্বার লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে, উপবাস ক'রে শুকিয়ে মরেছে গুম্ফায়-গুম্ফায়, কিন্তু বুদ্ধের বীজমন্ত্র তারা ছাড়েনি। এমনি ক'রে বহু শতাব্দি কেটে যাবার পর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের যুগ এল। বালতিস্তানে তখন এক ফকির বংশীয় 'গিয়ালপো' আলি শেরের শাসন চলছে। তিনি স্কার্দু জনপদের প্রসিদ্ধ দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং লাদাখ বিজয়ে অগ্রসর হন। লাদাখ আক্রমণকালে তিনি সেই প্রাচীন দাংতেনটি ভেঙ্গে দিয়ে গৌতম বুদ্ধের সেই পবিত্র দাঁতটি মহাসিন্ধুর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তাঁর সেই আক্রমণকালে লাদাখে আরেকবার লুটপাট এবং দস্যুবৃত্তি চলে। (Ladak: Alexander Cunningham, 1853) সেই ভগ্নাবশেষটি আজও পড়ে রয়েছে বালুপথের একান্তে।

যাই হোক, আলি শেরের পুত্র আহমেদ শাহর আমলে লাদাখ পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাহ মুরাদ লাদাখকে পুনর্বার জয় করার কালে লুটপাট ও দস্যুবৃত্তি করেন। লাদাখের সর্বশেষ স্বাধীন শাসক ছিলেন আরেকজন আহমেদ শাহ। ১৮৪০ সালে জারোয়ার সিংয়ের নিকট তাঁর পরাজয় ঘটে।

লেহ্ নগরীর বাইরে পাহাড়ের চূড়ায় যে গুম্ফা-মন্দিরগুলি বর্তমান তাদের মধ্যে 'চম্পাদেবের' মন্দিরের আকর্ষণ কম নয়। 'চম্পাদেবে'র মূর্তিটি চতুর্ভুজ। এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, অন্য হাতে বরাভয়দান প্রসারিত, তৃতীয় পাণিতে পুষ্পগুচ্ছ, চতুর্থটিতে পানপাত্র। মূর্তিটি আসনে উপবিষ্ট। দেহের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন। কণ্ঠে রত্নমাল্য, হাতগুলিতে কাঁকন-অলঙ্কার। সমগ্র দেহ পুরুষের,—মুখখানা নারীর। মাথায় চূড়াকার কেশবন্ধ, ললাটের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি বহু মূল্যবান রত্নখচিত টায়রা। চম্পা হলেন নরনারী-মিশ্রিত (androgynous) 'নপুংসক' দেবতা! উত্তর ভারতে, দ্রাবিড়ে, কলিঙ্গে, কাশ্মীরে, অথবা হিমালয়ের অন্য কোথাও চম্পাদেবের জুড়ি নেই! প্রতি গুম্ফার মন্দিরে মূর্তি বা বিগ্রহ রচনার মধ্যে যে মৌলিক চিন্তাধারা, চিত্রকলায় যে কল্পনাশীলতা এবং শিল্পের যে দক্ষতা,—এগুলি লাদাখের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অনন্যতা রুচিবোধ, চারু ও শিল্পকলার প্রতি সহজাত রসবোধ, চিত্র বা শিল্পসজ্জা রচনার মধ্যে যে অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের চিহ্ন বর্তমান,—এইগুলি লাদাখীদের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়। বস্তুত, স্থাপত্যকলায় 'হিন্দু'-ভারতের প্রাচীন গৌরব কতটুকু? সনাতনী ব'লে যাদের জানি, তাদের পুরাকীর্তি কোথায়? গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণ না

ঘটলে ভারতের প্রথম স্থাপত্যকলার সৃষ্টি হয় কিনা কে জানে! আমি সঠিক জানিনে, তবে বোধ হয় সম্রাট অশোকের আগের আমল থেকেই 'অজন্তার' গুহাশিল্পের কাজ আরম্ভ হয়। চম্পাদেবের মূর্তিতে এই কথাটি বলা হয়েছে, প্রতি জীবের মধ্যে শিব (কল্যাণ) বর্তমান, এবং নপুংসকের মধ্যেও নারায়ণের অধিবাস পরম সত্য! লামাসমাজের এই ভাবনাটি চম্পাদেবের মধ্যে একটি আকার লাভ করেছে।

লামাসমাজের নিজস্ব একটি নীতি তিব্বতের মতো লাদাখেও প্রবর্তিত। কিন্তু একথাটি ভুললে চলবে না, বৌদ্ধ সভ্যতার প্রবর্তনের দিক থেকে লাদাখীরা তিব্বত বা চীন অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসরবাদী। লাদাখে বৌদ্ধ দর্শনের মূলনীতির প্রভাব পৌঁছেছে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর ঠিক পরে, এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ সভ্যতার প্রথম পত্তন করেন লাদাখে,—যখন তার নাম ছিল, 'আখসাই'। চীন তখন কোথায় ছিল কেউ জানে না; তিব্বত ছিল একটা আদিম বর্বরতার আবরণ মুড়ি দিয়ে। এই হতভাগ্য, দরিদ্র ও নিরন্ন লাদাখ প্রথম ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতের মন্ত্রপাঠ করে তিব্বত ও চীনের কানে-কানে। মৌর্য-সাম্রাজ্যের কালে লাদাখ সভ্যতার সমারোহে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেও চুপ ক'রে কিন্তু বসে থাকেনি। সে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূত পাঠিয়েছে বৃহৎ প্রাচ্যের উত্তর পশ্চিমে ও পূর্বে। শুধু সিনকিয়াং, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান বা তিব্বত নয়—আজ যে সুবৃহৎ ভূভাগ সোভিয়েট ইউনিয়ন্ নামে পরিচিত—সেখানেও একটির পর একটি বৌদ্ধ গুম্ফা বা মঠ সৃষ্টি হয়। তাজিকিস্তান থেকে আরম্ভ ক'রে তুর্কমেনিস্তান অবধি পুরাস্থাপত্য-কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আজ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, তার ফলে একটির পর একটি বৌদ্ধ স্থাপত্যই আবিষ্কৃত হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অদ্যাবধি যে সকল বৌদ্ধমঠ বা গুম্ফা বর্তমান সেগুলি একালেও বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মাচরণের এক একটি প্রধান কেন্দ্র। সোভিয়েট বৌদ্ধ-পরিষদের বর্তমান সভাপতি হলেন ধর্মায়েভ লবসাননিমা হাম্বো লামা। ইনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

লাদাখের লামাসমাজে একটি বিশেষ আত্মকেন্দ্রিক 'শাসক সম্প্রদায়' বর্তমান। রাষ্ট্র অনেকবার হাত বদলিয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে লামাগোষ্ঠীর নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতি পরিবারের থেকে একটি পুত্রসন্তান উৎসর্গীকৃত হবে গুম্ফার সেবায়; সে মানুষ হবে লামা পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে। সেই ছেলেটি সকলের সঙ্গেই বসবাস করবে বটে, কিন্তু নিজের বাড়িতে তার জন্য থাকবে একটি 'ঠাকুর ঘর', এবং নিজের বাড়িতেও সে থাকবে পুরোহিত হয়ে পূজা-অর্চনা নিয়ে। এই প্রকার একটি ছেলের নাম 'জেলাম।' শুধু ছেলে নয়, মেয়েও আছে 'উৎসর্গীকৃত'। এরা কুমারীকাল থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে। লাদাখে এদেরকে বলে, 'চোমো বা চুমো বা আনিস।'

এরা সংখ্যায় একশ'রও বেশি। এই মেয়েগুলি প্রায় সকল বয়সের এবং সুশ্রী, সৌজন্য-শীলা ও মঠবাসিনী। এরা অনেকটা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের 'দেবদাসীদের' মতো। কালিকট, দ্বারকা প্রভৃতি অঞ্চলে দেবদাসীগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন দুর্নীতির সংবাদ শোনা যায় এখানে সেটি এখনও সম্ভবত হয়নি। এরা দেবসেবা পূজা পাঠ, নৃত্য ও সঙ্গীতাদি নিয়ে থাকে। এদের কয়েকজনের আনত সৌজন্য, সুশ্রী চেহারা ও নম্র হাসি দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম। কিন্তু লাদাখেও লামাগোষ্ঠী দুই প্রকার, - পীত ও রক্তিম। পীত অর্থে প্রগতিবাদী,—পোশাক যাদের হরিদ্রাভ। রক্তিম অর্থে রক্ষণশীল—লাল পোশাক! এদের উভয় দলেরই গুম্ফা ভিন্ন ভিন্ন, আচার-অনুষ্ঠানও পৃথক ধরনের। এই উভয় দলেরই প্রতিনিধিরা সরকারী প্রশাসনের কাজে যায়, জমি চাষ করে, এবং ভেড়া ও ছাগলের পাল প্রতিপালনের কাজে নামে।

ভেড়া-ছাগলের কথা উঠলে মাঝপথে একটু থমকিয়ে যেতে হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি মধ্য এশিয়ার কয়েকটি ভূখণ্ডের রাজনীতি একদিকে মরুলোকে প্রবাহিত পার্বত্য জলধারা, এবং অন্যদিকে ভেড়া-ছাগলের পাল—এই দুটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রনীতি, দ্বিতীয়টির সঙ্গে অর্থনীতি। প্রাচীনকালের ইন্দো-গ্রীক, ইন্দো-ইরাণ, ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয়ান, ইন্দো-এরিয়ান এবং মধ্যযুগের তুর্কি, আফগান, পাঠান, লনজা বাল্‌তি, মঙ্গোল, চীন, তিব্বতী প্রভৃতি জাতি লুব্ধচক্ষে তাকিয়ে থেকেছে কয়েকটি বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল চারটি প্রদেশ,—চানথান, সিনকিয়াং, লাদাখ ও লাহুল-স্পিতি। এই চারটি প্রদেশ বিশেষ এক জাতির ভেড়া-ছাগলের লোমশ আবরণের তলায় অতি সূক্ষ্ম রেশমতুল্য এক প্রকার মিহি লোম জন্মায়, যেটির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর। এগুলির নাম পশমিনা—পশম নয়। সাধারণ একখানি কাশ্মীরি পশমের শালের দাম যেখানে মাত্র ৭৫৲ টাকা, সেখানে একখানি 'পশমিনা শাল' ২০০৲ টাকার কম নয়। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি কথা ছিল। এই পশমিনার সর্বপ্রধান বাজার বা ক্রেতা ছিল পাঞ্জাব ও কাশ্মীর। সেই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে একটি বিশেষ 'ধর্মীয় শপথ' বা চুক্তি-শর্ত একান্তভাবে প্রচলিত ছিল যে, এই পূর্বোক্ত চারটি প্রদেশে যত পশমিনা উৎপন্ন হবে, তার সমস্তটাই রপ্তানি হবে একমাত্র লাদাখের ভিতর দিয়ে। বলা বাহুল্য, লাহুল ও স্পিতি তৎকালে দক্ষিণ লাদাখের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'ধর্মীয় শপথ' ছিল এই, এই ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম যদি ঘটে, তবে সমস্ত পশমিনার গাঁইটগুলি বাজেয়াপ্ত করবেন পশ্চিম তিব্বতের রুদক বা গার্তক জনপদের শাসকগণ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে মুরক্রফ্‌ট্‌ ও ট্রেবেক লাদাখে গিয়ে দু'বছর বাস করেছিলেন শুধু এইটি বুঝবার জন্য, কেমনভাবে এই ব্যবসাটির মধ্যে মাথা গলানো যায়! (Moorcroft's Travels,

1819-25) উদ্দেশ্যটি পরবর্তীকালে সাফল্যলাভ করে ইংরেজেরই হাতে। মহারাজা গুলাব সিংয়ের কালে স্পিতি ও লাহুলকে লাদাখ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়,—যাতে চানথানের পশমিনা লাহুল হয়ে এসে পৌঁছয় পূর্ব পাঞ্জাবের নুরপুরে—কুলু ও কাংড়ার ভিতর দিয়ে। অন্যপক্ষে মহারাজা গুলাব তাঁর অংশের পশমিনা পেতে থাকেন সিনকিয়াং থেকে লাদাখ হয়ে কাশ্মীরে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে চীনের নূতন শাসকবর্গ এই প্রাচীন বাণিজ্যের উচ্ছেদ করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রায় ২ হাজার গাঁইট পশমিনা (আনুমানিক) এসে পৌঁছত। বর্তমানে সে সকল বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ।

চাংথান বা চানথান (তুষার ভূমি) প্রদেশের ইতিহাসটি ছোট, কিন্তু মূল্যবান। এই তিব্বতী প্রদেশে তিনটি পর্বতশ্রেণী গায়ে-গায়ে ভিড়েছে। সেই তিনটি হ'ল কুয়েন-লান, কৈলাস ও আলিং কাংড়ী। এই প্রদেশ অর্ধচন্দ্রাকার একটি বেষ্টনীর দ্বারা লাদাখকে বেষ্টন করে রয়েছে উত্তরে, দক্ষিণে ও পুর্বে এই তিব্বতী অঞ্চলে পার্বত্য জলধারার পাশে পাশে উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং সেসব অঞ্চলে শস্যের ফলনও যথেষ্ট। চানথানের স্বর্ণখনিগুলি তিব্বতে অতি প্রসিদ্ধ, যেমন প্রসিদ্ধ তার পশমিনা। রাজনীতিক দিক থেকে চানথান তিব্বতের ছত্রচ্ছায়া (suzerainty) মেনে চললেও সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতির দ্বারা এ প্রদেশ বরাবর শাসিত হয়েছে! সোনা এবং পশমিনা—এই দুই সামগ্রীর জন্য ভারতীয় অর্থ এদের হাতে এককালে প্রচুর জমা হত। সুতীবস্ত্রাদি, চাউল, গম, ফলপাকড়, চিনি, মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতি এরা কিনত ভারতের কাছ থেকে। এই চানথানের অন্তর্গত হ'ল হুনদেশ ও পুরঙ্গ উপত্যকা। এই দুটি অঞ্চলের প্রত্যেকটি জনপদ সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। রুদক, গার্তক, তাসিগং, তাকলাকোট, বর্খা, জ্ঞানীমণ্ডি,—এদের বাজারে ভারতীয় সামগ্রী কেনার জন্য সুদূর লাসা থেকে লোক আসত।

চানথান পশ্চিম তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ থেকে। তিব্বতে সিনকিয়াংয়ে এবং চানথানে চীনের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিবৃত্তটি ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য সৃষ্টির মতোই কতকটা অগৌরবে ভরা। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে নেপালের গোর্খাদের সঙ্গে তিব্বতের বিবাদ বেধে ওঠে, এবং তার ফলে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় তদানীন্তন দালাইলামা চীন দেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। চীনের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধ বাধে এবং গোর্খারা পরাজিত হয়ে তিব্বত ত্যাগ করে। কিন্তু এই সুযোগে চীনা শাসকগণ যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, পৃথিবীর সর্বকালের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারবাদীগণ সেই একই কাজ করে এসেছেন। তাঁরা লাসা নগরীতে চীনা-রেসিডেন্সি স্থাপন করেন, ও সেই রেসিডেন্টকে রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য সশস্ত্র পাহারা বসান, এবং লামাসমাজের প্রতিরোধ, হানাহানি এবং আন্দোলন সত্ত্বেও তিব্বতের রাজনীতি তখন থেকে পেকিংয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ভিন্ন নাম হয় 'সুজারেইনটি'! কৌতুকের বিষয় এই, সিনকিয়াং ও চানথানে সেই একই কালে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সিভিল ওয়ার দেখা দেয়। তাজিক, উজবেক, কাজাখ,—প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির রাজনীতিক আত্মকলহের মধ্যে চীন শাসকরা মিটমাট করতে আসেন আমন্ত্রিত হয়ে,—কিন্তু সিনকিয়াং এবং চানথান থেকে তাঁরা ফিরে যান নি। ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রায় সেই একই কালের সৃষ্টি। তফাৎ এই, জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু মূঢ় ও ধর্মান্ধ তিব্বত এবং আত্মঘাতী সিনকিয়াংয়ে জাতীয়তাবাদ ও গণআন্দোলন প্রবলতর হয়ে ওঠবার কালেই একালের নূতন চীনের শাসকরা তিব্বত ও সিনকিয়াংয়ের কণ্ঠরোধ করেছেন। এই শাসকরা বর্তমানে দুটি নীতি অনুসরণ করছেন। এশিয়ায় তাঁরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে সম্প্রসারবাদে পরিণত করতে চান, এবং আফ্রিকায় গিয়ে তাঁরা 'এক্তিয়ারী এলাকা' সৃষ্টি করতে পারলে সুখী হন। চীনের সমাজ ব্যবস্থার বর্তমান মূলভিত্তি হ'ল তথাকথিত উগ্র কমিউনিজম, কিন্তু তার সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চেহারাটি হল উগ্র ন্যাশন্যালিজম্।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে যখন চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন আথাসাই প্রদেশে আসেন, তখন এই ভূভাগটি 'কিয়ে-ছা' বা 'খা-চান' বা তুষারভূমি—এই নামে পরিচিত উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধভূমি। এই তীর্থস্থানে এসে তিনি পূর্বোক্ত ভিক্ষাপাত্র এবং 'দাংতেন' দর্শন করেন। এখানকার অধিবাসী বৌদ্ধগণকে তৎকালে বলা হ'ত 'খা-চান-পা' অর্থাৎ তুষারময় পার্বত্যভূমির মানুষ। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায় 'কিয়ে-ছা বা খা-চান' প্রদেশে শস্যের ফলন ছিল না। তাঁর পর্যটনকালের প্রায় দু'শ' বছর পরে যখন হুয়েন সাঙ কাশ্মীরে আসেন, তখন 'কিয়ে-ছা' প্রদেশের নাম, 'মা-লো-ফো'। অতঃপর লাদাখীরা একে বলতে থাকে 'লা-দোয়াগ'। এর সঙ্গে পুনরায় অপর একটি নাম যুক্ত হয়, 'মার-ইউল' বা রক্তিম ভূমি বা তুষারদেশ। এই 'লা-দোয়াগ বা মার-ইউলের' চতুর্দিকে যে রাষ্ট্রীয় সীমানা, সেটি মানুষের কৃত নয়। পার্বত্য প্রকৃতি এই ভূভাগের একটি চক্রবেড় আবেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে, যেটি অনেকটা প্রাকৃতিক বিস্ময়ের (phenomena) মতো। ২০ থেকে ২৫ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য প্রাকার-বেষ্টিত এই ভূখণ্ড ঠিক এই কারণে একক, নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে এসেছে চিরকাল। এখানকার অধিবাসীরা মৃন্ময় ভূমির জন্য, মানুষের জন্য, বন্ধু-সমাজের জন্য চিরকাল কেঁদেছে! এদের মেয়ে বা পুরুষের স্বভাব-সরলতা, সততা, প্রফুল্লতা এবং স্নেহমমতা—বৈরী দলকেও কাছে টেনেছে। চীন, তিব্বত, হুনজা,

বালতি, পাঞ্জাবী, ডোগরা বা শিখ শাসক—একে একে সবাই এদেরকে মেরেছে, এদের ঘর জ্বালিয়েছে, প্রতি গুম্ফার বহুযুগসঞ্চিত ধনরত্ন লুট করেছে, এদের মেয়েদেরকে নিয়ে কেনাবেচা করেছে—ধুলোয় আর পাথরে লুটিয়ে দিয়েছে এদের মাথা। কিন্তু 'লা-দোয়াগ' বা লাদাখের ইতিহাসে বিদ্রোহ বা বিপ্লব নেই, অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই, অনাচারের বিপক্ষে আক্রোশ নেই। এদের চরিত্র, মন, চিন্তা—সবগুলিই যেন স্নিগ্ধ ও শান্ত। এখানে মুসলমান এসে 'রাজা' হয়, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের সংহতি ঘটায়। এখানে রাজা হয় বৌদ্ধভিক্ষু, রানী হয় ইসলাম দীক্ষিতা এবং বৌদ্ধ গুম্ফার সেবিকা। এখানে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায়—কোনটায় ভেদাভেদ নেই। এই আশ্চর্য ভূখণ্ডে স্ত্রীলোক নিজেকে কোনও বিশেষ জাতিভুক্ত স্বীকার করে না,—এবং একই কালে সে বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু বা খৃষ্টান—চতুর্বর্ণকে নিয়ে ঘরকন্না পাতে! এখানে মানুষ বড়, শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সঙ্গীত এবং মানবতা বড়—জাতি বা ধর্ম বড় নয়। এরা কাঁদে গাছপালা ও তৃণভূমির জন্য, কাঁদে অন্নবস্ত্রের অভাবে, কাঁদে জীবন-বৈচিত্র্যের কামনায়। মানুষের এই ইতিহাস লাদাখের সর্বত্র একই প্রকার।

লেহ্ নগরীর সীমানা ছেড়ে যখন বেরিয়ে গেলুম, তখন দিনমান। কিন্তু এই দিনমানেই যে-জনশূন্যতা লক্ষ্য করা যায়, সেটি ভয়াবহ। মাঝে মাঝেই উঠছে সেই খর রৌদ্রে বালুর ঝাপটা, সেই ঝাপটা আঘাত করছে পাণ্ডুবর্ণ পাহাড়গুলিকে, এবং আবার সেই বালুরাশি ঝরঝরিয়ে নেমে আসছে পাহাড়গুলির গা মোলায়েম ক'রে দিয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে যে পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত বড়, যেগুলি লেহ্ নগরীর দ্বাররক্ষীর কাজ করছে, সেগুলির প্রত্যেক চূড়ায় একেকটি সুবৃহৎ গুম্ফা,—এবং তারা হ'ল 'নিমাউন, তিকসে, তিংনা, লংগুস্তা, রেজং, চমরে, মাথে, শঙ্কর' প্রভৃতি। এই গুম্ফা পর্বতগুলি লাদাখের সমতল থেকে তিনশ' চারশ' বা পাঁচশ' ফুট উঁচু। কিন্তু লাদাখের এই কয়টি গুম্ফা প্রমুখ ১৬টি প্রধান মঠ বা গুম্ফা হাজার-হাজার বর্গমাইলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে কোন কোনটি দুর্গম, দুঃসাধ্য এবং গহন গিরিলোকে প্রতিষ্ঠিত,—যাদের সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর যোগ সামান্যই। বহু লোকের বিশ্বাস, হিমালয়ের বহু গুহায় এবং কন্দরে এমন অনেক যোগী ও সাধুপুরুষ আছেন, যাঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। তাঁরা যে সত্যই আছেন, এটি বিশ্বাস করতেও অনেকের ভাল লাগে। অনেকে তাঁদের দেখা পেয়েছেন এবং তাঁদের যৌগিক ক্রিয়াও দর্শন করেছেন। এঁদের দু'একজনের কথা আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' দুই খণ্ডেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই প্রকার যোগী, সাধু বা মহাপুরুষ বৌদ্ধ বা মুসলমান জগতেও বহু বর্তমান। প্রথমেই মনে পড়ে আজমের নগরীর জগৎপ্রসিদ্ধ মইনুদ্দিন চিস্তিকে, তারপর সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের গুরু গাউস মহম্মদকে—যাঁর সমাধি মন্দির সেবার

দেখলুম গোয়ালীয়রে। তারপর মনে পড়ছে মৌলানা গিয়াসুদ্দিনকে--যে-মহাপুরুষের সমাধি উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির ছাড়িয়ে শিপ্রা নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এবং যেটি প্রত্যেক স্নানার্থী হিন্দু শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করে। হিমালয় ছাড়িয়ে গিয়ে যে বিশাল আনগ্ন এবং ভিন্ন প্রকৃতির গিরিলোক দেখতে পাওয়া যায়—যেমন কৈলাস, কারাকোরম, কুয়েন-লান, ত্রিয়েন-সিন, নিয়েনচেনতাংলা—এগুলিকে বলা হয় হিমালয়োত্তর গিরিলোক (Trans Himalayan ranges)। এই গিরিলোক সর্বত্র তৃণলতা বৃক্ষশূন্য কিন্তু সাধুশূন্য নয়। পূর্বোক্ত গুম্ফাগুলি—যেগুলির নাম করলুম একটু আগে, সেগুলি ছাড়াও যাঁরা পশ্চিম তিব্বতে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা জানেন—শিম্বিলিং, গোস্থল, থুগোলো বা গঙ্গাচু গুম্ফাগুলিতে এমন বহু যোগী বা সাধু অদ্যাবধি বর্তমান আছেন যাঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৌদ্ধ মহাপুরুষ। এঁদের সঙ্গে জ্যোতিষ্কলোকের যোগাযোগ নাকি ঘনিষ্ঠ। 'দ্বিতীয় গৌতম বুদ্ধের' আবির্ভাব-কাল এঁরা জানেন ; দশ হাজার বছর পরে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের কিরূপ চেহারা দাঁড়াবে, এঁদের কাছে সেটি সুবিদিত। এঁরা একাদশ শতাব্দীতেই নাকি যোগশক্তিবলে জেনেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর কোন্ বছরে এবং কোন্ চান্দ্রতিথিতে দেবভূমি ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করবে! এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সকল দেশ—এমন কি পেকিং শহরেও—একটি করে আনন্দ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু 'জগৎগুরু' তিব্বতে ও লাদাখে কোনও প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করার প্রয়োজন ঘটেনি। এরা উভয়ে এতই আত্মস্থ ও স্থিতধী ছিল।

বলা বাহুল্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, অদৃষ্ট, ভাগ্যগণনা, হস্তরেখা বিচার যৌগিকশক্তি—এগুলির সম্বন্ধে সর্বদেশে এবং সর্বকালে মানুষের একটি সহজাত মোহ আছে। এই মোহ মানুষের প্রাক্তন সংস্কার কিনা আমার জানা নেই। অত বড় প্রগতিবাদী উপমহাদেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন—সেখানে থাকাকালীনও এগুলি লক্ষ্য ক'রে আমি খুবই কৌতুক বোধ করেছিলুম! ভারতীয় যৌগিকশক্তি, তার প্রক্রিয়াদি, এবং যৌগিক ব্যায়াম ইদানীং সেখানে খুবই সমাদৃত। লাদাখের লামা বা বৌদ্ধসমাজে যৌগিক এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা দেখা যায়। মৌলানা গিয়াসুদ্দিনের অনুরাগী শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন, মৌলানা তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে আকাশপথে উড়ে যেতে পারতেন। উজ্জয়িনীর এটি জনশ্রুতি।

লেহ্ নগরী ছোট, তার কথা ছেড়ে দিই। কিন্তু বাইরের বৃহত্তর উপত্যকা ও প্রান্তরে শত শত এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধস্তূপ দাঁড়িয়ে, যেগুলির নাম 'চোর্তেন' বা 'মানে।' এরা কখনও ক্ষুদ্রাকার, কখনও বা বৃহদাকার। চোর্তেনগুলির ভিন্ন নাম হল স্তূপ,' মানে' গুলি চতুষ্কোণ। প্রতি পদে, প্রতি পথে, প্রতি পাহাড়ের উপরে-নীচে,

আশেপাশে—ওই এক ছাঁচ এবং একই শ্বেতবর্ণ। যাঁরা বর্মাদেশে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা জানেন মান্দালয় বা মেমিয়োর প্রান্তর মাইলের পর মাইল এবং নগরের পর নগর—এই প্রকার হাজার হাজার বৌদ্ধস্তূপ বা চোর্তেনে ভরা। এই জনবিরল লাদাখের দুস্তর কোনও প্রাণীশূন্য বা তৃণশূন্য এলাকায় যদি সহসা কোনও এক পথের বাঁকে এমনি এক অর্থহীন 'চোর্তেন' চোখে পড়ে, তখন এই আশ্বাস পাওয়া যায়, দুই চার মাইলের মধ্যে হয়ত এক আধজন মানুষের দেখা মিলতেও পারে! কোনও বিশেষ মরুপার্বত্য উপত্যকার কোথাও জনপদ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা, বহু দূর থেকে একটি দৃশ্যমান চোর্তেন তার সঙ্কেত জানায়। সামান্য কয়েক বিঘা মৃন্ময় ভূমি—যাতে একটু চাষবাস চলে, এবং তার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ গুম্ফা,—বাস, ওইটুকুর মধ্যেই লাদাখীর 'সব খেলার সীমা, সকল কীর্তির অবসান।' ওর বাইরে জীবনের আর কোনও ঔৎসুক্য নেই, সন্বিৎসা নেই, বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। তারপর যখন মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায়, তখন প্রত্যেক লাদাখী বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যায়, "আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখ-দুঃখের শেষ পরিণাম—রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।"

না, হাঁটা যায় না। এক মাইল হাঁটতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে। বায়ু-শীর্ণতা এত প্রবল যে, নিঃশ্বাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। নিজের থেকেই দম ফুরোয়, এবং পা-দুখানা অকর্মণ্য হতে থাকে অহেতুক একটা ক্লান্তিতে। একদা যয়শলমের শহর ছাড়িয়ে 'থর' মরুভূমিতে খানিকটা হেঁটে দেখেছিলুম, সেখানে অনন্ত ঘন বালুরাশির মধ্যেও হাঁটা সহজ, কেননা বায়ুস্তর সেখানে ঘন, শ্বাসপ্রশ্বাস সেখানে দীর্ঘ। এখানে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে এক রুক্ষ পৃথিবী, যার হাড়-পাঁজরায় কোনও রস নেই—এবং যেখানে বায়ুর শুষ্কতা আমারই সর্বদেহকে রুক্ষ ঝরাপাতায় পরিণত করছে কথায় কথায়। না, হাঁটা যায় না!

বেশী দূর নয়, মাত্র ৬ মাইল পেরোলেই 'খাদুংলা' গিরিসঙ্কট (১৮,৪০০)। খাদুংলার নিচে পর্যন্ত এই ৬ মাইল পথ নতুন করে তৈরি হয়েছে 'গ্যাংলেস' অবধি। এটি চড়াই পথ। কিন্তু পথনির্মাণে বড় রকমের কোনও বাহাদুরি নেই। উঁচু নিচু একটু সমান করে দেওয়া এবং পাথরের টুকরোগুলি সরিয়ে ফেলা,—এর থেকে বেশী কিছু নয়। পীচের রাস্তা হলে অন্য কথা।

লেহ্ থেকে খাদুংলা সঙ্কট পেরিয়ে আমাদের যে পথটি চলেছে, এটি অদূরবর্তী সিনকিয়াং পৌঁছবার প্রাচীন পথ। খাদুং থেকে সিনকিয়াং মোটামুটি ১০০ মাইল। এই পথটি খাদুংলা অতিক্রম করে শিয়োক এবং নুব্রা নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে

'সাসেরলা' গিরিসঙ্কটের দিকে। অতঃপর 'সাসেরলা' সঙ্কট পেরিয়ে দেপসাং উপত্যকা ছাড়ালে উত্তরে কারাকোরম গিরিসঙ্কট (১৮,৩০০)। এই ভারতীয় অঞ্চল সম্প্রতি চীন দখল করেছে পাকিস্তানের সহযোগিতায়। ভারত এটি ফেরৎ পাবে কিনা ভারতবাসী জানে না।

খার্দুংলা পেরিয়ে পূর্ব লাদাখে পৌঁছবার অর্থ, লাদাখ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে 'মুজতাগ' কারাকোরমের (কৃষ্ণগিরি) এক জনশূন্য উপত্যকায় অবতরণ। এই উপত্যকার নাম 'নুবরা'। এই প্রদেশটিতে অগণিত সংখ্যক পার্বত্য নদী উত্তরের এবং পূর্বের হিমবাহলোক থেকে নেমে বয়ে চলেছে। নুবরা নদী মাত্র একটি ধারায় নেমে এসেছে উত্তর কারাকোরামের প্রধান হিমবাহ 'সিয়াচেন' থেকে। কিন্তু এই ভূভাগে কারাকোরম পর্বতমালাকে খান খান করে কেটেছে 'শিয়োক' নদী। এ নদী তার শাখাপ্রশাখার ধারাগুলি থেকে দুটি প্রধান উপত্যকার তুষারগলা জল নিচ্ছে,—তাদের একটি হল দেপসাং, অন্যটি চ্যাংচেনমো। এই দুই উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে তিনটি অঙ্গভূমি,—লিংজিটাং, আকসাই-চীন ও সোডা প্লেনস্। বর্গমাইলের হিসাবে এই ভূভাগ ১৫ হাজার বর্গমাইলের কম নয়। কিন্তু 'মুজতাগ' কারাকোরম ও কুয়েনলান পর্বতমালার মধ্যবর্তী এই ভূভাগে—অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকায় —মানুষ, তৃণ, লতা, বৃক্ষ, বসতি—এদের কোন চিহ্ন খুবই কম। এই ১৫ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বিভিন্ন ঘাঁটিতে চীন-ভারত সংঘর্ষ বাধে,—যেমন গলোয়ান, দৌলৎবেগ ওল্‌দি, পাংগং, থর্নাক, চ্যাংচেন্‌মো, দেপসাং প্রভৃতি। কারাকোরমের পশ্চিম পারে নুবরা উপত্যকা, নুবরার উত্তরে পাক-ভারত 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা'। কিন্তু কারাকোরম ও লাদাখ গিরিশ্রেণীর মাঝখানে 'শিয়োক' ও 'চুসুলে' ভারতের প্রতিরক্ষার ঘাঁটি বর্তমানে দুর্ভেদ্য বলেই আমি অনুমান করি। লেহ্ থেকে চুসুলের (১৮,০০০) পথটি নির্মাণ করেছেন সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্ট, এবং ঠিক এই ধরনের কয়েকটি পথ নির্মাণ করে তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন, পৃথিবীর উচ্চতম ভূভাগে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সমরায়োজনের প্রচেষ্টা কি প্রকার বিস্ময়কর ও অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয়!

ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধবাদী, এবং বিরোধী দলের মধ্যে যাঁরা ভারত গভর্নমেন্টের কড়া সমালোচক, তাঁদের কারও সঙ্গে লাদাখের চাক্ষুষ পরিচয় নেই। বর্তমান শতাব্দীতে যে কয়টি বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলির অল্পবিস্তর সংবাদ অনেকেরই জানা আছে। উত্তর আফরিকার মরুভূমি, প্রশান্ত মহাসাগর, সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তর ভাগের তুষারভূমি, মালয়ের অরণ্যলোক, উত্তর বর্মার দুস্তর এলাকা—এগুলি কেউ ভোলেনি। কিন্তু লাদাখ এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে এক হাজার মাইলের মধ্যে পেট্রল ও রসদ নেই, কোনও নদীর উপরে উপযুক্ত

সাঁকো নেই, বিমান অবতরণের ঘাঁটি নেই,—এবং অপরিচিত পর্বত জটলার ভিতর দিয়ে বিমান চলাচল যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিপজ্জনক! এছাড়া প্রবল ঠাণ্ডায় মোটরট্রাক এবং বিমানের কলকব্জা কথায়-কথায় বিগড়ে যাওয়া ; যেখানে হাসপাতাল, প্রাথমিক শুশ্রূষা কেন্দ্র—এসব নেই, মানুষের সমাজ বা লোকালয় বা মাথা গোঁজার কোনও আশ্রয় নেই, যেখানে কথায়-কথায় তুষারের মধ্যে যান-বাহন বা মানুষ ডুবে যায়, যেখানে বায়ুশীর্ণতার জন্য সুস্থ মানুষ যখন-তখন দম আটকিয়ে মারা পড়ে এবং যেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে প্রত্যেকের দেহ হিমক্ষতে (frost-bite) পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়। ভারতীয় সমতল সমুদ্রসমতা থেকে কোথাও এক হাজার ফুটের বেশি উঁচু নয়। সেই অনুপাতে যদি ধরি, তবে পাঠানকোটের উচ্চতা ১ হাজার ফুট, পীর পাঞ্জালের ৯ হাজার, জোযিলার ১১½ হাজার, লেহ্ ১১½ হাজার, চুসুলের ১৮ হাজার, আকসাইচিনের ২০ থেকে ২১ হাজার! যে দেশে খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, শিল্পাঞ্চল নেই,— এবং যেখানকার যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রথম কর্তব্য হল লাদাখীদের জন্য অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ঔষধ প্রভৃতি যোগান দেওয়া ; সেখানে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সামনের ভাগে চীনের সামরিক বাহিনী, এবং পিছন ভাগের থেকে ছুরিকাঘাতের জন্য নিত্যপ্রস্তুত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী! সুতরাং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মুখে ও পিছনে এখন দুটি যুদ্ধ-সীমান্ত! সন্দেহ নেই, আকসাই-চিনের নানা অঞ্চল থেকে ভারতীয় বাহিনীকে অতিশয় অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে বারম্বার পিছিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন, তাঁরা বলবেন, ভারতের এই 'পরাজয়ের' মধ্যে যতখানি গৌরব আছে, চীনের নূতন শাসকবর্গের আগ্রাস এবং জয়লাভের ভিতরে ঠিক ততখানি পরিমাণেই কলঙ্ককালিমা লিপ্ত রয়েছে। ভারতের 'দু' হাজার বছরের বন্ধু' চীন যে-দুটি ভূখণ্ডে ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই দুটি হল লাদাখ ও নেফা বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা। প্রথমটি ছিল সর্বাপেক্ষা পরিত্যক্ত, দ্বিতীয়টি ছিল সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত! এই দুটি অঞ্চলই বৌদ্ধ—যারা চিরকাল অহিংসাশ্রয়ী এবং শান্তিবাদী!

একদিকে লেহ্ নগরী, অন্যদিকে নুবরা উপত্যকা। মাঝখানে পূর্ববর্ণিত লাদাখ গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত খাদুংলা গিরিসঙ্কট। নুবরার ভৌগোলিক চেহারা অনেকটা যেন কূর্মপৃষ্ঠ। এখানে একই শিয়োক নদীর ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঘুরেছে ইংরেজি 'U' অক্ষরটির মতো। এইটির মাঝখানে নুবরা নদীটি নেমে উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। এই নুবরা ও শিয়োকের উত্তরশীর্ষ বিরাট ও উত্তুঙ্গ হিমবাহের দ্বারা সমাকীর্ণ, এবং তাদের উচ্চতা ২৬,০০০ ফুট। এই উপত্যকা উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু, মাঝে মাঝে গিরিনদীর ফাটল,—সেগুলির ভিতর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে জলোচ্ছ্বাস

নেমে আসে শিয়োক নদীর দিকে। এখানকার প্রাচীন পৃথিবীর বন্য বিস্ময়ের দিকে চেয়ে থাকলে যেন চোখের সামনে সৃষ্টির আদি রহস্যের দ্বার খুলতে থাকে। কূর্মপৃষ্ঠ প্রস্তরপ্রধান নুবরা উপত্যকার সমগ্র উত্তরভাগ কারাকোরমের সংখ্যাতীত হিমবাহে অবরুদ্ধ। কিন্তু এদেরই ভিতরে পর পর চারটি গিরিসঙ্কট সিনকিয়াংয়ের দিকে খোলা। তারা হল আঘিল, মার্পোলা, শকসগাম ও কারাকোরম। এই চারটিই ছিল ভারতীয় এলাকা। সম্প্রতি চীন এবং পাকিস্তানের শাসকবর্গ এগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন! বিংশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব লাদাখ এবং উত্তর কাশ্মীর যদি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় তবে এই গিরিসঙ্কটগুলিও ভারতের হাতে আবার ফিরবে।

নুবরা নদীর ধারে (চিপ-চাপ ভ্যালী) যে জনপদটি সর্বপ্রধান, সেটির নাম 'চরসা'। এখানকার যিনি শাসক, তিনি লাদাখের রাজপ্রতিনিধি। উত্তরের জলরাশির তাড়নার ভয়ে নুবরা উপত্যকার ছোট ছোট জনপদ ও বৌদ্ধ মঠ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তৈরি। সম্প্রতি ভারতের কর্তৃপক্ষ নুবরায় নানা জনহিতকর কাজে হাত দিয়েছেন। সমগ্র লাদাখে জ্বালানি কাঠ ছিল না এবং লাদাখে শাল, সেগুন, পাইন, ওক, আখরোট বা চেনার বৃক্ষ জন্মানো সম্ভব নয়। কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি কাঠ এবার পাওয়া যাচ্ছে এই কারণে যে, লাখ দশেক যেমন তেমন গাছ গজিয়ে উঠেছে! লাদাখে দাহ্যবস্তু ছিল না বললেই হয়। জ্বালানি কাঠ এবং আমদানী করা কেরোসিন —এ দুটি আছে বলেই লাদাখে জীবন ধারণ সম্ভব।

নুবরা এবং শিয়োক—এ দুটি মহাসিন্ধু নদেরই উপনদী। 'সিয়াচেন' হিমবাহের সমস্ত জল যেমন পায় নুবরা, শিয়োক তেমনি পায় তার সমস্ত জল দেপসাং ও চ্যাংচেনমোর বিভিন্ন হিমবাহ থেকে। কিন্তু আপন বিচিত্র গতির পথে ঘুরে এসে নুবরার জল নিয়ে সিয়ারি ও থাপালু জনপদ ছাড়িয়ে পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকার মধ্যে গিয়ে শিয়োক মহাসিন্ধুতে মিলেছে। শিয়োকের ইতিহাস কৌতুকজনক।

একই হিমবাহ—তার জল নিয়ে দক্ষিণে নেমেছে শিয়োক ও নুবরা, আবার উত্তরের ওপারে নেমে গিয়ে উত্তরপথে সেই জল নিয়ে বয়ে চলেছে ইয়ারকন্দ নদী। মাঝখানে কারাকোরম। প্রায় ৯০ বছর আগে এই ইয়ারকন্দ নদী যথাসময়ে খুঁজে না পেয়ে পরিব্রাজক সোয়েন হেডিন ও তাঁর সহচর মহম্মদ তাক্‌লামাকান মরুভূমিতে মৃত্যুমুখী হয়েছিলেন। তৃষ্ণায় যখন উভয়ের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর আগে যখন মায়াবিনী মরীচিকারা প্রেতিনীর মতো সম্মুখপথে নৃত্য করতে থাকে, সেই সময় দু-শ গজ দূরে ইয়ারকন্দ নদী দেখতে পেয়ে সোয়েন হেডিন তাঁর দুর্বল দেহে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে নদীর তটে পৌঁছন এবং পায়ের জুতো ভরে ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসেন!

Trans Himalaya : Sven Hedin)

লেহ্ নগরীর ক্যারাভান পথটি কারাকোরম থেকে বেরিয়ে ইয়ারকন্দ নদীপথটি ধরে। কিন্তু সীমানা পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আমাকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল।

সম্প্রতি যেটিকে আকসাই-চিন বলা হচ্ছে, চেয়ে দেখছি সেটি কয়েকটি এলাকার সমষ্টি। এর আগেও বলেছি, কারাকোরম (মুজতাগ) এবং কুয়েন-লান পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থলটির নাম আকসাই-চিন। এই অঞ্চল বর্তমানে লেহ্ তহশীলের অন্তর্গত হলেও পাঁচটি এলাকায় এটি বিভক্ত। সেগুলি হল দেপসাং, সোডা প্লেনস, আকসাই-চিন, লিংজিটাং ও চ্যাংচেনমো। চ্যাংচেনমো এবং রূপস্থ এলাকার ঠিক মাঝামাঝি পাংগং হ্রদ এলাকা। এই দীর্ঘলম্বিত হ্রদটির অধিকাংশ ভাগ তিব্বতের মধ্যে। যেখানে ভারত ও তিব্বত একটি সীমানায় মিলেছে সেখানে ভারতীয় এলাকার মধ্যেই 'খুর্নাক' দুর্গটি অবস্থিত। এই হ্রদটি লম্বায় অন্তত একশ মাইল, কিন্তু চওড়ায় তিন থেকে চার মাইলের মধ্যে। ভারতীয় অংশে এটি পড়েছে কমবেশি ৪০ মাইল। এই হ্রদটি সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। কিন্তু আকসাই-চিনে যতগুলি কুস্বাদ জলপূর্ণ হ্রদ আছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নভূমিতে রয়েছে পাংগং। এই অপ্রশস্ত ও দীর্ঘলম্বিত হ্রদের 'নির্মল' সুদৃশ্য ও কুস্বাদ জলরাশি সমস্ত দিনমানের মধ্যে বহুবার আপন বর্ণপরিবর্তন করে সূর্যরশ্মিজালের কৌণিক ও তির্যক (angular) বিকীরণের ফলে। রক্তিম, পীত, হরিৎ,—বিভিন্ন বর্ণ। অপরাহ্ণের পর থেকে গভীর ঘন নীল। রাত্রে এর বর্ণ দাঁড়ায় ঘন কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণাম্বরীকে চুম্বন করার জন্য আকাশের হীরকদ্যুতিমান তারকার দল যেন এই হ্রদের অগাধ জলরাশির মধ্যে নেমে আসে।

এই হ্রদের ঠিক দক্ষিণে একটি পার্বত্য নদীর তটে 'চুসুল' জনপদ। এখানে অতি প্রসিদ্ধ একটি বৌদ্ধগুম্ফা বর্তমান। সম্প্রতি 'চুসুল' এলাকায় লোকসমাগম এবং পণ্য-বিপণি বেড়ে উঠেছে। এটি এখন শক্তিশালী ভারতীয় সামরিক পাহারার অন্যতম ঘাঁটি।

পাংগংয়ের ভারতীয় অংশে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র বসতি চোখে পড়ে। ওদের আশে-পাশে রয়েছে সামান্য সবুজের ছোপ। সেগুলিতে কিছু কিছু যব আর মটর ফলে। হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থলের নাম 'তাকরুং'। সেখান থেকে এগিয়ে গেলে অন্য যে কয়টি বসতি চোখে পড়ে, সেগুলির নাম 'কাফে', মিরাক, মান, পানমিক এবং লুকুং'। লুকুংয়ে মোট ৬ খানা ঘর, 'মান'এও তাই। 'পানমিকে' ১ খানা। শুধু 'মিরাক' একটু বড়—খান ১৫।২০ ঘর। এদের বাইরে চারিদিক মহাশূন্য। কিন্তু সেই আদি-অন্তহীন শূন্যলোক তুষারশীর্ষ, নগ্নকায় এবং রাক্ষসরূপী পর্বতমালায় সমাকীর্ণ। এই 'মেদমাংসহীন পঞ্জরাস্থিমালার' ফাঁকে ফাঁকে একেকটি উপত্যকা—যার ভূপৃষ্ঠ শুধু পাথুরে চাটান্!

এরই নাম চ্যাংচেন্‌মো! এই ভূভাগের উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট, এবং এরই ভিতর দিয়ে তুষারগলা জলধারা একটির পর একটি চলে গেছে পশ্চিমের শিয়োক নদীতে। এই অপ্রশস্ত সমতল প্রস্তরভাগ লম্বায় ৬০।৭০ মাইল এবং এর নিম্নতল অবধি নেমে এসেছে হিমবাহ। এর উত্তরে তুষারস্তরের ফাঁকে ফাঁকে এক এক সময়ে অতিশয় লোমশ ভেড়া-ছাগলের পাল চলে যায় এক-আধজন যাযাবর 'চাম্পার' সঙ্গে। কোথায় বহু দূরে আছে বুঝি 'পামজাল', যেখানে কয়েকটা তৃণফলক আর লতাগুল্ম বা আগাছার জন্মসংবাদ শোনা গেছে! আবার যেন কোথায় পাহাড়ের কোন ফাটল দিয়ে নির্গত হচ্ছে আতপ্ত জলধারা,—সেই 'কিয়াম' নামক স্থলটিতে বুঝি ঘাস জন্মেছে! সেখান থেকে আবার ছুটল ভেড়া-ছাগল সেই কোন্‌ 'গগ্‌রায়',—যেখানে আগাছার আশে-পাশে পাথরের চাটানের ফাঁকে ফাঁকে নধর ঘাস গজিয়েছে! এদের বাইরে আর কিছু নেই। যা আছে তা একটির পর একটি গিরিচূড়া যাদের উচ্চতা ২০ থেকে ২১ হাজার ফুট। সমতল ভাগ ওদেরই সঙ্গে উঠছে উত্তরে ও পূর্বে ১৫ থেকে ১৬ এবং ১৬ থেকে ১৭ হাজার ফুটে। এবার চ্যাংচেন্‌মোর উত্তরে এল লিংজিটাং উপত্যকা,—এটি বিশাল প্রস্তর সমতল—তার উপরে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পাণ্ডুবর্ণ পাথর ছড়ানো। ইতিহাসের কোনও কালে এখানকার আকাশে জলদ-জাল দেখা যায়নি এবং কখনও বৃষ্টিপাতও ঘটেনি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বাতাস উত্তপ্ত হতে থাকে এবং দিনমানের রৌদ্রাগ্নিতে এই পাথরের জগৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে,—যার আয়তন বর্গমাইলের হিসাবে মোটামুটি ১ হাজার মাইল। সেই উত্তাপ প্রায় ১৯০ ডিগ্রীতে পৌঁছয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে এখানে যে ঠাণ্ডা নামে, সেটি "জিরো ডিগ্রির নিচে" বিয়োগ-চিহ্নে হয়ত বা ৫০ ডিগ্রীতে পৌঁছয়! এই লিংজিটাং হ'ল কুয়েন লান পর্বতমালার পশ্চিম ভাগের জলাবতরণের (wastershed) ভূভাগ (১৮০০০)।

লিংজিটাং-এর উত্তরে এবং পশ্চিম কুয়েনলানে আর দুটি এলাকা পাওয়া যায়। প্রথমটি হল আকসাই-চিন, দ্বিতীয়টি সোডা প্লেন্‌স। ইতিহাসের কোনও পর্বে এই অঞ্চলগুলিতেও মানব-বসতির কোনও সংবাদ মেলেনি। "It is truly a part where mortal foot hath ne'er or rarely been" (Drew). এখানে কয়েকটি লবণ হ্রদ এবং কুস্বাদ জলাশয় বর্তমান। এখানকার শত শত বর্গমাইল পার্বত্য প্রস্তর-উপত্যকায় একটি তৃণফলকও কখনও দাঁড়িয়ে ওঠেনি! 'মুজতাগ' কারাকোরম এবং কুয়েন-লানের মধ্যবর্তী এই হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকার সংবাদ কেবলমাত্র ১৯ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে শোনা যায় মাত্র! ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগে সাধারণ ভারতবাসী আকসাই-চিনের উল্লেখ শুনেছিল কিনা সন্দেহ। আকসাই-চিন অনেকটা যেন ভারত-ভূখণ্ডের একটা অতিরিক্ত অংশ মাত্র (appendix), যার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের

শিরা-উপশিরা বা রক্ত চলাচলের বিন্দুমাত্র যোগও নেই। চতুর চীনা চিকিৎসকগণ এই এপেন্‌ডিসাইটিসটি সম্প্রতি 'অপারেশন' করেছেন।

কিন্তু ১৯ শতাব্দীর ইংরেজ তার ভারত সাম্রাজ্য সীমানার ব্যাপারে কোনও অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তা রাখতে চায়নি। এই লিংজিটাং ও চ্যাংচেন্‌মোতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে তাকে ভাবতে হয়েছিল, যদি কখনও কোনও শত্রু এই অঞ্চলে ভারতকে আক্রমণ করে, তবে কি প্রকারে সেটি সম্ভব! ভারত আক্রমণের যে সম্ভাব্য পথ তিনটি তাঁরা অনুমান করেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমটি হ'ল আকসাই-চিনের এই রুক্ষ ও কর্কশ মালভূমি, দ্বিতীয়টি হ'ল, কারাকোরম গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে লেহ্‌ নগরী আক্রমণ; তৃতীয়টি হ'ল, গিলগিট থেকে কাশ্মীর। ("Northern Barrier of India—1875")

ইংরেজের এই অনুমান পরবর্তী ৮০ বছরের পর অনেকাংশে সত্যে পরিণত হয়েছে!

মহারাজা রণবীর সিং কর্তৃক নিযুক্ত লাদাখের ইংরেজ গভর্ণর তাঁর একটি পর্যালোচনায় আকসাই-চিন ও তিব্বতের মধ্যকার সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেছিলেন, "From the pass at the head of the Chang Chenmo Valley southwards the boundary line is again made stronger. Here it represents actual occupation so far that it divides pasture lands frequented in summer by the Maharaja's subjects from those occupied by the subjects of Lhasa. It is true that with respect to the neighbourhood of Pang Kong lake there have been boundary disputes which may now be said to be latent. There has never been any formal agreement on the subject. This applies also to all the rest of the boundary between the Maharaja's and the Chinese territories." (Federic Drew, Governor of Ladakh—1871).

এই প্রাণশূন্য, প্রাণীশূন্য এবং জীবজন্মহীন বিশাল ও প্রস্তরাকীর্ণ আকসাই-চিনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ ছট্‌কিয়ে আসে এক একটি প্রাণের টুকরো! হয়ত একটা ধূসর লোমশ কিয়াং (গর্দভ), নয়ত একটা কালো খরগোস, নয়ত বা একটা কস্তুরী মৃগ। এরা খুঁজতে আসে ঘাস কিংবা কাঁটালতার বীজ। খুঁজে না পেয়ে সূর্যোদয়ের আগেই পালায়।

মধ্য এশিয়ার সকল অঞ্চলের মতো এখানেও সূর্যোদয়ের অর্থ, সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত একাকার হয়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠা। কিন্তু অতিশয় লঘু বায়ুস্তরে সেই অগ্নিরশ্মিজাল যে সকল মায়াচিত্র (illusion) রচনা করে তাদের পিছনে ছুটে বহু

াহসী বহুবার প্রাণ দিয়েছে,—ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। আকসাই-চিনের এই বিরাট মালভূমিতে 'আবহপ্রকৃতির' গুণে সেই মায়াবিনী পাগলিনীর দল ধ্যাহ্নকালের অগ্নিরৌদ্রের মাঝখানে নির্লাজ-নির্ভয়ে নৃত্য করতে থাকে! পূর্বদিকে খ ফিরিয়ে যেন দেখা যায়, অনন্ত সমুদ্রের সুশীতল গভীর নীলাম্বুরাশির আন্দোলিত সৌন্দর্য, তার উপরে সুফলা ও শস্যশ্যামলা একেকটি দ্বীপ এবং দ্বীপচূড়ায় তুষারের কিরীট। তাদের সমস্তগুলি যেন মালভূমির সমতলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ইট হয়ে দেখো, সেই সমুদ্র এগিয়ে এসেছে হাতের নাগালের মধ্যে। যদি কেউ বসে ড়ে, সেই জলাশয় তৎক্ষণাৎ কাছে আসে। কিন্তু উঠে দাঁড়ানো মাত্র সেটি অদৃশ্য য়! সেটি কোথায় গেল, এটি স্পষ্ট করে বুঝবার জন্য ক্লান্ত দেহ ও তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে যতেই হয় এগিয়ে কোন্ এক অচ্ছেদ্য আকর্ষণে। তখন—সম্মুখে যেটি ছিল সুসমতল ালভূমি, সেটি নাচতে-নাচতে সরে গিয়ে একটি পাহাড়ঘেরা মনোরম স্বচ্ছ সরোবরে রিণত হয়,—যার কাকচক্ষুসম জল স্নিগ্ধ-মধুর মৃত্যুর মতো মূঢ় পথিককে ধীরে ধীরে ডকে নিয়ে যায়!

দিনান্তকালে আক্সাই-চিন তুহিন ঠাণ্ডায় অসাড় হ'তে থাকে।

॥ ১৩ ॥

হেমিস গুম্ফা [মধ্য এশিয়া]

উত্তর ভারতের প্রকৃত রাষ্ট্রসীমানাকে নির্ভুলভাবে জানতে গেলে উত্তর হিন্দুস্তানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। পামীরে, সিনকিয়াংয়ে এবং তিব্বতে গিয়ে দাঁড়ালে ভারতের সীমানা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। হিন্দুকুশ, কারাকোরম, কুয়েন-লান্ এবং জাস্কার—এইগুলি কাজ করছে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাকারের মতো। এই সুবৃহৎ প্রাকারের বাইরে পূর্বোক্ত দেশগুলি অনেক নীচে। সৃষ্টির আদিপর্বে ভূ-প্রকৃতির একটি অবারিত দাক্ষিণ্য ছিল ভারতের প্রতি। পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি ভূভাগ থেকে ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করার জন্য এই ভূ-প্রকৃতি গোপনে-গোপনে আবহমানকাল থেকে কাজ ক'রে এসেছে। এই পার্বত্য-প্রাকার বেষ্টনী—যাকে বলে এসেছি পাথরের ফ্রেম—এটির দৈর্ঘ্য কমবেশি আড়াই হাজার মাইল। হিন্দুকুশ থেকে এর আরম্ভ এবং ভারতের সুদূর উত্তর-পূর্বলোক—যেখানে ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগ ঘটেছে, সেই 'নাম্চাবারোয়া' (হিমালয়েরই অংশ) গিরিশ্রেণী অবধি গিয়ে এই প্রাকার-বেষ্টনী শেষ হয়েছে।

এ নিয়ে তর্ক তোলে না কেউ, কারণ এ নিয়ে তর্ক ওঠে না। সূর্য ওঠে পূর্বাকাশে —কেউ তর্ক করে না, জলের গতি নিচের দিকে,—তর্কের অতীত। ভিতরে-ভিতরে ইতিহাস বদলেছে, নানা কালনেমি এসে নানাযুগে লঙ্কাভাগ করেছে,—কিন্তু হিন্দু-স্তানের এই বহির্বেষ্টনী কোনও যুগে বদলায়নি, কেননা এর পরিবর্তন সম্ভব নয়। ভূ-প্রকৃতির অত স্পষ্ট এবং নির্ভুল নির্দেশক্রমেই একদা এই হিন্দুস্তানের নাম রাখা হয়েছিল উপমহাদেশ। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপকে থান থান ক'রে কাটা হয়েছিল ভিতরে-ভিতরে। কত রাষ্ট্রের নাম ডুবেছে, কত রাষ্ট্রের নতুন মহাকরণ হয়েছে—সবাই জানে। কিন্তু 'ইউরোপ' নামটি ঘোচেনি এত দল-বদলের মধ্যেও। স্বাধীন পাকিস্তান, স্বাধীন নেপাল, সম-স্বাধীন ভুটান বা সিকিম, পূর্বকালের সম-স্বাধীন কাশ্মীর—এদের অস্তিত্ব সত্বেও 'হিন্দুস্তান' নামটির পরিবর্তন ঘটেনি। অদ্যাবধি আফগানিস্তান, পামীর, ইরাণ, পাখতুনিস্তান, বেলুচিস্তান, সিনকিয়াং প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ যে কোনও পাকিস্তানীকে 'হিন্দুস্তানী' বলেই জানে। এ নিয়ে ভারত-বাসীরও গর্ব করার কিছু নেই। কারণ 'হিন্দু'র মূল শব্দটি হ'ল সিন্ধু! হিন্দুস্তানের অর্থ-সিন্ধুনদের দেশ। 'জয় হিন্দ্' মানে সিন্ধুর জয়!

'সিন্ধু—কোহ্'—এই শব্দটির অপভ্রংশ হিন্দুকুশ,—এর পূর্বাংশ হিমালয়ের

সঙ্গে যুক্ত। ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রকার পরীক্ষা ক'রে একদা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল, কারাকোরম হিমালয়েরই সম্প্রসারিত শাখা। সেই কারণে এর নাম দিয়েছিল, কারাকোরম-হিমালয় (Kenneth Mason)। কৃষ্ণগিরির তুর্কি প্রতিশব্দ হ'ল, কারা (কালো) কোরম (পর্বত)।

হিন্দুস্তানের এই বৃহৎ প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছিদ্রপথ,—যেগুলির নাম গিরিসঙ্কট ; দুর্গপ্রাকারের নীচে যেমন থাকে এককেটি প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথগুলিতে ঢুকতে গেলে বাইরে থেকে চড়াই ভাঙ্গতে হয় প্রচুর। যেমন পামীর থেকে ঢুকতে গেলে প্রায় ৬ হাজার ফুট ; সিনকিয়াং বা ইয়ারকন্দের সমতল থেকে উঠতে গেলে প্রায় ১৪ হাজার ফুট ; পূর্ব কুয়েনলান থেকে আসতে গেলে প্রায় ৮ হাজার ফুট, এবং তিব্বত থেকে প্রবেশ করতে গেলে প্রায় ৫ হাজার ফুট। সুদূর উত্তরে এবং সুদূর উত্তর-পূর্বে এই সকল উঁচু চড়াই পথে না উঠলে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করা যায় না। কেবলমাত্র কাশ্মীর ও লাদাখের প্রবেশপথ বা গিরিছিদ্রপথের সংখ্যা কম বেশি ২৫টি। বিগত ১৯৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দে চীনের নূতন শাসকগণ যে-ছিদ্রপথটি দিয়ে নিঃশব্দে আকসাই-চিনে ঢুকে একটি একশ মাইলের লম্বা পথ উত্তর দক্ষিণে নির্মাণ করিয়েছিলেন সেই ছিদ্রপথটির নাম 'কারঘালিক'। এটি 'রসকম্' নদী-উপত্যকার অন্তর্গত। এই ছিদ্রপথের মুখটি সিনকিয়াংয়ের দিকে খোলা। বহুলোকের ধারণা, চীন শাসকগণ সিনকিয়াং থেকে তিব্বত যাতায়াতের জন্য একটি পথ নির্মাণ করেছেন মাত্র। কিন্তু সেটি সত্য নয়। বড় রকমের প্রশস্ত পথ তাঁরা নির্মাণ করেছেন এখন পর্যন্ত তিনটি। ১৯৫৭ সালে প্রথমকার পথটি আসকাই-চিনের অন্তর্গত 'হাজি লঙ্গর' জনপদের ভিতর দিয়ে আসে এবং এটির ছিদ্রপথ বা গিরিসঙ্কট ছিল 'ইয়াঙ্গি দাওয়ান।' এই পথটি উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে চ্যাংচেনমো উপত্যকা পেরিয়ে তিব্বতে ঢোকে। ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় পথটি সিনকিয়াংয়ের দিককার 'কারাতাগ' সঙ্কটের ভিতর দিয়ে ঢুকে দেপসাং পেরিয়ে শিয়োক নদীর পূর্বপার দিয়ে এক সময় 'লানক' গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে তিব্বতে ঢোকে। তৃতীয় পথটিও ওঁদের হাতে প্রস্তুত হচ্ছে। এই পথটি কারাকোরম গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে দক্ষিণে এসে সম্ভবত 'দমজোর' বা 'লানক' সঙ্কট পেরিয়েই তিব্বতে ঢুকবে! চতুর্থ আরেকটি পথ তাঁরা বানিয়েছেন এগুলির আগে। সেই পথটি চান্থান থেকে সিনকিয়াং যাবার মধ্যস্থলে আকসাই-চিনের চাঁদি কেটে নিয়েছে। তৃতীয় পথটি নির্মাণ করার আগে চীনের শাসকবর্গ একটি চুক্তি করেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে। কারাকোরম ও দেপসাংয়ের নিকটবর্তী এই চুক্তি-এলাকার আয়তন বোধ করি ৩ হাজার বর্গমাইল। কৌতুকের বিষয় হ'ল এই, লাদাখের এই অঞ্চল কাশ্মীরের 'যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার'

সম্পূর্ণ বাইরে একটি ভারতীয় অঞ্চল। এখন মোটামুটি বুঝতে পারা যায়, 'মুজতাগ-কারাকোরমের' পূর্বপার থেকে কুয়েন-লানের পশ্চিম পার অবধি প্রায় সম্পূর্ণ আকসাই-চিন্ এলাকা (আনুমানিক ১২ হাজার বর্গমাইল) চীন-শাসকবর্গ দখল করেছেন।

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত এই ভারতীয় এলাকাটির সঙ্গে চীন শাসকবর্গের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত। সিনকিয়াং, চানথান, পশ্চিম ও পূর্ব তিব্বত—এরা চীন বিরোধী। এসব ভূ-ভাগ শত শত বছরের স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। চীনের সাম্রাজ্য এদিকে কোথাও স্বীকৃত নয়। আকসাই-চিন এলাকাটি যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তে না পাওয়া যায়, তবে মোট ২৫ লক্ষ চীনা সৈন্যের চলাচল পদে পদে ব্যাহত হতে থাকে। আকসাই-চিন দখল করার পর তাঁরা সিনকিয়াং, চানথান ও পুরঙ্গ উপত্যকার সামরিক ঘাঁটিগুলি মজবুদ করতে সমর্থ হয়েছেন।

'চুসুলের' পথ চলে গিয়েছে মহাসিন্ধুর ওপারে। এপারে আমি 'হেমিস' গুম্ফার পথ ধরেছিলুম।

এটি সিন্ধু উপত্যকাপথ। অদূর উত্তরে খার্‌দ্‌ংলার সঙ্কট। সামনে কারাকোরমের বিশাল প্রাকার যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এটি লাদাখ গিরিশ্রেণীর পূর্বপ্রান্ত। ওপারে অন্তহীন বালু ও পাথরের পাহাড়। কিন্তু দূরের থেকে সেগুলি অতি মোলায়েম ঢালু মনে হচ্ছে। বড় বড় পাহাড়গুলির চূড়ায় গুম্ফাগ্রাম,—সেখানেই লাদাখীদের সংসারযাত্রা। দূরে দেখা যায় ফিয়াং আর পিতুক। আমি যাচ্ছিলুম প্রায় সিন্ধুর তীরে তীরে। ডান দিকের উত্তুঙ্গ পর্বতপ্রাকার তুষারময়। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ধুলোর ঝাপটা চলছে ওপারে বেশি। রৌদ্র প্রখরতর।

সিন্ধুর দুই পারে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে 'চোর্তেন, মানে' আর 'মণি দেওয়াল!' পাহাড় পর্বতের প্রত্যেক ফাঁকে ফাঁকে, প্রতি প্রাঙ্গণে, প্রতি গুম্ফা-পাহাড়ের প্রবেশপথে, নদীতীরে, যবের ক্ষেতের আশেপাশে—শ্বেতবর্ণ ছোট ও বড় একটি বৌদ্ধ স্তূপ। এ যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, এ যেন চক্ষুপীড়া! কোনটা বৃহৎ মূর্তি, কোনটা ক্ষুদ্র, কিন্তু অধিকাংশই স্তূপ। একেকটি ৩০, ৪০ বা ৫০ ফুট অবধি উঁচু। ছোটগুলি ৩ ফুট থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত।

সিন্ধুর এপারে তীরভূমিতে একেকটি জনবসতির সংলগ্ন এক এক টুকরো যব ও মটরের ক্ষেত। যেখানে সবুজ বর্ণ বা শস্যের ফলন সেখানেই চোখের তৃপ্তি। রুক্ষ বাতাসের তাড়না থেকে শস্যগুলি বাঁচাবার জন্য প্রায় সর্বত্রই 'মণি-দেওয়ালগুলি' কাজ

করছে। আল্‌গা পাথরের একেকটি চাপ্‌ড়ি সাজিয়ে দেওয়ালগুলি প্রায় চার ফুট উঁচু করা। কিন্তু প্রত্যেকখানি পাথরের চাপ্‌ড়িতে পুণ্যভাষণ খোদাই করা অপরিসীম যত্নে! সেই পাথরের টুকরোর সংখ্যা কত লক্ষ বা কত কোটি তার হিসাব কেউ জানে না! এ বিস্ময় পৃথিবীর কোথাও নেই। ইতিহাসে কেউ শোনে নি বিনা পারিশ্রমিকের এই মেহনত! প্রতি অক্ষরে এই যত্ন, এই আন্তরিকতা, এই অক্লান্ত উদ্দীপনার সঙ্গে নিছক আনন্দের সৃষ্টি,—অথচ এতে বকশিস কিছু নেই!

পথের বাঁ দিকে নদী, ডান দিকে পর্বতশ্রেণী—যার উচ্চতা প্রায় সমান—অর্থাৎ ১৯ থেকে ২০ হাজার ফুট। পর্বত ঈষৎ গৈরিকবর্ণ, কিন্তু গাছপালা তৃণলতা—কোথাও কিছু নেই। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ,—সমস্তই পাহাড়ে ঘেরা। আকাশ কত বড় এখানে বুঝবার উপায় নেই। দিগন্ত কা'কে বলে কেউ জানে না! সিন্ধুর তীরভূমির সমতল পথ ধ'রে দূর দূরান্তরে চ'লে যাচ্ছিলুম।

লাদাখীদের ঘরদোর দেখতে দেখতে পথ পার হচ্ছিলুম।

বড় গাছ যে দেশে নেই, সেখানে 'টিম্বার' কোথায়? পাথরের আর কাঁকর-মাটির দেওয়াল উঠতে পারে,—কিন্তু ছাদ? প্রতি ঘরের মাথার উপর আচ্ছাদন দেওয়া,—সে এক মস্ত সমস্যা! বৃষ্টি-বাদলের প্রশ্নই নেই। ফুটো ছাদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, ভয় শুধু ঠাণ্ডার, রৌদ্রের আর বরফের। ঘর তৈরির জন্য খানকয়েক বরগা যারা জোগাড় করতে পারল তারা বাহাদুর। পাথরের চাকতির উপর শুকনো ঘাস আর কাঁকর-মাটির চাপড়া,—ওইতে যে গৃহনির্মাণ হয়, তাতে তিন পুরুষের চলে যায় হাসিমুখে। ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, বজ্রাঘাত, অতিবৃষ্টি—এগুলোর কোনটাই নেই! লাদাখ জানে না, বর্ষা কাকে বলে।

ধূ ধূ করছে উপত্যকার প্রান্তর খররৌদ্রে। দূর থেকে দূরে অলস গতিতে চলেছে এক একজন ঘোড়সওয়ার। চারিদিকের অন্তহীন মরুপাথরের পর্বতমালার তলায়-তলায় যে প্রান্তর আর পাহাড়তলীর সীমা চোখে পড়ে না, সেখানে এই ঘোড়সওয়ারের ক্লান্তগতির মধ্যে পাওয়া যায় কেমন যেন অসীম বৈরাগ্য এবং আলস্যের স্বাদ। মহাকাল এখানে নিমেষনিহত। সময়ের ধারা তার গতিচিহ্ন রেখে চলছে না। মাঝে মাঝে একটির পর একটি চলেছে ভেড়া-ছাগলের পাল। প্রত্যেকটি জন্তু ঘন লোমে আচ্ছন্ন। শুনলুম বছরে তিনবার এই লোম কাটা হয়। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পশমিনা পাওয়া যায় ভেড়া ও ছাগলের পেটের দিকে, যেদিকে তাদের দেহের কোমলতা সর্বাপেক্ষা বেশি। যত অধিক ঠাণ্ডা দেশ, ততই অধিক লোমশতা।

একটির পর একটি পাহাড়ি গুম্ফা পেরিয়ে যাচ্ছি। 'স্তোক বা তোক' গ্রামের সংলগ্ন যে গুম্ফা সেটি বড়। কিন্তু তার ভিতরের ইতিহাস প্রায় একই। শুধু পুঁথির

সংখ্যা কোথাও কম, কোথাও বা বেশি। 'তোকের' উপরকার যে অট্টালিকা, সেটির গঠন কৌশল দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বহু লামা ও লোকজনের বাস। শুনলুম লাদাখের পুরনো রাজবংশের কোনও কোনও ব্যক্তি আজও এই গুম্ফা গ্রামে বাস করেন। এই গুম্ফাটি আধুনিক কালে অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বছর আগে 'সেপাল নামগিয়ালের' আমলে নির্মিত।

বালুপাথরের পথ ধূ ধূ করছে বটে, কিন্তু শস্যক্ষেত্র বা ফলের বাগানের কোন্ পাশ থেকে হঠাৎ গানের একটা ধুয়ো যখন ছিটকে আসে, তখন সমস্ত চেহারাটা যায় বদলিয়ে। যে কয়দিন ধরে এ অঞ্চলে বাস করছি, তার প্রতি দিনমানে যখন-তখন যেখানে সেখানে এমনি করে সুরের একটা লয়, নয়ত একটা আকস্মিক মধুর কণ্ঠের তান, হঠাৎ যেন ছটকিয়ে আসে কানে, কিন্তু ভালো করে শোনবার আগেই যায় মিলিয়ে! বুঝতে পারি নে, তখন সমস্ত লাদাখের মরু পর্বত কেমন যেন ককিয়ে ওঠে বেদনায়, তারপরে নিঃঝুম চুপ! এখানে থামল, কিন্তু দূরে আবার কোথাও উঠলো হঠাৎ এমনি একটা ধুয়ো! এমনি একের পর এক। এপাড়া থেকে ওপাড়া। মিস্ত্রি, দোকানদার, মেষপালকের বৌ, মাঠের চাষী, গুম্ফার লামা যাযাবর চাম্পা, ডাক-বাংলার চৌকিদার, এ গান সর্বত্র এক! একটি টুকরো, একটি মাত্র তান, একটিই ধুয়ো। এবার শুনছি যেন কোন্ পাহাড়ের পাশে, সিন্ধু তীরের যবের ক্ষেতের ধারে। এ গান এখানে সত্য তার পরিবেশ নিয়ে। মরুপাথরে, পাহাড়ে, তুষারে, প্রান্তরের ধূলি বায়ুর হাহাকারে এ গান সত্য। উর্মিমুখর মহাসিন্ধুর প্রবাহের সঙ্গে এ গান যেন ছুটে চলেছে!

গুম্ফাবাসিনী 'চোমো' বা 'চুমো' মেয়েরা নাচ গান ভালবাসে। চোখ কান যাদের খোলা তারা দেখে যাবে, লাদাখ হল শিল্পীর দেশ। লাদাখের বর্ণাঢ্য চিত্রকলায় যে মৌলিক কল্পনার অভিনবত্ব, সেটি এখনও অনাবিষ্কৃত। ভারতীয় স্থাপত্যকলা থেকে এরা ধার করে নি, মঙ্গোলীয় শিল্পকলার অনুকরণ করে নি। কিন্তু প্রতিটি মূর্তির ব্যঞ্জনায়, প্রতি ভাস্কর্যে স্থাপত্যে এবং প্রকাশে যে মৌলিকতা, যে মাত্রাবোধ, চিন্তার যে ব্যাপকতা, সেগুলি অনন্য। মেয়েদের নাচগানের মধ্যেও তাই। আমি ওদের ভাষা বুঝি নে সত্য, কিন্তু সেদিন রাত্রে রাজবাড়ীর নিচের দিককার এক 'খালোন' পরিবারের চারটি মেয়ে ও তিনটি পুরুষ যে-ভঙ্গীতে নাচল, সেটি সম্পূর্ণ ই লাদাখের বৈশিষ্ট্য। অঙ্গে অঙ্গে তারা যেভাবে পাক দিল, দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে যেভাবে শাকা-থুব্বার (শাক্য স্থবির) উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদনের ভঙ্গীকে প্রকট করে তুলল, সেটি দেখে অভিভূত হয়েছিলুম! বড় ঘরখানা অন্ধকার। ভিতরে নানাবিধ পিতল ও রঙীন মৃন্ময়মূর্তি। কেরোসিনের আলোটা ছিল বাইরে,

কিন্তু ভিতরে এই পরিবারের বর্ষীয়সী কয়েকটি মহিলা চর্বির প্রদীপ জেলে প্রথমে অতিথি অভ্যর্থনার জন্ত 'চ্যাং' (স্থানীয় দেশী মদ্য) বিতরণ করলেন। আমার অসুবিধা, আমি এঁদের ভাষা জানি নে এবং সামাজিক আদব-কায়দাও বুঝি নে। কিন্তু ওঁদের মধ্যে একটি মুসলমান ছোকরা অল্প অল্প হিন্দি বোঝে। 'খালোন' পরিবারের এই বৌদ্ধগৃহিণী এই ছোকরার পিসি। এই সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও মিষ্টভাষী যুবকটি আমার সর্বপ্রকার তদ্বির তদারক করত।

ধীরে ধীরে হেমিস গুম্ফার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু মাঝপথে নাচ গানের কথা উঠল বলেই মনে পড়ছে, সম্প্রতি এক ভারতীয় মহিলা লাদাখে এসে এঁদের নৃত্য-গীতের মধ্যে অশ্লীলতার আভাস পেয়েছেন! তাঁর নিরীক্ষা কতখানি সত্য আমি হয়ত বুঝি নে। নর্তকী অথবা নর্তকের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেখানে বিশেষ একটি নৃত্যচ্ছন্দে নৈবেদ্যর মতো দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়, যেখানে সংবেদনশীলতাটাই বড়—দৈহিক লাজলজ্জা বা আবরণের স্বল্পতার কথা ওঠে না। সেখানে খণ্ডকালের আবেশ-মদিরতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দেওয়া বোধহয় চলে না।

লাদাখের অধিকাংশ মেয়ে সংস্কারমুক্ত ; ভারতীয় ঐতিহ্যের ক্রীতদাসী তারা নয়। তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান—কোনও শ্রেণীর মধ্যে পড়তে চায় না। তারা নারী, এই তাদের পরিচয়। তাদের মধ্যেই জননী, 'চোমো-ব্রহ্মচারিণী', তাদের মধ্যেই নর্তকী, গায়িকা, শিল্পী, শিক্ষয়িত্রী, তাদের মধ্যেই সুনিপুণা গৃহিণী। কপালে লালফিতা বাঁধা, গলায় বিভিন্ন পলা ও মোতির মালা, কানে অলঙ্কার, হাতে হাড়ের বালা, পিঠে একখানা লোমশ ভেড়ার ছাল বাঁধা। এরা নাচে, গান গায়, মজুরি করে, পুরুষের সঙ্গে বেপরোয়া জীবনের দিকে ভেসে যায়, সংসারকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলে, সন্তানকে পিঠে বেঁধে নিয়ে পথে বেরোয়। এরাই সাধারণ মেয়ে, এদের নিয়েই সমাজ, এদের জন্যই লাদাখ! ভয়, কুণ্ঠা, লজ্জা—এদেরকে ঘুচিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে মেয়ে, এজন্য পুরুষের সমাজে প্রতিবাদ দেখতে পাচ্ছি নে। অথচ এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি উভয়পক্ষ সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মনীতিপরায়ণ এবং প্রফুল্লচিত্ত। লাদাখের পুলিশের খাতায় চৌর্যবৃত্তি, হত্যাকাণ্ড, শিশুহত্যা, রাহাজানি, নারীঘাতন, এ ধরনের সামাজিক অপরাধ নেই বললেই হয়। আমি এখানে দু'দিনের জন্ত এসে এদের এতকালের একটি জীবন-ধারার প্রতি বক্রোক্তি করে যাব—এমন দুঃসাহস আমার নেই। আমি দেখার জন্ত এসেছি, দেখে চলে যাব।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ মূর্তির দপ্তর থেকে একটি সৌম্যদর্শন লাদাখী যুবক আমার পথ-প্রদর্শক ছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি ক্যামেরা। আমি যে-এলাকাগুলিতে

গত কয়েকদিন থেকে বিচরণ করছি, তাদের প্রত্যেকটি হয় চীন-ভারত আর নয়ত পাক-ভারত যুদ্ধ-সীমান্ত এলাকা। লেহ্ তহশীলে সম্পূর্ণই চীন-ভারত একেবারে মুখোমুখি। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও ঘটনাই ঘটতে পারে। সুতরাং চারিদিকেই ছিল একটি নাটকীয় উৎকণ্ঠা। সে যাই হোক, যুবকটির হাতে ক্যামেরা থাকা সত্বেও আমার নিষেধ ছিল, বাইরের কোনও ছবি সে না তোলে। আমি একটি বিশেষ নীতি পালন করে যাচ্ছিলুম—এটি বলাই বাহুল্য।

পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসে একস্থলে থামলুম। বাঁ দিকে মহাসিন্ধুনদ তার ঘননীল তুহিন জলরাশি নিয়ে বয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তারই তীরে-তীরে চলে গিয়েছে চুসুলের পথ। ডানদিকে অন্য একটি প্রশস্ত পথ গিরিশ্রেণীর জঠরের মধ্যে ঢুকে কোন্ বাঁকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইটিই 'হেমিস' গুম্ফার প্রবেশপথ। আমরা ডানদিকে ফিরলুম।

একদা তরুণ বয়সে দুঃসাধ্য এবং দুস্তরের দিকে আমার ভাবনা ছুটত। অসম্ভবের আকর্ষণ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য করত। নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে আত্মতুষ্টি ছিল দু-চোখের বিষ। অসাধ্য সাধনের চিন্তা আমাকে স্থির থাকতে দেয় নি কোনদিন। সেইকালে ভেবেছিলুম এই "হেমিস" গুম্ফার কথা। কিন্তু সেদিন এর ভৌগোলিক অবস্থিতি সঠিকভাবে জানাও ছিল না। আমার সঙ্গী শিক্ষিত লাদাখী যুবক—সম্ভবত কোনও 'খালোন' পরিবারের—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার ক্যামেরা দিয়ে 'হেমিস' গুম্ফার ভিতরকার ছবি আমার নেবার দরকার ছিল। হেমিস হল লাদাখের তীর্থশ্রেষ্ঠ। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধজগতে লাসার পরেই হেমিস। আমরা হেমিসের দিকে অগ্রসর হলুম। পথের উপর থেকে অনুমান করা যায় না, গুম্ফা ঠিক কোন্‌খানে।

অনেককালের গুপ্ত বাসনা চরিতার্থ হতে চলেছে এই মধ্য এশিয়ার পার্বত্যলোকে। সেজন্যে মনে মনে কিছু রোমাঞ্চ ছিল। পথ এক মাইলের কিছু কম। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলুম। বাইরে থেকে অনেকগুলি 'চোর্তেন' বা বৌদ্ধস্তূপ ভিতরকার গুম্ফার সঙ্কেত জানাচ্ছিল।

পথের দুদিকে যবের ক্ষেত খামার থেকে ফসল উঠে গেছে। পড়ে আছে কেবল মূল্যবান ঘাস। আমরা পায়ে-পায়ে বিরাট পাহাড়ের তলার দিকে এক বাঁকে প্রবেশ করলুম।

প্রায় ১২৫ বছর আগে জম্মুরাজের উজীর সেনাপতি জরোয়ার সিং নতুন করে লাদাখ জয় করেন। কিন্তু লাদাখ বিজয়ের নামে জরোয়ার সিং 'হেমিস' গুম্ফার ধনরত্নাদি লুঠ করতে পারেন নি, কেননা এটি ছিল পাহাড়ের অন্তরালে। এখানকার

লামাসমাজ লেহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়ে জারোয়ার সিংয়ের সৈন্যবাহিনীর জন্য পরবর্তী ছয় মাসের মতো খাদ্যাদি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দান করেন। 'হেমিস' বেঁচে যায়।

পথের বাঁক আবার ঘুরল পাহাড়ের (১৯,০০০) তলায় তলায়। কিন্তু এবার আমাদের সামনে যেটি প্রতিভাত হল সেটি মধ্য এশিয়ার বিস্ময়। সেটি শস্যশ্যামল এবং বনবৃক্ষলতাতৃণশোভাময় গ্রাম। বাঁ দিকে একটি বৃক্ষচ্ছায়ার তলায় পুষ্পলতা-সমাকীর্ণ পার্বত্য শীর্ণ নদী তার সুন্দর ও স্বচ্ছ জলধারায় বয়ে চলেছে। অরণ্যপক্ষীর কূজনগুঞ্জন কবে থেকে যেন ভুলে গিয়েছিলাম গত জন্মের স্বপ্নকথার মতো! আজ এখানে পৌঁছে নামহারা কোন্ পথিক পাখির চূর্ণকণ্ঠের ডাক শুনলুম। কবে যেন কোথায় ছেড়ে এসেছি হিমালয়কে, তারই একটি ভগ্নাংশ এখানে ঠিকরিয়ে এসে যেন তার সেই নন্দনকাননের চন্দনগন্ধে আমাকে বিবশ করল।

গিরিনদীর ঠিক পাশে একটি ছায়ানিবিড় তৃণ বিছানো আসনে বসে পড়লুম। যুবকটি খবর নিতে গেল গুম্ফার মন্দির খোলা আছে কিনা। আমার তাড়া নেই। আমি সেই তথাকথিত 'দৃশ্য-দর্শক' নই। অতএব ওই নরম ঘাসগুলির উপরেই এক সময় শুয়ে পড়লুম। আমার মাথার ঠিক পাশে একখানা দানবাকার গৈরিক পাথর ঠিক যেন ছত্রধারণ করে রয়েছে। একটি ঝিরিঝিরি ঝরণা পাশেই কোথাও নামছে, তার থেকে সূক্ষ্ম জলকণা ছিটকিয়ে আসছে মুখেচোখে। মাথার নীচে উপলাহতা গিরিনদীর কলমুখরতা শুনছিলুম। সামনে উঁচুতে গ্রাম—আকারে ছোট। কিন্তু নবাগতকে দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও দেখতে-শুনতে লাগল। তাদের বিবিধ বর্ণের পোশাক বা ঘাঘরা, কপালে লাল বা বেগনি ফিতা, পিঠে লোমশ ভেড়ার এক একখানা ছাল, রৌদ্রদগ্ধ বর্ণ, এগুলি সব মিলিয়ে একটি বিচিত্র আবহ সৃষ্টি করে। এখানে পাঁচ ছয় শত লামার বসবাস শুনেছি।

তিনদিকের উঁচু পাহাড় অনেকটা রোমান অক্ষর "ইউ"-এর মতো। 'হেমিস' তার ক্রোড়বর্তী। সমগ্র লাদাখের মধ্যে একমাত্র 'হেমিস'—যেটি পর্বতচূড়ায় অবস্থিত নয়, যেটি সহজ নাগালের মধ্যে। এর উপর দিয়ে চলে গেছে দুই হাজার দুশ বছর। এই হেমিস তিব্বতের মন্ত্রগুরু। তফাৎ এই, তিব্বতের প্রাক্তন সম্রাট কুবলাই খাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিল তিব্বত ও লাসা, কিন্তু লাদাখ এবং হেমিস সেই সৌভাগ্য লাভ করে নি। গুরুর মুখে অন্ন জোটে নি, কিন্তু তার শিষ্য ঐশ্বর্য-সম্পদে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে! এরপর যা হয়। শিষ্য প্রভুত্ব করে এসেছে গুরুর উপরে। গুরু যত মার খেয়েছে নিজের ঘরে, ততই সে মুখ ফিরিয়েছে লাসার দিকে। এটি সর্বাপেক্ষা হাস্যকর, গয়া-কাশী-কৌশাম্বী লুম্বিনী-কুশীনারা-রাজগৃহ ইত্যাদি পড়ে রইল ভারতে, আর লাসা হয়ে উঠল বৌদ্ধজগতের শাসক! হিন্দুভারত

বৌদ্ধ দর্শনকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে একদা মেনে নিলে লাসার প্রাধান্য কবেই তলিয়ে যেত। চীন ও তিব্বতের তীর্থ হল লাসার 'পোটালা' প্রাসাদ, কিন্তু বৌদ্ধজগতের ধর্মগুরু স্বয়ং দালাই লামার তীর্থ হল ভারতবর্ষ! ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তরুণ দালাই লামা প্রথম আসেন ভারতে। সেইকালে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের চারতলার একটি ঘরে বসে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলুম, ভারতবর্ষ আপনার কেমন লাগে?

সৌম্য সুহাস দালাই লামা ইংরেজিতে জবাব দিয়েছিলেন: "It's the place of my pilgrimage."

এক সময় যুবকটির সঙ্গে চললুম। ভিতরে অল্প চড়াই পথ। একপাশে পাহাড়ি ক্ষেতখামার এবং ছোট ছোট অনেকগুলি ঘরদোর। অন্য পাশে সরু নদীনালা, এবং তার পিছনে বিশাল পার্বত্য প্রাকার। এই সব পাহাড়ের নানা ফাটল দিয়ে তুষারগলা জল নামছে। এ পাহাড়ে 'কাকার' বা জংলী লোমশ ছাগল (দাঁতাল হরিণও বলে), কস্তুরী মৃগ এবং গৈরিকবর্ণ ভালুক—এরা চ'রে বেড়ায়। পাহাড়ি সাপ, বিষাক্ত কাঁকড়া বিছা এবং অন্যান্য সরীসৃপের বাসাও নাকি আছে। আমরা নদীটি পার হয়ে ওপারে এসে দেখি, সামনে পিছনে বিস্তৃত বন বাগান এবং বড় বড় গাছের জটলা। ওক এবং পপলারের সমরোহ প্রচুর। নিভৃত অথচ সুবিস্তৃত এমন একটি সুশ্যামল ভূখণ্ড এই আনগ্ন, রুক্ষ এবং নিরাভরণ গিরিশ্রেণীর গর্ভে লুকিয়ে থাকতে পারে এটি না দেখলে বিশ্বাস করা চলে না।

আশেপাশে অগণিত সংখ্যক মন্দির। মন্দিরের সঙ্গে ঘর মেলানো। আবার ঘরের গায়ে পাথরের উপর বিভিন্ন দেবতার মূর্তি খোদিত। গৌতম বুদ্ধের মূর্তি চিনিয়ে দিতে হয় না। বিষ্ণু চক্র, যমের দণ্ড, এবং পদ্মাসনের পদ্মসম্ভব, এঁদের এখন দেখলেই চিনতে পারি। প্রবেশপথের আগে একটি বৃহৎ মণিচক্র। ধীরে ধীরে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। পথ সামান্য, কিন্তু বায়ু-শীর্ণতার জন্য দ্রুতগতি অসম্ভব। নিজেকে অতিশয় গুরুভার এবং খুবই ক্লান্ত মনে হয়। চারিদিকে অনন্ত অনাহত শান্তি—নিস্তব্ধতাটা কেবল পাখী ডাকায় ঈষৎ মুখর। আমাদের সামনে নিষেধ কোথাও নেই। সমস্তটাই অবারিত। 'হেমিস' ১১,০০০ ফুট উঁচু।

এক সময় উচ্চভূমির উপরে দেখতে পেলুম একটি বৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকা, যার জাফরি-কাটানো বারান্দাগুলির কাঠের আয়তন জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। নীচের থেকে তার শীর্ষদেশ একশ' ফুট উঁচু। অন্য কোনও গুম্ফায় এমন করে যেটি কখনও চোখে পড়ে নি, সেটি হল হেমিসের সুপ্রাচীন জীর্ণ চেহারা। আমরা ধীরে ধীরে চড়াই পথে উঠে মস্ত বড় পুরনো দরজাটা পার হয়ে ভিতরে ঢুকলুম। এই কাঠের দরজার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। সামনে এক বিস্তৃত উঠোন, এবং এখানে

অনায়াসে পাঁচ-সাত হাজার লোকের জমায়েত হতে পারে। প্রতি বছর জুলাই মাসে এই উঠোনে মেলা বসে। বাঁদিকে সারি সারি অনেকগুলি যাত্রীশালা। সমস্ত চেহারাটা পুরোনো জমিদার বাড়ির চকমিলানো এক বৃহৎ চত্বরের মতো। উপর দিকে সেই বিশাল অট্টালিকার দেওয়ালে সর্বত্র রঙীন বর্ণচিত্রের সমারোহ। সমস্তটার সঙ্গে যেন একটি বিশালতার মহিমা! এই অট্টালিকা ঠিক পাশের গিরিশ্রেণীর বিরাট দেহের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং জনচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে ঢাকা।

উঠোনের মেঝে পাথর দিয়ে বাঁধানো। বাঁদিকে এবং সম্মুখে একটির পর একটি যাত্রীশালা। এগুলি এখন বন্ধ। চারিদিকে যেন জরা ও অবসাদ। দেখছি নে কোথাও প্রাণের চিহ্ন, ভরা জীবনের সমারোহ কোথাও দপ দপ করছে না—এ যেন প্রাচীন একটা সভ্যতা ছারখার হয়ে ভিতরে পড়ে রয়েছে। এখানে-ওখানে তাকিয়ে আমার মন যেন চোট্ খেয়ে গেল। বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে যেখানে এসে পৌছবার কল্পনা আমার কত রাত্রির নিদ্রাকে অস্বস্তিতে ভরে তুলেছিল, আজ এখানে এসে একটা আশাভঙ্গের মনস্তাপ বোধ করছি। সে কালের সেই তরুণ এখানে এসে ঠিক কী দেখতে চেয়েছিল, আজ মনে নেই। কিন্তু যা দেখছি, তার সঙ্গে মিলছে না সে কালের সেই রসকল্পনা!

উঠোনের উপর থেকে তুই পাট সিঁড়ি উঠেছে বড় একটানা বৃহৎ বারান্দায়। বারান্দার কোলে মন্দির-কক্ষ একটির পর একটি। ক্ষয়া-ঘষা পুরনো সিঁড়ি দিয়ে উঠলে দোতলাতেও তাই। প্রতি কক্ষে বিভিন্ন মূর্তি। প্রতি কক্ষেই জরা-প্রাচীনের তুর্বোধ্য ইতিহাস অন্ধকারে বিজবিজ করছে। পাথর ও কাঁকর-মাটির দেওয়ালের উপর দিকে কতকটা খোলা—সেগুলি দিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে আলো আনা হচ্ছে। এই অট্টালিকা ও মন্দির-কক্ষগুলির চাকচিক্য হয়ত হাজার বা দেড় হাজার বছর আগে ছিল, তখন এর প্রাণপ্রাচুর্য নিজেকে ঘোষণা করত দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু আজ সেই প্রাণের মৃত্যু ঘটেছে! প্রথম নির্মাণের পর থেকে এ-গুম্ফার সংস্কার নাকি একবার মাত্র হয়েছে, এবং সেটি মহারাজা প্রতাপ সিংহের আমলে—১৯ শতাব্দীর শেষদিকে। লামা বংশপরম্পরার চলাফেরা এবং অবিরত আনাগোনার জন্য সিঁড়ির ধাপ, ঘরের মেঝে, বারান্দার পাথর—সমস্ত ক্ষয়ে গেছে। এখানে ঝুপসি, ওখানে অন্ধকার, দোতলায় ধূলি-জঞ্জাল, তিনতলার মেঝে ফুটো, চারতলার দরজা-জানালা ভাঙা, এখানে-ওখানে কাঠ-কয়লার দাগ, দেওয়ালগুলি থেকে চাপড়া ধসা, খোলা ছাদের ভাঙা পাঁচিল, নড়বড়ে পুরানো কাঠের বারান্দা, ভাঙা পাথরের পাত্র—সব মিলিয়ে খাঁ খাঁ করছে! 'হেমিস' মরে গেছে—এ-খবর আমি জানতুম না।

এখানকার যিনি প্রধান পুরোহিত এবং হেমিসের অধিনায়ক, তিনি একজন 'কুশক'। যেমন পিতুক গুম্ফার বর্তমান অধিনায়ক হলেন, কুশক বকুলা। কুশক বকুলা কাশ্মীর সরকারের জনৈক মন্ত্রী। শোনা যায়, তাঁর কাশ্মীরে জাফরানের কাজ-কারবারও আছে। সে যাই হোক, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও প্রাক্তন সংস্কার-সহ 'কুশক' হয়েই একজন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি 'কুশক' কিন্তু লামা নন। লামা 'তৈরি' হয়—কুশক 'জন্মায়'। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে হেমিসের 'কুশক' তাঁর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য লাসায় যান। অতঃপর চীন গভর্নমেণ্ট তাঁকে আটক করে রাখেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত এখানে এখন কেউ নেই। একজন বিশিষ্ট লামা শুধু এখানে সব দেখাশোনা করেন। এরপর চীন শাসকগণ যখন পুনরায় নূতন করে লাদাখ আক্রমণ করেন, তখন হেমিসের সর্বপ্রকার মূল্যবান সামগ্রীসম্ভার এখান থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং এখানে যা পড়ে রয়েছে, সেগুলি হল কয়েকটি মূর্তি, কিছুসংখ্যক উপচার ও পূজার সরঞ্জাম এবং কয়েকখানি পট ও অতিপ্রাচীন কয়েকখানি রঙীন চিত্র। আমি গিয়েছি সুদূর বঙ্গদেশ থেকে। বিগত ৪২ বৎসরের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ ছাড়া অপর কোনও বাঙালী এখানে এসেছেন কি না, তা-ও আমার জানা নেই। সে যাই হোক, পূর্বোক্ত লামা মহাশয় আমাকে একখানি ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের মতো রঙীন চিত্রপট, একখানি মন্ত্র খোদিত পাথর এবং লাদাখী ভাষায় লিখিত কয়েকটি ছিন্নপত্র উপহারস্বরূপ দান করলেন।

পুঁথির ভাণ্ডারের জন্য হেমিসের দেশজোড়া খ্যাতির কথা শোনা ছিল। সেই সব পুঁথির সংখ্যা কত হাজার বা কত লক্ষ—আমার জানা নেই। তারা এক-এক যুগে এক-এক ভাষায় লিখিত। তাদের বর্ণমালার মধ্যে ব্রাহ্মী, পালি, নাগরী এবং মাগধী বাংলা নাকি উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের নিজস্ব 'শারদা' ভাষা এর মধ্যে আছে কিনা জানিনে। আমি যে বিশেষ পুঁথিখানি দেখার জন্য এসেছি, সেখানির সম্বন্ধে একদা স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে এটি নিয়ে মোটামুটি আলোচনাও করেছি। কিন্তু কোনও পুঁথি এখানে নেই! কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট সেগুলি অন্যত্র নিয়ে গেছেন।

বিগত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ কাশ্মীর ভ্রমণ উপলক্ষে লাদাখের হেমিস গুম্ফায় আহত অবস্থায় আসেন। এখানে কিছুদিন থেকে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। হঠাৎ তিনি একদিন কথায় কথায় 'কুশকের' মুখ থেকে শোনেন যীশুখৃষ্ট তাঁর তরুণ বয়সে নিরুদ্দেশকালে মরুভূমির পথ ধরে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উরসা হয়ে কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে লাদাখে উপস্থিত হন এবং হেমিস গুম্ফায়

গৌরবোজ্জ্বল খ্যাতি তাঁকে হেমিসে আকর্ষণ করে আনে। যীশুখৃষ্টের সেই নিরুদ্দেশ কাহিনী নিয়ে পালি ভাষায় একখানি পুঁথি রচিত হয়। পরবর্তী যুগে যখন খৃষ্টের পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে, তখন এই মূল পুঁথিখানির কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন কয়েকটি প্রসিদ্ধ গুম্ফায় সেগুলি সযত্নে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। মূল পুঁথিখানি লাসায় 'পোটালা' প্রাসাদের নিকটবর্তী 'মার্বুর' নামক এক পার্বত্য মঠে অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। নিকোলাস নটোভিচকে জনৈক দো-ভাষী পূর্বোক্ত অনুলিপিখানির (তিব্বতী ভাষায়) খাপছাড়া বর্ণনা পাঠ করে শোনান এবং নটোভিচ সেগুলি সযত্নে টুকে নিতে থাকেন। তিনি সম্ভবত এগুলি রুশ বর্ণমালায় টুকে নেন এবং পরে সেগুলি মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করেন। অতঃপর এলেক্সিনা লরেঞ্জার নামক আমেরিকাবাসিনী এক মহিলা এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং বইখানির নাম দেওয়া হয় "The Unknown Life of Jesus Christ—এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন শিকাগোর Indo-American Book Company, Illinois, U.S.A. (1894)। বইখানি খুবই চিত্তাকর্ষক, এবং খৃষ্টের জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ১৬টি বছরের 'ভারত-সংযুক্ত' কাহিনীগুলি যেন বিশ্বাস করতে বাধে না। স্বামী অভেদানন্দজী এই বইখানি আমেরিকায় পাঠ করে অভিভূত হন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং হেমিসে এসে মূল পুঁথির তিব্বতী অনুলিপিখানি দেখেন ও দো-ভাষীর সাহায্যে তার পাঠোদ্ধার করেন। বলাবাহুল্য, স্বামীজি সে-কালে এ-ব্যাপারটির আগাগোড়া প্রামাণ্য যুক্তি-সহ বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন এবং যীশুখৃষ্ট যে তাঁর যৌবনকালে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও গৌতম বুদ্ধের মন্ত্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে স্বামীজির তিলমাত্র সংশয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টের "সারমন অন দি মাউন্ট"-এর ভাষণের সঙ্গে বুদ্ধের বাণীর সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যীশু স্বদেশে ফিরে যান। অতঃপর তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করার পর তাঁর ভক্তরা যখন তাঁকে নিরাময় করে তোলেন, তখন তিনি পুনরায় আসেন কাশ্মীরে। বেলুচিস্তান ও সিন্ধু সীমানার এক স্থলে এবং শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'খানাইয়ারী', নামক একটি অঞ্চলে অদ্যাবধি যীশুখৃষ্টের সমাধিমন্দির দেখা যায়।

সেকালে নিকলাস নটোভিচকে কিন্তু এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন নি। তিনি স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড। একজন খাঁটি রুশ, অন্যজন খাঁটি ইংরেজ! যখনকার কথা বলছি তখন, অর্থাৎ ১৯ শতাব্দীর নবম দশকে উত্তর কাশ্মীরের সীমানা রচনার ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ ও রাশিয়ার মধ্যে প্রচুর মনোমালিন্য চলছে। সেই-কালে কোনো রুশ পর্যটককে উত্তর কাশ্মীরের কোথাও ঘোরাফেরা করতে দেখলে

তাকে গুপ্তচর মনে করা ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। রাশিয়ার প্রতি ইংরেজের বিতৃষ্ণা ঐতিহাসিক। চার্চিল সাহেব ছিলেন তার শেষ প্রমাণ এবং স্যর ফ্রান্সিস ছিলেন স্যর উইনস্টন চার্চিলেরই সমসাময়িক। যাই হোক, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বালতিস্তানের স্কার্দু জনপদে নিকলাস নটোভিচের সঙ্গে স্যর ফ্রান্সিসের হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়। একজন যাচ্ছেন হেমিসের দিকে, অন্যজন আসছেন পেকিং থেকে মঙ্গোলীয় মরুভূমি, সিনকিয়াং মরুভূমি এবং কারাকোরম অতিক্রম করে বালতিস্তানের ভিতর দিয়ে শ্রীনগর ও রাওয়ালপিণ্ডির দিকে! নটোভিচকে জনৈক ইংরেজ মনে করে স্যর ফ্রান্সিস যখন সাগ্রহে এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে, তখন শুনলেন তিনি রুশ! এবার স্যর ফ্রান্সিসের নিজের কথাই এখানে উদ্ধার করে দিই—

...'He announced himself as M. Nicholas Notovitch an adventurer who had, I subsequently found, made a not very favourable reputation in India....This same M. Notovitch afterwards published what he called a new "Life of Christ," which he professed to have found in a monastery in Ladak, after he had parted with me. No one, however, who knew M. Notovitch's reputation, or who had the slightest knowledge of the subject, would give any reliance whatever to this pretentious volume." (The Heart of a Continent : 1887).

পরবর্তীকালে স্যর ফ্রান্সিস স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিলেন হেমিস গুম্ফা—তখন তিনি কাশ্মীরের কমিশনার। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি! হেমিসে যাবার আগেই নটোভিচ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। নিকলাস নটোভিচের বইখানি ইংরেজ সরকার ভারতে ঢুকতে দেন নি!

ওদের মধ্যে একটি মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তিটি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তার পাশেই অপর একটি মূর্তির নাম 'রাসচেন'—ইনিই এই গুম্ফার আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং এঁকে বলা হয় 'ব্যাঘ্রলামা'। জীবদ্দশায় ইনি কি প্রকার চরিত্রের মানুষ ছিলেন কেউ জানে না, কিন্তু তাঁর মূর্তি ও চক্ষুর তীব্রতা মনে কিছু দুর্ভাবনা আনে! ভিতরটা ঝুপসি, কালিঝুলিপড়া এবং আগাগোড়া জীর্ণ। পুরনো মাটি ও পাথরের একপ্রকার বদ্ধগন্ধ কতক্ষণের জন্য যেন মোহাবিষ্ট করে রাখে। আসবাবপত্রের চেহারা কিছু মঙ্গোলীয়-কারুকলার সঙ্গে কাশ্মীরিয় আভাস জানায়। অন্ধকার সেই মন্দিরে বহু বিচিত্র চেহারার মূর্তি—যাদের মধ্যে অনেকগুলি এর আগে দেখি নি। চারিদিকে বিস্ময়জনক অলঙ্করণের বৈচিত্র্য—যেগুলি অনেকের নিকট অর্থবোধ নয়। কোনও

সামগ্রীর সঙ্গে আধুনিক কাল বা যুগ জড়িয়ে নেই। ৩০০।৪০০ বছর এই সকল মন্দিরের পক্ষে সামান্য কথা। কাঠের বাটি, রেশম ও জরির সাজ, ময়লা সোনা, বা পিতল বা রূপো, মূর্তিগুলির বর্ণাঢ্যতা, উপরের চাঁদোয়া, বেদী-নির্মাণ কলা, ফটিকের বিভিন্ন পাত্রাদি, মণিরত্নের সজ্জা—এ সমস্ত আটশ', হাজার, দেড় হাজার বা দু'হাজার বছরেরও অনেক আগের সংগ্রহ। রৌপ্যপাত্রগুলিতে জলভরা—সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিদিন টাট্‌কা জল ভ'রে দেওয়া হয়। পাত্রগুলি সেই একই,—কিন্তু লামা-বংশপরম্পরা এই জল ভ'রে দিয়ে যাচ্ছে শত শত বছর ধ'রে। ব্যতিক্রম ঘটে নি কোনও যুগে। ওদের মধ্যে একটি সাংঘাতিক চেহারার দেবীমূর্তি রয়েছে, যেটি নীলবর্ণা রাক্ষসীরূপিণী! ইনি করালী, মহাকালী। এমন সুতীব্র, জীবন্ত, বজ্রহস্তা, বিভীষণা এবং ক্ষুধার্ত পিশাচী-মূর্তি ভারতের অন্যত্র কোথাও দেখি নি। প্রতি বৎসর জুলাই মাসের মেলায় এখানে ব্যাপকভাবে পশুবলিদান দেওয়া হয়,—বুদ্ধমূর্তির অপার করুণাময় দৃষ্টির সম্মুখে! এই নিয়মটি কেবলমাত্র হেমিসেই প্রচলিত তা নয়, লাদাখের প্রতিটি বড় গুম্ফায় এই নিয়মটি পালন করা হয়। বাঙ্গালীর তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে লাদাখ বা তিব্বতের বৌদ্ধদর্শনের কি প্রকার একটি আত্মিক যোগা-যোগ আছে, সেটি আমার সম্পূর্ণ জানা নেই।

এই বিরাট শূন্য অট্টালিকার প্রত্যেকটি তলার প্রতি কক্ষে, ছাদে, বারান্দায়, গুহামন্দিরে, প্রতি ঘরে এবং ভগ্নাবশেষের আশেপাশে আমি যেন অনেকটা কস্তূরী মৃগের মতো আপন উগ্র গন্ধে বিবশ হয়ে ছুটোছুটি করছিলুম! ভিতর থেকে আমার একটা আত্মতাড়না এই জনমানবশূন্য ভৌতিক পুরীর ছমছমে ছায়াগুলির মধ্যে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না! আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, যেটি আমি জানি নে। হয়ত কোনও লুপ্ত সভ্যতার টুকরো, হয়ত কানিংহাম বর্ণিত গৌতমবুদ্ধের সেই দাঁত, হয়ত সম্রাট অশোক বা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের কোনও স্মৃতিচিহ্ন, কিংবা হয়ত কোনও প্রেতচ্ছায়ার চুপি চুপি চাপা কণ্ঠনিঃসৃত মহাকবির বাণী: "যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই, তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই, বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও। ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত—"

না, একালে হেমিসের ভাষা কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে শূন্য পুরী—যেটি ছিল এককালে সমারোহে সমুজ্জ্বল। পড়ে আছে যেন শবদেহ—মহাপরিনির্বাণের শয্যায়। চারিদিকে দানব-দলনের চক্রান্ত,—কিন্তু শান্তিপাঠের নূতন মন্ত্র নেই হেমিসের কণ্ঠে। এই শবদেহের বুকের উপরে কান পেতে এই নতুনকালের জীবনের স্পন্দন শোনবার চেষ্টা পেয়েছিলুম, কিন্তু পারি নি। এই সংবাদটি নিয়েই আমাকে ফিরতে হবে যে, সমস্ত মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে গেছে চরম অপমান,

উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে। বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যদি কখনও ঘটে তবে ভারতের গাঙের সমতলেই সেটি সম্ভব হবে। মধ্য এশিয়ায় নয়, চীনে, তিব্বতে, লাদাখে নয়, দক্ষিণ পূর্ব প্রাচ্যেও নয়,—তার পুনরুজ্জীবন লাভ ঘটবে আপন জননীর কোলে! মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সে ফিরবে আবার ভারতেরই অমৃতলোকে!

বাইরে এসে দেখলুম কয়েকজন জরাস্থবির তাম্রবর্ণ প্রবীণ লামাকে—যাদের মুখে ভাষা নেই। পরণে গৈরিক আলখেল্লা, মাথায় কানমোড়া টুপি, মুখে নিরীহ হাসি, গতিভঙ্গীতে অপরিসীম নিরুৎসাহ। আমার সহচর সেই লাদাখী যুবক কয়েকটি ছবি তুলল। ছেলেটির ক্যামেরার হাত অতিশয় অযোগ্য ও অক্ষম, পরে প্রমাণ পেয়েছিলুম।

পাখি ডাকছিল হেমিসের বনে আর বাগানে—তা'রা অবেলার পাখী! ঝরণার আওয়াজ শুনেছি গুহালোকে,—যার উপরে ঝুঁকে পড়েছে রাক্ষসরাজগিরি! ওধারে বায়ুর তাড়নায় মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছে দোলায়মান মণিচক্রগুলি—যাদের পিতল বা তাম্রপৃষ্ঠে লেখা—"ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।" অদূরে পার্বত্য পুষ্পলতার দল কাঁপছে ঝরণাবিকীর্ণ শিকরকণায়। সন্ধ্যাসমাগমে বন্য হরিণ চুপি চুপি আসবে মটরের ক্ষেতে, রাত্রের দিকে কারাকোরমের ওদিক থেকে নেমে আসবে রক্তিম ভালুক। হেমিসের শূন্যপুরীর ছাদের উপরে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসবে গোসাপের মতো বৃহদাকার সরীসৃপ! কিন্তু আমার যাত্রা এবারের মতো এখানেই শেষ হল। যত অগ্রসর হচ্ছি, ততই যেন বোধ করছি, কেউ যেন আসছে আমার পিছনে দু' হাজার বছরের চাপা নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে! না, বেঁচে নেই! যা কিছু পুরাতন, চিরাচরিত, গতানুগতিক—তার মৃত্যু আসন্ন। নবজীবনের নবীন মন্ত্র যেখানে উচ্চারিত হয় না, সে আপন প্রাণশক্তির অভাবেই মরে। সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর নিঃশব্দ কান্না আমার পিছনে। আমরা ধীরে ধীরে হেমিস ছেড়ে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার খরপ্রবাহ মহাসিন্ধু 'দরিয়ার' নীল জলরাশির তীরে এসে দাঁড়ালুম। সামনে আবার সেই আদিঅন্তহীন মরুপাথরের জগৎ আমাদের চোখের উপর নিজেকে প্রসারিত করে দিল।

॥ ১৪ ॥

লাদাখ রণাঙ্গনের পরিবেশ

মধ্য এশিয়ায় নদীর ভিন্ন নাম হল 'দরিয়া'। এটি বোধ করি তুর্কি শব্দ। হেমিস গুম্ফা ছেড়ে যখন 'সিন্ধু দরিয়ার' কূলে এসে দাঁড়ালুম, বেলা তখন পড়ে আসছে। সামনেই একটি নতুন লালবর্ণ লোহার সেতু, তার দুইদিকে সামরিক সশস্ত্র প্রহরা। ওপারে সেই আমাদের চুস্থলের পথ চ'লে গেছে ধুলোবালির ভিতর দিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে বহুদূর। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর কঠোর চেহারা একালে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুস্থলের ঘাঁটিতে,—সেই ঘাঁটির ঠিক পূর্বে একদিকে পাংগং হ্রদসহ খুর্নাক দুর্গ, অন্যদিকে স্পাঙ্গুর হ্রদ। এই দুটি শীর্ণলম্বিত জলাশয় এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পূর্বাংশ তিব্বতে, পশ্চিমাংশ লাদাখে। এই সব অঞ্চলে চীনের শাসকবর্গ কিছুকাল থেকে মাঝে মাঝে কয়েকটি 'শব্দসমষ্টি' (phrase) ব্যবহার করে নেহরুজিকে হয়রাণ করেছিলেন! সেগুলি হল, "line of control, line of actual control, line of virtual control" ইত্যাদি। কৌতুকের বিষয় ছিল এই, প্রায় প্রতি সপ্তাহে চীন সৈন্যদল যত গুটি-গুটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এগিয়ে এসেছে, ততই 'virtual control' ধীরে ধীরে 'line of control', এবং 'actual control'-এ পরিণত হয়েছে! Virtual এবং actual-এর জটিলতার নিত্য-পরিবর্তনশীল চৈনিক ব্যাখ্যা শুনে ক্যামব্রীজে-পাসকরা নেহরুজি প্যারিসে-পাসকরা চৌ এন-লাইর দিকে চেয়ে লোকসভায় বারম্বার হেসেছেন! আমাদের ছোটবেলায় কলকাতায় চীনা ফেরিওয়ালারা রঙীন কাগজ, সরু কাঠি এবং সূতো দিয়ে তৈরি একটি চমৎকার ছেলে-ভোলানো খেল্‌না বিক্রি ক'রে বেড়াত, সেটিকে তামাসা ক'রে অনেকে বলত, 'চাইনীজ্ পাজ্‌ল!' অর্থাৎ চীনা গোলক-ধাঁধা! একদা জর্জ বার্ণার্ড শ বলেছিলেন, "a lier must be truthful", মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জন্যই মিথ্যাকে সর্বদা নির্ভুল ক'রে রাখা দরকার! এক মিথ্যাকে ঢাকার জন্য বহু মিথ্যার জটিলতা সৃষ্টি ক'রে চীনশাসকবর্গ তাঁদের বন্ধু রাষ্ট্রদের কাছেও হাস্যাস্পদ হয়েছেন! তাঁদের কাল্পনিক মানচিত্র রচনার নিত্যনতুন কৌতুক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে রইল! সে যাই হোক, উক্ত পাংগং এলাকায় প্রথম যুদ্ধ হয় তিব্বতের সঙ্গে ভারতের। সেটি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় যুদ্ধ এই সেদিনের ভারত-চীন (১৯৬২)। পাংগং-এর জল বড় সুস্বাদ!

সিন্ধুনদ পারাপার করেছি জীবনে অনেকবার। কিন্তু জল স্পর্শ করলুম এই প্রথম। এখানে পৃথিবী বালুপাণ্ডুর বর্ণ,—তারই মাঝখান দিয়ে ঘন নীল একটি ফিতার মতো সিন্ধু প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সেই জল মধুরস্বাদ। অদূরবর্তী কৈলাস পর্বতমালার এক হিমবাহলোকে এর উৎপত্তি, কিন্তু মানস সরোবর থেকে অপর এক নদী 'গার্তাং' এসে এর সঙ্গে মিলেছে লাদাখ সীমান্তের ঠিক দক্ষিণে তিব্বতী তাসিগং জনপদে। এটি আগে বলেছি। সিন্ধুর এই জল কোথা থেকে এবং কি প্রকারে স্বর্ণকণিকা বহন করে, অথবা ভূ প্রকৃতির কোন্ রহস্যাচ্ছন্ন কারণে লাদাখ অথবা তিব্বতের বালুদানা স্বর্ণকণায় রূপান্তরিত হয় আমি জানি নে। এই নদের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল থেকে উত্তর ও পশ্চিমে ৭০০ মাইল অবধি প্রবাহপথে অজস্র স্বর্ণকণা হাজার হাজার নরনারীর জীবিকা সমস্যার সমাধান করে।

হেমিসের পথটি দক্ষিণ দিকে এক সময় বালুপাহাড় ও ক্ষেতখামারের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি সিন্ধু পার হয়ে চুসুলের পথটি ধরে লেহ্ শহরের দিকে চললুম। সন্দেহ নেই, পথ বড়ই কর্কশ, রুক্ষ এবং ধূলি সমাকীর্ণ। সেই ধুলোয় পুনরায় সর্বাঙ্গ ধূসর হতে থাকল—যেমন পল্লীগ্রামের যাত্রাদলের অভিনেতা ঘন পাউডার মুখে চোখে বুলিয়ে ভৌতিক চেহারায় আসরে নামে!

সর্বাপেক্ষা অরুচিকর বোধ হচ্ছে শতে-শতে কাতারে কাতারে 'চোর্তেন', 'মানে', আর 'মণি দেওয়াল।' সুন্দরীশ্রেষ্ঠ রাজকন্যা 'হেমিস' দেখে ফিরছি, এখন আর ঘুঁটে-কুড়ুনি দিয়ে আমার মন উঠবে না! সুতরাং অন্যদিকে মুখ ফেরাবার চেষ্টা পেলুম। আশ্চর্য, প্রত্যেক যুগে এক একজন নমস্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, এবং বিদায় নেবার আগে মানবজাতির গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেবার জন্য একদল পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়ে যান! মহাবীর, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, তুলসীদাস, গুরু গোবিন্দ, কার্ল মার্ক্স, গান্ধী প্রভৃতি একে একে সকলের কথা মনে পড়ে! এঁদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জাতি, দল, লাঠিয়াল, ধর্মান্ধ সঙ্ঘ এবং কতকগুলি অদ্ভুত পোশাক ও টুপি! এই দুঃখে নেহরুজী কবে যেন একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আমি পেগান্। কতকাল আগে রাশিয়ার জনৈক নেতা বলেছিলেন, আমি নিহিলিষ্ট! তাঁর নাম বোধ হয় ছিল, বাকুনিন। কিন্তু চীন দেশের সর্বশেষ মহাপুরুষরা যাদেরকে লাদাখের এই শুকনো পাহাড়-পর্বতে লাফালাফি করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, বৈদান্তিক ভারতবর্ষ তাদের উৎপাতে অধুনা অস্থির! এই অস্থিরতার চেহারা দেখতে দেখতেই এক সময় 'শে' ও 'স্তোক' গুম্ফাগ্রাম পেরিয়ে গেলুম। 'শে' গ্রামটি আকারে বড় এবং বিস্তর বসতিযুক্ত। এখানকার সুবৃহৎ গুম্ফা

রাজা দেলদান নামগিয়ালের নির্মিত। লেহ্-র আগে 'শে' ছিল লাদাখের রাজধানী। লেহ্ শহরে পৌঁছবার প্রায় ১৩ মাইল আগে সিন্ধুনদ বাঁক নেয় ঈষৎ পশ্চিমে। এই সন্ধিস্থলের বিস্তৃত ময়দানে এক খণ্ড বন-বাগান এবং একটি বাংলো চোখে পড়ে। এটি ছিল এককালে 'সাহেব বাংলা' অর্থাৎ ডোগরারাজনিযুক্ত ইংরেজ অফিসার— যারা লাদাখীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি। এই পথের কাছাকাছি পাহাড়ের উপরে ও নীচে এমন এক একটি বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি পাহাড়ের গায়ে খোদিত ও নির্মিত রয়েছে যা দেখলে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। কিন্তু আজ এরা অর্থ হারিয়েছে অনেকটা। এই সকল মৈত্রেয় বুদ্ধ ও শাক্যস্থবিরের 'নির্জীব' চক্ষুর সামনে ভারতীয় প্রতিরক্ষার যে বিপুল আয়োজন চলছে, সেটি মধ্যযুগীয় নয়,—একালের বিজ্ঞান-বিদ্যার সেগুলি সর্বশেষ পরিণত ফল! কারাকোরমের ওপারে চীন, এপারে ভারত, উভয়েই সম্পূর্ণ আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই অভিনব সমর-সজ্জার সঙ্গে যেটি লাদাখীদের চোখে পড়ছে, সেটি তাদের পক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন! সামান্ত সামগ্রীর ভিতর দিয়ে তারা দেখছে বৃহৎ পৃথিবীর প্রগতি। বিভিন্ন প্রকার মোটর, সামরিক সাঁজোয়া গাড়ি, হেলিকপ্‌টার ও বিচিত্র শ্রেণীর বিমান, বিভিন্ন প্রকার কামান এবং বিস্ময়কর মারণাস্ত্র! তা ছাড়া সর্বপ্রকার তৈরি-খাদ্য, অদ্ভুত রকমের মনোহারী সামগ্রী, অপরূপ পোশাক বস্ত্রাদি ও সাজসজ্জা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এর থেকে তৈরি হচ্ছে লাদাখের নতুন মন ও চরিত্র, নতুন ক্ষুধা ও অভাববোধের চেতনা, এবং নতুন ধরনের জীবনশিল্পের পরিকল্পনা। চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসা হবেই একদিন, কারণ নিকট-প্রতিবেশী চিরকালের জন্য বৈরী হয়ে থাকতে পারে না, এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা একদিন হতেই হবে। কিন্তু লাদাখ সেদিন আর পুরনো গুম্ফায় ঢুকে চোখ বুজে থাকবে না। কয়েকদিন আগে ডেপুটি কমিশনারের পারিষদ্ সভায় বসে দেখলুম, লাদাখের ভিতর থেকেই এবার সেই নেতৃত্ব উঠে দাঁড়াচ্ছে। শত শত বছর ধরে লাদাখ মার খাচ্ছে—তুর্কি, তিব্বত, হুনজা, পাঠান, মঙ্গোল, শিখ ও ডোগরা—একে একে সবাই ওদেরকে মেরেছে, লুঠ করেছে, ওদের ঘর-দোর ভেঙে দিয়েছে, মুখের অন্ন কেড়ে খেয়েছে, ওদের ঘরের মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কিন্তু এবার লাদাখীরা মাথা তুলছে। ইতিমধ্যেই বিস্তৃত রণাঙ্গনে ওদের শৌর্য, শক্তি, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়েছে। ওরা চাইছে শিক্ষা, অন্ন, অর্থনীতিক সুবিধা, সামাজিক শৃঙ্খল-মোচন এবং লামাতন্ত্রী রাজনীতির উচ্ছেদ। তিব্বত মার খাচ্ছে ওদের চোখের সামনে—দেখছে ওরা। মূঢ়তা, মধ্যযুগীয় বর্বরতা, ধর্মান্ধতা, লামাতন্ত্রের অকথ্য অনাচার, বিভিন্ন প্রকার

সামাজিক দুর্নীতি, জীবন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অপমানের বোঝা বয়ে বেড়ানো, ভূমিদাসগোষ্ঠীর শোচনীয় দুর্দশা—এদের প্রতিকারের জন্য খড়্গ তুলেছে এবার মহাকাল! মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য—সর্বত্র ঝড় উঠেছে এবার! রাজনীতির কূট তর্ক, প্রগতিবাদ বা আদর্শবাদ বিরোধিতার চুল ছেঁড়াছেঁড়ি, আন্তর্জাতিক কলহ—এদেরকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সেই ঝড় আসছে এগিয়ে! যে দেশে যত আছে নিরন্ন আর বুভুক্ষু, যেখানে যত আছে নিরাশ্রয় আর অনুন্নত, যত আছে সর্বহারা, মানহারা, বাস্তহারা আর আশাআশ্বাসহারার দল—তারা তুলেছে এই ঝড় প্রাচ্যের সর্বত্র! সেই ঝড়ের উদ্দাম আঘাতের হাত থেকে ভবিষ্যৎ ভারতেরও নিস্তার আছে কিনা, আজও কেউ জানে না!

লেহ্ শহরে আবার ফিরে এলুম।

ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিয়ে লাদাখীরা মাঠে গিয়ে যখন তাদের প্রিয় খেলা 'পোলো' আরম্ভ করে দেয়, তখন খেলাটা হয়ে ওঠে কৌতুকরঙ্গ। ঘোড়ার পদক্ষেপ গুনে গুনে সুশ্রী মেয়েরা দিচ্ছে হাততালি, এবং 'চ্যাং' পানের ফলে আপনার উদ্দীপনায় কেউ কেউ যে নেচে ওঠে না তা নয়! মাঠে মাঠে ঘোড়ার পায়ের থেকে ধুলো উড়ছে প্রচুর, কিন্তু উভয়পক্ষের খেলাটা জমে উঠলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! মেয়েরা সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আরও যেন তাতিয়ে তোলে।

কুকুর বা বিড়াল মদ্য পান করে না। পৃথিবীর সকল সভ্য এবং ভদ্র সমাজে মদ্য একটি প্রধান পানীয়। লাদাখের সকল সমাজে 'চ্যাং' নামক দেশী মদ্য প্রচলিত এবং বৌদ্ধ জগতে এটি অতিশয় জনপ্রিয়। সিকিমে দেখতুম, পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা শিংতামের হাটতলাটার দোকানে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে চ্যাং পান করছে! চ্যাং-এর বর্ণ ঘোলা জলের মতো। স্বাদে ঈষৎ বস্ত। যব অথবা ধান—যেখানেই যেটি সুলভ তাই পচিয়ে (fermented) এটি প্রস্তুত। 'পোলো' খেলার মাঠে যাবার আগে মেয়েপুরুষ সবাই এটি প্রচুর পরিমাণে পান করে। প্রস্তুত করার গুণে এ বস্তুটি কখনও উগ্র, কখনও বা কিছু মোলায়েম। যবের ঘাঁট বা পিঠা, মাংসের সুরুয়া, যবের ছাতুর ঘোল, চমরীর ঘন দুধ আর দই, কাঠের বাটিতে চায়ের সঙ্গে নুন আর মাখন এবং সময় মতো দু'এক ঘটি 'চ্যাং'—এই সব দেখেশুনে সেদিন রিগজিম নামগিয়াল খালোনকে বলে এলুম, আসুন একবার কলকাতায়—ভেজাল বাদাম তেলে পচা মাছ রান্না করে খাওয়াব, তার সঙ্গে রুটি চিবোবেন! একেবারে অমৃত!

লেহ্ শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে বুঝতে পারা যায়, লাদাখের ভাষা তার নিজস্ব। এ ভাষা আঞ্চলিক। তিব্বতী ভাষার সঙ্গে তার যেটুকু যোগ, সেটি যেন মৈথিলীর

সঙ্গে বাঙ্গালার যোগের মতো। লাদাখের বর্ণমালা বা লিপি তিব্বতের কাছে ধার করা—এটি ভ্রান্ত ধারণা। এ বর্ণমালা ভারত এবং কাশ্মীরের কারখানাতেই তৈরি, যেটি নাগরি এবং মাগধী বাঙ্গালার বক্ররূপ। তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণমালা, শিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—এগুলি প্রধানত যুগিয়েছে ভারত, তথা কাশ্মীর ও বিশেষ করে লাদাখ ; কতকাংশ যুগিয়েছে মঙ্গোলিয় সভ্যতা। তিব্বতের কাছে লাদাখের ঋণ অতি সামান্যই। কিন্তু লাদাখের ভাষায় মিশ্রণ আছে অল্পবিস্তর। তুর্কি, ইয়ারকন্দি, শারদী, ইয়াসেনি, বাল্‌তি, হিন্দুস্তানী এবং পারসিক বা আরবী। এগুলি ফোড়নের মতো লাদাখীর মধ্যে ঢুকেছে। ভাষা সকল সময় হেঁটে বেড়ায়। যত হাঁটে ততই সে প্রাচীন খাদ্য সংগ্রহ করে। বাঙ্গলা ও ইংরেজী তার প্রমাণ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও লেহ্‌ ছিল মস্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্র। রাষ্ট্রসীমানা নিয়ে তখনও গোলযোগ ওঠে নি। ইয়ারকন্দি বা তিব্বতী ছাড়াও লেহ্‌-র বাজারে আসত দার্দ, নাগরী, হুনিয়, চানথানি প্রভৃতি ঘড়েরা। এদিকে থাকত কাশ্মীরি, পাঞ্জাবী, ডোগরা, লাদাখী—সবাই। নাম্‌দা, চরস, পশমিনা বা পশম কেনাবেচার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কাশ্মীরের নিজস্ব পশম চিরকালই কম। লেহ্‌ শহরে ও বাজারে বিক্রি হত 'পশমিনা-ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। কস্তুরীর চাহিদাও কম ছিল না। ভারত থেকে গম, যব, কেরোসিন, দেশলাই, টিম্‌বার, সূতিবস্ত্র এবং নানা মনোহারী বিক্রি হত। মে মাস থেকে অক্টোবর অবধি—অর্থাৎ তুষারগলা থেকে আরম্ভ করে নতুন তুষারপাত পর্যন্ত জমজম করত এমন একটা জনসমারোহ এবং পণ্যবিপণি, যেটির চেহারা ছিল মধ্যযুগীয়। ওরই মধ্যে একটি পণ্য ছিল, স্ত্রীলোক! কেউ তন্বী, কেউ সুশ্রী, কেউ নাচে বা গান গায় ভাল, কেউ বা নূতন ঘরকন্নার প্রতি আসক্ত—এদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলত এবং ওই মধ্যযুগীয় মনোভাবই সেখানে কাজ করত। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় মানুষ চালাচালি এবং স্ত্রীলোক কেনাবেচা বহুকাল থেকে প্রচলিত। পামীর অঞ্চলে, ইয়ারকন্দে, খোতানে, তাজিকিস্তানে এবং সিনকিয়াংয়ের অন্যান্য অঞ্চলেও অদ্যাবধি হাজার হাজার কাশ্মীরি, লাদাখী, এমন কি পাঞ্জাবী পরিবার বর্তমান। শুধু মেয়ে নয়, শত সহস্র পুরুষও। উজবেকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যাদেরকে আমি দেখেছি, কি মেয়ে বা কি পুরুষ—তাদেরকে আফগানি, কাশ্মীরি বা ভারতীয় বলে চিনতে দেরি হয় নি। অন্য পক্ষে লেহ্‌ শহরেও তাই—নানা সম্প্রদায় এসেছে নানাকালে। তারা এখানে ওখানে, পাহাড়ে বা জনপদে ভেড়ার পাল নিয়ে ঘর বেঁধে বসে গেছে। কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজে তারা জায়গাও পেয়েছে। অদ্যাবধি—যুদ্ধবিগ্রহের এত অশান্তির

মধ্যেও লাদাখের অর্থনীতির মূল চেহারা হল ভেড়া-ছাগল-কেন্দ্রিক। পাহাড়ের অন্ধি-সন্ধিস্থলে বা ছোট ছোট জনপদের এখানে ওখানে বিপুল পরিমাণ পশুলোমের রাশিগুলি সেই কথা বলে। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার সেদিন হেসে বললেন, ১৯৬২-তে চীন আক্রমণকালে জওয়ানদের জন্ম 'সোয়েটার' পাঠানো নিয়ে ভারতে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল—সেটি একেবারেই হাস্যকর! সেই হুজুগের মধ্যে লোককে বোঝানো কষ্টকর ছিল যে, আমরা পশম বা সোয়েটারের দেশেই বাস করছি! ওটায় আমাদের কোনও দরকার ছিল না!

তা হলে কোন্‌টা ছিল বিশেষ জরুরী?

সেনাধ্যক্ষ মহাশয় হাসলেন। বললেন, সেগুলি আজও দরকার! বিকেল চারটের থেকে রাত্রে ঘুম না আসা পর্যন্ত জওয়ানদের ভুলিয়ে রাখার মতো এই বরফ আর মরুভূমির দেশে আছে কিছু? আছে কি খেলার মতো মাঠ? আছে কি সিনেমা-থিয়েটার? আছে কি কোনও বিচিত্র অনুষ্ঠানের কেন্দ্র? সোয়েটার পাঠানোর চেয়ে ম্যাজিসিয়ান পাঠালে পারতেন! সিনেমার ছবি দেখানো বেশী দরকার। তাস-পাশা-ক্যারম-ব্যাগাটেল্‌-দাবা-নাচগানের আসর—এই সব পেলে জওয়ানরা খুশী হয়! আমোদ চাই ইাশর—আমোদ! যারা সর্বদা জীবনপাত করবার জন্ম প্রস্তুত, তাদের জন্ম আমোদ আর আনন্দের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আমাদের প্রধান কাজ। কিন্তু 'আমার ছেলেরা' অত্যন্ত 'লক্ষ্মী'—সব অসুবিধা সহ্য করে হাসিমুখে! শীতকালটা থেকে যান, দেখবেন, তাদের কী অসাধারণ আর সাংঘাতিক জীবনযাত্রা!

প্রশ্ন করলুম, যুদ্ধের অবস্থা কি রকম মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। পরে বললেন, চীনাদের কথা বুঝি বলছেন? অতর্কিত অবস্থায় পিছন থেকে মাথায় লাঠি মেরে বাহাদুরি নিয়েছিল সেবার! বোধ হয় ভালই করেছিল! শাপে বর হয়েছিল! It was a boon in disguise! এখন যদি কেউ ওদের খুঁচিয়ে আরেকবার যুদ্ধে নামায় তা হলে খুশীই হই!

হা হা হা করে তিনি আরেকবার আত্মপ্রত্যয়শীল হাসি হাসলেন। পরে বললেন, যুদ্ধের জন্ম ওদের তেমন আর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না! But we are prepared to the teeth!

সেদিন ওঁদের তাঁবুতে উৎকৃষ্ট চা পান করে বিশেষ উদ্দীপনা নিয়ে ফিরেছিলুম।

ফিরে এসে দেখি, জনৈক বাঙালী যুবক আমার জন্ম ডাকবাংলোয় অপেক্ষা করছেন। তাঁর নাম বিশ্বজিৎ সেন। দূর মধ্য এশিয়ার এই শহরে হঠাৎ বাঙালীকে দেখব, এটি চমকপ্রদ। ফলে, এক মিনিটের মধ্যেই আমাদের আলাপ জমে উঠল।

শ্রীমান্ বিশ্বজিৎ নৃতত্ত্ব বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী এম. এস-সি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কালে ইনি এক সময়ে বিভিন্ন আদিবাসীদের সমাজে বাস করেছেন, এবং সেই সূত্রে কলকাতার অনেকগুলি দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদির সঙ্গে ইনি জড়িত। সম্প্রতি বছর দুই হল ইনি দিল্লীতে Indian School of International Studies' প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করছেন। ইনি 'নেফায়' আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েক মাস বসবাস করেছিলেন। সম্প্রতি লাদাখে বাস করছেন দু' মাস হতে চলল। বলা বাহুল্য, শ্রীমান্ বিশ্বজিৎকে পেয়ে আমি বিশেষ লাভবান হয়েছিলুম। হিমালয় এবং তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে এঁর অভিজ্ঞতার সীমানা যথেষ্ট ব্যাপক এবং এই বিষয়টি নিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। তাঁর ঘরছাড়া মনের চেহারা দেখে সেদিন খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম।

লেহ্ শহরে যেখানেই ঘোরা যাক্, সেঙ্গে নামগিয়ালের রাজপ্রাসাদ চোখে পড়বেই। শুধু তাই নয়, এর নির্মাণ কৌশল এবং নকশায় এমন একটি বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে যেটি জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে যে কোনও তির্যকে নতুন নতুন চেহারা প্রকাশ করে। বিশালতার দিক থেকে এই প্রাসাদের নিজস্ব একটি মহিমা রয়েছে। এটি সেই প্রাচীন 'বাদশা মহল'—মস্ত পাহাড়ের উপরে দশতলা উঁচু অট্টালিকা। প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় উঠলে নীচের ক্ষুদ্র শহর কতটুকুই বা। যেমন গোয়ালীয়র কিংবা চিতোর দুর্গের উপর উঠে গিয়ে দাঁড়ালে নীচের দিকে মানুষের ছোট ছোট জীবনের খেলাঘর। পাহাড়ের উপরে প্রাসাদ বা দুর্গ একদা রাজগোষ্ঠীর পক্ষে আত্মরক্ষার আশ্রয় ছিল। কলকাতায় পাহাড় ছিল না, সেই কারণে প্রথমকালের ইংরেজ সৈন্যরা মাটির তলায় বাসা বেঁধেছিল! সেটি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। আধুনিক যুগে মারণাস্ত্রের উন্নতি হবার ফলে দিল্লী-আগ্রার দুর্গ কৌতুক দৃশ্যে পরিণত হয়েছে! লালকেল্লা আর চিড়িয়াখানা এখন প্রায় একই!

কিন্তু এখানে এই দশতলা প্রাসাদের উপর থেকে চারিদিকের যে দৃশ্যাবলী দেখেছিলুম, ভারতবর্ষে সেটি কোথাও নেই!

উত্তরে কারাকোরমের অনেকগুলি চূড়া চোখে পড়ে, কিন্তু তার হিমাজ দেখলে এখান থেকেই যেন ভয় করে। আন্দাজে বুঝতে পারা যায়, 'চিপ-চ্যাপ' উপত্যকার পরেই সিনকিয়াং। কারাকোরম তার বাম বাহু প্রসারিত করেছে কুয়েন-লানের মধ্যে—সমগ্র উত্তর-পূর্ব দিগন্ত শ্বেত সাম্রাজ্য। সমস্ত দিনমান সেখানে সূর্যকিরণোজ্জ্বল, সেখানে কোলে কোলে কোথাও মেঘ ভাসে না। ইতিহাসের কোনও পর্বে এবং বিশ্বসৃজনের কোনও কল্পে আকাশের এই নির্মল নীলিমা মেঘকজ্জল হয় নি, শ্রাবণের

করুণ বেদনা কাকে বলে কেউ জানে না, তুই দিগন্তের উদয়াস্ত কেউ কোনদিন চোখে দেখে নি। একদিকে বৃক্ষলতাচিহ্নহীন লোহিত পর্বতশ্রেণী তার তুষারমণ্ডিত রূপ নিয়ে যেন অচঞ্চল সমুদ্রের মতো থৈ থৈ চেহারায় স্তব্ধ রয়েছে।

সুদূর দক্ষিণের দৃশ্যটি অতি মনোজ্ঞ। 'রূপসুর' পরেই কৈলাসের ধবলশীর্ষ এখান থেকেই একপ্রকার চেনা যায়। সেখানে মধ্যাহ্নকালের সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে। তার ঠিক পশ্চিমে হিমালয়ের শিখরলোক কোন্ দিক থেকে আরম্ভ হয়ে কোন্ দিগন্তের পারে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে আরেকবার যেন দেখতে পাচ্ছি উত্তর-পূর্বদ্বার—যেটি আমার চোখে চিরকাল ধরে একটি ভৌগোলিক বিস্ময়ের মতো হয়ে রয়েছে। এই ভুবনমোহিনী তুষারকিরীটিনী জননীর দিকে চেয়ে বোধ করি মহাকবি তাঁর অনবদ্য গানটি রচনা করেছিলেন, "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি, নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী···।"

নীচে লেহ্ নগরীর ক্রোড়ভূমি থেকে অন্তহীন অধিত্যকার প্রান্তর—যেটি লাদাখের বিস্ময়। অদূরে এখানে ওখানে এক একটি গুম্ফা পাহাড় যেগুলির নাম স্তোক, শে, ফিয়াং, পিতুক ইত্যাদি—যাদের কথা এর আগে বলেছি। যতদূর দৃষ্টি চলে উত্তরে ও দক্ষিণে, সেই অধিত্যকাভূমি সিন্ধু নদ ও দু'একটি শাখা সিন্ধুর এপাশে-ওপাশে দূরদূরান্তরে চলে গেছে, আর তাকেই চারিদিক থেকে প্রাকারের মতো বেষ্টন করে রয়েছে বিভিন্ন নামের একেকটি গিরিশ্রেণী। এই প্রাসাদেরই সংলগ্ন রাজ-গুম্ফাটি ছিল এককালে অতি প্রসিদ্ধ। এই গুম্ফাটি রাজকীয় বলেই এটি ছিল একদা জড়োয়া জহরৎ মণি-মাণিক্য ও ধনরত্নে পরিপূর্ণ। এই সকল সম্পদ চারিদিকের মরুভূমির ভিতর দিয়ে 'বৌদ্ধ পিপিলিকার দল' শত শত বছরের পরিশ্রমের দ্বারা তিল তিল করে সংগ্রহ করেছিল। ঐহিক যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও চিত্তপ্রিয়, শিল্পকলার যা কিছু আনন্দ-অবদান—সব মিলিয়ে এই রাজগুম্ফা তৈরি হয়েছিল। দারু ও কারু-শিল্প, ললিত ও চারুকলা, প্রতি সামগ্রী নির্মাণ ও রচনার অনবদ্য দক্ষতা—একটা সুরসিক জাতির সৌন্দর্যবোধের শ্রেষ্ঠ উপচার—এটির মধ্যে তাদের নিখুঁত পরিচয় রয়ে গেছে যুগে ও যুগান্তরে। এই গুম্ফার সঙ্গে নির্মিত বিরাট ও চিত্তাকর্ষক মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তিটির যে ছাঁচ, সেটি ভারতীয় শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন। বুদ্ধের নিমীলিত নেত্রদ্বয়ে দিব্য চেতনার যে ভাবটি নিত্যকালের করুণায় উদ্ভাসিত, সেটি যেন ত্রিকালজয়ী ; সে যেন জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অতীত এক সপ্তস্বর্গীয় মহিমায় দর্শককে অনুপ্রাণিত করে।

প্রাসাদের ভিতর মহলটি আজও সুন্দর। দেওয়ালচিত্রগুলি কালক্রমে কতকটা মুছেছে, কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে রয়ে গেছে লাদাখী শিল্পীর

রাজকীয় মেজাজ। বর্ণাঢ্যতার মধ্যে রয়েছে হাতের লাবণ্য সূক্ষ্ম শিল্পকলা—যেটি সূক্ষ্মতর রসানুভূতির উপরে কাজ করে যায়। প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে যেন বিচিত্র বৌদ্ধ জগৎ। সভাকক্ষ, পারিষদ কক্ষ, বিশ্রামাগার—এককালে এগুলি সুসজ্জিত ছিল। আজ আগাগোড়া শুধু যাদুঘরের চেহারায় পরিণত। এটি এখন সংস্কৃতি ও লোক-কল্যাণকর্মে নিয়োজিত।

বিস্ময়ের বিষয় এই, প্রত্যেক যুগে বার বার এ-প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় নি। সে-কালে ব্যাঙ্ক ছিল না, ছিল ঘরোয়া কোষাগার, ধনরত্ন গচ্ছিত রাখার নিরাপদ স্থান। ধনরত্ন গচ্ছিত রাখার নিরাপদ স্থান সেই কোষাগার ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না। শুধু তাই নয়, গোপন করার সুবিধা ছিল কম এবং ধন-রত্নাদির সংবাদ সহজেই জানাজানি হয়ে যেত। এ শুধু লাদাখে নয়, কাশ্মীরেও এই, ভারতেও এই। যাই হোক, ১৭শ শতাব্দীতে আলিশের এসে রাজপ্রাসাদের সর্বস্ব লুঠ করেন, মূর্তিগুলি চুরমার করে দেন, হাজার হাজার পুঁথি ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেন। এরপর জরোয়ার সিং আসেন। তিনি ওসব পুঁথি বা ধর্ম বা দেবমূর্তি—কিছু বুঝতেন না। তিনি বোঝেন স্বর্ণমুদ্রা, জড়োয়া জহরৎ, মণিরত্ন এবং মূল্যবান সামগ্রী। আলিশেরের পরবর্তী দু'শ' বছর ধরে যত পুঁথি লেখা হয়েছিল, তিনি প্রায় সবই ধ্বংস করে ল্যাঠা চুকিয়ে দেন। সেই সব ছিন্নভিন্ন কাগজপত্রের কিছু অংশ আজও আছে। সঞ্চয় ও সংগ্রহ করে রাখার একটা সুপ্রাচীন অভ্যাস বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মজ্জাগত। লাদাখের প্রত্যেকটি গুম্ফায় এই অভ্যাসের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়। এই অভ্যাসের পিছনে ছিল যত্নশীল মন। সেটি মধুমক্ষিকার মতো। লাদাখ প্রাচুর্যের দেশ নয়, নব নব উৎপাদনের সম্ভাবনা কোথাও নেই। পুঁজি অল্প, সেই পুঁজি তিল তিল করে বাড়ে, সেইজন্য ছিল অপব্যয়ের ভয়; যেটুকু খরচ হয়, সেটুকু আবার জমা পড়তে দেরি লাগে।

লেহ্ শহরের পথঘাট বলতে বিশেষ কিছু নেই। যা আছে, তাকে বলা চলে মধ্যযুগীয় অলিগলি। কয়লা বর্ণের পাথুরে রাবিশ, পাথরের টুকরো পথের সমতল থেকে মাথা-তোলা, নালি-নর্দমা চোখে পড়ে না, কিন্তু অলিগলির ভিতর দিয়ে চলেছে ঝরনা। এদেরই আশেপাশে জরাজীর্ণ বাড়িগুলি প্রায়ই দোতলা। কোথাও মাটি-ধসা, কোথাও ভেঙে-যাওয়া, কোথাও বা ঝুলে-পড়া। ঘরের পাশ দিয়ে, গলির বাঁক ঘুরে, জলধারা ডিঙিয়ে, বাগানের ধার মাড়িয়ে-কোনমতে যাওয়া যায় এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। কিন্তু এইসব অলিগলির ভিতর দিয়েই জীপ গাড়িকে আনাগোনা করতে দেখলুম বইকি। ওদিকে পুলিস সাহেব, ওধারে কালেক্টরী, এপাশে হাসপাতাল, ওদিকে ইস্কুল, এদিকে বাগান পেরিয়ে গেলে দপ্তর, ক্ষেতখামারের পাশ কাটিয়ে

কমিশনারদের বাগান-বাড়ি—সুতরাং জীপ গাড়ির আনাগোনার পথ যেমন করেই হোক সম্ভব করে তুলতে হয়। কিন্তু সব মিলিয়েও লেহ্ শহর এখনও সেই মধ্যযুগীয়। অন্তত তিন-চারশ' বছর পিছিয়ে না গেলে এ ধরনের একটা মরু-শহর কল্পনা করা যায় না। ওই সব ঘিঞ্জি গলিপথের তলায়-তলায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল পার্বত্য ঝরনা কুলকুলিয়ে বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত, সেগুলিও কৌতুক-দৃশ্য। পাইপের জল নেই, জলের শোধনের দরকার নেই, শহরে জলাশয় বা জলাধার একটিও নেই—অথচ জলের অভাবও নেই বিন্দুমাত্র! প্রতি ঘরের প্রায় দরজার ঠিক বাইরে—চারিদিকের জঞ্জাল ও নোংরার পাশ কাটিয়ে অফুরন্ত স্বচ্ছ ছোট ছোট ধারা বয়ে চলেছে। যদি ইচ্ছা হয়, ওখানেই শৌচাদি, ওখানেই তৃষ্ণা নিবারণ, ওই জলেই রান্না, ওর মধ্যেই ঘোড়া-ভেড়া-ছাগল-মানুষ একই সঙ্গে মুখ ডুবিয়ে পান করছে। মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ন কালে যে ছোট ছোট জলস্রোতগুলি লেহ্-র ভিতর দিয়ে বইতে থাকে, তার চেয়ে সুস্বাদু, স্নিগ্ধ ও আনন্দদায়ক জল অন্য কোথাও পান করেছি মনে পড়ে না। হিমালয়ের জল বহু সময়েই নিরাপদ নয়। কেননা, সেই সব জলধারা নানাবিধ লতাপাতা, শিকড়, ওষধিবন, পাহাড়ের বিভিন্ন প্রকার মাটি ইত্যাদি ধুয়ে-ধুয়ে নিচের দিকে নামে। এখানে সেই প্রশ্ন নেই। চারিদিকে বিশাল নগ্নকান্ত পাহাড়ের শ্রেণী এবং তাদের শীর্ষলোক চিরস্থায়ী তুষারে ভরা। বেলা ন'টা-দশটার পর থেকেই সেই তুষার গলতে থাকে সর্বত্র, এবং পুনরায় সন্ধ্যারাত্রির পর থেকে নতুন তুষারপাত ঘটতে থাক। একখানি সরকারি মুখপত্র এই সূত্রে বলছেন:

"Ladakh at some comparative recent period of history was under the sea. Later on when it emerged it was covered with an ice-cap. The ice-cap has been melting more or less continuous ever since" (Directorate of information, J. & K. Govt. Srinagar, 1964)

সেদিন ওই অলিগলি আর বন-বাগানের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছলুম এক খৃষ্টান পরিবারের বাড়িতে। এঁরা লাদাখী খৃষ্টান, সাধারণ এক গৃহস্থ। ভিতরে ঢুকতেই পিতা ও পুত্র যথারীতি সমাদর করে বসালেন। বাড়িটি একতলা এবং ঘরগুলি সুশ্রী। ভদ্রলোকটি অতি মিষ্টভাষী এবং অমায়িক। ইংরেজীতে তিনি আলাপ করেছিলেন। এই বাড়িরই একটি অংশে প্রার্থনা-মন্দির। ভদ্রলোকটির নাম স্তান্‌জিন্ রাজু। এঁর তিনটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। ছেলেটি এবার সরকারি জলপানি পেয়েছে। গৃহিণী লাদাখী মহিলা, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। তিনি চায়ের সঙ্গে বিস্কুট প্রভৃতি নিয়ে এলেন। পরনে খৃষ্টানী গাউন, গলায় পলার মালা এবং হাতে হাড়ের বালা। গাউনের উপর পশমের জ্যাকেট পরা। অত্যন্ত সাধারণ নিরীহ ভদ্রমহিলা।

এখানেও সেই ১৮৮৫ সালের মোরাভিয়ান ফাদার হাইডের ইতিহাস। এই গির্জাগৃহ তাঁরই কীর্তি বহন করছে। বিগত ৮০ বছরের মধ্যে লাদাখে মোট ১৩০ জন খৃষ্টানের সংখ্যা উঠেছে। এর বেশি সংখ্যা হওয়া বোধ হয় আর সম্ভব নয়। এই নিয়েই ভান্দ্‌ জিন্‌ সাহেবের সঙ্গে সেদিন আলোচনায় কিছুক্ষণ কাটল। প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ার খৃষ্টান পাদরীরা কোনকালে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। খৃষ্টানরা সাম্রাজ্যলোভী এবং তারা প্রথম পাদরীর ছদ্মবেশে এসে ঢোকে, এবং তারপর আসে ব্যবসায়ীর বেশ ধরে—এই হল মধ্য এশিয়ার বিশ্বাস। "বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল, পোহালে শর্বরী" (রবীন্দ্রনাথ)। ভারতের ব্যাপারে সে-কালে ইংরেজদের চেহারা দেখেছিল সবাই। ফলে, তিব্বত, চীন, সিনকিয়াং, পশ্চিম তুর্কিস্তান, পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার অনেকে ইংরেজ সম্বন্ধে খুব সতর্ক ছিল। যদি কখনও ইংরেজ তার গণ্ডির বাইরে পা বাড়াত, তবে সে যেই হোক না কেন, মারধর-খেত প্রচুর। মধ্য এশিয়ার পাহাড়ে প্রান্তরে বহু ইংরেজের জীবন গেছে। ১৬শ শতাব্দীর শেষ দিকে 'জেসুইট' মিশনের জনৈক স্পেনীয় ফাদার এণ্টনী মন্‌সেরেট সম্রাট আকবরের সভায় আসেন। তিনি কেবল হিমালয়ের মোটামুটি মানচিত্র এঁকে নিয়ে চলে যান (১৫৯০)। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরেকজন আসেন, তাঁর নাম বেনেদিকৎ-দা-গোয়েস। তিনি হিমালয় অতিক্রম না করে কাবুলের ভিতর দিয়ে পামীর হয়ে ইয়ারকন্দ যান, এবং সেই অঞ্চলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৬০৭)। তিব্বতে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ায় প্রথম খৃষ্টান গির্জা স্থাপন করেন দু'জন পর্তুগীজ পাদরী আন্দ্রেদ ও মার্কুয়েস (১৬২৬)। মানস সরোবরের অদূরবর্তী 'গুজে' নামক জনপদে (পুরঙ্গ উপত্যকা) তাঁরা এই খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠানটি 'প্রবর্তিত' করেন। বর্তমান তিব্বতের এই অংশ তখন লাদাখের অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রসীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল! অর্থাৎ লাদাখরাজ সেঙ্গে নামগিয়াল এই উপত্যকা তিব্বতের নিকট থেকে যুদ্ধজয়ের ফলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ লাভ করেন। এটি কৈলাসের এলাকা। প্রসঙ্গত বলা যায়, 'মনসা' এবং পদ্মপুরাণে' এটি ভারতীয় এলাকা বলেই বর্ণিত আছে। যাই হোক, পর্তুগীজ পাদরীদের এই খৃষ্টান মিশন চার বছর অবধি বেশ চলে এবং মোট চারশ' তিব্বতীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তারপর পাদরী সাহেবদেরকে 'ভূতে' ধরে। অর্থাৎ, তাঁরা স্বয়ং 'গুজে'র রাজাকে ধরে খৃষ্ট-দীক্ষা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড 'বিপ্লব' বাধিয়ে তোলেন। সেই বিপ্লবে তাঁদের গীর্জা ভেঙেচুরে তচনচ করে দেওয়া হয় এবং নবদীক্ষিত ৪০০ জন তিব্বতী খৃষ্টান ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে 'পাপে'র প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু ওখানেই ফাদার আন্দ্রেদ ও ব্রাদার মার্কুয়েসের কর্মফল শেষ হয় নি। 'গুজে'র সেই 'কুলাঙ্গার রাজাকে ধরে আন্দ্রেদ ও মার্কুয়েসের সঙ্গে তাঁকে প্রায়

এক দড়িতে বেঁধে এই লেহ্ শহরে এনে ছেড়ে দেওয়া হয় (১৬৩০)। (Early Jesuit Travellers in Central Asia, by C. J. Wesseles : 1924) এই সূত্রেই বলা যেতে পারে, প্রথম ইউরোপীয় পর্যটক যিনি লেহ্ শহরে আসেন পীর পাঞ্জাল, কাশ্মীর ও জোযিলা পেরিয়ে, তাঁর নাম 'ইপ্পোলিতো দেসিদেরি।' সেটি ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে।

মিঃ রাজুর ঘরটির দক্ষিণমুখী জানলা দিয়ে বাইরের বিশাল ময়দানের একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল। ওখানে অগণিত সংখ্যক 'পোলো খেলা'র ময়দান ছিল, কিন্তু এখন সামগ্রিকভাবে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করা হচ্ছে। এত বড় আয়োজন এবং বিপুল কর্মতৎপরতা অন্য কোথাও চোখে পড়ে নি। ওর মধ্যে একটি লক্ষ্যবস্তু ছিল, যেটি আমার পক্ষে চিত্তাকর্ষক। সেটি মঙ্গোলীয় ডিজাইনের তাঁবু। এগুলি গোলাকার মঙ্গোলীয় টুপির মতো, এবং বিশেষ কৌশলক্রমে সকল দিক এবং নিচের দিক ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ। উপরদিক থেকে আলো আনার জন্য চাঁদিটি কাচ, অভ্র বা এ-কালের স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। এই ধরনের সুগোল তাঁবু রচনার মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টিই বড় নয়, বালুর ঝাপট যত প্রবলই হোক এবং যেদিক থেকেই আসুক, এর গায়ে আঘাত করা মাত্রই সেই বালু পিছলে পড়ে যায়—অথচ ধাক্কা লাগে না! তুষার পতনের বেলাও তাই। উপর দিকে তুষার জমে ওঠার কোনও ক্ষেত্র নেই, এবং তুষার গললেও অসুবিধা নেই। বাঙ্গলা দেশের ধানের বা খড়ের গোলার সঙ্গে এগুলির যেন কোথায় একটি মিল আছে। এই চিত্তাকর্ষক তাঁবুগুলি একদা আন্তঃমঙ্গোলীয় মরুভূমিতে যাযাবর মঙ্গোলীয়রা ব্যবহার করত। মাত্র একশ' বছর আগেও গোবি মরুভূমির এক-একটি অংশ যখন চীনারা একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছিল, সেই কালে নির্বিরোধ মঙ্গোলীয়রা এই তাঁবুগুলি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে এখানে ওখানে 'নিরাপদ' আশ্রয় খুঁজে বেড়াত! মাঝে মাঝে চীনাদের এই সম্প্রসারণ উভয় পক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও কারণ হত। যাযাবর মঙ্গোলীয়রা ছিল ফূর্তিবাজ, স্বভাবশিল্পী, কাব্য ও সঙ্গীতরসিক, উৎকৃষ্ট দারুশিল্পী। চিত্র ও স্থাপত্য-কলায় এশিয়ার মধ্যে এদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যেত কম। এদের তরবারি খেলা, ঈগল ও বাজপাখি তাড়নার কৌশল, অশ্বারোহণের কৃতিত্ব, মাংস রান্নার বিবিধ বৈচিত্র্য—এগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। পোষা ঈগল পাখি ওদেরকে আজও বিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ভেড়ার ছানা ধরে এনে দেয় এবং পাখিরাও তার থেকে ভাগ পায়। বাজপাখি অন্য পাখি ধরে আনে। মঙ্গোলীয়রা নিজেদের বন্দুক নিজেরাই তৈরি করে। বিগত কয়েক বছর থেকে বহির্মঙ্গোলীয়ায় ভারতীয়গণের যাতায়াতের ফলে এটি জানা গেছে, মঙ্গোলীয় সমাজ ভারতের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতিশীল।

স্তান্দ্‌জিন্ রাজু মহাশয়ের ঘরে বসে এ আলোচনাগুলি তোলার একটি প্রধান কারণ, এঁদের মূল পিতৃপুরুষ মঙ্গোলীয়। উত্তর গান্ধার, উত্তর কাশ্মীর—প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছে আর্যবংশীয় এবং মধ্য এশিয়া থেকে মঙ্গোল—এদের উভয়ের মিশ্রণ ঘটেছে লাদাখে। দিবারাত্র এ-দৃশ্য স্বচক্ষেই দেখছি। স্তান্দজিন্ পরিবারটি তার ব্যতিক্রম নয়। এ-পরিবারেও বর্ণ-সঙ্কর ঘটেছে বার বার। আর্য, মঙ্গোল, ব্যাকট্রিয়—পরবর্তীকালে যাদের অধিকাংশ হয়েছে মুসলমান এবং বৌদ্ধ—তারা ছড়িয়ে পড়েছে কাশ্মীরোত্তর ছোট ছোট রাষ্ট্রে এবং লাদাখে। লাদাখের মতো এমন বর্ণসংহতির ক্ষেত্র ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলে নেই।

সেদিন বেলা হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এক সময় এই ভদ্র পরিবারটির নিকট বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

লেহ্ শহর এখন যুদ্ধ সীমানা—ভারত ও চীন লেহ্ তহশীলে মুখোমুখি। উভয়ের মাঝখানে শুধু 'মুজতাগ-কারাকোরম।' সুতরাং চারিদিকের পার্বত্য প্রাকারের মধ্য-উপত্যকাস্থলে যে বিপুল সমরায়োজন চলবে, এতে বিস্ময় নেই। কিন্তু এখানে কাশ্মীরের সিভিল গভর্ণমেণ্ট আপন স্বকীয়তায় চলে। তার জন্য আছে বেসামরিক বিমান ও ট্রাক বাহিনী, আছে তার নিজস্ব অন্যান্য যানবাহন। কিন্তু পথ সেই একই। শ্রীনগর থেকে জোযিলা, কারগিল, খালাৎসে, লেহ ও হুবরা। এটি কাশ্মীর ও লাদাখের মাঝখানের প্রধান প্রাণসূত্র পথ। কাশ্মীরের 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখার' দক্ষিণে নেমে পাকিস্তান যদি এই সূত্রপথ ছিন্ন করেন, তা হলে সমগ্র লাদাখের সমূহ বিপদ। এটি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই জানেন। লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ, চীনকে আমন্ত্রণ করা। শরীরের যে-অঙ্গে রক্ত-চলাচল নেই, সে অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পঙ্গু। চীনা সৈন্যদল ও তাদের সমরসম্ভার আমদানির পথ সেক্ষেত্রে হবে অবারিত। প্রত্যক্ষত, সে অবস্থায় লেহ্ নগরীর পতন অনিবার্য। এই একটিমাত্র কারণের জন্য লেহ্ নগরে উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার অবধি নেই!

আমি ওই বৃহৎ উপত্যকাব্যাপী সমরায়োজনের মধ্যেই পরিভ্রমণ করছিলুম। অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি চীনের নূতন শাসকবর্গের সঙ্গে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বন্ধুত্বকে যাঁরা মনে করেন অস্বাভাবিক, তাঁরা ভ্রান্ত। পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর এবং চীন-অধিকৃত সিংকিয়াং—এই উভয়েই মিলেছে পামীরে। এ-পারের সঙ্গে ও-পারের বন্ধুত্ব চিরকালের। বর্ণ, সংস্কৃতি, খাদ্য, সামাজিক জীবন, ভাষা ও বর্ণমালা, প্রথা ও প্রচলন—উভয়ের হুবহু এক। সেই অপরিচিত জগতের সঙ্গে মহারাজা গুলাব সিং থেকে আরম্ভ করে রাজ্যপাল করণ সিং অবধি—কারও কোনও পরিচয় নেই। সে একটা ভিন্ন জগৎ।

চীনের প্রয়োজন আছে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের। চীনের জনসংখ্যা তার প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশি। নানা স্থানে তাকে উপনিবেশ বসাতে হবে। ভিয়েৎনামে, ইন্দোনেশিয়ায়, কম্বোজে, সিয়ামে, মালয়ে, বর্মায়—সে কেবলই তার লোক বসিয়ে চলেছে! এখন সে লোক বসাচ্ছে তিব্বতে, চানখানে, খোতানে, সিনকিয়াংয়ে এবং পামীরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এবার সে যেতে আরম্ভ করেছে আরবে ও আফ্রিকায়। ইতিমধ্যেই আফ্রিকায় সে উপনিবেশ বসাচ্ছে। সম্প্রতি সে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ঘুরছে! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এককালে সর্বাগ্রে পাঠাতো পাদরীকে, সম্প্রসারবাদী চীন এ-কালে হিটলারকে অনুকরণ করে সর্বাগ্রে পাঠাচ্ছে রাঁধুনী (চীনা হোটেলের রান্না অতি উপাদেয়), ধোবা (চীনা ড্রাইংক্লিনিং শ্রেষ্ঠ ধোলাইকার), মুচি (চীনাবাড়ির জুতো অতিশয় জনপ্রিয়), নাপিত (চীনা সেলুনের কাটছাঁট সকল দেশে প্রসিদ্ধ), ছুতোর মিস্ত্রী (কাঠের কাজে চীনা মিস্ত্রী অদ্বিতীয়)। পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে চীনারা নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অর্থনীতির একটা বড় অংশ তাদের প্রভাবে আসার পর রাজনীতিক প্রভাবের কথা উঠবে কিনা, এখনই বলা কঠিন।

কিন্তু এর জবাব পেয়েছিলুম ১৯৫৭ সালে বর্মা ভ্রমণকালে। রেঙ্গুন হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাকে আধ ঘণ্টার জন্য 'দেখা সাক্ষাৎ' মঞ্জুর করেছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলুম, এটি বর্মাদেশ, কিন্তু চীনাদের প্রভাব এত দেখছি কেন?

আমার প্রশ্নটি বুঝে তিনি হাসলেন—কী দেখছেন?

আমি বললুম, চাউলের অধিকাংশ কারবার, অধিকাংশ সংবাদপত্র, অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি রপ্তানি, অধিকাংশ দোকান আর আড়ৎ, কাজ-কারবার, যানবাহন, এমন কি বহু ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি—সমস্তই চীনা মহলের হাতে! টিম্বারের ব্যবসা তারাই করে, জঙ্গলের ইজারা তাদের হাতে—বর্মা গভর্নমেণ্ট শুধু শুল্ক পান। সংবাদপত্রগুলির মালিক অধিকাংশই তাঁরা। আপনি অনুগ্রহ করে এর ওপর একটু আলোকপাত করুন।

বিচারপতি মহাশয় আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি যেটি অনুমান করছেন, সেটি খুব মিথ্যে নয়। ভয়ে ভয়ে আমি বললুম, কিন্তু বিশ বছর বা পঁচিশ বছর পরে বর্মার রাজনীতিক চেহারা কি প্রকার দাঁড়াবে—আপনি অনুমান করেন?

বিশ বছর!—বিচারপতি মহাশয় ঈষৎ জলজল করে উঠলেন, বর্মা হল তিব্বতেরই স্বগোত্র—জানেন ত। পনেরো বছরই যথেষ্ট—তখন এসে আরেকবার খবর নেবেন!

সেদিন আমি হাসিমুখে উঠে এসেছিলুম।

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের ফলে পশ্চিম-দক্ষিণ কারাকোরমের তিন হাজার বর্গমাইল এলাকা চীন লাভ করেছেন। এ ছাড়া পাকিস্তান-অধিকৃত হুনজা, নাগর, উত্তর বালতিস্তান প্রভৃতির থেকে আরও চার হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে চীন-পাকিস্তানের মধ্যে একটি আলাপ চলছে। অর্থাৎ গিলগিট থাকবে পাকিস্তানের শেষ সীমা! বলা বাহুল্য, পাকিস্তান সম্ভবত চীনের অনুরোধ রাখতে বাধ্য হবেন।

চীনের নূতন শাসকবর্গ তাঁদের প্রত্যেক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা, চীন সকলের নিকট প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত। সম্প্রতি সিনকিয়াংয়ে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁরা একদিকে যেমন তাঁদের ঘৃণাকে শব্দায়মান করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁরা সতর্কও করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, আফগান, পাকিস্তান, তিব্বত এবং সিনকিয়াংকে। এ-আওয়াজ তাঁদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের, আক্রোশ এবং আত্মাভিমানের, ক্রোধের ও পূর্ব যুগের অপমান বোধের। এর ঠিক বিপরীত দিকে দেখি, পাকিস্তানের জন্ম ঘটেছে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা এবং চিত্তগ্লানির থেকে। অভিশপ্ত ভারতের অন্তর্নিহিত জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ, শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিদ্বেষ, জঘন্য অস্পৃশ্যতাবোধ, অপরিণামদর্শী আত্মকলহ—ভারতের এই ঐতিহাসিক কলঙ্কগুলি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে চার্চিল-দলসৃষ্ট পাকিস্তান।

আজ দুই বিদ্বেষ এবং দুই আক্রোশ একত্র হাত মেলাচ্ছে হিমালয়ের উত্তর চরিত্রে! দুই ঘৃণা ও দুই আত্মাভিমান দাঁড়িয়ে উঠেছে পাশাপাশি। কিন্তু এই দুইয়ের প্রকৃতি দুই প্রকার। একপক্ষ আমাদেরই লোক, আমাদেরই আত্মজ, আমাদেরই সহোদর। অন্য পক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের—যাদের চিন্তাধারা ও চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সামান্যই।

দুই বিরূপ এবং বিপরীতমুখী শক্তি একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে লাদাখে এবং কাশ্মীরে। কাশ্মীরেও 'চীন' এবং লাদাখেও 'পাকিস্তান'! ভারত এসে এখানে দাঁড়িয়েছে উভয়ের মুখোমুখি। চেয়ে দেখছে সে, উভয়ের লক্ষ্য দুই প্রকার।

এই ত্রি-শক্তির কেন্দ্রবিন্দুটির উপর আজ আমি দাঁড়িয়ে। আমার এই লাদাখ ভ্রমণ শেষ করার আগে সামনে চেয়ে দেখছি একটা ভবিষ্যৎ—যেটি আমার মতো অনেকের চোখেই অস্পষ্ট আশঙ্কায় ধূসর। কিন্তু কেন এই আশঙ্কা, আমি জানি নে। শুধু জানি, অতীত ভারতের ইতিহাস ভাল নয়। সেই ইতিহাস স্মরণ করে এই দুর্ভাবনা মনে আসে, "সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।"

॥ ১৫ ॥

লাদাখের পরিশিষ্ট

লাদাখ থেকে আমার বিদায় এবার আসন্ন। আমি যাবার পথের পথিক। বহুকাল পরে হারানো বন্ধুকে যেন খুঁজে পেয়েছিলুম, পুরনো ইতিহাস ডিঙিয়ে এসে নতুন করে যেন তার সঙ্গে মন জানাজানি চলছিল।

চেয়ে দেখছি লাদাখের সর্বত্র পাথরে-পাথরে লেখা ভারতীয় শিলালিপি যেগুলি খৃষ্টজন্মের প্রায় তিনশ' বছর আগে থেকে খোদিত। এগুলি সেই অশোকের আমল থেকে চলে এসেছে পরবর্তী বারোশ' বছর পর্যন্ত। তারপরে বন্ধুর খবর মেলে নি অনেককাল। এর মধ্যে হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের সংহতি ঘটেছে ভারতে, এবং অনাদৃত ও অনাচারপীড়িত বৌদ্ধ সম্প্রদায় কালক্রমে আশ্রয় নেয় দুস্তর হিমালয়ের স্তরে স্তরে। আপন জন্মভূমির প্রতি অভিমানবশত তিব্বতের দিকে তারা মুখ ফেরায়, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন তিব্বতকে তারা সংস্কৃতিবান করে তুলতে থাকে। ভারতীয় ইতিহাস এই কথাই বলে, নালন্দার ভারতীয় সংস্কৃতি প্রায় ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত আপন একচ্ছত্র প্রভাবের দ্বারা তিব্বতে এক নতুন সভ্যতা বিস্তার করে।

আমি নিজে সাহিত্যকর্মী ও পর্যটক। ইতিহাস বা রাজনীতি আমার পেশা নয়। কিন্তু কাশ্মীর বা লাদাখ ভ্রমণকালে ওই দুটি বিষয় বাদ দিলে যা থাকে সে হল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা। কিন্তু এ দুটির মধ্যেও রাজনীতি ও ইতিহাস বিজড়িত। লাদাখের ভূগোল আগাগোড়া ইতিহাসেরই খেলা। চীন তার স্বরচিত ইতিহাসের বইটি সঙ্গে রেখেই লাদাখের ভূগোল দিচ্ছে বদলিয়ে। কাশ্মীরের নতুন গভর্ণমেণ্ট লাদাখের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেটি রাজনীতিরই রূপান্তর।

একালের সমাজ জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রের গতি-প্রগতি এমনভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত যে, কোনও চক্ষুষ্মান লেখক, সাংবাদিক বা সাহিত্যকর্মী রাজনীতিকে বাদ দিয়ে অথবা অর্থনৈতিক জীবনের চেহারাটাকে এড়িয়ে কেবলমাত্র চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে স্থির থাকছে না। আজ লাদাখ এবং কাশ্মীর সম্মিলিতভাবে ভারতের সামনে বিরাট এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ভারতের প্রায় ৪৫ কোটি নরনারী এই চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছে। লেখক সমাজ তার থেকে বিচ্ছিন্ন নন্।

যাবার আগে লাদাখ যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। সেই চোখ ছলছল

করছে কিনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিনে। মৈত্রেয় বুদ্ধের ধ্যান-নিমীলিত দুটি নেত্র কি ইতিহাসের কোনও যুগে ছলছল করে উঠেছে? অপার করুণাময় এবং অসীম ক্ষমায় সেই নেত্রদ্বয় নিত্য জাগ্রত,—এটি ত' আমারই মনের কল্পনা! সামনে চেয়ে দেখছি ছিন্নজীর্ণ ধূলিমলিন লাদাখ তার অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে দুর্গত। নিরীহ লাদাখ চিরকাল চেয়েছে তার স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে বেঁচে থাকতে। কিন্তু লেহ্ নগরীর আশে-পাশে ঘুরে দেখছি, হাজার বছরের মধ্যেও তাকে নির্বিঘ্নে বাঁচতে দেওয়া হয় নি। লেহ্ নগরীর উপর আধিপত্যের অর্থ, লাদাখের উপর কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব বহুবার হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রকার বিবর্তনের মধ্যে লাদাখের উন্নয়ন ঘটেনি কোনও যুগে।

লাদাখে অন্নবস্ত্র নেই, কলকারখানা বা কুটির শিল্প নেই, বিদ্যুৎ বা লোহা—কোনটাই নেই। কোথাও কোনও প্রকার উৎপাদনের চিহ্ন মাত্র চোখে পড়ে না। আছে কেবল কতকগুলি ভেড়া ও ছাগল, এবং তাদের ঘন লোম। কিন্তু তারও প্রাচুর্যের দিন আর নেই। চানথান, সিনকিয়াং, পুরঙ্গ, খোতান—এদের থেকে প্রচুর পশুলোম আসত একদিকে পাঞ্জাবে এবং অন্যদিকে লাদাখের ভিতর দিয়ে কাশ্মীরে। কিন্তু সেই বাণিজ্য বোধ হয় চিরকালের জন্যই বন্ধ হয়ে গেল! শুধু উত্তর হিমালয়ের পথেই নয়—গার্বিয়াং-ধারচুলার পথ, নেপালের মুক্তিনাথের পথ, দার্জিলিং চুম্বী বা উত্তর সিকিমের পথ, অথবা 'নেফা'র নানা পথ—কোনও পথ দিয়েই ভারতে এই বহু মূল্যবান পশুলোম আর পৌছবে না! সে যাই হোক, লাদাখের সেই প্রাধান্য এখন আর নেই। এখন সে হয়ে উঠল উত্তর ভারতের সীমান্ত ঘাঁটি। যেসব অঞ্চল ছিল 'মৃত' সীমানা, এখন তারা 'জীবন্ত'। কিন্তু লাদাখের শ্রীহীন দারিদ্র্য সম্পদের প্রাচুর্যে ভরবে কিনা, এইটি প্রশ্ন। পশুলোম কতটুকু পরিমাণ আছে, তাই নিয়েই লাদাখের অর্থনীতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে (১৯১৪-১৮) শুধু হিমালয় নয়—কারাকোরম, পামীর, তিয়েনসিন, কুয়েনলান, কৈলাস, নিয়েনচেনটাং প্রভৃতি পার্বত্য জগৎ ছিল 'নিদ্রিত'। পামীর, সিনকিয়াং, তাকলা-মাকান, চানথান, পুরঙ্গ—এরা কোথায় কেউ খবরও রাখে নি। লাদাখ, রূপসু, বালতিস্তান, হুনজা, নাগর, তাজিক, কিরগিজ—এদের নামও শোনে নি হয়ত বহুলোক। এরা ছিল তখন অজানা কোন্ মধ্য এশিয়ায়—যাদের সঙ্গে ভারতের প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তখন হিমালয় ছিল রূপকের মতো। দার্জিলিং, কাঠমাণ্ডু, আলমোড়া, মুসৌরী, সিমলা, অথবা কাশ্মীর উপত্যকা—এর বাইরে হিমালয়ের যে বিপুলতর এক জগৎ আছে, হিমালয়ের পিছনে ওপার আছে, ওপারে গিয়ে পৌছলে অন্যান্য জগতের হাতছানি আছে—এসব যেন

ছিল রূপক গল্প ! এর চেয়েও বিস্ময়কর ছিল এই, কয়েকটি পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া ভারতীয় কোনও রূপকথায় বা লোকসাহিত্যে হিমালয়ের উল্লেখমাত্র ছিল না !

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৩৯-৪৫) ইংরেজের পতন ঘটে এশিয়ায় এবং ভারতকে তার ছাড়তে হয়। চীনের পুনরভ্যুত্থান ঘটে পঞ্চাশ দশকে। নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তান আসরে নামে। ভারত হয়ে ওঠে নূতন এক শক্তি। নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন অভ্যুত্থান ঘটে। দেখতে দেখতে হিমালয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভারত গভর্ণমেণ্টের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি ছিল এই, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭-র মধ্যে প্রাচ্যের দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে না তাকিয়ে প্রতীচ্যের দিকে তাঁরা অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে প্রতীচ্য কাছে আসে নি, কিন্তু প্রাচ্য সরে গেছে অনেক দূরে। দক্ষিণ হিমালয়ের কয়েকটি জেলা বা মহকুমা ছাড়া বৃহত্তর হিমালয়ের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর খবর আমরা নিলুম না ! নেফার অধিবাসীকে শুধু দেখলুম ছবিতে ! ভুটানকে চিনতে চাইলুম না। সিকিমের প্রকৃত মনোভাবকে জানবার চেষ্টা পেলুম না। স্বাধীন নেপাল আমাদের নির্ভুল পরমাত্মীয় কি না সে প্রশ্ন রয়ে গেল ! এদিকে আবার হিমাচলের সঙ্গে পূর্ব পাঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় বিরোধ দেখা যাচ্ছে লাহুল, স্পিতি ও কুলু উপত্যকা নিয়ে। এঅঞ্চলের পুরনো ইতিহাস খুব উৎসাহজনক নয়। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে নূতন চীনের সম্প্রসারবাদ লাহুল-স্পিতির সমান্তরাল রেখায় উত্তর-পশ্চিমে জোযিলা গিরিসঙ্কট অবধি সমগ্র লাদাখ ও রূপস্থুর উপর দাবি জানাবে কিনা, এখনও সেটি স্পষ্ট হয় নি। হিমালয়ের সঠিক সীমানা ধরে চীনের শাসকবর্গ যদি হুন দেশের ভিতর দিয়ে লাহুল-স্পিতি ও জাস্কার প্রদেশ দখল করার চেষ্টা পান, তাহলে তাঁদের এই 'ঘোরাপথের হামলার' (out-flanking movement) ফলে লেহ্ নগরীসহ সমগ্র লাদাখ বিপন্ন হতে পারে। বহুলোকের সন্দেহ, সম্প্রতি পাকিস্তান কার্গিলের 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' ডিঙিয়ে লাদাখ যাবার পথটির উপর যে আক্রমণ করেছিলেন, সেটি তাঁদের নিজ সুবিধার জন্যও নয় এবং কাশ্মীর-বিরোধ জাগিয়ে রাখার জন্যও নয়—সেটির লক্ষ্য ছিল অনুরূপ। সেটি বলি। বিগত ১৮ বছর কালের মধ্যে পাকিস্তানের শাসকবর্গ কাশ্মীরই চেয়ে এসেছেন, কিন্তু লাদাখের কথা একবারও তোলেন নি। লাদাখের প্রয়োজন চীনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি। লাদাখ পাওয়ার অর্থ, সিনকিয়াং, তাগ্‌দুমবাস-পামীর সম্পূর্ণ কারাকোরম এবং বালতিস্তানসহ লাদাখ, জাস্কার ও রূপস্থুকে নিয়ে একটি নিরেট বৃহদাকার সাম্রাজ্য ! লাদাখ হল বর্তমানে সেই পরিকল্পিত সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ছিটমহল মাত্র। এই ছিটমহলের উচ্ছেদসাধন করা খুবই সহজ হয় যদি "শ্রীনগর-জোযিলা-কার্গিল-লেহ" নামক পথটি মাঝখান থেকে কেটে দেওয়া যায় ! এটি কাটবার শ্রেষ্ঠস্থল হল 'কার্গিল

সেক্টর।' মানচিত্র বিশারদমাত্রই জানেন, এই আক্রমণে পাকিস্তানের কিছুমাত্র লাভ নেই, কিন্তু চীনের সর্বপ্রকার সুবিধা আছে।

লেহ্ নগরীতে পৌঁছে প্রথম রাত্রে যিনি ডাক বাংলোয় এসে আলাপচারী করে গিয়েছিলেন, তিনি এখানকার এডিশনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার—অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার মিঃ মূর্তির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। এঁর অমায়িক সৌজন্য লক্ষ্য করে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলুম, তেমনি এঁর নাম-ধাম-পরিচয় সম্বন্ধে আমার মনে একটি ঔৎসুক্য জন্মেছিল। আমার সংশয় ছিল, উনি বাঙালী কিনা। এবার জানলুম উনি 'আধাআধি' বাঙালি, এবং ইংরেজ আমলের একজন প্রাক্তন অফিসার। ওঁর নাম মেজর অজিতকুমার নাগ। চেহারাটি সুশ্রী, সুগঠিত এবং বয়স এখন পঞ্চাশ হয় নি। চুল পেকেছে। উনি যখন ইংরেজীতে বললেন, আমার কয়েকখানি গ্রন্থের সঙ্গে উনি বিশেষ পরিচিত, তখনই ওঁকে আমি ধরলুম উনি বাঙালী। মিঃ নাগ কার্গিল তহশিলের শাসক এবং কলেক্টর। ওঁর সম্বন্ধে পরম্পরায় দুটি সংবাদ শুনলুম। প্রথম, উনি অতিশয় স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; দ্বিতীয়, কার্গিল তহশিলকে একটি নূতন ছাঁচে ঢেলে উনি সেখানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এ ছাড়া মিঃ নাগ আগে ছিলেন পররাষ্ট্র বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ওঁকে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী বলে মনে করতেন। উনি তাঁর সবিশেষ প্রিয় ছিলেন বলেই ওঁকে সমস্যাপীড়িত সুদূর কার্গিলে পাঠানো হয়েছে।

মিঃ মূর্তির ওখানে নৈশভোজের একটি আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু আহারাদির আয়োজনটি ছিল অন্যতম লাদাখী অফিসার জিৎ সিংয়ের বাংলোয়। কিন্তু আমি প্রথমে গিয়ে উঠলুম মিঃ নাগের বাগান বাড়িটিতে। বাইরে থেকে বা শ্রীনগর থেকে যে কর্মচারীরা আসেন, তাঁরা, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, প্রায়ই সপরিবারে আসেন না, কারণ এটি এখন যুদ্ধ সীমান্ত। লেহ্ নগরীতে বর্তমানে অনেকটাই সামরিক নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। মিঃ মূর্তি বা নাগ একাই থাকেন। মিঃ জিৎ সিং স্থানীয় লোক বলেই তিনি এখানে সপরিবারে বাস করেন। তাঁর স্ত্রীও লাদাখী মহিলা।

আমার সঙ্গে ছিলেন জনৈক কাশ্মীরী অধ্যাপক, পণ্ডিত মাখনলাল মাট্টু। এখানকার বৌদ্ধদর্শনচর্চা প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সুদর্শন।

মিঃ নাগের বারান্দায় উঠে এতদিন পরে এই প্রথম তাঁর সঙ্গে বাংলা ভাষায় আলাপ করলুম। এমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান বাঙালীকে এই দূর দেশে একটি গুরুদায়িত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত দেখে আমি যেন একটু প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ করছিলুম। মিঃ নাগের পৈতৃক বাস ছিল ঢাকায়। কিন্তু তাঁর বাবা তরুণ বয়সে রাওয়ালপিণ্ডিতে

চলে যান চাকরি নিয়ে। অতঃপর সেখানে এক পাঞ্জাবী মহিলাকে বিবাহ করেন এবং রাওয়ালপিণ্ডিরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। মিঃ নাগ সেই পাঞ্জাবী মহিলারই সন্তান।

আমার প্রশস্তির জবাবে মিঃ নাগ হাসিমুখে বললেন, আমার স্বাস্থ্যের সুখ্যাতি করছেন, কিন্তু শরীরের কোনও হাড় আমার আস্ত নয়।

মানে?

নাগ বললেন, মাংসপেশীর তলায় তলায় সমস্ত হাড় ভাঙা!—এই বলে তিনি তাঁর দুই বাহু এবং শরীর একটু মুচড়িয়ে এমন একপ্রকারের শব্দ সৃষ্টি করলেন যে, আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কেমন করে এমন হল?

কেমন করে? আমি যে আসলে মিলিটারী বিভাগের লোক! আমি ছিলুম পাইলট, প্লেন্ চালাতুম গত যুদ্ধে। নর্থ আফ্রিকায় জার্মানরা আমার প্লেনকে গুলি করে। পড়ে যাই মরুভূমির মধ্যে। প্লেন জ্বলে ওঠে। সবাই জানল আমি নেই! কিন্তু ছিলুম। কবে যেন কারা খুঁজে পেয়েছিল আমাকে। মরা মনে করেই তুলে এনেছিল! তারপর বছর খানেক আমার বডিটাকে লোহার জালে বেঁধে রাখল—যাতে না নড়ি। রাখে হরি মারে কে!—মিঃ নাগ আনন্দে হেসে উঠলেন। পরে বললেন, আসুন ঘরের ভেতর—ঠাণ্ডা পড়ছে—

এক প্রকার অভিভূত অবস্থায় তাঁর শোবার ঘরটিতে এসে বসলুম। ঘরটি ছোট, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। ইলেকট্রিক নেই লাদাখে, সুতরাং ঘর গরম রাখা যায় না। দেশে কয়লা নেই। অতিরিক্ত জ্বালানি কাঠ খরচ করা সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে অনুচিত। সুতরাং, ঠাণ্ডা ঘরই সই। এপাশে বিছানা। ওধারে সামান্য আসবাব আর মনোহারী সামগ্রী। এদিকে কাপড় চোপড় রাখা। ওখানে এটা ওটা। টেবিলের পাশে সামান্য পূজার সরঞ্জাম, এবং তার সঙ্গে একখানি ছোট পরমহংস রামকৃষ্ণের ছবি! এ যেন সব মিলিয়ে জনৈক বাসাড়ে কেরানির ঘর,—এটি অফিসারের যোগ্য নয়! আমার মূঢ় আত্মাভিমান সেই ক্ষণে এর বেশী আর কিছু দেখল না।

বোধ হয় মিঃ নাগ আমার সামনে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট ছিলেন। এবার সহজ হয়ে বসে নম্র মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, প্রথম থেকেই আমার জীবনে একটা গোলমাল ঘটেছিল। বোধ হয় মা-বাবার কাছে একটু বেশী আদর পেয়েছিলুম। ১১ বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সোজা চলে এলুম জামতাড়ায়,—১৫শ' মাইল দূরে। সেখানে এক সাধুর আশ্রমে এসে উঠলুম। উদ্দেশ্য, সন্ন্যাস নেবো!

এগারো বছর বয়সে সন্ন্যাস?

হাসিমুখে নাগ বললেন, বয়স বুঝি নি তখন,—মন বুঝতুম। বছর খানেক ছিলুম আশ্রমে। তারপর টো টো করে ঘুরে বেড়ালুম মাস ছয়েক—

মা-বাবার ওপর অভিমান ছিল?

একটুও না। বরং ভয়ানক টান ছিল দুদিক থেকে। সেই টানেই আবার একদিন ফিরে গিয়ে লেখাপড়া ধরলুম। মন ছিল না তেমন। কিন্তু কী যে হল! বছর বছর জলপানি পেয়ে চললুম এগিয়ে। একদিন এম-এ পাস করে বেরিয়ে পড়লুম আবার। হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে গেলুম কোথায় যেন। বাঁচবার একটুও আশা নেই। কখন মরব তাই অপেক্ষা করছে সবাই। এমন সময় এলেন এক স্বামীজী। অপরিচিত এক সন্ন্যাসী! জানতুম না তিনি কে। কে তাঁকে আনল! কি জন্যই বা তিনি সেই দূর দেশে এসেছিলেন। শুনেছি তিনি কি যেন সামান্য একটা ওষুধ আমাকে খাইয়ে গিয়েছিলেন! হ্যাঁ, এক মাস পরে সেরে উঠলুম। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধে গেলুম!

ঘরটি ঠাণ্ডা হচ্ছিল। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে ব্যারোমিটারে প্রায় ৪০ ডিগ্রী তাপ নেমে গেছে! আরও নামবে। বাইরে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। লেহ্ নগর নিশ্চুপ হয়ে গেছে অনেক আগে।

তারপর?

শান্তকণ্ঠে নাগ বললেন, প্লেনটি পড়ে যাবার পর প্রথম চোখ খুলেছিলুম করাচির হাসপাতালে। কিন্তু চমকিয়ে উঠেছিলুম একজনকে দেখে। তিনি সেই স্বামীজী! যার বাঁচবার কোনও আশা নেই, তার কপালে হাত রেখে তিনি বললেন, 'ভয় নেই! মায়ের আশীর্বাদ এনেছি তোমার জন্যে!'—ভাবলুম, কোথা থেকে কোথায় এই সন্ন্যাসী আমার খবর পান! কে ওঁকে পাঠায়! কেমন করে আমার খোঁজ পান? কেন উনি ধরে রয়েছেন আমাকে এমন করে? যাই হোক, সেই করাচির হাসপাতালে উনি বার তিনেক এসেছিলেন। একদিন জানলুম উনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী! শেষবারে এসে আমাকে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। এক বছর পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলুম। আমি ডাক্তারদের চোখে এক অদ্ভুত জীব। আমার শরীরের মধ্যে নাকি সবই খুচরো হাড়ের টুকরো, একটার সঙ্গে আরেকটার যোগ নেই। তবু বেঁচে রইলুম বেশ সুস্থ শরীরে। এবারও স্বামীজী আমাকে একটি ওষুধ খাইয়েছিলেন।

আমার চক্ষু মোহগ্রস্ত ছিল না। মিঃ নাগকে আমি নিরীক্ষণ করছিলুম। অলৌকিকতার প্রতি আমার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা তাঁর নেই—এটি লক্ষ্য করে

আমি খুশী হচ্ছিলুম।

এমন সময় কে একজন বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে জানাল, আমাদের আহারাদি প্রস্তুত। মিঃ নাগ বললেন, আপনি মিঃ জিৎ সিংয়ের ওখানে গিয়ে বসুন। আমিও যাচ্ছি মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলে—

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। এ বাড়িতে তাঁর মা আছেন আমি জানতুম না! কিন্তু তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, সন্ধ্যে থেকে সময় পাই নি, মাকে ডাকব! কথা না বললে উনি রাগ করেন। ওঁকে আমার সব কথাই বলি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আপনার মা এখানে আছেন আগে বলেন নি তো? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই—!

আমার প্রশ্নের উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের এক পদস্থ কর্মচারী যে কথাটি জানালেন, সেটি শুনে এই অন্ধকার নিস্তব্ধ মরুনগরী লেহ্ সহসা আমার কাছে যেন অবাস্তব মনে হল! আমি আবার বসলুম। অবিশ্বাস এবং সন্দেহ যাঁকে করব, তাঁর অমায়িক শান্ত হাস্য এবং সহজ ও স্বচ্ছ কণ্ঠ আমাকে এতক্ষণ আনন্দই দিয়েছিল! কিন্তু যখন শুনলুম, তাঁর মা হলেন অশরীরী, এবং তাঁকে ডাকামাত্রই এই ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে তিনি আবির্ভূতা হন ওমানবীয় কণ্ঠে নিজ জননীর মত মিঃ নাগের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন,—তখন আমার সর্বদেহে-মনে যে রোমাঞ্চ এবং বিচিত্র একটা উপলব্ধি দেখা দিল, সেটা যেন আমাকে কতক্ষণ স্থাণু, অনড় এবং অবশ করে বসিয়ে রাখল!

ঘরের বাইরে ভৌতিক অন্ধকারে বিশাল রণপ্রান্তর কঠিন ঠাণ্ডায় খাঁ খাঁ করছে। আধুনিক কালের সর্বপ্রকার বিজ্ঞান এবং বিচিত্র টেকনোলজির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিরাট এক মানব সমাজ অতি-বাস্তব এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে নিত্যসংগ্রামে রত! সেখানে কোনও অপ্রাকৃত, অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, ভৌতিক কিংবা যাদুকরের ভোজবাজির জায়গা নেই। যিনি এই অদ্ভুত কথাটি বলছেন তিনি একজন শাসক, সুশিক্ষিত, আমিষাহারী, গৃহী, সাহেবী-পোশাক পরিহিত—এবং যাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচী স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার অতি বাস্তব সমস্যায় নিত্য বিব্রত!

প্রশ্ন করলুম, আপনার মা কখন দেখা দেন?

স্বচ্ছকণ্ঠে নাগ বললেন, একবার দুবার রোজই আসেন। তিনি চান আমি সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকি। ঘরে নোংরা বা জঞ্জাল দেখলে তিনি রাগ করেন। তাঁরই জন্যে আমাকে বার দুই স্নান করতে হয়। সকালের দিকে আমার তাড়া থাকে, তবু পুজোয় বসলে তিনি আসেন। সন্ধ্যের দিকে মূর্তিসাহেবের ওখানে তাস খেলতে যাবার আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাই! উনি আমার সারাদিনের খবর রাখেন।

এখন উনি আসবেন ?

বিলক্ষণ! আসবেন বৈকি। এখানে সবাই জানেন ওঁর কথা।—মিঃ নাগ বললেন, আজ অবশ্য একটু দেরি হচ্ছে। চলুন, খেয়ে আসি। রাত্রে যার সঙ্গে কথা বলব!

আলোটা মৃদু। ঘরের ভিতরকার ঠাণ্ডাতেও আমার পা দুখানা যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু এক সময় গা ঝাড়া দিয়ে আবার আমি উঠলুম। পণ্ডিত মাত্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। উঠে দাঁড়ালুম এবার। ছোট ঘরখানার মধ্যে প্রায় ঠাসা আসবাবপত্র, এবং পুজোর জায়গা সেখানে সামান্যই অবশিষ্ট। ওরই মধ্যে স্বল্প আলোয় চোখে পড়ছে পরমহংস রামকৃষ্ণের ইঞ্চি ছয়েক সাইজের একখানি বাঁধানো ছবি—যে-ছবি দেখা যায় কলকাতার যে কোনও মুদি-মসলা-মনোহারি বা পানের দোকানে। আমি নিজে বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং আলো-ছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, আজগুবী, যাদুকরী এবং আগাগোড়া বিভ্রান্তিকর কাহিনীটি কি-ভাবে গ্রহণ করব, ঠিক অনুধাবন করতে পারলুম না। কেবল এই কথাটাই ভাবছিলুম, মিঃ নাগকে ঠিক যত পরিমাণেই অবিশ্বাস বা সন্দেহ করব, ঠিক তত পরিমাণেই আমি নিজের কাছে খেলো হতে থাকব। আমার এই 'বিবেক-সঙ্কট' এমন করে আর কোনও দিন দেখা দেয় নি। আমি সেই প্রথমদিন রাত্রিকাল থেকে ওঁর মুখে ইংরেজী আলাপ শোনা ইস্তক কখন কেমন করে ওঁর প্রতি একটি নিগূঢ় আকর্ষণ বোধ করছিলুম, সেইটি স্মরণ করে এক প্রকার অর্থশূন্য, উদ্‌ভ্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। মিঃ নাগও চললেন সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বাগান পেরিয়ে।

জিৎ সিং মহাশয়ের মস্ত আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত কক্ষের নৈশভোজে আমি ছিলুম অন্যকার সম্মানিত অতিথি। সিং মহাশয়ের অতি নিরীহ এবং শান্ত ও নিরভিমান লাদাখী স্ত্রী শাড়ি পরেছিলেন। তিনি স্বহস্তে সুন্দর রান্নাবান্না করে-ছিলেন—যেগুলি লাদাখ ভ্রমণকালে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু সেই রাত্রির হাসি তামাসা, গল্পগুজব এবং আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও নিজেকে যেন মূঢ়, অর্বাচীন এবং অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছিল।

ফিরবার পথে সেই রাত্রে আরও ১০ ডিগ্রি ঠাণ্ডা নেমে গিয়েছিল।

এই ঠাণ্ডারই একটি ছোট্ট কাহিনী লাদাখ ভ্রমণকালে আমাকে একটু চঞ্চল করেছিল। সেই কাহিনীটি অদূরবর্তী চীন-ভারত রণক্ষেত্র সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রাদিতে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

আমার বন্ধু পরলোকগত অধ্যাপক প্রিয়কুমার গোস্বামীর কর্মকেন্দ্র ছিল মীরাটে।

প্রাক্তন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অধিনায়ক এবং 'বন্দী জীবন'-এর প্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ভাগ্নি শ্রীমতী অমলাকে প্রিয়কুমার বিবাহ করেন। তাঁদের ছেলেটির নাম শ্যামল। শ্যামল এই লাদাখের যুদ্ধে এসেছিল।

সংবাদ যাঁরা পড়েন তাঁরাই জানেন, শীতকালের লাদাখ কী বীভৎস আকার ধারণ করে। দৌলৎবেগ-ওল্দি, গলোয়ান বা চিপচ্যাপ উপত্যকা, শিয়োকের পূর্বপার, থুর্নাক-পাংগং-ডেম্‌চক,—এসব অঞ্চলে তুষারলোকের সংগ্রাম কি প্রকার। এইরূপ একটি রণক্ষেত্রে চীন আক্রমণকালে ভারতপক্ষ একদা দিনান্তকালে যখন যুদ্ধ করতে করতেই পশ্চাদপসরণ করছিলেন, সেই সময় বহু জওয়ানদের সঙ্গে শ্যামলও আহত ও মূর্ছিত অবস্থায় ভূ-লুণ্ঠিত হয় এবং মৃত বলেই সে পরিত্যক্ত হয়। সেটি উভয় পক্ষেরই মৃত্যুলোক। দেখতে দেখতে শ্যামলের অচেতন দেহ বিপুল পরিমাণ তুষার বর্ষণের তলায় চাপা পড়ে এবং যথাসময়ে চীনপক্ষ সেই এলাকা দখল করে।

শ্যামলের মৃত্যু হয় নি। কিন্তু কখন এবং কবে তার জ্ঞান ফিরে আসে সেটি অস্পষ্ট। আঘাত ছিল তার চক্ষু ও নাকের মাঝখানে। চোখে ও মুখে তার রক্ত জমাট বাঁধে এবং দেহের রক্ত চলাচল তুষারশৈত্যের ফলে হিমকণিকায় পরিণত হতে থাকে। তৎসত্ত্বেও এই বীর বাঙালী তরুণ দুই হাতে সঙ্গোপনে তুষারের রাশি সরিয়ে মাথা তোলে। তখন দিনমান। সুতরাং সে সেই তুহিন মৃত্যুগহ্বরে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে। সন্ধ্যা সমাগমে সে সেখান থেকে উঠে কিছুদূর অবধি শত্রুর অলক্ষ্যে হাঁটবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার দুই পায়ে তুহিন-ক্ষত দেখা দেবার ফলে সে অকর্মণ্য হয়। তার বলিষ্ঠ মন ও দেহ সেই অবস্থাতেও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে চায় নি। সেই অন্ধকার তুষারপূর্ণ মৃত্যুলোকের ভিতর দিয়ে চীন প্রহরার চক্ষু এড়িয়ে সে হামাগুড়ি দিতে-দিতে ভারতীয় বেষ্টনীর দিকে অগ্রসর হয়। তখনকার ঠাণ্ডা শূন্য ডিগ্রির নিচে বিয়োগচিহ্ন ২৫ সেন্টিগ্রেডের কম হয়। এই ভাবে সমস্ত রাত চলবার পর সে যখন ভারতীয় সীমানার কাছাকাছি আসে, তখন দেখা যায় সে সরীসৃপের মতো বুক দিয়ে এগিয়ে আসছে। এদিকে এসে তার পুনরায় চৈতন্যলোপ পায়।

শ্যামলের এই অপরাজেয় লৌহপ্রতিজ্ঞা ভারতের যৌবন শক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে বলেই ভারতের রাষ্ট্রপতি তাকে সর্বোচ্চ সম্মাননায় অলঙ্কৃত করেছেন। পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে বটে, তবে তার তুষারক্ষতে পা দুটি পচে যায় বলেই দুটি পা হাঁটুর থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ডান হাতের কয়েকটি আঙুলও রক্ষা পায় নি।

ভারতীয় জওয়ানদের পক্ষে এটি নতুন গৌরবের ইতিহাস।

॥ ১৬ ॥

আধুনিক কাশ্মীর

লাদাখ থেকে বিদায় নিচ্ছিলুম।—

সেদিন প্রভাতকালে স্নানাদি ও প্রাতরাশের পর জনৈক জওয়ান এসে আমাকে নিয়ে গেল সেই তুহিন প্রান্তরে। সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। ৬টা বাজতে অনেক বাকি। দেখে নিলুম সেই প্রান্তরে ঠাণ্ডার চেহারাটা। অত ঠাণ্ডাতেও সামরিক কর্মচারীদের কোথাও কর্ম-কৃপণতা দেখছিনে। পোশাকের অন্তরালে চেনা যায় না কোনও ব্যক্তিকে, কিন্তু আমার কাগজটি পরীক্ষা করে জনৈক বিমান-অফিসার এগিয়ে এসে সপ্রতিভভাবে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, আমি চক্রবর্তী,—আমার বাড়ি কলকাতার শ্যামবাজারে। আপনাকে এখানে দেখব আশা করি নি।

হাসলুম শুধু। চক্রবর্তী বললেন, শীতে কষ্ট হচ্ছে না আপনার ?

হেসে বললুম, আর কতক্ষণই বা—?

ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স বিমানে আমি শ্রীনগরে ফিরব, সুতরাং চক্রবর্তীর একটু সহায়তা পাওয়া গেল। একটি কাগজে সই করতে হল—অর্থাৎ বিমানদুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু ঘটলে গভর্নমেণ্ট দায়ী হবেন না! আবার আমার হাসি পেল। আমাদের গভর্নমেণ্ট ভিক্ষান্নজীবী, সুতরাং আমার অপমৃত্যুর পরে তাঁরা আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য দানসাগর শ্রাদ্ধ করবেন, এমন অযথা প্রত্যাশা কেনই বা করব ? সুতরাং চোখ বুজে সই করেই বিমানে উঠলুম। চক্রবর্তী নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন। তখন অল্প রোদ উঠেছে। পাহাড়ের প্রাকার ছাড়িয়ে সূর্য উঠতে অনেকটা দেরি লাগে।

ঠিক আন্দাজ করতে পারিনে, তবে বোধ হয় লাদাখের সমতল ছাড়িয়ে ১০ থেকে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে উঠল সেই সামরিক বিমান। ছোট্ট হয়ে গেল লেহ্‌ শহর। তার চেয়েও ছোট হয়ে গেল স্তোক, পিতুক, ফিয়াং আর সেই বাদশামহল। নিচের দিকে দিগ্‌বলয়ব্যাপী বিশাল-বিস্তৃত গৈরিকবর্ণ কারাকোরম ও কুয়েনলান্‌। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উত্তরে ও দক্ষিণে মরুলোক তাকলা মাকান আর তিব্বত। জাস্কার লোহিতবর্ণ, তার উপরে ময়দানবের মতো দাঁড়িয়ে বিরাট হিমালয় প্রসারিত হয়ে

রয়েছে উত্তর-ভারতে। প্রভাত সূর্যের আলোয় সেই তুষার-কিরীটিনী ভুবনমনো-মোহিনীকে আমার দেখার দরকার ছিল।

ঠিক পৃথিবী নয়—তার কিছু উপরে যেখানে স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধিস্থল। এই সন্ধিলোকে অরণ্য-নদী-বন-কান্তার প্রভৃতির হরিৎ সৌন্দর্য নেই। সেই মায়ালোকের দ্বার এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। এ হল শুভ্রজট কালভৈরব,—দিগন্তজোড়া ধ্যানতপস্বী,—এ যেন হিংস্র, রুদ্র, 'শুষ্কবল্কলধারী বৈরাগী',—নারী-প্রাকৃতের ষড়ৈশ্বর্যশোভা যেন এখনও একে স্পর্শ করে নি। এ যেন ভারতভাগ্যবিধাতা।

বিমান ঘুরল চক্রাকারে। যেন এখানকার গগনলোকে আমার শেষ দর্শন কিছু বাকি ছিল। চক্রাকারে আরেকবার দেখে নিলুম আবহমান কালের উত্তর ভারতকে। হিন্দুকুশ, কারাকোরম, কুয়েনলান, কৈলাস,—এদের চক্রবেড়ের মধ্যাসনে ধ্যানমূর্তি দেবাদিদেব হিমালয় মহাতপস্যায় আসীন। এ যেন মণ্ডলেশ্বর মহর্ষি গৌতমের ব্রহ্মবিদ্যার আসর, তাঁকে ঘিরে বসেছে চূড়াজটধারী ঋষিবালক শিষ্যের দল। সূর্যের হোমাগ্নিকুণ্ডের আভা পড়েছে তাদের মুখচ্ছবির 'পরে।

বিমানটি চলল এবার পশ্চিমে জাস্কার ছাড়িয়ে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ দুই চূড়া নুন-কুন অতিক্রম করে। আমি ফিরে যাচ্ছি মর্ত্যলোকে।

বায়ুশীর্ণতা এক সময় ওই বিমানটির মধ্যেই আমাকে অক্সিজেনের চোঙটি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। এই বায়ুশীর্ণতা এবং প্রবল ঠাণ্ডার জন্য বিমানের কলকজা বিগড়ে যাবার ভয় থাকে; অনেক সময় বিভিন্ন সূক্ষ্ম কলকজাগুলি (mechanical apparatuses) ঠাণ্ডায় অচল এবং হিমায়িত (frozen) হয়ে যায়। এ নিয়ে অনেক দুর্বিপাক ও প্রাণহানি ঘটেছে।

বিমানপথে মাত্র একঘণ্টা। লোহিতবর্ণ পর্বতরাজ্য পার হবার ঠিক পরে হরমুখ আর ভৈরবঘাটির নিচের দিকে প্রথম দৃশ্যমান হল পাইনের গহন অরণ্যলোক। সে যেন যাদুকরের আশ্চর্য খেলা। পলকের মধ্যে সকল দারিদ্র্য ঘুচিয়ে ঐশ্বর্যে ভরে তুলল। অস্থিমালা অদৃশ্য হল, বনমল্লিকার মালা দিল ঝুলিয়ে ঋতুরাজ বসন্তের কণ্ঠে। এক সময় শ্রীনগর বিমান ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

এক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী যেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। এ যেন ছায়াবাজি, একটা মায়ামন্ত্রের খেলা। যেন বিরাট একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলুম কিছুকালের জন্য। কিন্তু সে কতকাল, মনে করতে পারি নে। সময় এবং দূরত্ব—যেন একটা চেতনামাত্র। মিলিয়ে গিয়েছিলুম যেন লক্ষ বছরের একটা কালের মধ্যে—সৃজনের কোন্ আদিপর্বে। সেই মূর্চ্ছা হঠাৎ ভাঙলো যেন যুগ-যুগান্তের পর। চোখ চেয়ে দেখলুম, সেই মরীচিকা মিলিয়ে গেছে। আবার আমার

চোখের সামনে উন্মীলিত হল হিমালয়ের সেই অরণ্য, সেই সুন্দর তৃণপুষ্পলতা-সমাকীর্ণ রূপরাজ্য,—মাত্র এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত যার অস্তিত্ব ভুলতে বসেছিলুম। ২৫ হাজারের থেকে ছিট্‌কে এসে পড়লুম ৫ হাজারে। লাদাখ প্রদেশ রয়ে গেল ১০ হাজার ফুট উঁচুতে।

অরণ্যে, ফলনে, শোভা ও সৌন্দর্যে উচ্ছলিত চতুর্দিক। বনপথে সেই ছায়াবীথি, সেই নধর মৃন্ময়তা সর্বত্র—কাশ্মীরের স্বভাব-কমনীয়তাকে প্রকাশ করছে। দিকে-দিকে অরণ্যনীল হিমালয়ের চূড়াদল আপন মহিমায় ও বিশালতায় বিরাজমান। আমি যেন কতকাল ধরে বাস করে এলুম ধূলিজটাধার উলঙ্গ সন্ন্যাসীদলের সর্বশূন্য রুক্ষ তপস্যার মরু-মরীচিকায়—এবার ফিরে এলুম আনন্দলোকের প্রাচুর্যের মধ্যে—যেখানে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী প্রকৃতি আপন ভোগবতীর রসধারায় নিত্যনবীনা। আবার ফিরে এলুম হিমালয়ের কোলে।

এবার এসে বাসা বাঁধলুম দাল হ্রদের তীরে। এটির নাম 'পার্ক হোটেল।' সামনে 'দাল', পিছনে 'তখ্‌ৎ-ই-সোলেমান' বা শঙ্করাচার্য পাহাড়। পাহাড়ের উপরে সুপ্রাচীন শিব ও শঙ্করের মন্দির। এটি স্বয়ং আচার্য শঙ্করেরই স্থাপনা। প্রাচীন কালের রাজা গোপাদিত্যের নামে, এটি ছিল 'গোপাদ্রি।'

পাড়াটা অভিজাত, এবং নিরিবিলি। হোটেলের ব্যবস্থাপনায় ইংরেজিয়ানার চেহারা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে দেশী চেহারা যাঁরা মিলিয়েছেন তাঁদের নাম 'কুণ্ডু স্পেশাল।' এঁদের এই ৩০ বছরের প্রতিষ্ঠান ভারত প্রসিদ্ধ এবং লক্ষ্য করেছি কাশ্মীরের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের চোখেও এঁরা প্রীতিভাজন। বছরে দু'তিন-বার এঁরা সম্ভ্রান্ত যাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরে আসেন, এবং প্রচুর টাকা কাশ্মীরে ঢেলে দিয়ে যান। 'কুণ্ডু স্পেশালের' খবর রাখেন স্বয়ং রাজ্যপাল ডাঃ করণ সিং।

মনে করেছিলুম আমার ভৃত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে একটু নিরিবিলিতে থাকব, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। 'পার্ক হোটেল' হয়ে উঠল একটি ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ,—যেখানে অতি সুস্বাদু রুই মাছের ঝোলের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ জম্মুর চাউলের গরম-গরম জুঁই ফুলের মতো ভাত অকৃপণভাবে পরিবেশন করা চলছে। মস্ত জলজ্যান্ত রুই মাছ ১ টাকা কিলো এবং পায়রার নখের মতো বৃহৎ সুস্বাদু চাউলের দানা কনট্রোলে সাত আনা কেজি। এবম্বিধ রামরাজত্ব সৃষ্টি করেছেন 'কুণ্ডু স্পেশালের' কর্মীরা—যাঁরা জন ষাটেক মহিলা ও পুরুষকে আত্মীয়সূত্রে বেঁধে একটি সচ্ছল গৃহস্থালী পেতে প্রায় দিবারাত্র আনন্দ কলরবে এই হোটেলকে মুখর করে রেখেছেন। এঁদের বন্ধুত্বসূত্রটি ঠিক ব্যবসায় পদ্ধতিতে বাঁধা পড়ে নি বলেই এঁরা যাত্রীদলের বিশেষ প্রিয়। ফলে হয়েছে এই, এ হোটেলের ইংরেজিয়ানাটা কনে-বৌ-এর মতো আড়ালে-আবডালে গা ঢাকা

দিয়েছে। বেশ ভালই লাগছিল।

কিন্তু আমার সময় হাতে ছিল কম। বিশ্রামের কাল আমার সীমাবদ্ধ।

সেদিন সকালের দিকে বেরিয়ে পড়লুম 'হজরৎবাল' মসজিদ অভিমুখে। পুরনো শহরের দিক দিয়ে এই মসজিদের প্রবেশ পথ। পাশ দিয়ে চলে গেছে গান্ধারবল যাবার প্রাচীন সড়ক,—এধার দিয়ে 'ক্ষীরভবানী।' ওটা থেকে বেরিয়ে ক্ষেতখামার আর পাহাড়তলীর ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে গেলে 'মানসবলের' সেই নিভৃত মায়াকানন এবং সামনের বিস্তৃত জলাশয়টির উপর রক্তশতদলের সেই আশ্চর্য সমারোহ।

হজরৎবাল মসজিদের প্রধান প্রবেশপথটি দাল হ্রদের তীরে। যদি কেউ 'শিকারায়' বসে এই মসজিদটিকে দর্শন করে, তবে তার কাশ্মীর ভ্রমণ সার্থক। এর নির্মাণকলায় মোগল স্থাপত্যের যে-আভিজাত্য, শিল্পকুশলতা ও বিশালতার যে-মহিমাটিকে ধরা আছে, সেটির তুলনা না আছে ভারতে, না বা আছে পাকিস্তানে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি আহমেদাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, আজমের—এদের সকলকে ধরেই বলছি। হজরৎবাল মসজিদটি নির্মাণ করেন সম্রাট শাহ্‌জাহান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ ততদিনে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দ ও বুখারার স্থাপত্যকলার ভাবনা ভারতীয় স্থাপত্যের ভাবনার সঙ্গে মিলে একটি সংহতি সৃষ্টি করেছে। এই মসজিদের ভিতরে ও বাইরে পাথরের কাজ, এর খিলান, গঠনভঙ্গী এবং এর বিবিধ প্রকার জাফরি ও সর্বোপরি এর প্রকাশভঙ্গীটি দর্শক মাত্রকেই আনন্দে অভিভূত করে। এ মসজিদ একটি বিস্তৃত এলাকা নিয়ে নির্মিত। কিন্তু দাল হ্রদের দিকে এর শোভা বর্ধনের জন্য যে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানটি রচনা করা আছে সেটি মনোরম। সেখানে চেনার-পাইন এবং ওক-আখরোট বৃক্ষশ্রেণী সৃষ্টির দ্বারা সমস্তটাকে অতুলনীয় করে তোলা হয়েছে। দাল হ্রদের তীরস্থ বারান্দা, প্রাঙ্গণ ও সোপান-শ্রেণী—সব মিলিয়ে সম্রাটের সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে মোগল যুগই হল কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ। কাশ্মীরকে ভূস্বর্গে পরিণত করেন শাহ্‌জাহানের পিতা শৌখীন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁর পিতা সম্রাট আকবর কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে যে নূতন ও কল্যাণজনক প্রশাসন ব্যবস্থার পত্তন করেন, তার ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত।

হজরৎবাল মসজিদের পিছন দিককার প্রবেশপথটি পুরনো শহরের দিকে খোলা। এদিকটা অপরিচ্ছন্ন। আশেপাশে এঁটোকাঁটা, নোংরা নর্দমা, দু'চারটে দোকানদানি, ভিখারী বৈরাগীর আনাগোনা, তার ওধারে গরীব গৃহস্থালী ঘরকন্না। এই পুণ্য-তীর্থের গায়ে-গায়ে এগুলি না থাকলেই বোধ হয় ভাল হত। এদেরই ভিতর দিয়ে মূল মসজিদের বারান্দায় গিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। এর পরে সবই পরিচ্ছন্ন এবং

আগাগোড়া সমস্তই চিত্তাকর্ষক।

সামনেই একটি আলো জ্বলছে। তার নীচে একটি চাঁদার বাক্স। দুটি টাকা ওই বাক্সটির মধ্যে ফেলে দিয়ে মস্ত দরজা পেরিয়ে মূল্যবান কার্পেট মোড়া এবং সুসজ্জিত বৃহৎ নমাজ-কক্ষটির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইতিমধ্যে পাঁচ ছয় জন দর্শনার্থী ওখানে প্রবেশ করেছিল।

মুসলমান জগতের চক্ষে এই মসজিদ অতিশয় প্রধান একটি পুণ্যতীর্থ। আমার সঠিক জানা নেই, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক ধর্মপরায়ণ মুসলমান হজরৎ মহম্মদের পবিত্র কয়েকগাছি মাথার চুল ভারতে নিয়ে আসেন, এবং সেই পবিত্র কেশগুচ্ছ রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে তৎকালের এই নবনির্মিত মসজিদে স্থাপনা করা হয়। শুধু ভারত বা কাশ্মীর নয়, প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যেখানে যত মুসলমান আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চোখে এই মসজিদ বা কাশ্মীরভূমি পরম পবিত্র ও আরাধ্য।

এই বৃহৎ ও সুচিত্রিত কক্ষটি সর্বদা পুষ্পগন্ধে, ধূপে এবং চুয়াচন্দনে আমোদিত। এটি ভাবতে সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয় যে, যাঁর কেশগুচ্ছ এখানে সুরক্ষিত, তিনি গৌতম বুদ্ধ এবং যীশুখৃষ্টের ন্যায় পৃথিবীতে একটি সম্পূর্ণ নূতন দর্শনসম্মত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন এবং যেটির অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রগতি এবং মানবতাবাদ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর এক সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে অদ্যাবধি অনুপ্রাণিত করে চলেছে। পণ্ডিতরা বলেন, ইসলাম-সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় হল তার প্রাণশক্তি। জাতি-শ্রেণী-সমাজ নির্বিশেষে সে গ্রহণ করে, কিন্তু বর্জন করে না। সেই কারণে তার বিজয়যাত্রা-পথের শেষ আজও হয় নি। ইসলামের এই প্রগতিবাদ খৃষ্টান সভ্যতাকেও অনেকক্ষেত্রে হার মানিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আলোচনায় আমার অধিকার কম।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ প্রান্তে পয়গম্বরের এই পবিত্র কেশগুচ্ছ দুর্ভাগ্য-ক্রমে কয়েকদিনের জন্য অদৃশ্য হয়। এই ঘটনায় কেবল ভারত ও পাকিস্তান নয়, সমগ্র পৃথিবী হায়-হায় করে উঠেছিল। এত বড় অন্যায় কাদের হাতে ঘটে, এবং কারাই বা সঙ্গোপনে পুনরায় সেই পবিত্র কেশগুচ্ছ যথাস্থানে রেখে দিয়ে যায়,—এ রহস্যটি অদ্যাবধি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে ধরা পড়েন কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান, এবং তাঁদের পিছনে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমান যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও পরিচয় পাওয়া যায় আভাসে ও অনুমানে। অতঃপর একান্ত সৌজন্য ও শালীনতাবশত তৎকালীন নেহরু গভর্ণমেণ্ট বা কাশ্মীরের রাজ্য সরকার এটি নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে চান নি। অনেকের ধারণা, এই দুঃসংবাদটি

পাওয়ামাত্র প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে হৃদরোগে প্রথম আক্রান্ত হন। এই সময় প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান বোধ করি সহজভাবেই একটি কথা বলেছিলেন যে, 'মুসলমান কখনও এ কাজ করতে পারে না',—(স্টেট্‌স্‌ম্যান, ৫।১।৬৪), কিন্তু তাঁর বক্তব্যটি ঠিক বুঝতে না পেরে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত খুলনা শহরের প্রায় ২০ হাজারের একটি জনতা উন্মত্তভাবে হিন্দু নাগরিকদের উপর আক্রমণ করে, এবং ক্রমে সেই আক্রমণ একটির পর একটি ঘটতে থাকে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এটি আমার আলোচ্য নয়। বিস্ময়ের কথা এই, যে-মুসলমান বীর বাঙ্গালীর দল পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সাধারণকে রক্ষা করার জন্য এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নরহন্তাদের নিকট আত্মাহুতি দিয়েছিল, তাঁদের শোচনীয় অপমৃত্যুর সম্বন্ধে একটি মাত্র বাক্যও উচ্চারণ করেন নি ভারতের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ—যাঁদের অনেকে দিল্লীর ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারী এবং যাঁদের কারও কারও বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানে। তৎকালে এইরূপ সমবেদনা প্রকাশ করাটা তাঁদের পক্ষে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ হত কিনা আমি জানি নে। কিন্তু এটি অনুমান করা কঠিন নয়, পূর্বোক্ত প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালী মুসলমানের এই আত্মাহুতির কাহিনীটি বাঙ্গালীর একালের কদর্য ইতিহাসের মধ্যেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কক্ষের শেষ প্রান্তে ডান দিকে হেঁট হলে একটি ক্ষুদ্র গুহাকক্ষ (vault) দেখতে পাওয়া যায়। এটি কাঠের ফ্রেম ও কাঁচ দিয়ে ঢাকা। আগাগোড়া তালা-চাবি বন্ধ। এরই ভিতরে অপর একটি স্ফটিকাধারে পবিত্র কেশগুচ্ছটি পরম যত্নে সুরক্ষিত এবং অ-দৃশ্যমান অবস্থায় থাকে। এটির জন্য পাহারা মোতায়েন রাখা হয় দিবারাত্র। ঘটনার দিন রাত্রে শ্রীনগরে ছিল শীতকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রবল তুষারপাত। বিস্ময়ের কথা এই, সেই রাত্রে 'অতিশয় ঠাণ্ডার জন্য' এই কক্ষের প্রহরীরা (মাত্র সেই রাত্রির জন্যই) অনুপস্থিত ছিল। এখানে বলা যায়, কাশ্মীরের ধর্মীয় ট্রাস্টের সভাপতি হলেন শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। কিন্তু ঘটনার কালে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন এবং সেই ঘটনার ১৩ সপ্তাহ পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

জনৈক অতি ভদ্র ও মিষ্টভাষী মোল্লা ওই গুহাকক্ষটির অগ্রভাগে তত্ত্বাবধান করছিলেন। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আগাগোড়া সমস্তটাই 'পর্মাত্মার' ইচ্ছা, সেখানে আমাদের কোনও হাত নেই! কোন্ দুশমন এই পবিত্র বস্তু অপহরণ করেছিল, এবং কবে কেমন করেই বা এটি আবার স্বস্থানে রেখে চুপি চুপি চলে গেল,—এ কেউ দেখে নি বা কেউ জানে নি। এ শুধু জানেন সেই 'পর্মাত্মা।'

অপহরণটি বুঝি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারীর সতর্ক চক্ষুর উপর দিয়ে অপহৃত পবিত্র

কেশগুচ্ছের অতি সঙ্গোপন পুনঃস্থাপনা—এটি কেমন ক'রে সম্ভব,—আমার এই উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে মোল্লার স্বর্গীয় দুটি চক্ষে যেন একটি দিব্যভাব দেখা দিল। তিনি শান্ত ও নম্রকণ্ঠে বললেন, 'পর্মাত্মা কি লীলা।'

কক্ষের মধ্যে সশস্ত্র পাহারা আনাগোনা করছে এখন দিবারাত্র। কিন্তু দর্শনার্থী-গণের পক্ষে পবিত্র কেশগুচ্ছ দর্শন করা এখন সম্ভব নয়। প্রতি বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে তীর্থযাত্রীরা এটি দর্শন করতে পারেন। আমার অপর একটি প্রশ্নের জবাবে মোল্লা বললেন, বক্সী আবদুল রসিদ নামক এক ব্যক্তিকে এজন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে তিনি বক্সী গোলাম মহম্মদের সহোদর নন। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।

মোল্লা পুনরায় তাঁর দুই চক্ষু উলটিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন, পর্মাত্মা জানে! ইন্সানকো গিয়ান থোড়ি হুঁ।

কাশ্মীরের অধিকাংশ মুসলমান হলেন প্রাক্তন বর্ণহিন্দু। অদ্যাবধি তাঁরা প্রাচীন সংস্কার এবং অধ্যাত্ম অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সেই কারণে তাঁরা 'আল্লাহ' শব্দটির পরিবর্তে 'পরমাত্মা' শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন।

সে যাই হোক, এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরে কাশ্মীরের মুসলমান জনসাধারণ প্রাক্তন 'প্রধান' মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করে এবং তাঁর নিজস্ব দুটি সিনেমা চিত্রগৃহসহ কয়েকটি ভূ-সম্পত্তিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বক্সী গোলাম সপরিবারে আত্মরক্ষার জন্য শ্রীনগর ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্টের তদন্তের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি কাশ্মীরের ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অন্যতম অধিনায়ক। কিছুদিন আগে ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্স ভারতের জাতীয় কন্গ্রেসে আত্ম-অবলোপ (merge) সাধন করেছে! এর জন্য বক্সীর ভাগ্যে কি প্রকার বকশিস মিলতে পারে, এখনও কেউ জানে না।

বক্সীজি অসাধু ব্যক্তি কি না সে-বিচার করবেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু একালে ভারত ভাগ্য বিধাতার মারাত্মক বিদ্রুপ হ'ল এই, যাঁরা যোগ্যতম দেশ-সংগঠক, তাঁদের বিরুদ্ধেই আসছে অসাধুতার অভিযোগ। তাঁদের অনেকের নামই অপ্রকাশিত। কিন্তু যাঁরা সুপ্রচারিত, তাঁরা হলেন সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ, বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক, বক্সী গোলাম মহম্মদ ইত্যাদি। পণ্ডিত নেহরু এঁদের অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মশক্তিকে মৃত্যুকাল অবধি স্বীকার ক'রে গেছেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণে এঁরা অন্যান্যের বিদ্বেষভাজন হয়ে উঠেছিলেন কি না, সেটি ভারতবাসীরা কেউ জানে না।

পার্ক হোটেলের ঠিক সামনেই দাল হ্রদে একটি 'শিকারা' ভেসে চলেছে ধীরে

ধীরে। ওরই মধ্যে গদিয়ান হয়ে পড়ে ছিলুম। সূর্যাস্তের কিছু বিলম্ব ছিল।

যে-ছোকরাটি শিকারার ডগায় ব'সে গুনগুনিয়ে গান ধরেছে, সে হল 'দেম্বহজ্' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। উলার হ্রদের নৌকা যারা চালায় তাদেরকে বলা হয় 'গারিহজ্' সম্প্রদায়। সমগ্র কাশ্মীরে প্রকৃতপক্ষে ২০।২২টি বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায় বর্তমান, এবং তাদের মধ্যে ভারতীয় হিন্দুসমাজের মতো জাতি ও শ্রেণী বিচার, বর্ণবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা এবং উচ্চনীচ মনোভাব বর্তমান। কিন্তু সেক্ষেত্রে বর্তমান কাশ্মীরের হিন্দু সাধারণ মাত্র একটি সম্প্রদায়। তারা হ'ল পণ্ডিত। তারা বর্ণশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছাড়া হিন্দুদের ভিন্ন গোষ্ঠী বর্তমান কাশ্মীরে নেই। ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও এ ব্যাপারে কাশ্মীর ভারতের বিপরীত। কাশ্মীরের যাঁরা 'বর্ণশ্রেষ্ঠ' মুসলমান হতে চেয়েছেন তাঁরা নিজেদেরকে ভাগ করতে চেয়েছেন চার ভাগে। অর্থাৎ শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। কিন্তু এঁরাই আবার কয়েকটি সম্প্রদায়কে 'ছোট জাতে' পরিণত করে রেখেছেন, যেমন অশ্বপালকরা হ'ল একালের 'হরিজন'— যাদেরকে বলা হয় 'গল্লাওয়ান।' এরা ছিল এককালের অতি দুর্ধর্ষ জাতি—যখন এদের নাম ছিল 'চাক'। এদেরই শক্তিশালী রাজার নিকট সম্রাট আকবরের সৈন্য-বাহিনী তিনবার পরাজিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। যাঁরা পহলগাঁও জনপদে গিয়ে 'গল্লাওয়ানদের' পূর্বগৌরবের কাহিনী মন দিয়ে শুনেছেন, তাঁরাই জানেন এদের গর্বিত মুখভঙ্গী! শেখ এবং সৈয়দ সম্প্রদায় যাদেরকে 'ছোট জাত' বলেন, তারা হ'ল কাশ্মীরের ফল-ফুল-সব্জি ও মাছ-মাংস বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, মেষপালক, মাঝিমাল্লা, গায়েন (minstrel), মুচি, ঝাড়ুদার ও চাকর-বাকর। যারা দেহাতে চৌকিদারি করে, বা খানসামা, পাহারাদার,—তাদের নাম 'ডুম', তারাও 'ইতর' শ্রেণীভুক্ত। যারা যাযাবর বা জিপসি, যারা নাগরিক জীবনযাত্রার ধার ধারে না,— তাদেরকে বলা হয় 'বাতাল'। বাতালী মেয়েরা কাশ্মীরের প্রকৃত সুন্দরী বলে খ্যাত। সবশেষে আছে অপর একটি দল, তাদের নাম 'ভাঁড়'। এরা পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ 'গোপাল ভাঁড়েরই' সমগোত্রীয়। এরা নাচ-গান-অভিনয়-কৌতুক এবং বিবিধ রঙ্গরস নিয়ে থাকে।

'বর্ণ' মুসলমানদের শ্রেষ্ঠাংশ হল 'শেখ' সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে শিক্ষিত, পণ্ডিত, শিক্ষক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং কাশ্মীরের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর। এঁরা পাঠান এবং মোগল আমলে ধর্মান্তরিত হন্। পাঠান আমলে প্রাণরক্ষার জন্য এবং মোগল আমলে আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এঁরা ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হ'ন। শেখ এবং সৈয়দ পরিবারে এখনও বহু বর্ণহিন্দু তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান। শুনতে পাওয়া যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর সঙ্গে শেখ

মহম্মদ আবদুল্লার একটি সুদূরবর্তী আত্মীয়তা আছে। সে যাই হোক, কাশ্মীরের সৈয়দ সম্প্রদায়ের অবস্থা বেশ ভাল। এঁদের হাতে অধিকাংশ কাজ কারবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। অন্যপক্ষে এঁরাই রক্ষণশীল মুসলমান এবং কাশ্মীরের ধর্মগুরু। এঁদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি দুই গোষ্ঠী চিরকাল ধরে পারস্পরিক বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ইসলামের ব্যাখ্যা উভয়ের মধ্যে মেলে নি কোনওদিন। শিয়া মুসলমানগণ কাশ্মীরের ধনপতি, যদিও তাঁরা সুন্নি অপেক্ষা সংখ্যায় কম। কাশ্মীরের কুটীরশিল্প এঁদের হাতেই সমৃদ্ধ। কাশ্মীরী শাল বলতে যে সামগ্রী বুঝতে পারা যেত, তার মালমসলা অধিকাংশই কাশ্মীরের নয়,—যেমন ভাল পশম ও পশমিনা বরাবর এসেছে তিব্বতের চানথান, সিনকিয়াংয়ের ইয়ারকন্দ, কাশগড় বা খোতান এবং লাদাখের বিভিন্ন জনপদ থেকে। এখন লাদাখের নিজস্ব সরবরাহ কম এবং কাশ্মীরী শালের মধ্যে ভেজাল ঢুকেছে প্রচুর। সুতরাং সেদিন আর নেই। পশমিনা শাল ব'লে কাশ্মীরে যেটি কিনতে পাওয়া যায়, সেটির কতটা অংশ প্রকৃত পশমিনা,—এটি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হয়! ইদানীং এই সকল ব্যবসা বাণিজ্যে ঢুকেছে পাঞ্জাবী রাজপুত, ভাটিয়া মারোয়াড়ী ইত্যাদি। শ্রীনগরের বাজার এখন বড় হয়েছে অনেক এবং সুলভ বা সস্তা বলতে এখন আর বিশেষ কিছু নেই।

কাশ্মীরের রেশম ব্যবসায়টি আধুনিককালে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই উৎপাদনশিল্প কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের আয়ত্তাধীন। কাশ্মীরের নিজস্ব গুটিপোকার চাষ, তার থেকে রেশমী সামগ্রী-উৎপাদনের জন্য সুবৃহৎ কলকারখানা ইত্যাদি টুরিস্টদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু এই গুটিপোকার চাষ কাশ্মীরে প্রথম আরম্ভ হয় মোগল আমলের আগে পাঠান অধিকারের কালে। সিনকিয়াং-এর অন্তর্গত কাশগড় জনপদের তদানীন্তন শাসক মীর্জা হাইদার মধ্য এশিয়ার ইসলাম-সংস্কৃতির কেন্দ্র বুখারা নগরী থেকে মাত্র '১ ছটাক' গুটিপোকার ডিম কাশ্মীর শাসকের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেন এবং তারই সঙ্গে এই ডিমগুলি ফোটাবার অন্যান্য নির্দেশ থাকে। এরপর মোগল আমলে এবং পরবর্তী দুরানি অধিকারের যুগে এই রেশম শিল্পের এক প্রকার অবলুপ্তি ঘটে।

কিন্তু আধুনিক কাশ্মীরী রেশম শিল্পের যে বিপুল সমৃদ্ধি আজ দেখা যাচ্ছে তার জনক হলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী। এঁর নাম নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। মহারাজা গুলাব সিংয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহারাজা রণবীর সিং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। কলকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে তৎকালে নীলাম্বর বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর বাড়ি ছিল হেদুয়ায় (আধুনিক আজাদ হিন্দ্ বাগ) ঠিক উত্তরে বিডন স্ট্রীটের

উপর। তিনি ছিলেন জজ এবং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। স্পষ্টতঃ, তদানীন্তন বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের রাজধানী কলকাতার এই বিশিষ্ট নাগরিককে কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই নিয়োগের পর থেকেই আধুনিক কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আরম্ভ হয়। কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি থাকাকালেই তিনি মহারাজার প্রধানতম মন্ত্রণাদাতা ও উপদেষ্টা নির্বাচিত হন এবং তিনি কাশ্মীরে প্রথম আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর হাতে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং তিনি আধুনিক স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র, কারিগরীবিদ্যা, পূর্তবিভাগ, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি একটির পর একটি চালু করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং চিকিৎসা বিদ্যা—তাঁরই সৃষ্টি। শ্রীনগরের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র "মাহুরা পাওয়ার হাউস"—যেটি উপজাতীয় পাঠান আক্রমণকারীরা সাময়িককালের জন্য অকর্মণ্য ক'রে দিয়েছিল (২৪ অক্টোবর, ১৯৪৭), সেটি নীলাম্বরের পরিকল্পিত 'জলবিদ্যু' কারখানা! এ ছাড়া তিনি একটি 'অনুবাদ কেন্দ্র' স্থাপন করেছিলেন শ্রীনগরে। সেখানে ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের বই—সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থ ও সমাজনীতি এবং প্রশাসন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদি কাশ্মীরী ভাষায় তিনি অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁরই আমলে বহু সংখ্যক বাঙালী পরিবার—অধ্যাপক, শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী গিয়ে কাশ্মীরে বসবাস আরম্ভ করেন। বাঙলা দেশে কাশ্মীরকে সুপরিচিত করার কাজে তাঁর অবদান অনেকখানি।

এর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাশ্মীররাজ্যের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য রেশম শিল্পের প্রতি মনোযোগ দেন। যে রেশম শিল্পের এক প্রকার অবলুপ্তি ঘটেছিল, তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা পান। সর্বাগ্রে এই শিল্পটিকে তিনি কাশ্মীররাজ্যের একচেটিয়া দখলে আনেন (১৮৭১), এবং কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি থাকা সত্ত্বেও তিনি রেশম শিল্প বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেন। এই বৃহৎ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা থেকে মোট ২২ জন গুটিরেশম বিশেষজ্ঞকে কাশ্মীরে নিয়ে যান এবং তাঁদেরই সর্বাঙ্গীন তত্ত্বাবধানে গুটিপোকার বিজ্ঞানসম্মত প্রজনন, চাষ, (Sericulture) প্রতিপালন, গুটি থেকে রেশম নিষ্কাশন ও সূত্রকরণ (filature and reeling) প্রভৃতি বিভিন্ন সূক্ষ্ম কাজগুলি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। কালক্রমে তাঁরই চেষ্টায় এই শিল্পটি প্রচুর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং এইটির জন্যই বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবার কাশ্মীরে একটি উপনিবেশ গ'ড়ে তোলেন। কিন্তু সর্বাধুনিক কাল চিরদিনই

একটু অকৃতজ্ঞ, সেই কারণে কাশ্মীরের রেশম শিল্পটির এই বিপুল সমৃদ্ধির কালেও নীলাম্বরের নামের উল্লেখ সহসা কোথাও দেখি নে। শুধু তাই নয়, স্থায়ী বাঙ্গালী পরিবার যাঁরা কাশ্মীরে এতকাল ছিলেন, একে একে তাঁরা প্রায় সকলেই কাশ্মীর ত্যাগ করেছেন। কাশ্মীরে এখন সমস্থায়ী বাঙ্গালীর একটি জনতা দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা ভারত সরকারের অথবা তাঁদের সামরিক বিভাগের কর্মী। ভিন্নতর ক্ষেত্রেও দু'চারজন বাঙ্গালী এখনও আছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে গিয়ে কাশ্মীরে কোথাও জায়গা-জমি কিনে কেউ বসবাস করবেন, সেটি বর্তমানে আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু যে কোনও কাশ্মীরী ভারতের যে কোনও রাজ্যে গিয়ে জমি-জায়গা কিনতে পারেন। কাশ্মীরে এই ধরনের অসঙ্গতি পদে পদেই দেখতে পাওয়া যায়। 'আজাদ কাশ্মীর' বেতারে ভারতবিরোধী প্রচার চলছে প্রায় দিবারাত্রই এবং শুনছে না এমন লোকও কম,—কিন্তু কর্তৃপক্ষ দিব্য উদাসীন। কাশ্মীরে বসে বেতার সঙ্গীত যারা শোনে, তারা 'আজাদ কাশ্মীর' আগে ধরে! কাশ্মীরে 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো' নেই, আছে 'কাশ্মীর রেডিয়ো'। এই ধরনের আরও অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। দিল্লীতে ব'সে বলছি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু আচরণে প্রকাশ করছি কাশ্মীর ও ভারত পৃথক! ভারতের এই আত্মপ্রত্যয়হীন দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪) রাজনীতির দিক থেকে কাশ্মীরের ক্ষতি করেছে অনেক। কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্ট প্রথম থেকেই সততাবাদী হ'তে চেয়েছিলেন কিন্তু নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ্ হ'তে চান নি। ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ: কাশ্মীরে যেতে গেলে একটি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা কিছু-কাল আগেও চলিত ছিল। বর্তমানে সেই হাস্যকর নিয়মটি উঠে গেছে।

'আজাদ কাশ্মীর' গভর্নমেণ্টের রাজধানী কোথায় আমি জানিনে। কিন্তু স্বাধীন কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বা পাকিস্তানভুক্তি—এই প্রশ্নের মীমাংসা হবার আগেই (২২ অক্টোবর, ১৯৪৭) সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম পশ্চিম কাশ্মীরের 'পুঞ্চ' (বর্তমানে ভারতভুক্ত) জনপদে একটি ঘরভাড়া নেন এবং সেই ঘরটির নাম হয় 'আজাদ কাশ্মীর সরকার।' সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় ছিল এই, অব্যবস্থিতচিত্ত মহারাজা হরি সিং যখন কোনও সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে 'স্থিতাবস্থা চুক্তিতে' আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তখন সহসা একদিন এই 'আজাদ কাশ্মীর সরকার' গঠনের সংবাদটি প্রচার করেন পাকিস্তান রেডিয়ো। 'আজাদ কাশ্মীর' সরকার প্রত্যক্ষ-ভাবে যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা—শেখ আবদুল্লা, গোলাম সাদিক, বক্সী গোলাম, মাসুদ, ফারুকি, মীর্জা আফজল প্রভৃতির অতি পরিচিত এবং আত্মীয়-কুটুম্বস্থানীয় ব্যক্তি! স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়, 'আজাদ কাশ্মীর সরকার' গঠনের প্রারম্ভে শেখ

আবদুল্লার দলের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করেছে অনেকখানি। ফলে 'আজাদ কাশ্মীর' বেতার সংবাদটি যাঁরা শোনেন, তাঁরাই জানেন, এঁরা ভারত গভর্নমেন্টকে যত না কটূক্তি করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী গালি দেন গোলাম সাদিক বা বক্সী গোলামকে! কিন্তু সে যাই হোক, 'আজাদ কাশ্মীর' বেতার মাঝে মাঝে অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাদিও পরিবেশন করে থাকেন। 'কাশ্মীর রেডিয়ো' কাশ্মীরে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

এবার শ্রীনগরের চেহারা দেখছি একটু অন্য রকম (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪)। সাময়িক পত্রাদি বেড়েছে অনেক। বাইরে থেকে এসেছে বহু কাজ কারবারের লোক। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বিপণি ও বেসাতি প্রচুর বেড়েছে। ভিখারীর সংখ্যা এবার এত কম, আগে ভাবি নি। শিখ বা পাঞ্জাবীরা খাবারের দোকান দিয়েছে সংখ্যাতীত। অজস্র যানবাহন। মোটর ও বাস অবিশ্রান্ত। চারদিকে পাকা ইমারত নির্মাণ চলছে; বড় বড় দোকান বসে গেছে তাদের নীচে। দেড় টাকা আপেলের কিলো। দু টাকা আঙুরের। একদা খাঁটি ঘি ছাড়া খাবার ছিল না। এখন বনস্পতি ঘি-এর থৈথৈকার। শ্রীনগরে ছয় আনা প্লেট ছিল ঘৃতপক্ব ফাউল-কারি, এখন দু টাকা। চার আনার দুধ ৮৭ পয়সা। হোটেলের দু টাকার ঘর এখন ৬ বা ৮ টাকা। কিন্তু জ্যান্ত রুই মাছ যখন শুনলাম ১ টাকা কিলো, তখন 'কুণ্ডু স্পেশালের' রান্নাঘর ছাড়তে আর মন উঠল না!

॥ ১৭ ॥

শ্রীনগরের পরিবেশ

শ্রীনগর এলাকার বাইরে গিয়ে পড়লেই গ্রামীণ কাশ্মীর, এবং দুইয়ের ভিতরকার পার্থক্য অপরিসীম। গ্রামের লোকেরা নিরুৎসুক ও বিরাগী। থাকে শুধু নিজেদেরকে নিয়ে। চাষ করে, পশম বোনে, ভেড়া-ছাগল রাখে, ফলের বাগান দেখে এবং সব্জির খামার নিয়ে থাকে। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলে কম। কিন্তু চাহনি দেখলে মনে হয় ওদের পেটে যেন অনেক কথা আছে। ভারতের সঙ্গে ওদের আজও তেমন পরিচয় ঘটেনি বলেই ওরা ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তাকায়।

মোগল এবং পাঠানদের সঙ্গে ওরা ঘর করেছে বহুকাল। জাতধর্ম খুইয়েছে, ঘরের মেয়েকে দিয়েছে, জায়গা-জমি দিয়ে তাদেরকে ধরেও রেখেছে। ওরা বোধ হয় জানে, প্রতি একশ' বছরে একবার ক'রে ওদের রাজশক্তি বদলায়, ধন সম্পত্তি লুট হয়, ওরা মারধর খায়, দেশে আগুন জ্বলে এবং দস্যুর দল ছুটে আসে। পাঠান থেকে মোগল, মোগল থেকে আবার পাঠান, তারপর শিখ এবং তারপর ডোগরা। একশ' বছর ধ'রে ডোগরা-ইংরেজ একজোট হয়ে ওদেরকে নিরাপদ রেখেছিল মাত্র। তারপর আবার এল নতুন বিপর্যয়।

ডোগরা-ইংরেজ জোট ওদেরকে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে মিলতে দেয় নি। জাতীয়তাবাদী ভারতকে ওরা চোখে দেখে নি এবং তাদের খবরও পায় নি। ওরা ওই পার্বত্য প্রাকারের আড়ালে বসে কেবল জেনে এসেছে প্রজাসাধারণ মানেই দরিদ্রনারায়ণ এবং মাথার উপরকার রাজশক্তি মানেই প্রবলপ্রতাপ এবং ধনকুবের। সেই ধনের উপর তাদের তিলমাত্র অধিকার নেই।

শ্রীনগর এলাকার বাইরে এখন কাশ্মীরী হিন্দুর সংখ্যা একেবারেই কম। প্রতি ১০ জনে হয়ত ১ জন মাত্র। কিন্তু মুসলমান আছে ৩ প্রকার। মোগল, পাঠান এবং কাশ্মীরি মুসলীম। মোগলরা প্রখর বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত, পাঠানরা হুজুগ-প্রিয় এবং চটুল, কাশ্মীরী মুসলীমরা শান্ত, এবং নির্বিরোধ। শেষের এরাই হিন্দু-পণ্ডিতদের সঙ্গে গায়ে গায়ে মিলিয়ে থাকে। কাশ্মীরে যখনই কোনও গণ্ডগোল বেধে ওঠে, তখন হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে কাশ্মীরী মুসলীমরা একাকার হয়ে যায়। কেন যায় সেটি প্রাচীন ইতিহাসের ভাষ্য। কিন্তু এই কারণটির জন্যই কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দানা বাঁধে না। শ্রীনগর এলাকায় এখন পণ্ডিত পরিবার

মোট ৮ হাজার এবং তাদের জনসংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ হাজার।

শ্রীনগর এলাকায় এবং পশ্চিম ও উত্তর কাশ্মীরে—বিশেষ ক'রে পশ্চিম পীর পাঞ্জালের দুই পারে—পাঠানের সংখ্যা প্রচুর। এদের আদি বাড়ি হাজারা, পূর্ব আফগানিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ বা সোয়াৎ কোহিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে। এদের কোনও দল পাখতুন, কোনও দল বা আফগান। শাহমীর থেকে জয়নুল আবেদিনের কাল পর্যন্ত এরা অল্পে অল্পে এসে ঢুকেছে কাশ্মীরে। মোগল আমলে আফগানিস্তান থেকে এসেছে প্রচুর। তারপর কাবুলের নাদির শাহ্ থেকে দোস্ত মহম্মদের কাশ্মীরি রাজত্বকালের ৮০ বছরের শত শত পাঠান পরিবার এসে কাশ্মীরে উপনিবেশ গড়েছে। যাদেরকে আজ আমরা 'উপজাতীয় পাঠান' বলে জানি, তাদেরই হাজার হাজার পূর্বপুরুষ ছড়িয়ে আছে কাশ্মীরের সর্বত্র—বিশেষ ক'রে পশ্চিমে এবং উত্তরে। আজ যে 'উপজাতীয়' পাঠানরা মাঝে মাঝে ছটুকিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে 'যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা' ছাড়িয়ে সমতল কাশ্মীরে ঢুকে পড়ছে, এর অনেক কারণের মধ্যে একটি হ'ল, 'জলের চেয়ে রক্ত ঘনতর।' তারা যদি কাশ্মীরী পাঠানদের বাড়ি-বাড়ি ঢুকে আত্মগোপন করে তাহলে সহজে তাদের চেনা যায় না। আসামের অন্তর্গত কাছাড়ের সমস্যাও প্রায় একই প্রকার। কাশ্মীরের অর্থনীতিক উন্নতি যতই ঘটবে, এ সমস্যা ততই বাড়তে থাকবে ব'লে মনে হয়। চতুর্থ যোজনার ২০ হাজার কোটি টাকার ঢক্কানিনাদ ভারতের পাড়া-প্রতিবেশী মহলকে বোধ করি স্থির থাকতে দিচ্ছে না।

বিগত ১৯৬১ সালের ৩০ জুলাই তারিখে কলকাতার ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত রণদেব চৌধুরী মহাশয়-সহ পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বিশেষ একটি কারণে গিয়ে দেখা করি। পণ্ডিতজী বলেছিলেন, 'infiltration-এর মূল কারণ অর্থনীতিক। ইতিহাসও বলে, ক্ষুধার তাড়না। উদ্দেশ্য—অন্নবস্ত্র আর কর্মসংস্থান। রাজনীতি আর পরের কথা।' তাঁর কথাটি শুনতে ভাল লেগেছিল।

ইংরেজ ও ডোগরারাজের যুক্ত আমলে (১৮৪৬—১৯৪৭) একশ' বছরের মধ্যে পাঠানদের অর্থনীতিক জীবনযাত্রার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। অসন্তুষ্ট হাজারা ও পাখতুন-পাঠানরা একালের পাকিস্তানের প্রতিও তুষ্ট নয়। সুতরাং স্বভাবতই তারা রোষকষায়িত। পাকিস্তানে যদি তাদের অন্ন না জোটে, তাহলে চতুর্থ যোজনার অংশভোগী 'নাদির শাহের কাশ্মীরের' দিকে তাদের চোখ পড়ে। পাখতুনিস্তানের হুজুগ অপেক্ষা 'আজাদ' কাশ্মীরের হুজুগ তাদের পক্ষে বেশী লোভনীয় হোক,—পাকিস্তানের পক্ষেও এটি কাম্য বৈ কি।

সামাজিক জীবনে কাশ্মীরী মুসলীমের সঙ্গে পাঠানদের আজও মিল ঘটেনি।

উভয়ের গোষ্ঠী পৃথক। মোগলদের সঙ্গে কাশ্মীরীর সদ্ভাব যথেষ্ট এবং বিবাহ-সম্পর্কও ঘটেছে প্রচুর। আজ কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে উঠতে চাইছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়,—যারা আধুনিক কালের শিক্ষায় কাশ্মীরকে নতুন করে গড়তে চাইছে। এদের মধ্যকার বৃহৎ অংশটা হ'ল পুরাকালের বর্ণহিন্দু—পাঠান ও মোগল আমলে যাদের নাম হয়েছে কাশ্মীরি মুসলিম। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক মোগল—যারা মিলে এসেছে ওদের সঙ্গে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছে পূর্বযুগের দরিদ্র পাঠানরা,—যারা অধিকাংশ শ্রমিক সাধারণ, পর্যটকমাত্রেরই সঙ্গে যাদের অল্প বিস্তর পরিচয় ঘটে থাকে। কাশ্মীরে আর্যসভ্যতার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি এবং ইসলামের নবতম পত্তন—এই সন্ধিযুগের মধ্যে একটি বিশেষ তারিখের উল্লেখ এখানে করা চলে। সেটি ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।

লালচৌক থেকে 'আমীরা কদল' পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলুম অনেক দূর। সেই শ্রীনগর এখন আর নেই। বড় বড় রাস্তা বেরিয়েছে নানা দিকে। দুই ধারে অগণিত সংখ্যক অট্টালিকা। দূরদূরান্তরে বড় বড় গম্বুজের মতো বাড়ি, ওধারে কাশ্মীর সরকারের নবনির্মিত সেক্রেটারিয়েট। চারিদিকে এখন কেবল নির্মাণের কাজ চলছে। সাধারণ লোকে কাজ পেয়েছে অনেক, সেই কারণে তাদের হাতে পয়সাও এসেছে। সর্বাপেক্ষা যেটি দৃশ্যমান, সেটি হল ভারতের সঙ্গে এই পার্বত্য রাজ্যের অবরোধটি ভেঙেছে। বাইরে থেকে অজস্র লোক এসে মিলেছে। জনকল্যাণ ও শিক্ষা, কারিগরি ও কাঠের কাজ, রেশম ও অন্যান্য শিল্প, প্রচুর খাদ্য ও সূতীবস্ত্রের আমদানি, ফল পাকড় ইত্যাদির চালানি কাজ, এবং সামরিক দপ্তরকে কেন্দ্র করে বিপুল আমদানি রপ্তানি,—এরা সামগ্রিকভাবে কাশ্মীরকে সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী করে তুলেছে। বক্সী গোলাম মহম্মদের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ আছে, এবং বহু কোটি টাকা তাঁর আমলে তছরূপ হয়েছে এমন কথাও শোনা যায়। কিন্তু বিগত ১০।১২ বছরের মধ্যে কাশ্মীরের অর্থনীতিক উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত রয়েছে বৈ কি। একালের জাতীয় জীবনে অসাধুতা অনেকটা যেন সয়ে গেছে, কিন্তু সরকারী অযোগ্যতা বা অক্ষমতা কেউযেন আর সইতে চাইছে না। ইদানিং শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই 'চোর চোর' খেলায় মত্ত এবং একজন অপরকে হাতে-নাতে ধরবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফাঁদ পেতেও রয়েছে। কিন্তু এগুলি ক্ষমা করা যায় এই কারণে যে, বিগত এক হাজার বছরের জাতীয় চরিত্র এক প্রকার ভ্রষ্টনীতি হয়ে থেকে এবার পাঁক ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে। এটি সন্ধিযুগ বলেই পুনরুজ্জীবনের যুগ। সুতরাং এখন সাধুতা অপেক্ষা যোগ্যতার মূল্য বেশি, সততা অপেক্ষা কর্মক্ষমতার বেশি দরকার। কিছুকাল অবধি চুরি বা প্রতারণা যদি

চলতে থাকে চলুক, কিন্তু নবজীবন রচনার কাজ তার সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে চলুক, এইটি কাম্য। অন্যায়, পাপ, দুর্নীতি বা দুষ্কৃতি দেখে ভয় পেতে নেই,—এই ভয়াবহ জাতীয় অধোগতির মধ্যেও উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয়, কোন্ পথ দিয়ে বাসুদেব আসছেন পঞ্চপাণ্ডবকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের সেই পায়ের শব্দ শোনবার আগে নবকালের কুরুক্ষেত্র রচনার ভূমিকা যতদিন ধরে' চলে চলুক না কেন।

কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চল কলকাতার সত্য পরিচয় নয়। শ্রীনগরের সিভিল লাইন, দালগেট, বাদামিবাগ, বড় বড় হোটেল বা ব্যাঙ্কের পাড়া দেখলে টুরিস্টদের মন ভোলে, কিন্তু এদের বাইরে শ্রীনগর অনেক বড়। যেখানে মধ্য এবং স্বল্পবিত্তরা থাকে, যাদের দিকে চেয়ে বলতে পারা যায় এরা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের লোক,— যাদের প্রতিদিনের প্রাণ-সমস্যার খবর বাইরে পৌঁছয় না, তারা কোন্ পল্লীতে কি প্রকার জীবন যাপন করে, টুরিস্টরা সচরাচর ঠিক সেদিকে লক্ষ্য রাখে না। শ্রীনগর এবং তার আশেপাশে কম বেশি মোট ৩২ থেকে ৩৩ হাজার পরিবার বাস করে। এ-কালের রাজনীতিক অনিশ্চয়তা এবং অব্যবস্থিতচিত্ত গভর্নমেণ্টের দ্বিধাগ্রস্ত নীতির জন্য বহু পণ্ডিত পরিবার কাশ্মীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এদের সামনে ভবিষ্যতের চেহারা স্বচ্ছ নয়। শত শত পরিবার ঘর বাড়ি বা বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছে জম্মু অথবা অন্যত্র। এদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত, কিন্তু অবস্থা পড়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ-বৃত্তি অনিশ্চিত। ফলে বেকারের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়াও দুর্ঘট হচ্ছে। ঘরে ঘরে উপার্জন কম, কিন্তু খরচের মাত্রা সমানই রয়েছে। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিপণি-বেসাতি কিছু নেই। পথের ধারে দোকান দিয়ে বসতে তারা শেখে নি। ফড়ে বা ফেরিওয়ালা তারা নয়। পশম বা কাঠের কাজ তাদের হাতে নেই। চাষবাসের কাজ তারা কখনও করে নি। কৃষিক্ষেত্রের উপর দখলীস্বত্ব তাদের নেই। তারা শ্রমভীরু, নির্বিরোধ, শান্তিপ্রিয় এবং আত্মকেন্দ্রিক। বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে চিন্তাশীলতায় যেমনই তাঁদের প্রতিভা, তেমনি তাঁরা আত্মপ্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠাহীন। একদিকে যেমন তাঁরা আচার-নিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনি কুসংস্কারে জীর্ণ। এঁরা যেমন এককালের বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিদগ্ধ মনের অধিকারী, জ্ঞানের দীপ্তিতে ও মননশীলতায় যেমন কাশ্মীরের গৌরব,— অন্যদিকে তেমনি ভয়ভীরু, নিন্দাবাদী, স্বার্থসন্ধানী এবং অনেকটাই ঈর্ষাকাতর। এককালে রাজদরবার থেকে রাজদপ্তর অবধি এঁদের একচেটিয়া ছিল। এঁদের পরামর্শ, যুক্তি, বিধান এবং নির্দেশ ভিন্ন কাশ্মীরের কোনও গভর্নমেণ্টই চলে নি। আজও তার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নি। মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যিনিই হোন্, তাঁর

প্রকৃত পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত।

আমার বন্ধু পণ্ডিত দীননাথ কাউলের বসতবাড়িটি খুঁজে বার করার জন্য একদিন পুরনো শহরের অলিগলির মধ্যে ঢুকেছিলুম। আমি নিজে 'গন্দা শহর' কলকাতার বাসিন্দা। প্রকৃত নোংরা কাকে বলে আমি জানি। কিন্তু কলকাতাকে 'গন্দা শহর' আখ্যা দিয়ে দিল্লীর কোন্ এক অনভিজ্ঞ মন্ত্রী কবে যেন গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর নিজের বাড়ি কোন্ শহরে আমি জানিনে। কলকাতা কর্পোরেশনের নিত্যস্থায়ী কলঙ্ক ঢাকবারও আমার চেষ্টা নেই। কিন্তু সম্রাট অশোক তেইশশ' বছর আগে যে নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই নগরীর পাড়া পল্লীর অলিগলিতে অদ্যাবধি ঝাড়ুদার বা মেথর কাজ করেছে কিনা, পূর্বোক্ত মন্ত্রীর কাছে সেটি জানলে ভাল হত। 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরের এই বীভৎস নোংরা চেহারা নিয়ে পুরনো শ্রীনগর আজ যেন অপেক্ষা করে রয়েছে, কবে আসবে সেই অপরাজেয় কর্মী—যিনি এই অপমানিত, অধঃপতিত ও দুর্গত জীবনের থেকে জনসাধারণকে একটি পরিচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাবেন। যতই এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীর মধ্যে ঢুকেছিলুম, এবং এ গলি থেকে ওগলি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—ততই এক নোংরা থেকে অন্য-নোংরার বীভৎস অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য, এই নোংরা জঞ্জালের বহুলাংশ স্থানান্তরিত হয় না, পারিপার্শ্বিক জীবন এদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে। প্রতিবাদ ওঠে না, প্রতিরোধ দেখা যায় না,—মারমুখী জনতা ছুটে যায় না পৌর কর্তৃপক্ষের দিকে অবস্থার প্রতিকারের জন্য। প্রতি বাড়ি জরাজীর্ণ, প্রতিটি ভিতর মহল যেন জন্তুর খোঁয়াড়ের মতো ঝুপসি অন্ধকার, প্রতি পল্লীতে অগণিত সংখ্যক যক্ষ্মা ও কাসরোগী,—অন্ন-বস্ত্রহীন অর্ধাশনগ্রস্ত নরনারী যেখানে আলু আর 'কড়ম' শাক ছাড়া খাদ্য বোঝে না, শ্রেষ্ঠ খাদ্য আজও যেখানে স্বপ্নবৎ। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বসে বসে শুধু ভাগ্যের হাতে মার খাচ্ছে মুখ বুজে। ওর মধ্যেই আছে সম্মানরক্ষার দায়, বাইরের চেহারাটাকে ধোপদরস্ত রাখার দায়, সামাজিক জীবনে মুখোস রক্ষার দায় এবং প্রতিদিনের প্রাণ রক্ষা সমস্যার মীমাংসার দায়। কাশ্মীরের এই জাতি-বর্ণ-শ্রেণী-নির্বিশেষে জনসাধারণের দিকে চেয়েই একদা "Gazetteer of Kashmir" নামক গ্রন্থে এই কথাগুলি ছাপা হয়েছিল:

...and it cannot be doubted that a people possessed of such intellectual powers, descendants of a warlike race, though now the greatest cowards in Asia, whom centuries of the worst oppression have not succeeded in utterly brutalising must be capable of a moral regeneration." (C. E. Bates, 1873). কাশ্মীরের এই মনুষ্যত্বপন্থী নৈতিক

পুনরুজ্জীবনের দিকে সমগ্র ভারত চেয়ে রয়েছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে এক সঙ্কীর্ণ জনসমাকীর্ণ গলির এক স্থলে এসে থামলুম। পথের তলার দিকে হেঁট হয়ে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গিয়ে যে ফটকটির মধ্যে ঢুকলুম এবং যে প্রাচীন যুগের চেহারাটা দেখা গেল, সেটি সম্ভবত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেরই। এই ধরনের 'গুপ্ত' পাড়াপল্লীর সংখ্যা পুরনো শ্রীনগরে প্রচুর। অনেকগুলি বাড়ি, পাড়া ও পল্লী মিলিয়ে একটি মাত্র বাহির হবার পথ। ৫০০ বছর আগে প্রথম পাঠান অধিকারের আমল থেকে কাশ্মীর বিপর্যস্ত হতে থাকে, সেই কাল থেকে এবম্বিধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সেই পাঠানদের অনাচার এই সেদিনও হয়ে গেছে ১৯৪৭-এর অক্টোবরে। বরামূলা অঞ্চলে ১৪ হাজার নরনারী ও বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র ১ হাজার জনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

চারিদিকে কয়েকটি পুরনো কালের বাড়ির কোলের দিকে এক মস্ত কাঁচা উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে যখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, তখন সামনের বাড়ির দোতলার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা মোগল প্রাসাদের একখানা জীবন্ত ছবি—যেখানে জাফ্‌রি-কাটানো বাতায়নে বসে রয়েছে বাদশার রাজ-অন্তঃপুরিকা নিচেকার পুষ্পোদ্যানে ময়ূর-নৃত্যের দিকে তাকিয়ে। অবিকল সেই ছবি। তফাৎ এই শুধু মেয়েটির অবগুণ্ঠন নেই।

আমাকে দেখে মেয়েটি নড়ে উঠল, এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, হ্যাঁ, সামনের বাড়িটাই হল 'সুখু স্কুল'। আপনি কাকে চান্?

পণ্ডিত দীননাথ কাউলজীকে।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। পরনে তার শালোয়ার আর আজানুলম্বিত টাইট-ফিটিং পাঞ্জাবী। তার হাতের কাছে ছিল একটি ওড়না,—ওইটি সে বক্ষবাস-স্বরূপ দুই কাঁধে তুলে নিল। লক্ষ্য করলুম, ছোট জানলাটি ছাড়িয়ে তার মাথা উঠল উঁচুতে, এবং পাশ ফিরতেই তার কালো কেশরাশির সুদীর্ঘ লম্বিত বেণী কৃষ্ণ-সর্পের মতো ঝুলে পড়ল শ্রেণীযুগের অনেক নিচে। মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল ২২।২৪ বছর বয়স। আমাকে সহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আসুন, এই বাড়ি। উনি আমার 'পিতাজি।'

অতি পুরনো বাড়ি, কিন্তু ধরণটি নতুন। সামনের চেহারাটায় ইমারতি কাজ। কাশ্মীরের যে-শিল্পীরা চিরকাল ধরে দারু ও কারুশিল্পকলায় আশ্চর্য অলঙ্করণ-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছে, এই ইমারতির সূক্ষ্ম নির্মাণশিল্পে তাদেরই হাতের ছাপ রয়েছে। আমি যখন বারান্দায় উঠছি তখন একটি সৌম্যকান্তি সুদর্শন যুবক বেরিয়ে এসে

আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আপনার কথা বাবার মুখে শুনেছি। আপনি ভেতরে আসুন—উনি এখনই ফিরবেন। দয়া করে ওপরে চলুন।

তুমি পণ্ডিতজীর কে হও?

আমি তাঁর ছেলে!—উভয়ের আলাপের ভাষা ইংরেজি।

বারান্দায় উঠে ভিতরে ঢুকতেই দেখি, মাটির দেওয়াল, মাটির ঘর, মাটির মেঝে ও সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পাক-খাওয়া সিঁড়ি ওপরের দিকে উঠেছে। এই প্রথম আমি জাত-কাশ্মীরীর অন্দরমহলে প্রবেশ করলুম। ছেলেটির চেহারা, কথাবার্তা, ধরণ-ধারণ—আগাগোড়া এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের ছেলের মতো। ওদের কাশ্মীরী 'বোলি' আমি বুঝিনে। সেইটি জেনে ইংরেজিতেই আলাপ আরম্ভ হয়ে গেল। দোতলায় উঠে দেখি, এটাও মাটির মেঝে এবং এর তিন দিকে তিনটি ঘর। অল্প পরিসরের মধ্যেই এক একটি ঘর স্বল্পবিত্ত ভদ্র পরিবারের উপযোগী সাজানো। মেয়েটি এবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, বাবা গিয়েছেন বিয়ে বাড়িতে—আমার পিসতুতো বোনের বিয়ে আজ। আপনি বসুন,—বাবা এখনই আসবেন।

ঘরটি ছোট। ভিতরে মাদুর ও শতরঞ্চির ফরাস পাতা। সামনে একটি বেতার যন্ত্র। পাশে কতকগুলি বই কাগজ গোছানো। এধারে ছোট তোরঙ্গর ওপর বাক্স সাজানো। এটা ওটা সাধারণ আসবাবপত্র। যে-ছোট জানলাটির ধারে মেয়েটি বসে ছিল, সেটি ঘরের মেঝেরই কাছাকাছি। মেয়েটির হাতে ছিল পশম বোনবার সরঞ্জাম।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে একজন বিশিষ্ট কাশ্মীরী কার্পেট ব্যবসায়ীর বাড়িতে একবার দিন তিনেকের জন্য আতিথ্য নিয়েছিলুম। তিনি কাশ্মীরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তাঁর তরুণী কন্যা ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। সেই প্রথম দেখেছিলুম, কাশ্মীরের অভিজাত মুসলমান বংশের কন্যা। সেই মেয়েটির রূপ, বর্ণ, দেহলাবণ্য, শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য সমস্ত মিলিয়ে অগ্নিশিখার মতো! তার দেহের উচ্চতা ছিল প্রায় ৫½ ফুট। তার সেই ঘন কালো চুলের দীর্ঘ-লম্বিত বেণী, বড় বড় কালো চোখ ও কালো ভুরু—আমার মনে ছিল। পণ্ডিত দীননাথের কন্যার ঠিক সেই প্রকার সুগৌর-বর্ণ এবং সুন্দর দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্য করে এটি নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এরা আর্যজাতির (Indo-Aryan) আদি বংশসম্ভূত। একই বংশ ও রক্তের ধারা, একই সংস্কৃতি ও সংস্কার, একই ভাষা ও লিপি এবং একই প্রকার সামাজিক জীবন—কিন্তু একালে কারও নাম হয়েছে মুসলমান, কেউ বা হিন্দু! আজ লাহোরের সেই রূপলাবণ্যবতীর সঙ্গে পণ্ডিত দীননাথের কন্যার কোনও

পার্থক্যই নেই। নমস্কারের ভঙ্গী, অভ্যর্থনার ভাষা, বিনয়নম্রতার সঙ্গে আসন নেবার জন্য অনুরোধ, কল্যাণকুশল বার্তা জানবার আগ্রহ,—মেয়েটির দিকে চেয়ে আমি যেন চলে গিয়েছিলুম সেই সুদূর অতীত ১৯৩৫ সালের লাহোরে! কিন্তু সে-কাহিনী অনুরূপ।

ভাই বোন দুটিকে নিয়ে যখন গল্পগুজবের আসরে বসেছি, তখন বৃদ্ধ দীননাথের ছোট ভাই এসে বসলেন ফরাসে। ইনি রাজ-সরকারে একজন বিশিষ্ট মুন্সী ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর কাছে পারিবারিক পরিচয় শুনছিলুম। তাঁর ছেলেটি দিল্লীতে কাজ করে। পুত্রবধূ এখানে। তাঁর দুই কন্যাই অবিবাহিত। দীননাথের এই ছেলেটি গ্রাজুয়েট। এখন কি যেন কারিগরি বিদ্যা শিখছে। আশা আছে কাশ্মীর সরকারে কাজ পাবে। দীননাথের বড় মেয়েটি বিবাহিত। এটি ছোট মেয়ে, এবং এই কাছেই কোন্ গার্লস্ স্কুলে শিক্ষকতা করে। এর এখনও বিবাহ হয়নি।

আমি যখন গল্প শোনায় অন্যমনস্ক, তখন মেয়েটি অলক্ষ্যে ইশারা করল ভাইটিকে। ভাইটি উঠে বাইরে গেল। আমি যে অতিথি এটি ভুললে চলবে কেন? চা এবং জলযোগের প্রশ্ন আছে বৈকি। সুতরাং ওই ইশারার অর্থ আমার অজানা নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই এল কাশ্মীরি বালুসাই ও কালাকন্দ্ এবং মেয়েটি এক সময় তার শালোয়ার ঝরমরিয়ে উঠে গেল কাচের প্লেট, পেয়ালা ও ডিসের খোঁজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলযোগের সমারোহ। কিন্তু এখানেও সেই বাঙ্গালীর মতো রেওয়াজ। অতিথি সামনে বসে গোগ্রাসে গিলবে, আর তাকে ঘিরে শুকনো মুখে বসে থাকবে গৃহস্থ! আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, তা হবে না। সবাই এক সঙ্গে খাবো। এ আমি শুনব না।

মাঝখানে উভয়পক্ষের ভাষাটা শুধু রয়ে গেল পরদেশী। নৈলে কাশ্মীর ও বঙ্গদেশ সেই সন্ধ্যায় একপাতেই বসে গেল। 'কাকাবাবু' প্রবীণ ব্রাহ্মণ হিসাবে একপাশে বসে রইলেন সরস আলাপচারী নিয়ে।

পণ্ডিতজীর জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও তিনি এসে পৌছলেন না। বুঝতে পারা যাচ্ছে বিপত্নীক ভদ্রলোক ভাগ্নির বিয়েতে কন্যাকর্তা হিসাবে আটকিয়ে পড়েছেন। এদিকে সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং আনন্দের আসর ভেঙ্গে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছিলুম সেই সময় কলরব শোনা গেল সিঁড়ির নীচে এবং শ্রীনগরের স্বভাবসিদ্ধ অতি ক্ষীণ ইলেকট্রিক আলোয় যে তিনটি নারীকে উজ্জ্বল কোলাহলসহ উঠে আসতে দেখলুম—তারা কোন্ পারিজাত কাননে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেইটি ভেবে থমকিয়ে গেলুম! ওর মধ্যে দুটি হল 'কাকাবাবুর' কন্যা ও পুত্রবধূ, এবং তৃতীয়টি

পণ্ডিত দীননাথের বিবাহিত বড় মেয়ে। এঁর বয়স ত্রিশের নীচেই হবে। এঁর কোলে ছিল বছর খানেকের একটি শিশুপুত্র। সেটিকে তিনি নামিয়ে দিলেন কুমারী মাসির সামনে মেঝের উপর।

শিশুটি আমার ন্যায় উটকো, অপ্রত্যাশিত এবং 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিকে হঠাৎ দেখে যখন ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত, আমি তখন তাকে বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিলুম। আমার বিশ্বাস, তাজা ফুলের একটা তোড়া তুললুম দুই হাতে। ইউরোপের নানা দেশে এবং ইংল্যাণ্ডে ঘুরেছি বৈকি। অনেক শিশুকে দেখেওছি, কোলেও তুলেছি। তারা সাদা, বিরলকেশ এবং স্বাস্থ্যবান। তাদের লাবণ্য আছে, কিন্তু শোভা আছে ক্বচিৎ। কিন্তু কাশ্মীরী শিশু—যাদের জন্ম শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের অন্দর মহলে প্রকৃত সুন্দরীর গর্ভে যারা দানা বেঁধে উঠছে, তারা আশ্চর্য বস্তু!

অভ্যাগত পুরুষ কমবয়স্ক হলে তার সামনে মেয়েদের কতকটা আড়ষ্টতা বা সঙ্কোচ থাকে। এখানে সে প্রশ্ন ছিল না। ফলে হল এই, এতক্ষণ ছিলুম চারজন, এবার হলুম সাতজন। কিন্তু আমি যখন ধরে বসলুম, আপনারা বিয়ে বাড়ি থেকে সদ্য ফিরছেন, সুতরাং কাশ্মীরী বিবাহের আনুষ্ঠানিক কাহিনীটি আমার কাছে বলতে হবে, এবং আপনাদের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং প্রসাধন সজ্জার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে, তখন নবাগত বিদেশীর 'সম্মানার্থ' পণ্ডিতজীর যুবক পুত্র ও অনূঢ়া কন্যা তাঁদের ভগ্নি ও 'ভাবী'-দেরকে নিয়ে একটি সোচ্ছ্বাস আনন্দের হাট বসিয়ে দিল, এবং 'কাকাবাবু' বয়সে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললেন, I'll myself now prepare the tea for the second time.

পুত্রবধূ এবার স্বচ্ছ কাশ্মীরী 'বোলিতে' শ্বশুরের প্রতি সহাস্য অনুযোগ জানিয়ে বললেন, আপনার বড্ড হাত পোড়াবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই না?

শ্বশুর বললেন, কিন্তু আমি যে সেদিন রাঁধতে গিয়েছিলুম?

পুত্রবধূ আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন। 'কাকাবাবুর' মেয়ে বললেন, তুমি ত' আলু সেদ্ধ করতেও জানো না, বাবা!

কথাগুলি কিছুই নয়, সামান্যই এর মূল্য। কিন্তু একটি কাশ্মীরী পরিবারের অন্দর মহলে একটি নূতন জগতের মধ্যে বসে কথাগুলি আমার কাছে একটি পরম অর্থ বহন করছিল! কাকাবাবুর স্ত্রী বিয়েবাড়ি থেকে বেরোতে পারেন নি, এবং আজ হয়ত তিনি ফিরতেই পারবেন না। কিন্তু তাঁকে দেখলে আপনি অবাক হয়ে যেতেন। ভীষণ লাজুক আমার খুড়িমা।

পণ্ডিতজীর বড় মেয়ে তাঁর খুড়িমার বর্ণনা দিলেন। আশ্চর্য, শিশুপুত্রটি আমার

কোলের মধ্যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু ওর জননী এবার ওকে টেনে নিয়ে বললেন, এবার ও ঘুমোবে। দিন্ আমাকে—

বাচ্চাটি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে। কাকাবাবুর বদলে পণ্ডিতজীর ছোট মেয়েটিই আবার চা করে নিয়ে এল!

মেয়েদের পরনে কাশ্মীরী সিল্কের শালোয়ার। পাঞ্জাবীর হাতায় জরি ও লেসের কাজ। গলায় মুক্তোর চিক অথবা মালা। ওড়নাতেও জরি ও লেস। গায়ে একটি করে লাল অথবা রক্তনীল মখমলের শর্ট্-জ্যাকেট্, কিন্তু উপর দিকে তাদের অর্ধচন্দ্রাকার কাটুনি, এবং তার ধারগুলিতে লেস বোনা। সমগ্র পরিচ্ছদটি মেয়েদের চলাফেরাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। দ্রুত হাঁটা বা দৌড়ানো, এমন কি অশ্বারোহণের পক্ষেও এই পরিচ্ছদ উপযুক্ত। সুন্দরী-দলের এই সজ্জাশিল্পের মধ্যে এমন একটি সুশ্রী শোভনতাকে আনা হয়েছে, যেটি বোধ করি কাশ্মীরের নিজস্ব। কিন্তু এই 'নিজস্ব'ও নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসে একটি পরিণতি লাভ করেছে। প্রত্যেক দেশের আবহ অবস্থা (Climatic condition) ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের প্রবর্তন করে। একদা পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী সৌদি আরবীয় শহর দাহানের বিমান ঘাঁটিতে ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ওরই মধ্যে যাদেরকে সেই রাত্রে উত্তপ্ত মরুলোকের হাওয়ার মধ্যে আনাগোনা করতে দেখ্ছিলুম, তাদের আপাদমস্তক জোব্বা, এবং মাথা থেকে ঝুলছে মস্ত ঘোমটা। এটি দরকার। গরম হাওয়া ও বালুর ঝাপট থেকে নিত্য আত্মরক্ষার জন্য এই বেদুইনের পোশাক একান্তই প্রয়োজন। কাশ্মীরে পোশাক পরিচ্ছদ বদলেছে অনেকবার। ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয়ান, গান্ধার, 'তুরুষ্ক' (তুর্ক), ইরাণ, মঙ্গোলীয়,—এরা নতুন-নতুন পোশাকের বৈচিত্র্য এনেছে। ধর্মীয় বিবর্তনে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম—এরাও যোগান দিয়ে এসেছে পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যে। কিন্তু এখন যেটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মোগল আমলে প্রবর্তিত যে পরিচ্ছদ বৈচিত্র্য, সেইটি কাশ্মীরের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে প্রচলিত। পণ্ডিতরা ব্যবহার করেন আচকান ও শালোয়ার, এটি 'হিন্দু' পোশাক নয়। মেয়েদের টাইট-জ্যাকেট, জরি বা মখমল বা লেসযুক্ত ওড়না—কতকটা রাজপুত ধরনের হলেও এর মূল চেহারাটি মোগল আমলের। পাঠানদের জ্যাকেট ও 'পাঞ্জাবী' কাশ্মীরে জনপ্রিয় নয়।

সেই রাত্রে চোখে যেন আমার কাজল লেগে গিয়েছিল! বিনা নোটিশে খুঁজতে এসেছিলুম 'সুথু' স্কুলের বৃদ্ধ হেড মাস্টারকে। ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম রাত তখন প্রায় দশটা। পণ্ডিতজী তখনও এসে পৌছলেন না!

চোখে এই কাজল লাগে কাশ্মীরে পদার্পণ করা মাত্রই। সমস্ত ভারত বিচরণ

করে এসো, সর্বত্রই মনে হবে তুমি হিন্দু, তোমার হিন্দু সংস্কৃতি ও শিক্ষা, হিন্দুর মধ্যে তুমি মানুষ, হিন্দু আদর্শে তুমি গঠিত। কিন্তু কাশ্মীরে আসামাত্র তুমি অনুভব করবে তুমি ভারতীয়! এখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-লাভ ঘটেছে তার সংহতি সৃজনে। এখানে জাতি বা বর্ণ বড় হয়নি, বড় হয়েছে সংস্কৃতি ও সভ্যতা। কাশ্মীরের ভূমি হল আর্য-ভারতীয়, তার সংস্কৃতি আগাগোড়া পৌরাণিক ও বৈদিক। এই সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তন্যপান করে জাতি বর্ণনির্বিশেষে প্রতি কাশ্মীরী বড় হয়েছে! এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রূপ শান্তি, মৈত্রী, অহিংসা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। পূর্বোক্ত মিঃ বেট্স-এর কথাগুলি মিথ্যা নয়। শত শত বছরের সাংঘাতিক অনাচার এবং উৎপীড়ন সত্ত্বেও কাশ্মীরের জনসাধারণ পশুর স্তরে নামেনি, মানবতাবাদের মূল আদর্শের থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি কাশ্মীরে দাঁড়াবার জাগা পায়নি, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘের মতো দক্ষিণ থেকে এ মনোবৃত্তি ভেসে আসে বটে, কিন্তু কাশ্মীরের উদার আকাশে এবং "গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনের" মধ্যে কোথায় যেন তার মিলিয়ে যায়! মাঝে মাঝে আসে রাজনীতিক উত্তেজনা, মাঝে মাঝে সাময়িক ভাবপ্রবণতার চাঞ্চল্য, কিন্তু কাশ্মীরের আদি প্রকৃতি এদের ভিতর থেকে রুক্ষতাকে উবিয়ে দেয়। উপমহাদেশ ভারতবর্ষের থেকে মাঝে মাঝে কুশিক্ষা এসে এদেরকে চঞ্চল করে তোলে, এই মাত্র।

কিন্তু আজ যে বিবাহ অনুষ্ঠানটির কথা শুনে এলুম, সেটি হিন্দু বিবাহ নয়, সেটি আর্য ভারতীয় বা কাশ্মীরী বিবাহ। সেই বিবাহ-বাসরে যারা যোগদান করেছে তারা মুসলমান বা হিন্দু কোনটাই নয়, তারা কাশ্মীরী! মেয়েরা বলল, কাশ্মীরে সবাই আসে সকলের ঘরে, তফাৎ কিছু নেই। আত্মাভিমান বা জাত্যাভিমান—কোনটাই নেই। আমরা কাশ্মীরী। হিন্দু-মুসলমান শুধু দুটো সংজ্ঞা মাত্র। আমাদের বিয়েবাড়িতে বা উৎসব অনুষ্ঠানে, পাল-পার্বণে এমন বহু আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব আসেন যাঁরা ভিন্ন ধর্মের লোক। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আমরা ত কাশ্মীরী!

শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই কথাগুলি বলতে আরম্ভ করেছে শ্রীনগরের পথে ঘাটে। সেই কাশ্মীর হারিয়ে যাচ্ছে, সেই মূঢ়, মারখাওয়া, মধ্যযুগীয় হরি সিংয়ের কণ্ঠরোধ-করা কাশ্মীর! কাশ্মীরের প্রতাপ সিং কলেজে ছেলেমেয়েদের ডিবেটিং যারা শোনেনি, কাশ্মীরের নতুন কালের কবি ও সাহিত্যকর্মীর সংশয়াচ্ছন্ন 'সিনিসিজমের' সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেনি, মদ্যপানের আসরে একত্রিত কাশ্মীরীদের তিক্ত বিদ্রোহকণ্ঠ যাদের কানে ঢোকেনি—তাদের কাছে নতুন কাশ্মীর এখনও অপরিচিত। এরা এগিয়ে আসছে, আর দেরি নেই। এরা আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনীতির পাশাখেলার কেবলমাত্র ক্রীড়নক হয়ে থাকতে চাইছে না। এরা আঘাত করবে অন্যায় আর

অসৎকে, এরা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে বিদ্বেষ আর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে! এরা কাশ্মীরের সমস্ত কলঙ্কের ইতিহাসকে মুছে দেবার জন্য এগিয়ে আসছে।

বিগত দশ বছরের মধ্যে শ্রীনগরের আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্ব পাঞ্জাব ভিন্ন অপর কোনও রাজ্যে এত অল্পকালের মধ্যে এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটেনি।

পুরনো শহরের সেই অতি নোংরা গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে আমার টাঙ্গা লালচৌকের চওড়া চৌমাথার কাছাকাছি এসে পৌছল। রাত বেশ হয়েছে, কিন্তু এখনও আমাকে যেতে হবে প্রায় মাইল তিনেক পথ। বাদামিবাগ পেরিয়েই যাব, ওই পথেই সুবিধা। পার্কের প্রায় সামনে বক্সী গোলাম মহম্মদের অগ্নিসাৎ করা সিনেমা হাউস তার খাঁচাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ভিতরের আগাগোড়া জ্বলে পুড়ে প্রায় কাঠকয়লায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

ঠুং ঠুং করতে করতে টাঙ্গা চলল 'দাল-গেটের' দিকে। সেখানে পুল পার হয়ে যাব বাঁ-হাতি দাল হ্রদের ধার দিয়ে বেশ অনেকটা দূর। ইদানীং মোটর বাস চলছে এপথে, কিন্তু সংখ্যায় কম। রাত্রে হু হু করে এই প্রশস্ত সুন্দর পথ।

পার্ক হোটেলে এসে পৌছলুম রাত তখন এগারোটা।

পরদিন ছুটতে ছুটতে এলেন পণ্ডিত কাউল। গত রাত্রে আমার আসবার ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরেছেন। আজ আমাকে তাঁর ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেই হবে। ছেলেমেয়ে, কাকা, পুত্রবধূ, প্রভৃতি সকলের একান্ত অনুরোধ। কোনও আপত্তি চলবে না!

পণ্ডিতজী বৃদ্ধ হলেও আমার বহু প্রকার ফরমাসে সহায়তা করেছেন। উনি উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষ ভদ্র। 'সুথু' স্কুলের উন্নতির মূলেই উনি। উনিই ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অবসর সময়ে উনি বহিরাগত টুরিস্ট বা পর্যটক সম্প্রদায়ের পক্ষে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাদি করেন। ওঁর ছোট মেয়েটি শিক্ষকতা করে বটে, তবে তার বিবাহের জন্য উনি বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন। মেয়েটির বয়স চব্বিশ হতে চলল। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া আজকাল বড়ই দুর্ঘট। তা ছাড়া গহনায়, নগদে, কনে সাজানোর অনেক টাকার ধাক্কা। এ ছাড়া বিয়ের যাবতীয় খরচ। আরও আছে। বরাভরণ, দানসামগ্রী, ফুলশয্যা, নমস্কারী—কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা রাখব বলুন ত? ছেলেটার একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি না হলে আর চলছে না। পণ্ডিতজী বিমর্ষভাবে আলাপ করছিলেন।

এমন সময় হোটেলের চাপরাশি এসে খবর দিল, আপনার টেলিফোন!

আমি বেরিয়ে এসে উঠোন পেরিয়ে ছোট আপিস ঘরে ঢুকে ফোন ধরলুম। জনৈক মহিলা মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমি শেখ মহম্মদ আবদুল্লার বাড়ি থেকে বলছি। আপনি কি তাঁর সঙ্গে 'সাক্ষাৎকার' চেয়েছিলেন ?

তাঁর পরিচ্ছন্ন মিষ্ট ইংরেজি ভাষার জবাবে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

—উনি বাইরে গেছেন। ২১ তারিখ সকালে ফিরবেন—পরশু দিন। আপনি ওই দিন বিকেল তিনটের সময়ে যদি 'মুজাহিদ মঞ্জিলে' আসেন তা হলে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।

॥ ১৮ ॥

'কাশ্মারী মুসলিম' শেখ আবদুল্লা

শেখ মহম্মদ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা আরেকটু স্পষ্ট হওয়া দরকার।

এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও কাশ্মীরে যে কয়জন সর্বজনমান্য রাজনীতিক নেতা উপমহাদেশ ভারতবর্ষের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাকিস্তান সৃষ্টি ও ভারতের স্বাধীনতালাভের পর এই তিনজনের ভাগ্য বিড়ম্বিত হতে থাকে। তিনজনই ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালুচ ও পাখতুন-পাঠান যোদ্ধা, কিন্তু চার্চিল-প্রমুখ বিলাতের রক্ষণশীল দলের চক্রান্তের ফলে এঁদের তিনজনের স্থান হয় পাকিস্তানের কারাগারে।

এই তিনজনের প্রথম জন বর্তমানে জরাব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে পাকিস্তান ত্যাগ ক'রে কাবুলে বাস করছেন। তাঁর নাম খান আবদুল গফুর খান। তাঁকে বলা হয়ে থাকে, 'সীমান্ত-গান্ধী।' দ্বিতীয়জন বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দিবালোকে অতর্কিত অবস্থায় রাওয়ালপিণ্ডিতে হত্যা করা হয়েছে। ইনি হলেন ডাঃ খান সাহেব—'সীমান্ত গান্ধীর' জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই অপরাজেয় এবং অসমসাহসিক যোদ্ধা বিগত ১৯৪৬ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পণ্ডিত নেহরুর রাজনীতিক সফরকালে সেখানকার উৎকোচপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর পাঠানের গুলী-বৃষ্টির মধ্যে নেহরুজীকে পিতার ন্যায় আপন ক্রোড়ের মধ্যে নিয়ে রক্ষা করেন। অকৃতজ্ঞ আধুনিক কালকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, অতিশয় নাটকীয় রাজনীতির সঙ্কটকালে এই দুই 'পাখতুন বীর' উপমহাদেশের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন। তৃতীয়জন, বেলুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুসম্মানিত জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা খান আবদুস সামাদ খান। এঁকে বলা হয়ে থাকে 'বালুচগান্ধী'। এঁর সংবাদ এখন আর সহজে পাওয়া যায় না। ইনি কারা-অন্তরালে বা মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন কিনা সেটি স্পষ্ট নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'পাখতুন' বা 'পাখতুনিস্তান'—এই দুটি শব্দ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কানে উঠলে তাঁরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু 'পাখতুন' শব্দটি অতি প্রাচীন। সেকালে গান্ধারের অধিবাসিগণকে বলা হত 'পাকতাইক' এবং এর

থেকেই 'পাখতুনের' উৎপত্তি।

("In the old Gandhara, the present Peshawar district, the designation Paktyike used by Heredotos refers to the same territory and represents the earliest mention of the ethnic name Pakhtun or the modern Indian Pathan, is equally certain." Ancient Geography of Kashmir, by A. M. Stein, 1895).

পূর্বোক্ত তিনজনের পর চতুর্থ ব্যক্তি হলেন শেখ আবদুল্লা। এঁর পরিচয় ভিন্ন প্রকার। আগের তিন জনের মতো ইনি সর্বভারতীয় নেতা নন,—এঁর নেতৃত্ব কাশ্মীরের বাইরে কখনও আসেনি। ইংরেজের বিপক্ষে এঁর লড়াই ছিল না, ছিল কাশ্মীরের রাজগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পূর্বোক্ত তিন জনের মতো ইনি তৎকালীন কন্‌গ্রেসের একজন নেতা ছিলেন না, ইনি ছিলেন কাশ্মীরের মুসলমান গোষ্ঠীর প্রধান ও নির্ভীক মুখপাত্র। ভারতীয় কন্‌গ্রেসের প্রশ্রয়ের মধ্যে যখন 'দেশীয় রাজ্য গণ-সম্মেলন' (States Peoples Conference) গড়ে ওঠে তখন শেখ আবদুল্লা গড়ে তোলেন, 'নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুসলীম সম্মেলন।' এই সম্মেলনের যেটি মূল আদর্শ, সেটি ছিল তৎকালীন (১৯৩২) মুসলীম-প্রধান জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলমান গোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার (rights) প্রতিষ্ঠা। কাশ্মীরের ইংরেজ-রেসিডেন্সী এবম্বিধ 'সম্মেলন' প্রতিষ্ঠায় সেই কালে বাধা দেননি, কেননা একটির মধ্যে তাঁরা একটি 'সাম্প্রদায়িক' বর্ণ লক্ষ্য করেছিলেন। পরবর্তী ৭ বছর অবধি এই 'সম্মেলন' ভারতীয় কন্‌গ্রেসের একটি 'অস্পষ্ট' প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল। তৎকালে কাশ্মীরে কনগ্রেসের প্রবেশাধিকার না থাকায় ভারতীয় নেতাগণ এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। শেখ আবদুল্লা এই 'ধ্বনি' তুলেছিলেন, জম্মু এবং কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান হওয়া সত্বেও রাজদপ্তরে এবং কাশ্মীর সরকারের ডোগরা সৈন্যদলে অধিকাংশ কর্মী হিন্দু—এটি অন্যায় এবং অসঙ্গত। শেখ আবদুল্লা কারাগারে যান।

শেখ আবদুল্লার পরামর্শ পরিষদে তৎকালে হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। এটি কাশ্মীরের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। অতঃপর ভারতীয় কন্‌গ্রেসের উদ্যোগে এবং হিন্দু পণ্ডিতের পরামর্শে ১৯৩৯ সালে 'মুসলীম সম্মেলনটি' নিজ নাম বদলিয়ে 'নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশন্যাল বা জাতীয় সম্মেলনে পরিণত হয় এবং ১৯৪০ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর পরিভ্রমণ উপলক্ষ্যে এসে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ১২ দিন অতিবাহিত করেন। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বোধ করি ১৪।১৫ বছরের, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। শেখ আবদুল্লার পিতৃপুরুষরা হলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ। পণ্ডিত নেহরুর পরিচয়ও হল, তিনি কাশ্মীরী হিন্দু।

কাশ্মীরের রাজগোষ্ঠী মূল কাশ্মীরের 'মৃৎসম্ভূত' নয়। তাঁরা পূর্বকালের পাঞ্জাবের অন্তর্গত জম্মুর কোনও এক ডোগরা-সামন্ত-প্রধান রণজিৎ দেওর উত্তর-বংশের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রগোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীর তিন ভাই—গুলাব সিং, ধ্যান সিং ও সুচেৎ সিং—এঁরা তিনজন মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের অনুগ্রহে এক একজন রাজা হয়ে বসেন এবং নিজেদের মধ্যে জম্মু ভাগাভাগি করেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজস করে গুলাব সিং ১৮৪৬ সালে একটি চুক্তির (অমৃতশহর চুক্তি) ফলে কাশ্মীরের মহারাজা হন। এই ঘটনার ঠিক একশ' বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে শেখ আবদুল্লা 'ধ্বনি' তুললেন, 'কুইট্ কাশ্মীর। কাশ্মীর কর কাশ্মীরিজ।' অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে দূর হও। কাশ্মীরীদের জন্যই কাশ্মীর। অর্থাৎ তিনি মহারাজা হরি সিংকে তাড়াতে চাইলেন।

শেখ আবদুল্লা এবার দীর্ঘকালের জন্য পুনরায় কারাগারে গেলেন। 'কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্স' জমে উঠল। ভারতবর্ষ মহারাজা হরি সিংহের প্রতি বিরূপ ছিল। কন্‌গ্রেস এগিয়ে গিয়ে 'দেশীয় রাজ্য গণসম্মেলনের' সঙ্গে 'কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের' হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব পাতালো। কিন্তু কন্‌গ্রেস মেনে নিল, উভয়ের পৃথক সত্তা।

১৯৪৭ সালে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর 'জুন প্ল্যানটি' (৩ জুন, ১৯৪৭) প্রকাশ করার পর ওই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শ্রীনগরে গিয়ে তিনি ৪ দিন ধরে মহারাজাকে এইটি বোঝাতে থাকেন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেই কারণে কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' (sovereing indipendence) ব'লে ঘোষণা করা বা স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ (Dominion) বলে কাশ্মীরকে স্বীকৃতি দান,—কোনটাই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে আর সম্ভব নয়। সুতরাং পরবর্তী ১৫ আগষ্টের মধ্যে তিনি যদি পাকিস্তান (তখনও প্রস্তাবিত) বা ভারত—যে কোনটির সঙ্গে কাশ্মীরকে যুক্ত করেন তবে কোনও প্রকার দুর্যোগ (troubles) দেখা দেবে না। কেননা সেক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের যে-কোনও একটি কাশ্মীরের 'রক্ষক' হবে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একথাও তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে ভারত সেটিকে ভুল বুঝে রুষ্টও হবে না—এই নিশ্চিত আশ্বাসটিও তিনি স্বয়ং সর্দার প্যাটেলের কাছে পেয়েছেন।

"(He went so far as to tell the Maharajah that, if he acceeded to Pakistan, India would not take it amiss and that he had a firm assurance on this from Sarder Patel himself."—V. P. Menon).

অব্যবস্থিতচিত্ত মহারাজা এই অনুরোধে সাড়া দেননি এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের

অনুরোধ সত্ত্বেও শেষ দিনে অসুস্থতার ভাণ করে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেন নি।

উপজাতীয় পাঠানরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে (২২ অক্টোবর, ১৯৪৭) সেই সময় শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরকে রক্ষা করার জন্য এক বিরাট প্রতিরোধবাহিনী গঠন করেন। এই সময় কাশ্মীরের সৈন্যদলের মধ্যে যে অংশটি মুসলমান, তারা গিয়ে উপজাতীয় পাঠানদের সঙ্গে যোগ দেয়। তখন উপজাতীয় পাঠানদের নেতৃত্ব করেন পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহোদর ও পাকিস্তান সৈন্যদলের অন্যতম সেনাপতি আকবর খান ওরফে জেনারেল তারিক। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন মেজর জেনারেল শের খান ও প্রাক্তন 'আজাদহিন্দ ফৌজের' মহম্মদ জামান কিয়ানি, জেনারেল বুরহামুদ্দিন এবং আরও অনেকে। শেখ আবদুল্লা সেই সময় মরণপণ সংগ্রামের জন্য নিজে সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীকে ডাক দেন।

২৬ অক্টোবর মহারাজা তাঁর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনের সহযোগে শেখ আবদুল্লাকে রাজ্যের দায়িত্বভার দিতে বাধ্য হন এবং শেখ সাহেব তাঁর নিজ দলবল সহ একটি অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। কিন্তু ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যাকাল থেকে তিনি মহারাজার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই দিনটি এই কারণে স্মরণীয় যে, মহারাজা চারিদিকের সাংঘাতিক ও বীভৎস ঘটনাবলীর মধ্যে এই দিন অতিশয় বিপন্নভাবে ভারতের শরণাপন্ন হন এবং কাশ্মীরকে 'ভারতভুক্ত' করেন। ২৭ অক্টোবর তারিখের প্রত্যুষে ভারতীয় সৈন্যদল বিমানযোগে শ্রীনগরে প্রথম অবতরণ করে। উপজাতীয় পাঠান দস্যুদল তখন মাত্র ৩৩ মাইল দূরে বরামূলায় লুট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল। কিন্তু এই দস্যুদল যখন পাল্টা আক্রমণের চেহারা দেখে পলায়ন করতে বাধ্য হয়, তখন সমগ্র বরামূলার ১৪ হাজার নরনারী, শিশু ও বালক বালিকার মধ্যে মাত্র ১ হাজার জনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে এটি বোধকরি বুঝতে পারেন নি, ভ্রষ্টচরিত্র পাঠানদের এই চারিত্রিক দুর্নীতিই তাঁদের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যের কারণ হবে। তাঁরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

এমনটি কিন্তু ঘটত না। অব্যবস্থিতচিত্ত মহারাজা হরি সিংয়ের অপরিণাম (prisoner of indecision) দর্শিতা, চিন্তা ও বিবেচনা শক্তির জড়তা—এই সম্মিলিত অপগুণগুলির ফলে সেদিন থেকে পাকিস্তান ও ভারতের হাজার হাজার জীবনের অপচয় ঘটেছে। তাঁর সেদিনকার অযথা ও বিলম্বিত সিদ্ধান্তের শোচনীয় পরিণাম-স্বরূপ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার চিত্তবিরোধ আজও ঘোচেনি।

সে যাই হোক, মহারাজা কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা এরপর

পাকিস্তানের চক্ষুশূল হলেন। কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পথে তিনিও ছিলেন বাধা স্বরূপ। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হাতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবের কি প্রকার ভয়াবহ অবস্থা ঘটে এবং কিভাবে তিনি কারারুদ্ধ হন—সেটি শেখ সাহেব জানতেন। সুতরাং কাশ্মীরের অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে তিনি মহারাজাকে এইরূপ পরামর্শ দেন যে, 'ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স' পরিচালিত কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু সাধারণ ও লাদাখের বৌদ্ধ সমাজ—এঁরা কেউই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চান না।

রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে যাঁরা ভারতে ও পাকিস্তানে এই ব্যাপারটি নিয়ে কিছু চিন্তা করেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে পাকিস্তান কাশ্মীরকে হারিয়েছেন। এটি বুঝতে পারা গেছে, কুটিল ষড়যন্ত্র ও হিংস্রতা হৃদয়কে জয় করবার পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ নয়। সেদিন তাঁদের রাজনীতি ছিল 'নাবালক।' কেননা একদিকে তাঁরা নিঃশব্দে 'স্থিতাবস্থা চুক্তির' আড়ালে কাশ্মীরকে অনাহারে মারতে চাইলেন, অন্যদিকে ছদ্মবেশে পাখতুন পাঠানদের কর্তা হয়ে কাশ্মীরে হানা দিলেন।

খান আবদুল গফুর খান, আবদুস সামাদ খান, ডাঃ খান সাহেব—এঁদের তিন-জনের লাঞ্ছনার পর কালের কুটিল গতি অনুসারে শেখ আবদুল্লার উপরে আসে ভাগ্যের বিদ্রূপ। 'যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার' (জানুয়ারী ১, ১৯৪৯) এপারে-ওপারে পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে 'আজাদ কাশ্মীর' ও ভারতীয় কাশ্মীরের লোকজন নিঃশব্দে কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে আনাগোনা করে। এটি স্বাভাবিক। কেননা এপারে মা, ওপারে বাবা। এপারে শ্যালক, ওপারে ভগ্নিপতি। এপারে ভাই, ওপারে দাদা। এপারের সহোদর, ওপারের গোয়েন্দা। ওপারের পুলিস, এপারের বন্ধু। এপারে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ওপারে লর্ড ইসমে। ওপারে চার্চিল, এপারে এ্যাটলী। এপারে লেবার, ওপারে কন্‌জারভেটিভ। এপারে অশ্রু, ওপারে নৈরাশ্য! এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিয়তির ক্রীড়নক শেখ আবদুল্লা!

কিন্তু কাশ্মীরের এই 'অবিসম্বাদিত' নেতাকে নিয়তি টেনে নিয়ে যায় এক আবর্ত থেকে অন্য ঘূর্ণাবর্তে। মহারাজা হরি সিংকে কাশ্মীর ত্যাগ করতে হয়। তিনি বোম্বাইতে এক প্রকার নির্বাসিত ও উপেক্ষিত জীবনযাপন করতে থাকেন। তাঁর নাবালক পুত্র শ্রীমান করণ সিং 'সদর-ই-রিয়াসৎ' পদে ১৭ বছর বয়সে বৃত হন। এই সময়ে আমেরিকা ভারতকে এক হাতে প্রচুর টাকা ধার দিতে থাকেন এবং অন্য হাতে তাঁদের ক্রীড়নক পাকিস্তানকে কাশ্মীর সম্পর্কে সঙ্গোপন শলা-

পরামর্শ দেন। ফলে কাশ্মীরের ইউনাইটেড নেশনস্-এর কেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং দুষ্ট চক্রান্তের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এরা চোরকে চুরি করতে বলে একদিকে, অন্যদিকে গৃহস্থকে সতর্ক করে। মিস ইভান্সের ঘটনা অনেকেরই মনে আছে। কমিউনিস্ট চীনকে বা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ভবিষ্যৎকালে কোনও সুযোগে আঘাত করার জন্য, অথবা কমিউনিজম-এর প্রগতি রোধ করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা জীইয়ে রাখার হাস্যকর আমেরিকান নীতি ভারতের দক্ষিণপন্থী কনগ্রেসের অনেকটা সমর্থন লাভ করে। এমনি একটা সময় আমেরিকার কূটনীতি-বিদ্ পরলোকগত মিঃ আদলাই ষ্টিভেনসন এসে ভারত-পাকিস্তান ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের নির্ভুল বিবরণ অদ্যাবধি অস্পষ্ট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শেখ আবদুল্লা কিছু-কিছু 'অসংলগ্ন' কথা বলতে থাকেন (মে, ১৯৫৩)। ভদ্র এবং সংযত ব্যক্তি যদি হঠাৎ পেট ভরে আমেরিকান্ শ্যামপেন্ পান ক'রে আলুথালু অবস্থায় পথে বেরিয়ে পাঁচজনের মধ্যে টলটলে হয়ে কথা বলে, তা হলে ঠিক কি প্রকার পরিস্থিতি দাঁড়ায় আমি জানিনে। পণ্ডিত নেহরু শেখ সাহেবকে সংযত করবার জন্য শ্রীনগরে যান, কিন্তু শেখ সাহেবের পেটে তখনও সেই শ্যামপেনের ক্রিয়া চলছে!

এই ঘটনার মাস তিনেক পরে (৮ আগস্ট ১৯৫৩) একদা প্রভাতকালে কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ ২২ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ করণ সিং ৫০ বৎসর বয়স্ক শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন! কোন কোন মহলে এই সংবাদ রটে, আগের দিন রাত্রে দিল্লীর মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্য পরলোকগত রফি আহমেদ কিদোয়াই সাহেব শ্রীনগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন!

অতঃপর ১০ বছর ৮ মাস পরে 'শের-ই-কাশ্মীর' বা কাশ্মীরের 'ব্যাঘ্র' শেখ আবদুল্লা মুক্তিলাভ করেন (৮ এপ্রিল, ১৯৬৪) এবং ৩০ এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরুর আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত পুরনো বন্ধু! কয়েকদিন অতিথি হিসাবে পণ্ডিতজীর সঙ্গে একত্র বাস ক'রে শেখ সাহেব নানা রাজ্যে গিয়ে নানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি স্থিরমস্তিষ্ক ৪ জন ব্যক্তির সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা হলেন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, রাজাগোপালাচারী, বিনোবা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণ। এখানে এটি উল্লেখযোগ্য, মুক্তিলাভের পর থেকেই শেখ সাহেব লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরির সামনে ভারতের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রবল ও বিরক্ত কণ্ঠে বক্তৃতাদি করতে থাকেন। তাঁর সেই জেহাদী ভাষণগুলি পাকিস্তানে যেমন সুখ্যাতি লাভ করে, ভারতে তেমনি সেগুলির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়! নেহরুজী যখন শেখ সাহেবকে

দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেন, তখন দক্ষিণপন্থীর দল খুশী হননি —পাছে বন্ধুবৎসল পণ্ডিতজী 'বেফাঁস' কোনও সিদ্ধান্ত ক'রে বসেন! সেই কারণে তাঁরা পণ্ডিতজীকে মাঝে মাঝে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন এই বলে যে, "কাশ্মীর ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর ভারতের—"

পণ্ডিত নেহরুর উত্তরাধিকারী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় তখন সংযতবাক ও পণ্ডিত নেহরুর প্রতি একান্তভাবে আস্থাবান। তিনি বোধ করি জানতেন, আমেরিকা প্রভাবিত দক্ষিণপন্থীর দল চীন-আক্রমণের কাল থেকে তাঁর দীক্ষাগুরু পণ্ডিতজীকে সুনজরে দেখেন না! কিন্তু নবভারত-স্রষ্টার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তার জন্য তাঁরা ভিতরে-ভিতরে চক্রান্ত করলেও বাইরে অসন্তোষ প্রকাশ করতে সাহস পেতেন না! এর আগে 'কামরাজ প্ল্যান' এঁদের অনেককে সংযত করে!

ভারতের ভাগ্যবিধাতা—নেহরুজী এবং শেখ আবদুল্লাকে মাত্র ৪ সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন! কাশ্মীর-কেন্দ্রিক পাক-ভারত বিরোধের মীমাংসার জন্য শেখ সাহেব পাকিস্তানে যান নেহরুর সম্মতিক্রমে। সেখানে গিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এবং অন্যান্য পাক-নেতাগণের সঙ্গে এখানে-ওখানে আলাপচারী নিয়ে যখন ব্যস্ত, সেই সময় (২৭ মে ১৯৬৪) ভারতে ও আন্তর্জাতিক জগতে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর মৃত্যু ঘটে! রাওয়ালপিণ্ডির একটি সংবাদে বলা হয়, পণ্ডিতজীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শেখ আবদুল্লা শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন! তিনি তাঁর সমস্ত ভ্রমণসূচী ও বৈঠক বাতিল করে পরের দিন অপরাহ্নে দিল্লীতে এসে ২০ লক্ষ নরনারীর সঙ্গে পণ্ডিতজীর শবদেহ যাত্রায় যোগদান করেন। রাজঘাটের নিকটবর্তী শান্তিবনের শ্মশানে সেদিন আমি উপস্থিত ছিলুম। সেই বীভৎস সন্ধ্যা সমগ্র ভারতের আকাশে যেন মৃত্যুর মায়াজাল বিস্তার করেছিল।

প্রসঙ্গত বলি, নেহরুজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে সেই রাত্রেই একটি চার্টার্ড বিমান-যোগে আমি দিল্লী রওনা হই। পণ্ডিতজীর বাড়িতে পৌঁছে তাঁর মৃতদেহের পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াই তখন রাত ৩-১৫ মিঃ।

দিল্লীর সর্বাপেক্ষা গরমের সময় সেদিন পণ্ডিতজীর মৃত্যুর ঠিক পরেই প্রবল বৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই রাত্রের দিল্লী ছিল স্নিগ্ধ ও শীতল! পরের দিন মধ্যাহ্নকালে (১১-৪৪ মিঃ) শবযাত্রার প্রাক্কালে দিল্লীতে ভূমিকম্প ঘটে!

সে যাই হোক, ভাগ্য-বিড়ম্বিত শেখ আবদুল্লা অন্য সকলকে বাদ দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ ধরেছিলেন পণ্ডিত নেহরুজীকে। এবার নেহরুজীর মৃত্যুর পর সেই

'অন্য সকল' তাঁর প্রতি উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিল! একদিন নিঃশব্দে তিনি শ্রীনগরে ফিরে এলেন।

নেহরুজীর মৃত্যুর ৩ মাস ২৫ দিন পরে শেখ আবদুল্লা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলুম। 'পার্ক হোটেল' থেকে টাঙ্গায় চ'ড়ে গেলে ক্ষতি ছিল না, সময়ও ছিল যথেষ্ট। তা বললে কি হয়। লোকে আপিস যায় ট্রাম-বাসে, কিন্তু ধোপদস্ত জামাকাপড় পরে যখন 'পাত্র' দেখতে যায়, তখন চায় ট্যাক্সি! ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ভিন্নপ্রকার যানবাহন মেলে। আমরা ট্যাক্সিতে উঠলুম বেলা তখন আড়াইটে।

আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মণ্ডল নামক এক বন্ধু। ট্যাক্সিচালক জানে, কোথায় কোন্‌টা। পথ বোধ করি মাইল তিনেক। পুরনো শ্রীনগরের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এসে একটি পাঁচিল ঘেরা বড় বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। এইটি 'মুজাহিদ মঞ্জিল।' আশপাশে গৃহস্থ পল্লী। বাড়িটি দোতলা, বর্ণ রক্তিম, কিন্তু বাড়িটির নির্মাণকৌশল সুশ্রী। কোনও অভিজাত রাজপুরুষের পক্ষে বাড়িটি মানানসই। সামনে পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট খোলা ময়দান, কিন্তু ফুলবাগান নেই—কাশ্মীরের যেটি বৈশিষ্ট্য। আমরা এগিয়ে ভিতরের বারান্দায় উঠে শেখ সাহেবের খোঁজ করলুম। তিনি দোতলায় আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই বাঁ-হাতি আপিস ঘর। অনেক কোটপ্যাণ্টপরা ভদ্রলোক টেবিলে বসে কাজ করছেন। এ বাড়িটি হ'ল 'ধর্মীয় ট্রাস্ট' অফিস। শ্রীনগর এবং অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে যত মসজিদ ও প্রার্থনা স্থান আছে,—এখান থেকে সেগুলি পরিচালিত হয়। শেখ সাহেব হলেন এই 'ধর্মীয় ট্রাস্টের' প্রেসিডেণ্ট। তিনি উত্তর দিকের বড় হলঘরে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে সভার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন; সভা শেষ করে তিনি এখনই বেরোবেন। সভাটি বিশেষ জরুরী। ঘড়িতে দেখলুম তিনটে-পাঁচ।

বাড়িটি নিরিবিলি এবং দরদালানগুলি পরিচ্ছন্ন। লোকজন কোথাও দেখছিনে—দু'-একজন চাকর-বাকর ছাড়া। পাড়াটাও শান্ত। ফুরফুরিয়ে কাশ্মীরি হাওয়া বইছিল।

আপিসঘরে ঢুকে ভদ্রলোকটির সঙ্গে একথা-ওকথার পর প্রশ্ন করলুম, ক্ষমা করবেন, আপনি এখানকার কে?

আমি?—প্রসন্ন মুখে ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, আমি এই ট্রাস্ট আপিসের সেক্রেটারী।

বললুম, আপনাকে দেখে ঠিক কাশ্মীরি মনে হচ্ছে না কেন বলুন ত!

উনি হেসে জবাব দিলেন, আমার বাড়ি মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে? ক্ষমা করবেন, আপনার নামটি জানতে পারি কি?

আমার নাম, রাজ বাহাদুর।

বললুম, এটি ইসলামীয় প্রতিষ্ঠান, আপনাকে এখানে রাখায় ওঁদের অসুবিধা নেই?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, এ অসুবিধা কাশ্মীরে কোথাও নেই!

কথাটি নির্ভুলভাবে সত্য বলে এ প্রসঙ্গটির উল্লেখ করলুম। এই অনন্যতা কাশ্মীরের সহজাত। এখানে নাগরিকদের একটিমাত্র পরিচয়, তারা কাশ্মীরি। তাদের চরিত্রে বহু দুর্বলতা এবং বহু অসঙ্গতি বর্তমান,—কিন্তু জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ নেই। রাজনীতিক বিদ্বেষ মাঝে মাঝে এসে পড়ে, মাঝে মাঝে উগ্রমূর্তিও দেখা দেয়,—কিন্তু তার আয়ুষ্কাল একেবারেই কম। ভয়-ভীরু ও ভদ্র, নিরীহ ও নির্বিরোধ, নিস্তেজ ও নির্বিকার,—এমন একটা সমাজকে একদা সেই বিশিষ্ট ইংরেজটি বলে গেছেন, "the greatest cowards in Asia".

সভাকক্ষ থেকে শেখ আবদুল্লা যখন বেরিয়ে এলেন, বেলা তখন সাড়ে তিনটে। সাধারণ সংবাদপত্রে তাঁর যে-ছবি মাঝে মাঝে বেরোয়, এই চেহারার সঙ্গে তার মিল কম। ইনি দীর্ঘাকার, উচ্চতায় ছয় ফুটেরও বোধ হয় বেশি। মুখশ্রী প্রকৃতই সৌম্য, গতি ধীর,—চিন্তান্বিত, নম্রতায় শান্ত। গায়ের রং বিতস্তার মতো,—অনেকটা যেন সোনালি চাঁপা! বয়স বোধ হয় ষাট পেরিয়েছে। পরণে পায়জামা, গায়ে লম্বা একটি গরম আচকান। মাথায় টাক। টুপি নেই। এ যেন কাশ্মীরের বিশাল দেওদার তরু! আমার মর্মে রং লেগে গেল।

সতীর্থদেরকে একে একে বিদায় দিয়ে শেখ সাহেব আমাদের দিকে ফিরলেন। স্মিতমুখে বললেন, আসুন এই ঘরে—

ছোট একটি নিরিবিলি ঘরে এনে আমাদের বসিয়ে নিজে তিনি সামনে বসলেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে এক সময় বললুম, আপনি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকায় যাবেন শুনেছিলুম। ঢাকা বা কলকাতার লোক আপনাকে অনেককাল দেখেনি। বাঙালীকে দেখলে আপনি খুশী হতেন।

আমারও খুব ইচ্ছা ছিল।—মিষ্টি কণ্ঠে শেখ সাহেব জবাব দিলেন।

কথাটি সামান্য, কেবলমাত্র মৌখিক। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সততা ধ্বনিত হয়ে উঠল আমার কানে। আমি তাকালুম তাঁর দিকে। চক্ষুলজ্জা আমার কম,—ইতিহাসের গঞ্জনা ছিল আমার মনে। বোধ হয় সেই কারণেই আমি বলে বসলুম, আপনার অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে আপনি পাকিস্তানে লাঞ্ছিত এবং ভারতে সমাদৃত ছিলেন। এ কালে ভারতে নিন্দিত এবং পাকিস্তানে অভিনন্দিত,—ভাগ্যের এই বিদ্রূপের

পিছনে রহস্য কি, বলুন ত ?

শেখ সাহেব প্রথমে হাসলেন। পরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, possibly Kashmir is unknown to both of them (হয়ত কাশ্মীর ওঁদের উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত)।

অরবিন্দ মণ্ডলমশায়ের দৃষ্টি ছিল অপলক। তিনি মুগ্ধচক্ষে চেয়েছিলেন।

আমি এবার দুঃসাহসী প্রশ্ন তুললুম, আমরা থাকি অনেক দূরে—বাঙলা দেশে। আপনাকে '৫৩ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঠিক কি কারণে, সেটি আমাদের কাছে আজও স্পষ্ট হয়নি। এ সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য ?

শেখ সাহেবের মুখে চোখে সহসা গাম্ভীর্য দেখা দিল। কিন্তু তিনি তাঁর উত্তেজনাকে সংযত করতে জানেন। তেমনি মৃদুকণ্ঠেই তিনি জবাব দিলেন, আমি আজও জানিনে কেন আমাকে বন্দী করা হয়েছিল, আর কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমার তথাকথিত অপরাধের বিচার হচ্ছিল আদালতে, কিন্তু মামলা কেন তুলে নেওয়া হল বুঝলুম না। অন্যায় যদি কখনও ক'রে থাকি, আমাকে তাঁরা সংশোধন করলে পারতেন। নিজের অপরাধ বুঝবার আগেই আমার শাস্তি হয়ে গেল।

কিয়ৎক্ষণ শেখ সাহেব চুপ করলেন। পরে বললেন, নানা অপ্রিয় কথা মনে আসে, কিন্তু আজ ব'লে লাভ নেই। আমি কি শুধু কার্যোদ্ধারের বাহন মাত্র ছিলুম ? কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী আমি, অথচ স্পষ্ট জানলুম না কোথায় আমার ভুল, আর কার সঙ্গেই বা ষড়যন্ত্র করলুম !—অথচ হঠাৎ একদিন আমাকে ধরে জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল ! এই কি গণতন্ত্র ?

আপনি কি মনে করেন, কাশ্মীর ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ নয় ?

এবার বড় বড় চোখের নির্বিকার চাহনি। সেই চাহনিতে না আছে কূটনীতি না বা কোনও চাতুরীর সঙ্কোচন। এক ঝলক হেসে শেখ সাহেব বললেন, এই অচ্ছেদ্য অংশটির প্রতি ভারতের কোনদিনই কোন আকর্ষণ বা স্নেহ ছিল না। কেন জানেন ? কিন্তু বড় অপ্রিয় কথা—

তাঁর মুখ-চোখের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমরা আপনাকে উত্তেজিত করতে আসি নি।

শেখ সাহেবের কণ্ঠ স্বভাবতই মৃদু এবং তাঁর সৌজন্যে কৃত্রিমতা নেই। সহাস্যে বললেন, না না, এতে উত্তেজনা কিছু নেই ! এ যুক্তির কথা। কাশ্মীরে শত শত কোটি টাকা ওঁরা ঢেলেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে ঢেলেছেন সন্দেহ আর অবিশ্বাস। আমি এগুলো ঘোচাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু হয়ত সেই কারণেই আমাকে সরানো হয়েছিল। How can I convince now the people about India's

Profession and practice ? What face I have to them ?

তাঁর কথায় আমি দুঃখিত হচ্ছি কি না আমার মন তাঁর প্রতি কঠোরভাবে বিরূপ হয়ে উঠছে কি না, সেটি গ্রাহ্য না করেই তিনি বলে চললেন কাশ্মীরই যেন বড়, কাশ্মীরবাসীরা যেন কেউ নয়। এ যেন জনদশেক লোক মিলে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বেচা-কেনার বাগ্‌বিতণ্ডা। সে-মেয়ে যেন মূঢ়-মূক একটা সম্পত্তি মাত্র। তার মন হৃদয় চিন্তা বা বিবেচনা-শক্তি—কোনটাই যেন নেই! তাকে নিয়ে লোফালুফি করছেন মহারাজা, ইংরেজ, ভারত আর পাকিস্তান। কেউ জানতে চান না কাশ্মীরের নিজস্ব মনোভাব এবং অভিমত! প্রকৃত মনোভাব যদি কেউ প্রকাশ করে, সে হয় উভয় পক্ষের শত্রু!

একটু থেমে শেখ সাহেব বললেন, কবে ছিল অচ্ছেদ্য? ছিল কি কোনও কালে? ইতিহাস কি বলছে? বরং পাকিস্তানই ছিল ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ। রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর "India Divided" পড়েন নি? এই 'অচ্ছেদ্য' পাকিস্তান যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কাশ্মীর চান, কোন্ তর্কে বাধা দেবেন তাকে? কিন্তু আমি জানতুম, সে-বাধা কেমন করে দিতে হয়। পাকিস্তান চান কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে, আমি চাই কাশ্মীরবাসীর কল্যাণকে। কিন্তু ভারতের কর্তৃপক্ষ আমার প্রকৃত মনোভাবটিকে সন্দেহ করেন। কেন করেন, তাঁরাই জানেন!

আপনি এই বিতর্কের কিরূপ মীমাংসা চান?

ঠিক যে-মীমাংসা চেয়েছিলেন নেহরুজী।—শেখ সাহেব আবার মুখ তুলে তাকালেন—আমার পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ—যাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। ১৯৫৩ সালে বড় অবিচার করেছিলেন তিনি আমার প্রতি। কিন্তু বড় ভাইয়ের সেই শাসন আমার মনে অশ্রদ্ধার চিহ্ন রাখে নি! আমার জন্ম বিতস্তার কোলে। আমি কাশ্মীরি—আমি ভালবাসার জন্যেই কাঁদি।

দরজার সামনে সেক্রেটারী এসে দাঁড়ালেন। অপর কা'রা যেন কোনও কাজে এসেছেন! শেখ সাহেব উঠে গিয়ে বললেন, পরে।—এই বলে তিনি এবার দরজাটা ভেজিয়ে আবার এসে বসলেন।

আমার প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছিল এবং জবাবটিও ছিল তাঁর মুখে। তিনি 'ভারত-ভুক্তি'র দলিলের (Instrument of Accession) গল্পটি আগাগোড়া বলে গেলেন। তাঁর চোখের সামনেই সব ঘটে। এর পর তিনি বললেন, কাশ্মীরবাসীরাই জানে এর প্রকৃত মীমাংসা! দুই স্বাধীন রাষ্ট্র দুটি সৈন্যদল নিয়ে কাশ্মীরে চেপে বসে রয়েছেন! একটির নাম 'army of occupation', অন্যটির নাম 'army of liberation'। এই উভয় 'আর্মিকে সরিয়ে নিন উভয় রাষ্ট্র। দুই পক্ষ মিলে তাড়িয়ে

দিন্ ওই ইউনাইটেড নেশনসদের ষড়যন্ত্রীর দলকে,—যারা দুই পক্ষের কোটি কোটি টাকায় ঘা দিচ্ছে।

কিন্তু এই সুযোগে উপজাতীয়রা যদি আবার আক্রমণ করে ?

কে বললে ?—শেখ সাহেব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, ১৯৪৭ সালের ১ নভেম্বর লাহোরে জিন্না-মাউন্টব্যাটেনের বৈঠক ভুলে যাবেন না! জিন্না সাহেব বলেছিলেন, 'দুই পক্ষ একই সময়ে কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাক।' মাউন্টব্যাটেন প্রশ্ন করেন, উপজাতীয় দস্যুদলকে কেমন করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সরানো সম্ভব হবে? মিঃ জিন্না সকলের মাঝখানে বসেই বলেন, "If you do this I will call the whole thing off."

সুতরাং এবিষয়ে আমরা নিশ্চিন্তই থাকতে পারি। এর পর যা কর্তব্য, সেটি স্পষ্ট। অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং অশ্রদ্ধা ঘুচিয়ে কাশ্মীরকে নিয়ে উভয় পক্ষ বসুন এক টেবিলে। মতে মিলতে না পারি, বন্ধুত্বে দোষ কি? কাশ্মীরের কল্যাণ এবং উন্নতি উভয় পক্ষ ভাবুন। বহিঃশক্তি কাশ্মীরকে যাতে দখল না করে, আক্রমণ না করে—তার যুক্ত দায়িত্ব নিন 'উপমহাদেশ।' সব উৎকণ্ঠা, সব অনিশ্চয়তা ঘুচুক। শুধু এইজন্তেই ছুটেছিলুম সেদিন দিল্লীতে, শুধু এই শ্বাসরোধী অবস্থার কথাই পণ্ডিতজীকে বলতে গিয়েছিলুম। আর—এই কথাবার্তাই চলছিল আমার সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডিতে। এমন এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে কোনও পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সকল পক্ষের সম্মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কাশ্মীরের দরজা খুলে যাক সকলের জন্ত। কিন্তু আমার চরম দুর্ভাগ্য, এই সময় পণ্ডিতজী মারা গেলেন।

আপনি কি স্বাধীন কাশ্মীর চান ?

শেখ সাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, আমার চাইবার অনেক আগেই 'আজাদ কাশ্মীর' গ'ড়ে উঠেছে।

আমরাও তাঁর সঙ্গে হাসলুম। কিন্তু আর নয়, প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল।

আমরা উঠতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় ভবানীপুরবাসী অরবিন্দ মণ্ডলমশায় পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর কথা তুললেন! শ্যামাপ্রসাদ মারা যান এই শ্রীনগরে দাল হ্রদের অদূরবর্তী পাহাড়ী উপত্যকায় একটি সুন্দর বাগানবাড়িতে। সেই সময় শেখ আবদুল্লা ছিলেন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (২২ জুন, ১৯৫৩)।

মণ্ডল মশায়ের প্রশ্নটি শুনে শেখ সাহেব আবার বসলেন। বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং এই কাশ্মীর শিউরে উঠেছিল। আমি জানি, হাহাকার করেছিল। এত বড় নেতা, এমন বিদ্বান, এত বড় একজন পার্লামেন্টেরিয়ান—ওঁর মৃত্যুতে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলুম।

মণ্ডলমশায় এবার শেখ সাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালেন। তিনি বোধ করি ভিন্ন প্রকার ভাষণ আশা করেছিলেন। তাঁর দিকে ফিরেই শেখ সাহেব পুনরায় বললেন আপনি যেটি শুনতে চান, সেটি আমি নিজেই বলি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে আমার নৈতিক দায়িত্ব আমি অস্বীকার করব না।

মৃত্যুতে মানুষের হাত নেই সকলেই জানে।—শেখ সাহেব যেন একটু ব্যথিত কণ্ঠেই বললেন,—কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি আমার কর্তব্যে ভ্রষ্ট হয়েছিলুম।

মণ্ডলমশায়ের মুখে চোখে প্রবল ঔৎসুক্য দেখা দিল। শেখ সাহেব বললেন, আমি তখন প্রধানমন্ত্রী,—আমি আমার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব কোনমতেই এড়াতে পারিনে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওপর আমি নির্ভর করেছিলুম, শ্যামাপ্রসাদের সমস্ত দেখাশোনার ভার তাঁদের হাতে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তাঁরা আরও বেশি মনোযোগী হলে ভাল হত। তবে, আমার বিশ্বাস, তাঁরাও ঠিক এতটা বুঝতে পারেননি। আমি পরে পণ্ডিতজীকে আর ডাঃ বি. সি. রায়কে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে লিখেছিলুম। সেই বেদনাদায়ক দিনটির কথা কেউ আমরা ভুলিনি।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। আমরা বিদায় নিলুম।—

এ লেখা যখন লিখছি ততদিনে 'আমীরা কদলের' তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে বিতস্তায়।

শেখ আবদুল্লা সাহেব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা ঘুরে 'হজ' করতে গিয়েছিলেন মক্কাতীর্থে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে তিনি 'হাজী' আবদুল্লা হয়ে ওঠেননি। তাঁর চেহারাটি আমার ভালো লেগেছিল এই কারণে যে, তাঁকে কেবল মক্কায় নয়,—নবদ্বীপের কীর্তনের আসরে, কাশী বিশ্বনাথের নাটমন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর চত্বরে,—কোথাও তাঁকে বেমানান মনে হবে না। তিনি যদি পিতলের ক্রস গলায় ঝুলিয়ে সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালে ঢোকেন জোব্বা চড়িয়ে,— সবাই তাঁকে বলবে ফাদার রেভারেণ্ড। শেখ আবদুল্লা তাঁর ছাড়পত্রে লিখিয়েছিলেন, তিনি কাশ্মীরি মুসলীম। বোধ হয় ভুল করেননি। কাশ্মীরি মুসলীম নমাজ পড়ে না, রমজানের মাসে উপোস করতে চায় না, পরমাত্মাকে আল্লাহ্ বলে না,—এঁদের সম্প্রদায় একটু অন্যরকম।

পরের দিন ২২ তারিখ। আমি যাচ্ছিলুম গুলমার্গের দিকে। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে শুনলুম, বক্সী গোলাম মহম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শেখ সাহেবের তিনিও দোসর, তিনিও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

॥ ১৯ ॥

কাশ্মীর-কাহিনী

সম্রাট আকবরের যুগ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর সভাসদ আবুল ফজল কাশ্মীর সম্বন্ধে বলেছেন, এদেশে সর্বাপেক্ষা যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদের নাম ঋষি। তাঁরা স্বাধীন, নিরঙ্কুশ এবং তাঁরা কোনও প্রকার চলিত সংস্কার, ঐতিহ্য বা নিয়মানুগত্যের দ্বারা শৃঙ্খলিত নন। কাশ্মীরে এঁদের সংখ্যা দু' হাজার এঁরা নিরামিষাশী এবং এঁরা নারীসঙ্গ বর্জন করে থাকেন। পাহাড়ে, মন্দিরে, তপোবনে—এঁরা বসবাস করেন। কথিত আছে, আকবর কাশ্মীর দখল করতে গিয়ে যখন বার বার তিনবার 'চাক' রাজাদের নিকট পরাজিত হয়ে ফেরেন, তখন নাকি এই 'চাক' রাজাদের পিছনে ছিল ঋষিগণের যৌগিক তপস্যা। পরবর্তীকালের মোগল আমলে এই ঋষিগণ তাঁদের বাসভূমি, উপনিবেশ, মঠ ও বিভিন্ন অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠান মোগলদের হাত থেকে লাভ করেছিলেন!

অদ্যাবধি কাশ্মীর অনেকগুলি নামে পরিচিত। যেমন ঋষিভূমি, যোগীস্থান, শারদাপীঠ বা শারদাস্থান ইত্যাদি। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেওয়া নামটি সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করেছে। সেটি 'ভূস্বর্গ।'

কাশ্মীরের পূর্বোক্ত ঋষিকুল সম্বন্ধে কাশ্মীরেই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং সেটি অনুধাবন না করলে কাশ্মীরিদের যথার্থ চরিত্রের আস্বাদ পাওয়া যায় না। প্রায় একশ বছর আগে জনৈক বিশিষ্ট ইংরেজ এই প্রবাদটি উদ্ধার করেছিলেন। এই ঋষিকুলের যিনি প্রথম প্রবর্তক, তিনি ছিলেন একজন ফকির এবং তাঁর নাম ছিল খোজা আওয়িস (Awys)। তিনি ছিলেন বিদেশী। দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত ইয়েমেন্ (Yemen) প্রদেশের 'কুরুন্ নামক জনপদে এই ফকির জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কালক্রমে কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হন এবং অরণ্যভ্রমী এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন,—যাঁরা লতা, পাতা, শিকড় এবং বন্য 'উয়েপূল্‌হক্' নামক গুল্মমূল আহার করতেন। কালক্রমে এঁরাই ঋষি নামে পরিচিত হন। এইসব উপকথা উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, কাশ্মীরে আর্যসভ্যতার সঙ্গে ইসলামের সাংস্কৃতিক সম্মেলন ঘটুক।

কিন্তু এই সব উপকথার কোথায় কতখানি নির্ভুল, সেটি এখন আর জানবার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, চারিদিকের এই পর্বতপ্রাকার বেষ্টিত 'সুখী' উপত্যকা

কাশ্মীরের জন্মবৃত্তান্তও কেউ জানে না। শুধু শঙ্করাচার্য পাহাড়ে উঠে এটি স্পষ্ট বুঝা যায়, সুখী উপত্যকা এককালে ছিল প্রায় ২২০০ বর্গমাইলব্যাপী এক বিশাল সরোবর এবং সেকালের লোকরা বাস করত চারপাশের পাহাড় পর্বতে—যাদের উচ্চতা হল ১২ থেকে ১৮ হাজার ফুট। এই সরোবরের যুগ (lacustrine age) শেষ হবার পর একে একে পৌরাণিক কাহিনী গজিয়ে উঠতে থাকে—যেমন কাশ্যপ মুনির গল্প, জলোদ্ভব দৈত্য, দেবী পার্বতীর পাঠানো টিয়াপাখির মুখের ঢিল, শূকর অবতারের দন্তাঘাত ইত্যাদি বিভিন্ন রূপক কাহিনী এবং যাদের প্রমাণ কিছু নেই। অলৌকিক এবং অপ্রমাণযোগ্য কাহিনীর প্রতি আস্থা স্থাপন করার মধ্যে একপ্রকার অলস মস্তিষ্কের ক্রিয়া আছে,—এটি কাশ্মীরিদের ইতিহাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিই, কাশ্মীরি মুসলমানরাও মনে প্রাণে এ কাহিনীগুলি বিশ্বাস করে এবং সে-ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী আত্মীয়তা বর্তমান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কাশ্মীর চিরকাল অপরিচিত ছিল। এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানই একে বৃহৎ ভারতের নিকট পরিচিত হতে দেয়নি। কাশ্মীরকে ভারতের নিকট বোধকরি প্রথম পরিচিত করেন এক ফরাসী চিকিৎসক, ডাঃ বার্নিয়ের—যিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর যাত্রা করেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁরই প্রথম রিপোর্ট। তারপর একে একে আসেন অনেকেই। তাঁর আগে যাঁরা কাশ্মীরের রিপোর্ট লেখেন, তাঁরা প্রাচীন গ্রীক—টলেমি, হেরোডোটস, ডাইওনাইসিয়স, নন্নস প্রভৃতি। তাঁরা কেউ বলেছেন কাস্পেরয়, কাস্পেরিয়া, কাস্পাটাইরস, কাস্পাপাইরস, কাস্বীর, কাস্পীর—এবং শেষ পর্যন্ত ঋষি কাশ্যপের নামে 'কাশ্যপমার (মঠ)।' অনেকে কাশ্মীরকে 'কাশ্যপপুর' ধরে নিয়েছিল। অনেকের ধারণা, ঋষি কাশ্যপই প্রথম এই হ্রদের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন।

পৌরাণিক কাশ্যপের পরে গ্রীক, গ্রীকের পরে প্রাচীন চীন, তারপর বাঙালী শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, তারপর বোধ করি আলবেরুনি এবং আবুল ফজল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে এঁদের কারও রিপোর্ট তাঁদের কালে সংযুক্ত হয়নি। কাশ্মীর অপরিচিত থেকে গিয়েছিল। ভারতবাসী যে প্রথম কাশ্মীরের সংবাদ পেল বার্নিয়েরের তথ্যে—এটি শুনতে আশ্চর্য লাগে। বার্নিয়েরের পর ফরস্টর, মুরক্রফ্‌ট্, জ্যাকুয়েমণ্ট্, ভিগনে, দি অ্যানভিল ইত্যাদি। ভারতের ইতিহাস ভিনদেশীয়রা লিখে গেছে একে একে। ঔকং, ফা-হিয়েন, হুয়েনসাঙ—এঁরা না এলে প্রাচীন ভারতের চেহারাটা জানতুম কি না কে জানে! সম্রাট অশোকের কাশ্মীর ভুবে

গিয়েছিল বিস্মৃতির তলায়। বৌদ্ধ কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের ঔৎসুক্য ছিল না পুরাকালে।

চারিদিকের অবরোধের মাঝখানে পড়ে কাশ্মীরিরা ছিল কূটস্থ, আত্মকেন্দ্রিক—শামুক যেমন তার খোলাটার মধ্যে বাস করে নিজস্ব একটা জগতে। ওরই মধ্যে তার সীমা, ওরই মধ্যে তার সকল খেলার শেষ! প্রায় ৫ হাজার বছর আগে কাশ্মীরের প্রথম ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়—কুরুপাণ্ডবের সমসাময়িক কালে, যখন রাজা 'প্রথম গোনন্দ' কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গোনন্দর পর এক হাজার বছর হারিয়ে গেল কাশ্মীরের ইতিহাস! অতঃপর তৃতীয় গোনন্দ রাজত্ব আরম্ভ করলেন এবং তাঁরই বংশপরম্পরা রাজসিংহাসনে রইলেন আরও হাজার বছর। আবার নতুন এলেন প্রতাপাদিত্য এবং শেষ করলেন আর্যরাজ। এতে লেগে গেল প্রায় দু'শ বছর। তারপর রাজা মেঘবাহন থেকে বলাদিত্য—ছয়শ বছরের কাহিনী। এবার এলেন কর্কটবংশীয় রাজগোষ্ঠী। দুর্লভবর্ধন, দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রপীঢ়-বজ্রাদিত্য, তারাপীঢ়-উদয়াদিত্য, মুক্তাপীঢ়-ললিতাদিত্য, জয়পীঢ়-বিনয়াদিত্য, ললিতপীঢ়, অজিতপীঢ়, অনঙ্গপীঢ় এবং উৎপলপীঢ়—এঁদের নিয়ে চলে গেল আড়াইশ বছরকাল। এঁরা ঐতিহাসিককালের রাজবংশ এবং নানা লোক এঁদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এঁদের আলোচনা প্রথম ওঠে কবি কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণীতে'—সেটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম কাশ্মীরের পুরা ইতিহাস বলতে বসেন। তারপর আসেন বিল্‌হন, জোনারাজ, শ্রীবর, প্রজ্ঞাভট্ট প্রভৃতি অনেকে। পাঁচ হাজার বছরের শেষের পাঁচশ, বছরের মধ্যে এসে পড়েছে পাঠান, মোগল, শিখ, ডোগরা ও ইংরেজদের ইতিহাস!

'সুখী উপত্যকা' কাশ্মীর পুরাকালে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর অংশ ছিল 'ক্রমরাজ্য' অর্থাৎ 'কামরাজ'—এবং দক্ষিণের অংশ 'মাধবরাজ্য' বা 'মারাজ।' মোটামুটি দু'হাজার বর্গমাইল। এককালে যেটি ছিল চতুষ্কোণ বৃহৎ সরোবর, জল নিষ্কাশনের পর সেটি হয়ে উঠল একটি মস্ত সমতল মসৃণ উপত্যকা। এই বৃহৎ উপত্যকা বিতস্তা (গ্রীক বেদাস্পেস) নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরি। এই পলিমাটি সেই আবহমান কাল থেকে অদ্যাবধি জমছে স্তরে স্তরে—জমতে জমতে উপত্যকার উচ্চতা হয়ে উঠেছে ৫২০০ ফুট সমুদ্রসমতা থেকে। বিতস্তার এই পলিমাটির জল গিয়ে জমা হচ্ছে উলার হ্রদে এবং তার তলসমতাও তিল-তিল পরিমাণে উচ্চ সমতায় পরিণত হচ্ছে। প্রকৃতির এই নিয়মটি আজও এই ধারায় (process) অব্যাহতভাবে চলেছে। এর ফলে দাঁড়িয়েছে এই, সমগ্র উপত্যকাভূমি নধর ও পেলব এবং এর কমনীয়তা প্রতি কাশ্মীরির প্রকৃতির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। এ উপত্যকার ফুল, ফল,

ফসল, ফলন—পৃথিবী প্রসিদ্ধ। ভারতের কোনও রাজ্য, কোনও ভূখণ্ড কাশ্মীরের মতো এত উর্বর ও সমৃদ্ধ নয়। প্রান্তরের পর প্রান্তর বর্ণবাহার ফুল-বিছানো। একই বৃন্তে সাতরঙা পুষ্পশোভা কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় কিনা ভাবতে হয়। আপেল, আনার, আঙুর, রোজবেরি রাস্প্‌বেরি, পীয়র, এপ্রিকট্—এগুলি জানা ফল। কিন্তু জুলাই মাসের শেষ দিক থেকে অগণিত সংখ্যক অজানা ফলের মরশুম শ্রীনগরের বাজারে দেখে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ফসলের মাঠে আগাছার ভীড় কম। কিন্তু একটি ধানের শিষকে যখন একটি বর্ণাঢ্য পুষ্পলতা জড়িয়ে ধরে উঠে এলিয়ে পড়ে, তখন পথচারীর পদক্ষেপে ভুল ঘটে বৈকি!

এই বিতস্তা ভারতীয় গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতীর সমতুল্য নদী। কাশ্মীরিদের নিকট ইনি দেবী ও জননী 'বেদস্তা' (বিতস্তার ভিন্ন নাম)। এই বিতস্তার জন্ম ঘটে 'নীলনাগে'—যেটির অপর নাম ভেরনাগ। প্রসঙ্গত বলা যায়, 'নাগ' শব্দটির অর্থ সর্প হলেও কাশ্মীরের প্রত্যেকটি পার্বত্য ঝর্ণা সর্পাকৃতি বলেই এগুলি 'নাগ' নামে অভিহিত। যেমন কোকরনাগ, অনন্তনাগ ইত্যাদি। কাশ্মীরের মুসলমানগণ বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকটি ঝর্ণার সঙ্গে 'নাগদেবতার' সংযোগ আছে এবং সেজন্য তারা এগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজাও করে।

"The belief in Nagas is fully alive also in the Muhammadan population of the Valley, which in many places has not ceased to pay a kind of superstitious respect and illdisguised worship to these deities".—M. A. Stein, 1900.

বিতস্তার মূল উৎস পীর পাঞ্জাল পর্বতের নীচে নীলনাগের সুড়ঙ্গলোকে। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই নীলনাগের কোলে একটি অষ্টকোণবিশিষ্ট প্রস্তর চত্বরের ক্রোড়গর্ভ নির্মাণ করেন। এই গর্ভলোক থেকেই নীলনাগের জল উদ্গীর্ণ হয়ে আসছে। নীলনাগ হলেন মুনি কাশ্যপের পুত্র,—এইটিই এখানে অভিহিত। তিনি 'ভেরনাগ' নামক গ্রামে বাস করেছিলেন,—যেটি মোগল আমলে শাহাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। কথিত আছে, এই নীলনাগের নিকট শ্রীবিষ্ণু তাঁর লাঙ্গলের ফলাটি নিক্ষেপ করেন এবং সেইটির দ্বারা 'সতীসায়রের' (উপত্যকার) জল নিষ্কাশনের জন্য নালীপথ কাটা হয়। পরে মহাদেবের ত্রিশূলাঘাতে বিতস্তারূপিণী দেবী পার্বতীর আবির্ভাব ঘটে। জহ্নু মুনির কন্যা জাহ্নবীর জন্মবৃত্তান্তও অনেকটা এই প্রকার। সে যাই হোক, এই ভেরিনাগেই কাশ্মীরের তিনটি প্রধানতম তীর্থ বর্তমান,—নীলকুণ্ড, বিতস্তা ও নীলঘাট। এখানকার ক্রোড়গুহাপথ দিয়ে বিতস্তার যে ধারাটি নির্গত হচ্ছে সেটি ছাড়াও তার চতুর্দিকে ছত্রাকারে (parasol) যে জল বিকীর্ণ হতে থাকে

সেটিকে বলা হয় 'বিতস্তত্রা!' বিতস্তার মূল উৎস সেইটিই।

কাশ্মীরের এই নীলনাগ থেকেই কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণের জন্ম হয়েছে। সেটির নাম 'নীলমত' পুরাণ। এই পুরাণে বিভিন্ন নাগের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন 'মাহাত্ম্যে' তারা বর্ণিত। আবুল ফজল, আলবেরুনি, বুহলার, বার্নিয়ের, ট্রয়ের এবং বিশেষ করে কাশ্মীরি পণ্ডিত গোবিন্দ কাউল এগুলি নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। 'রাজতরঙ্গিণীর' গ্রন্থকার কবি কল্হন কাশ্মীরের ইতিহাসের প্রথম সূত্রপাত খুঁজে পান এই 'নীলমত' পুরাণে। সম্ভবত এই পুরাণ শারদালিপি ও শারদী ভাষায় প্রথম রচিত হয়, কিন্তু তার সন তারিখ কারও জানা নেই। পরে এটি বুঝি নাগরীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই লিপিতে প্রথম দেব-দেবতার কাহিনী রচিত হয় বলেই এটি 'দেবনাগরী' নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতে ইসলাম সংস্কৃতি যেমন আপন মৌলিকতা এবং স্বকীয়তার গুণে নিজস্ব স্থান নিয়ে বসে গেছে, কাশ্মীরে সেটি হয় নি। কাশ্মীরে একালে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, কিন্তু সেটি সংখ্যামাত্র, সেটি কেবলমাত্র সংজ্ঞার রূপান্তর—যেটি নিয়ে আজ রাজনীতির কচকচি চলতে পারে। ইসলাম সংস্কৃতি কাশ্মীরের চিরকালীন পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুসলীম সমাজের নিজস্ব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বলতে কাশ্মীরে কিছু নেই। অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের বুর্খা আছে, কিন্তু সেটি কাশ্মীরিদের চোখের উপর খোলা থাকে। একালে চলছে কাশ্মীরি 'বোলি' এবং পারসিক লিপি,—কিন্তু সংস্কৃত শব্দে সেটি কণ্টকাকীর্ণ। ভারতের ভাষায়, খাদ্যে, ব্যবহারে, পোশাকে, সামাজিক আচরণে সাহিত্যে-স্থাপত্যে-শিল্পে মুসলীম সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট,—ব্যবহারে, পোশাকে, সামাজিক আচরণে, সাহিত্যে-স্থাপত্যে-শিল্পে—মুসলীমপন্থী। হিন্দী বা পাঞ্জাবী ভাষা প্রবর্তনের জন্য যাঁরা কাগজে কাগজে তর্ক তোলেন, তাঁদের ভাষা বহুক্ষেত্রে উর্দু এবং লিপি আরবিক। কিন্তু কাশ্মীরে এর বিপরীত। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি কাশ্মীরে মুসলীম প্রভাবকে গ্রাস করেছে। পাঠান আমল থেকে মোগল আমল অবধি কাশ্মীরিরা ধর্মান্তরিত হয়েছে বটে, কিন্তু পুরাকালের আর্য সভ্যতার মূল নীতিগুলি তাদের স্বভাবধর্মে জড়িত রয়েছে। আর্য-সভ্যতার প্রতীক সম্রাট ললিতাদিত্যের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল 'চনকুন'। তিনি জাতিতে ছিলেন 'তুক্কর' এবং তাঁর বাস ছিল তুরুষ্ক দেশে (আধুনিক তুরস্ক)। ইনি একবার সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন একটি 'জিন মূর্তি' (বুদ্ধ মূর্তি)! সম্রাট ললিতাদিত্য তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং মগধ দেশ থেকে এক হাতীর পিঠে চড়িয়ে বিশাল এক বুদ্ধ মূর্তি তাঁর জন্য আনিয়ে দেন। এই

মূর্তিটি দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'চনকুন বিহারে' প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্তিটির নাম বৃহদ্বুদ্ধ। বৌদ্ধজগতে এমন বিশাল স্বর্ণমূর্তি অন্য কোনও যুগে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এই উদার সভ্যতার আদর্শ থেকে অদ্যাবধি কাশ্মীরিদের বিচ্যুতি ঘটে নি!

ভারতের বৃহৎ সমতলভাগে নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এক কাল থেকে অন্য কালে। কিন্তু চারিদিকের অবরোধের মাঝখানে কাশ্মীর ছিল আত্মকেন্দ্রিক, নিজকে নিয়েই সে থেকে এসেছে। মার খেয়ে তার পিঠ দুমড়িয়ে গেছে, রক্তে ভেসে গেছে তার উপত্যকা, দস্যুদলের হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছে বার বার, অনাচার সইতে না পেরে মুখ বুজে কেঁদেছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে অপমানে, অন্নের অভাবে জীবন দিয়েছে হাজারে হাজারে। কিন্তু আর্য-জাতির বেদমন্ত্র, বৌদ্ধ-সভ্যতার অহিংসাবাদ, হিন্দু-সংস্কৃতির মূল নীতি—এদের থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে নি। কোনও কাশ্মীরি আজ অবধি তরবারি ধরে নি, হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, ধর্মকে নিয়ে ধর্মান্ধ লড়াই করে নি, অনাচারের বিপক্ষে বিপ্লবের ধ্বজা ওড়ায়নি। ৫ হাজার বছর ধরে কোথায় যেন সে একটা নিগূঢ় নৈতিক এবং আত্মিক শক্তিকে ধারণ করে রয়েছে,—সহস্র অপমানের মধ্যেও সেই প্রদীপ যেন অনির্বাণ। সে ভয়ভীরু, স্তিমিত, তেজোবাঞ্ছনাহীন,—কিন্তু তার সহজাত পাণ্ডিত্য, তার মানবতাবাদ, তার নির্বিরোধ প্রকৃতি ও মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ—এইগুলি তাকে এক অনবদ্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। সেখানে সে হিন্দু বা মুসলমান কোনটাই নয়, শিখ রাজত্বের প্রভাব নেই তার উপর, ডোগরা বা ইংরেজ তাকে স্পর্শও করে নি এবং পাঠান বা তুর্কি বা ইরানির মার সে মনেও রাখে নি। সে চলে গিয়েছে তার সেই পুরাণে, তার বিদ্যায়, তার নিগূঢ় ভাবনায় এবং সহজ বৈরাগ্যে। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের এইখানে বড় রকমের পার্থক্য।

কিন্তু এই পার্থক্য কেবলমাত্র একটি যুগের চেষ্টায় সম্ভব হয় নি। গৌতম বুদ্ধের কাল থেকে খৃষ্টপরবর্তী পাঁচশ' বছরে যাঁরা একে একে কাশ্মীরে এসেছেন—অশোক, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, গান্ধারের কুশল রাজগোষ্ঠী—এঁরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অবধি কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর এবং পামীরের ওপারে কাশগড় ও ইয়ারকন্দ এবং মঙ্গোলিয়ার পূর্ব সীমানা অবধি অতি বৃহৎ ভূখণ্ড আপন অধিকারের মধ্যে এনেছিলেন। সেটি পররাষ্ট্র বিজয় নয়, এক্তিয়ারী সীমানা রচনাও নয়—সেটি ছিল সাংস্কৃতিক দায়িত্বের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালন করা। সিনকিয়াং বা তাকলা মাকান মরু অঞ্চলে ভারতের কোনও বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছিল এক একটি বৌদ্ধ সংস্কৃতি

চর্চার অধ্যাত্ম কেন্দ্র। সেখানে না ছিল একখানা তরবারি, না ছিল আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র—ছিল শুধু ভিক্ষুদলের এক একখানা ভিক্ষাপাত্র! সেই সঙ্ঘমিত্রদলের কাছে নতজানু হয়ে এসে বসেছে তুরুস্ক, মঙ্গোল, হ্যান্স (বর্তমান চীন) তিব্বতী—এবং আরও অনেক অনামা সম্প্রদায়। 'যাসার তাগ, দানদান কিলিক, মাইপো, এন্দেরে প্রভৃতি তাকলা মাকানের অন্তর্গত বৌদ্ধমঠের জীর্ণাবশেষগুলি অদ্যাবধি তারই পরিচয় বহন করে।

ঐতিহাসিক কালের এই হাজার বছরের মধ্যে আসেন অশোক, জলৌক প্রভৃতি। হুস্ক, যুস্ক, কণিষ্ক—এঁরা আসেন 'তুরুস্ক' বা 'তুরস্ক' জাতির থেকে। তাঁরা এসে আপন আপন চিহ্ন রেখে গেছেন এক একটি জনপদে। তাঁরা বৌদ্ধমঠ, চৈত্যবিহার প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। 'শ্রীনগর' ভারতসম্রাট অশোকেরই কীর্তি।

এর মধ্যে নানা সময়ে আসেন নানা নরপতি। নরজার, সিদ্ধ, উৎপলাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকুল, বসুকুল, মিহিরকুল প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন শ্বেত হূনবংশীয়। তোরামন ও মিহিরকুলের নাম ইতিহাসে অতি কুখ্যাত। কাশ্মীরের ইতিহাসে এত বড় কদাচারী ও নির্দয় নরপতি দ্বিতীয় নেই। কথিত আছে, একদিন তিনি তাঁর মহিষীর বক্ষোবাসে গৌতম বুদ্ধের স্বর্ণপদচিহ্ন লক্ষ্য করে জানতে পারেন, এই বক্ষোবাস সিংহলে প্রস্তুত। এর ফলে তাঁর মনে ভীষণ আক্রোশ দেখা দেয় এবং তিনি সিংহল আক্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সিংহলকে এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যকে পরাস্ত করে ফিরবার পথে পীর পাঞ্জালের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের চূড়া থেকে তাঁর একটি হাতী হঠাৎ গিরিখাদের নীচে পড়ে গিয়ে চীৎকার করতে থাকে। এটিতে তিনি কৌতুক বোধ করেন এবং গিরিশ্রেণীর উচ্চতম চূড়া থেকে তাঁর হুকুমে একশ' হাতীকে একে একে ফেলে দেওয়া হয়! পীর পাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত এই গিরিচূড়ার নাম 'হস্তীভঞ্জ'। হস্তীভঞ্জের আশেপাশে এই কাহিনীটি অদ্যাবধি প্রচলিত। রাজা মিহিরকুল তাঁর প্রমোদ ভবনের চারি পাশে নিহত নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধের মৃতদেহগুলি জমিয়ে তুলতে ভালবাসতেন! তিনি বৌদ্ধগণের শত্রু ছিলেন এবং শিবের উপাসনা করতেন। শ্রীনগরে 'মিহিরেশ্বর' শিবমন্দির' এবং অদূরবর্তী 'মিহিরপুর' তাঁরই কীর্তি। মিহিরকুল ৭০ বছর ধরে কাশ্মীর শাসন করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দেহে নানা দুষ্ট ক্ষত দেখা দেয়, বোধকরি তারই যন্ত্রণায় তিনি জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মনাশ করেন। প্রবাদ আছে, তাঁর মৃত্যুর পর কাশ্মীরিরা এক আকাশবাণীতে শুনতে পায়, "রাজা মিহিরকুল তিন কোটি নর-নারীর জীবননাশ করা সত্ত্বেও তাঁর পরলোকগত আত্মা সদ্‌গতি লাভ করেছে। কেননা, আপন দেহের প্রতিও তিনি দয়া প্রকাশ করেন নি!"

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আসেন প্রবরসেন। তিনি শ্রীনগরের প্রাচীন নাম বদলিয়ে রাখেন 'প্রবরপুর'। তৎকালে শ্রীনগরের ভিন্ন একটি নাম ছিল 'পুরানধিষ্ঠান।' এই পুরানধিষ্ঠানই বর্তমান 'পাণ্ড্রেথান'। এটি এখন শ্রীনগরের তিন মাইল উত্তরে পর্যটকদের পক্ষে এক মনোরম স্থান। প্রবরসেনের রাজত্বকাল কাশ্মীরের পক্ষে গৌরবজনক।

কর্কটবংশের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই শতাব্দী থেকেই কাশ্মীরের ইতিহাস অধিকতর সুস্পষ্ট হতে থাকে। এঁরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়—আদিত্যগোষ্ঠী। এঁদের মূল জনক ও জননী ছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য ও অনঙ্গলেখা। এঁদেরই চতুর্থ পৌত্র হলেন মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য। ইনি ৮ম শতাব্দীতে ৩৬ বছর ধরে কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন। ইনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী এবং কাশ্মীরের নূতন এক সভ্যতার প্রবর্তক। ইনি অনেকগুলি নূতন জনপদ নির্মাণ করেন। তাদের মধ্যে পরিহাসপুর, ললিতপুর এবং পর্নোৎস (আধুনিক 'পুঞ্চ') প্রধান। ইনি ছিলেন হিন্দুসভ্যতার স্তাবক, খামখেয়ালী ও মদমত্ত এক বিরাট পুরুষ। কথিত আছে, তিনি যখন সুদূর উত্তর-পূর্ব ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন, তখন তিনি তৎকালীন 'স্ত্রীরাজ্যে' (মণিপুর?) এসে দেখতে পান, হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্টা বিশাল এক নারীসেনাবাহিনী তাঁর সৈন্যদলের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত! কিন্তু প্রত্যেক নারী-সেনার অনাবৃত বক্ষযুগল লক্ষ্য করে সম্রাটকে ওইখানেই থমকিয়ে যেতে হয়! তাঁকে প্রথম দেখে এই নারীবাহিনীর পরিচালিকা—যিনি 'স্ত্রীরাজ্যের' রানী—তিনি আতঙ্কে কম্পমান হচ্ছিলেন, অথবা প্রণয়-রোমাঞ্চে থরথর করছিলেন, সেটি ঠিক বুঝতে পারা যায় নি!

("By showing their high breasts, and on seeing the emotion shown by the queen of "strirajya" in his presence by trembling andotherwise, no one could decide whether it were terror or love-desire".—Rajatarangini)

কিন্তু যে কারণেই হোক, সম্রাট সেই নারীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি, কারণ সে রাজ্যের পুরুষরা তাকে দেখে বনে-জঙ্গলে ও গুহা-গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। সম্রাট কেবল ধনরত্ন সংগ্রহ করে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ফিরবার আগে তিনি উক্ত স্ত্রীরাজ্যে নরহরি শ্রীবিষ্ণুর একটি ধাতব মূর্তি এমনভাবে চুম্বক ধাতুর সহায়তায় শূন্যে ঝুলিয়ে আসেন, যাতে সেটি উপরে ও নীচে সমান আকর্ষণ-বিকর্ষণে শূন্যেই ঝুলে থাকে!

সম্রাট ললিতাদিত্য অতিশয় মদ্যপায়ী, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রী

ছিলেন। কিন্তু অন্তদিকে ছিলেন উদার, দয়ালু হৃদয়বান এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। তিনি একদিকে যেমন বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ নির্মাণ করান, অন্যদিকে তেমনি একের পর এক মূর্তি, মন্দির এবং নানাবিধ স্থাপত্যের প্রতি উৎসাহ দান করেন। মার্তণ্ড শহরে আজও তাঁর অজস্র পুরাকীর্তি বর্তমান। তাঁর নির্মিত অগণন মন্দিরের মধ্যে পরিহাসকেশব, মুক্তস্বামী, সূর্যনারায়ণ বা মার্তণ্ড, ভূতেশ, জ্যেষ্ঠরুদ্র, চক্রধর, রাজবিহার, মুক্তবিহার, লোকপুণ্য, মহাবরাহ, মুক্তকেশব, গোবর্ধনধর বৃহদ্বুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাঁর মহিষী রানী কমলাবতী 'কমলহট্ট' নামক এক জনপদ নির্মাণ করে সেখানে 'কমলকেশব' নামক এক বৃহৎ রৌপ্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মন্ত্রীগণের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও তুরুষ্ক সম্প্রদায়ের লোকও ছিলেন। পরবর্তীকালে এই তুরুষ্কমন্ত্রী চনকুন সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন।

সম্রাট ললিতাদিত্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত। একদা তিনি তাঁর পরিহাসপুরের রক্ষিতা-ভবনে নারীপরিবৃত অবস্থায় প্রচুর মদ্যপানের পর তাঁর মন্ত্রীদলকে ডেকে বলেন, প্রবরসেনের প্রবরপুর যদি আমার পরিহাসপুরের মতো শোভাময়ী নগরী হয়ে থাকে, তবে প্রবরপুরে এখনই আগুন জ্বালিয়ে নগর ধ্বংস করো,—যাও।

মন্ত্রীরা অন্ধকার রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মদমত্ত রাজার মদিরা বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে দূর নগরীতে আগুন ধরিয়ে দিল এবং সম্রাট ঈর্ষাজনিত উল্লাসে সেই অগ্নিসৎকার স্বচক্ষে দেখলেন!

পরদিন নেশা কাটবার পর তাঁর কী অনুতাপ! এত ক্ষুদ্র তিনি? এত অনুদার? এমন অমানুষ?

মন্ত্রীরা কাঁপতে কাঁপতে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল সম্রাটের কাতর অনুশোচনা! মন্ত্রীরা তখন সহাস্য মুখে বললেন, সম্রাট, আপনি সুস্থির হন। কাল আপনার অবস্থা বুঝে আমরা ঘাস-খড়ের গাদায় আগুন দিয়েছিলুম!

বাঁচিয়েছ, মন্ত্রী!—সম্রাট বললেন, মদের খেয়ালে যদি কখনও এ ধরনের হুকুম দিই, তোমরা কখনও সেটি পালন করো না!

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর প্রায় একশ' বছর অবধি কর্কটগোষ্ঠী রাজত্ব করেছিল। কিন্তু কয়েকটি "নীচ জাতীয়া ও শিথিল চরিত্রা" নারীর গর্ভে সম্রাটের যে কয়েকটি সন্তান জন্মে তারাও পরবর্তীকালে শাসনদণ্ড হাতে পেয়ে আরও নীচে নেমে যায়। যাই হোক কর্কটবংশের পরে আসে উৎপল বংশীয় নরপতিরা। ৯ম শতাব্দীর শেষদিকে অবন্তীবর্মণের রাজত্বকাল বিশেষ গৌরবের। তাঁর কালে কাশ্মীরের সুখ ও সমৃদ্ধি ঘটে। ইনি উৎপলরাজের পৌত্র। এঁরা ছিলেন গরীব গৃহস্থ। কিন্তু আপন

প্রতিভায় অবন্তীবর্মণ জনগণের প্রিয় হন। কাশ্মীরের 'দামার' সম্প্রদায় ছিল দুর্ধর্ষ ও ধনাঢ্য জমিদারগোষ্ঠী। এদের চক্রান্তে, স্বেচ্ছাচারে এবং দলবদ্ধ হিংস্রতায় রাজশক্তির উত্থান-পতন ঘটত। এদের ন্যায়পরায়ণতার বালাই ছিল না এবং দরিদ্র প্রজাপীড়নে এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের একটা অংশ এদের সহায়ক ছিল এবং মন্ত্রীদের উৎকোচের দ্বারা এরা বশীভূত রাখত। এই 'দামার' বা দামড়ার দল অবন্তীবর্মণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে বশীভূত করতে সমর্থ হন। সকল বিরুদ্ধশক্তি তাঁর নিকট পরাস্ত হয় এবং তিনি ২৮ বছরকাল রাজত্ব করেন। তাঁর মন্ত্রী সুরাদিত্য কাশ্মীরের বিদ্বৎসমাজকে এবং কবি, শিল্পী, দার্শনিক ও কলাকারগণকে বহু সম্মানে ভূষিত করেন। অবন্তীবর্মণের কালে তাঁর পূর্তবিদ্‌ 'শ্রীযূর্য' বরাহমূলে গিরিখাদ কেটে বিতস্তার জল অপসারণ করেন। (বর্তমান 'সোপোর')। অবন্তীবর্মণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের কালে কাশ্মীরে আবার অবর্ণনীয় অরাজকতা দেখা দেয়। পরবর্তী দু'শ' বছর ধরে কাশ্মীরের বীভৎস ইতিহাসে শুধু মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায়, অনাচার, রাজনীতিক গুপ্তহত্যা, ফাঁসি, বিষপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রীদলের চক্রান্ত, চাটুকার সামরিক কর্তাদের কানাকানি এবং অধঃপতিত ও ঘৃণ্য সমাজের নরনারীদের সিংহাসন দখল—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই সব রাজারানীরা যেন পরমুখাপেক্ষী সঙ বা ভাঁড়ের মতো কৌতুকরঙ্গ নিয়ে অবসর বিনোদন করত। (Political History of Kashmir : R C. Kak)

১০ম ও ১১শ শতাব্দীর কাশ্মীর ছিল অন্ধকারে ও অত্যাচারে আচ্ছন্ন। এরই মধ্যে আসেন হর্ষরাজ, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুস্থল ও উচ্ছল—এঁদেরই কালে প্রথম একবার কাশ্মীরে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সেই বিদ্রোহে পণ্ডিত, পুরোহিত, সৈন্য, রাজকুমার, মাঠের চাষী ও শ্রমিক একযোগে প্রাসাদ আক্রমণ করে, আগুন জ্বালিয়ে রানীদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করে, যুবরাজকে খান খান করে কাটে এবং পলাতক রাজাকে এক দরিদ্র ভিখারীর ঘর থেকে ধরে এনে সর্বসমক্ষে বলিদান করে। এইভাবে প্রথম 'লোহার' রাজগোষ্ঠীর উচ্ছেদ ঘটে।

পরে 'সুস্থল' ও 'উচ্ছল'—এই দুই রাজাকেই হত্যা করা হয় (১১০১—২৮)। তারপর রাজা হন সুস্থলের পুত্র জয়সিংহ। তিনি তীক্ষ্ণধী ও কূটনীতিক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে ১৭ বছর অবধি 'দামারদের' সঙ্গে বিবাদ করতে হয়। তিনি ২৭ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান এবং অতঃপর কাশ্মীরে আবার ভয়াবহ অন্ধকার যুগ ফিরে আসে।

ইতিমধ্যে ১০ম শতাব্দীর রাজা লোহার বংশের সিংহরাজ তাঁর কন্যা দিদ্দার বিবাহ দেন রাজা প্রভগুপ্তের পুত্র ক্ষেমগুপ্তের সঙ্গে। তখন থেকে ক্ষেমগুপ্তের নাম

হয় 'দিদ্দাক্ষেম'। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর বালক পুত্র অভিমন্যু রাজা হন, কিন্তু জননী দিদ্দা হন তাঁর অভিভাবিকা। দিদ্দা কঠোর প্রকৃতির নারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শয়নকক্ষে রাজপুরুষরা অবাধে প্রবেশ করতেন! অভিমন্যুর রাজত্বকাল মাত্র ১৪ বছরের। কিন্তু ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, চাপা কানাকানি, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা—এইগুলিতে রাজ-প্রশাসন ব্যবস্থা জীর্ণ হতে থাকে। রানী দিদ্দা কঠোর হস্তে এগুলিকে দমন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরবাহনের সাহায্যে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ করে তোলেন। কিন্তু পরে ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তে নরবাহনের প্রতি তিনি বিরূপ হন। একদিকে তাঁর এই কঠোর ব্যবস্থাপনা, অন্যদিকে তাঁর দেহসৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট নানা রাজপুরুষ,—এই দুইয়ের সংযোগে বালক অভিমন্যুর রাজত্বকাল নাটকীয় হয়ে ওঠে। নরবাহন অপমানবোধে আত্মহত্যা করেন। এই সময়ে দামারের দলকে রানী দিদ্দা নানা কারণে ভয় ও সন্দেহ করতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর নৈতিক চরিত্র অতিশয় শিথিল ছিল। তিনি ছিলেন একপ্রকার অনন্তযৌবনা এবং প্রকৃতই রূপসী। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে প্রণয়ী, শুভানুধ্যায়ী, নিকট-বন্ধু, আত্মীয়—এদেরকে বিনাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। একদা নিজেকে নিরুপায় দেখে তিনি তাঁর পূর্ব-বিতাড়িত এক প্রণয়ীকে পুনরায় ডাকলেন। সে ব্যক্তি ছিল বীর ও যোদ্ধা। নাম তার 'ফাল্গুন।' তাঁর প্রথম পুরস্কার স্বরূপ রানী তাঁকে নিয়ে ঢুকলেন শয়নকক্ষে। বয়স্ক এবং বিবাহিত যুবক রাজা অভিমন্যু তাঁর জননীর এবম্বিধ দুর্নীতি নিঃশব্দ বিষাদে লক্ষ্য করতে করতে এক সময় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিনটি শিশুপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নন্দীগুপ্ত রাজা হয়। পুত্রশোকাতুরা দিদ্দা ধর্মকর্মে মন দেন। তিনি দুর্নীতি পরিত্যাগ করে আপন সংগৃহীত ধনরত্নসহ প্রজার কল্যাণে মনোনিবেশ করেন। ভুজ্য নামক এক ধর্মনীতিপরায়ণ ব্যক্তির সহযোগে তিনি 'অভিমন্যুপুর' নামক জনপদ এবং 'অভিমন্যুস্বামী' বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর একে একে তাঁরই আনুকূল্যে দিদ্দাস্বামী, দিদ্দাপুর, কঙ্কনপুর প্রভৃতি মন্দির ও জনপদ নির্মিত হতে থাকে। তাঁর নাম হয় 'কঙ্কনবর্ষা।' তিনি মঠ, চৈত্য, বিহার এবং বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ করেন বিতস্তা ও সিন্ধুর সংযোগস্থলে। কাশ্মীরের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারী একে একে মোট ৬৪টি অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠান ও জনপদের স্রষ্টা হয়ে ওঠেন! অতঃপর তিনি জীর্ণোদ্ধার কর্মে মনোযোগ দেন। যেখানে যত পুরাকীর্তি জরাজীর্ণ হয়েছিল, যত ছিল ভগ্নাবশেষ এবং কালক্ষত,—তিনি সেগুলি সযত্নে পুনর্নির্মাণ করান। এমনি করে এক বছর তাঁর শোকসন্তাপ ও বিভিন্ন কর্মে কেটে যায়!

হঠাৎ একদিন এই বয়স্কা রমণীর মনে যৌবন চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং তিনি

উপলব্ধি করেন, তাঁর তিনটি শিশুপৌত্র তাঁর সেই রতিরঙ্গের পথে মস্ত বাধাস্বরূপ! এই বাধাকে অপসারণ করার জন্য তিনি সংগোপনে 'ডাইনীবৃত্তি' শিক্ষা করেন এবং কৃতকার্য হন। অতঃপর এই বিদ্যাকে, তিনি পিতামহী হওয়া সত্ত্বেও, প্রয়োগ করেন তাঁর তিনটি পৌত্রের প্রতি একে একে। পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে তিনি উক্ত তিনটি বালক নন্দীগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্তর মৃত্যু ঘটান (৯৭৩—৮০ খৃঃ)। কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি। এই অদ্ভুত বিদ্যা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। এই বিদ্যা প্রয়োগ করে তিনি একশ'রও বেশি সংখ্যক জীবন নষ্ট করেন। এই সময় তাঁর নিকট-প্রণয়ী 'ফাল্গুনের' মৃত্যু ঘটে এবং এর ফলে রানী দিদ্দা বন্য হস্তিনীর মতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। তাঁর হুকুমে যে কোনও শ্রেণীর যে-কোনও পুরুষই তাঁর দেহলালসার নিকট আত্মদান করতে বাধ্য হত!

রাজকার্যে, প্রশাসন ব্যবস্থায়, জনসেবায় এবং রাষ্ট্রনীতির পরিচালনায় রানী দিদ্দার অনন্য প্রতিভা ইতিহাস স্বীকৃত। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতসমাজ-পরিচালিত রাজনীতি ১৪শ শতাব্দী অবধি খলতা, কপটতা, ইতরতা ষড়যন্ত্র, উৎকোচ, চারিত্রিক দুর্নীতি, ভয়াবহ শোষণ ও অনাচার ইত্যাদি বিভিন্ন দুষ্কৃতির দ্বারা পরিচালিত হত। অনেক ক্ষেত্রে রাজার চরিত্র সৎ ও ধর্মপরায়ণ, কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বা অমাত্যগণ তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে কোনও কালে শুচিশুদ্ধ থাকতে দেয় নি। কাশ্মীরের ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বের গৌরব খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুর চরিত্র কাশ্মীরে মেলেনি। কশ্মীরের সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অধ্যাত্মদর্শন এবং লোক-প্রতিভার পক্ষে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—সেগুলি হিন্দু-সংস্কৃতির চিরকালীন গৌরবের পরিচয় দেয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কাশ্মীরের যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব,—ভারতের অন্যান্য স্থলে বোধকরি তার সমকক্ষ কেউ নেই। মূল কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ৫১টি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ এবং সেইগুলিকে কেন্দ্র করে ৫১ খানি পুরাণ বা মাহাত্ম্য রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে পৌরাণিক অলৌকিকতা আছে প্রচুর, কিন্তু পৃথিবীর কোনও ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণ অলৌকিক কাহিনী থেকে মুক্ত নয়। গৌরবের কথা এই, এই মাহাত্ম্যগুলিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলিকে ত্রিকালজয়ী আখ্যা দিলে অতিশয়োক্তি হয় না। পার্বত্য অবরোধের মধ্যে এই হিন্দু-সংস্কৃতি নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের সাংস্কৃতিক সংযোগ অনচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত,—এটি যে-কোনও ইতিহাসের ছাত্র জানেন। অধুনা কাশ্মীর জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানপ্রধান, সেখানে কেবলমাত্র সংখ্যা বা হাত-তোলা ভোটের গণতন্ত্রের দ্বারা রাজনীতিক সুযোগ সুবিধা ঘটতে পারে। কিন্তু এই গণতন্ত্র বা গণজীবনের উপর

চেপে বসে রয়েছে বিগত ৫ হাজার বছরের সেই আর্যসভ্যতা—পরবর্তীকালে যার ভিন্ন নাম হয়েছে হিন্দু বা 'সিন্ধু' সংস্কৃতি! এই অপরিহার্য সিন্ধু সংস্কৃতির সর্বাগ্রেষী প্রভাবের মধ্যে পড়েছে আধুনিক পাঠান বা পাখতুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান, দম্‌বা, বম্‌বা, দার্দ, হুন্‌জা, এস্‌সেনি (ইয়াসেন), কাশ্মীরি হিন্দু, লাদাখী বৌদ্ধ, ডোগরা, ১৯শ শতকের শিখ সম্প্রদায় প্রভৃতি। জগদ্দল পাথরের মতো এই সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে এমনভাবে চেপে রয়েছে যে অদ্যাবধি প্রত্যেক কাশ্মীরির শিক্ষা, চিন্তা, কল্পনা, রাজনীতিক মতবাদ, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, সামাজিক জীবন, অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা, সমস্তই এরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর থেকে তাদের মুক্তি নেই। অবশ্য ইসলামের সংস্কৃতি এবং মুসলিম সভ্যতা কাজ করেছে প্রচুর। মোগল আমলে এসেছে উদারতা, সহনশীলতা, সমৃদ্ধি, সামাজিক সুবিচার ইত্যাদি। কাশ্মীরের জাত বদলেছে অনেকাংশে, কিন্তু ধাত বদলায় নি বিন্দুমাত্র। কাশ্মীরে পদার্পণ করামাত্রই সেই প্রাচীন আর্যসংস্কৃতি যেন চারিদিক থেকে পর্যটককে আকর্ষণ করে। প্রতি তীর্থ আর মাহাত্ম্য তাকে টানে। এখানে এসে ইংরেজ, আমেরিকান, জার্মান, ফরাসী—এরা খুঁজতে থাকে একটির পর একটি হিন্দু-স্থাপত্য। উচ্চশিক্ষিত মুসলমান এখানে 'পণ্ডিত' নামেও পরিচিত। স্কুল-কলেজের প্রথম শিক্ষা 'সিন্ধু-সংস্কৃতি'। মুসলমান বা হিন্দু বালকবালিকার জীবনের প্রথম পাঠ 'হিন্দুশাস্ত্র'। কাশ্মীরের প্রত্যেকটি নগর, শহর, জনপদ, গ্রাম, পুরাকীর্তি, নদী ও সরোবর—কোথাও কোনও নাম 'অ-হিন্দু' নয়। কালক্রমে তাদের হয়ত অপভ্রংশ বা বিকৃতি ঘটেছে, কিন্তু মূল জায়গায় সেটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত। প্রত্যেকটি অরণ্য, পর্বত, উপত্যকা, গিরিসঙ্কট, উপবন, লোকালয়—অদ্যাবধি হিন্দু নাম বহন করে। অমন সুন্দর যে সম্রাট আকবরের পার্বত্য দুর্গ, অথবা তখ্‌ত্‌-ই-সোলেমানের চূড়া—সে দুটি প্রত্যেক কাশ্মীরি মুসলমানের নিকট 'হরিপর্বত' ও 'শঙ্করাচারিয়া' নামে পরিচিত। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, একই প্রাচীরের সংলগ্ন, একই উদ্যানে নির্মিত, একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত—মুসলমান ও হিন্দুর স্থাপত্য সমভাবে উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা সযত্নরক্ষিত। বরং অধিকাংশ স্থলে হিন্দু-স্থাপত্য রক্ষার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মুসলমান সমাজ। আগে তাঁরা কাশ্মীরি, পরে তাঁদের অন্য কথা!

রানী দিদ্দার কাহিনীটুকু এখনও শেষ হয়নি। ঐতিহাসিক বলছেন, রাজ্য-শাসন ও পরিচালন কার্যে সুদক্ষ এই প্রতিভাশালিনী রানী প্রবীণ বয়স অবধি রিরংসার তাড়নায় জরজর ছিলেন! তাঁর ছিল অনন্ত যৌবনশ্রী এবং রূপলাবণ্য। তিনি অসপত্ন রাজ্যের একচ্ছত্র রানী হয়ে তাঁর দেহলালসাকে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করবেন, এজন্য হত্যা করেছেন পৌত্রগুলিকে এবং অন্যদিকে সংখ্যাতীত কলঙ্ক-

প্রচারকদিগকে বিনাশ করেছেন! অগণিত সংখ্যক লোভাতুর কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদেরকে তিনি কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা ক্রয় করেছিলেন! তিনি দিনে ও রাত্রে চিত্ত-বিনোদন কর্মে লিপ্ত থাকতেন।

এমনি এক সময়ে 'পর্ণোৎস' (পুঞ্চ) নগর থেকে পঞ্চভ্রাতাসংযুক্ত একদল মহিষ-পালক এসে রাজদরবারে চিঠিবিলি করার কাজ নেয়। কিন্তু 'পররাষ্ট্র দপ্তরে' যে ব্যক্তি এসে কাজ নেয় তার নাম 'তুঙ্গ'। তুঙ্গকে দেখামাত্রই রানী দিদ্দা প্রণয়াসক্তা হন এবং তখন তার বহু প্রণয়ী থাকা সত্বেও জনৈক দূত মারফত তুঙ্গকে ডেকে পাঠান। এই ঘটনায় তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রণয়ী 'ভুজ্য' রুষ্ট হন। রানী দিদ্দা বিষপ্রয়োগ করে ভুজ্যকে হত্যা করেন! অতঃপর এই প্রণয়াবিষ্টা রানী মহিষপালক তুঙ্গকে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর (সর্বাধিকার) পদে নিযুক্ত করেন। এর ফলে অন্যান্য বিতাড়িত মন্ত্রী ও রাজপুরুষরা রাজ্যময় বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে চান এবং দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার বিগ্রহরাজকে নেতৃত্বে বরণ করেন। তাঁদের প্ররোচনায় রাজ্যের ব্রাহ্মণরা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে দেন এবং গুপ্তঘাতকের দল তুঙ্গকে খুঁজে বেড়ায়। রানী স্বয়ং তুঙ্গকে রাজপ্রাসাদের এক বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু তিনি জানতেন কাশ্মীরের 'ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি।' উপবাসী ব্রাহ্মণদলের ভিতর থেকে তাদের নেতা 'সুমনমস্তককে' ডেকে রানী তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দেন। ফলে, প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করে ব্রাহ্মণের দল সরে পড়ে এবং যথাকালে রানী দিদ্দা বিগ্রহরাজকে বিতাড়িত করেন। তুঙ্গের তুঙ্গে এবার বৃহস্পতি! তিনি দ্বিগুণ শক্তিমান হয়ে ওঠেন এবং বিদ্রোহের ধ্বজা যারা তুলেছিল, তাদেরকে ধরে একে একে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেন।

রানী বোধ করি তাঁর দিব্যদৃষ্টির দ্বারা মহিষপালক তুঙ্গের ভিতরে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যপালকে আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যুৎ যেমন জড় লৌহচক্রকে সচল করে, রানী তেমনি ভাবে তুঙ্গের ভিতর এক অপরাজেয় প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করেছিলেন! রাজ্যের সর্বপ্রকার বিদ্রোহ, অসন্তোষ ও অশান্তিকে তুঙ্গ কঠোর হস্তে দমন করেন। ব্রাহ্মণরা উৎকোচ ও সুবিধা লাভ করে বশীভূত হন। বিগ্রহ-রাজের সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ পালায়, কেউ বা খুন হয়। সুমনমস্তক প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ—যারা রানীকে ঠকিয়ে স্বর্ণমুদ্রা নেয়, তারা কারাগারে যায়। এই সময় রাজাপুরীর (আধুনিক রাজৌরি) নরপতি পৃথ্বীপাল কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান তুঙ্গ তাঁর দলবল নিয়ে ভিন্ন পথ ধরে গিয়ে রাজৌরি আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে সমগ্র নগরী ভস্মীভূত করেন। পৃথ্বীপাল পরাজয় স্বীকার করে তুঙ্গের নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং ক্ষতিপূরণ দেন। অতঃপর তুঙ্গ কাশ্মীরের প্রধান

সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশশত্রু দামার বা দামড়াদের উপর। দামার গোষ্ঠীকে তিনি নিধন করেন। তিনি রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা এবং উৎকোচমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার পত্তন করতে সমর্থ হন। রানী দিদ্দার শত শত দেহসম্ভোগী প্রণয়ীদলের মধ্যে প্রাক্তন মহিষপালক দানবাকৃতি ও সুদর্শন তুঙ্গ সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে ওঠেন বটে কিন্তু অবসরকালে রানীর অন্যান্য প্রণয়ীরাও বঞ্চিত থাকতেন না। পুত্র ও পৌত্রাদির মৃত্যুর পরও দিদ্দা ২২ বছর অবধি অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর সহোদর উদয়রাজের অপর পুত্র সংগ্রামরাজকে রানী দিদ্দা যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেন। যুবরাজ রাজা হবার পর প্রবল পরাক্রমে ২৫ বছর ধরে কাশ্মীরে রাজত্ব করে যান (১০০৩-২৮)।

রানী দিদ্দার মৃত্যু ঘটে ১০০৩ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। এই তিথিটি কাশ্মীরে অতি প্রসিদ্ধ, কেননা প্রবাদ আছে, এই পুণ্য তিথিতে কাশ্মীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শারদা-সরস্বতী জাগ্রত হন শারদাতীর্থমন্দিরে এবং এই তিথিতেই গঙ্গাবল তীর্থে (১৩০০০ ফুট) দেবী জাহ্নবী তীর্থযাত্রীদের অনেকের নিকট আবির্ভূতা হন!

দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির আধার রানী দিদ্দা কাশ্মীর-ইতিহাসের এক মস্ত বিস্ময়। তাঁর প্রজাপালনের প্রতিভা, গঠনশক্তি, প্রশাসন ব্যবস্থা, লোককল্যাণকর্ম,—এগুলির সঙ্গে মিলে রয়েছে এক ভ্রষ্টচরিত্রা, দুর্নীতিপরায়ণা, যৌন-সরীসৃপ অদ্ভুতস্বভাবা নারী!

॥ ২০ ॥

হিন্দু কাশ্মীরের শেষ অধ্যায়

কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীণ হিন্দুসংস্কৃতি এবং হিন্দুজাতির রাজত্বকাল এ দুটি এক বস্তু নয়। দুরারোহ পর্বতমালার বেষ্টনীর মধ্যে এই সীমায়িত হিন্দুসংস্কৃতি যেমন শত শত বছর ধরে একটি কালজয়ী ইতিহাস রচনা করে এসেছে, এর ঠিক বিপরীত দিকে দেখি হিন্দুরাজত্বের অবিশ্বাস্য কলঙ্ককাহিনী।

ভারতীয় হিন্দু এবং কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ—এই দুইয়ের ভিতর পার্থক্য প্রচুর। সামাজিক সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতি যেমন সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছে, সেটি কাশ্মীর ভূখণ্ডে সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল—এরা সবাই একত্র মিলেছে মেলায়, পাল-পার্বণে, তীর্থপথে এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলনে। ভারতে সবাইকে নিয়েই হিন্দু জাতি। কাশ্মীরে তা হয়নি। মধ্যযুগের শেষ অবধি দুটি জাতি ছিল কাশ্মীরে। ব্রাহ্মণ এবং বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ যারা জাতিচ্যুত। এর বাইরে যারা ছিল তারা আদিবাসী গোষ্ঠী এবং পার্বত্য সম্প্রদায়। তাদের জাতি-নির্ণয় ছিল না। যেমন দার্দ বা দারদ। এরা প্রাচীন আর্যসম্ভূত—যে-আর্যরা আজও ছড়িয়ে আছে এসসেনি বা চিত্রালীদের মধ্যে; যাদের উপনিবেশ আজও পাওয়া যায় কারাকোরমের এবং হিন্দুকুশের অন্তর্গত কাফিরিস্তানে। এদের জাতি আজও অনির্ণীত। দার্দরা কেউ গেছে মুসলিম সমাজে, কেউ বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে। অনির্ণীত জাতি হিসাবে বম্‌বা, দম্‌বা, চাক প্রভৃতি বিভিন্ন পার্বত্য সম্প্রদায় ছিল নানা পাহাড়ে ছড়িয়ে। এদের সবাইকে দূরে রেখে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরা শাসন করত কাশ্মীরের সমতল উপত্যকা। প্রাচীন কাল থেকে খৃষ্টীয় ১৪ শতাব্দী অবধি কাশ্মীরের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন এই ব্রাহ্মণদের দ্বারা আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এরা কখনও হয়েছে রাজা, কখনও মন্ত্রী, কখনও বা রাজপুরুষ। এদের বিধান, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ, পরামর্শ - এগুলিকে অস্বীকার করে কোনও নরপতির পক্ষে শাসনকার্য চালানো সম্ভব ছিল না। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কারও পক্ষে প্রবেশপথও নিষিদ্ধ ছিল। সম্রাট ললিতাদিত্যের পর কাশ্মীর থেকে বৌদ্ধ বিতাড়ন মোটামুটি আরম্ভ হয়—সেটি ব্রাহ্মণদেরই পরামর্শে। একদিকে যেমন হিন্দুসংস্কৃতির জয়ঘোষণা ছিল, অন্যদিকে তেমনি ছিল অতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক অনাচার ও উৎক

অসহিষ্ণুতা, জাতি বিদ্বেষ, রাজনীতিক ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা। এরাই প্রতি যুগে উসকিয়ে তুলত রাজপ্রাসাদের চক্রান্ত, প্রশাসনিক দুর্নীতি, রাজনীতিক গুপ্তহত্যা এবং পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—এদের অসাধ্য কিছু ছিল না; ৯ম শতাব্দীর পর থেকে ১৪শ শতাব্দী অবধি কাশ্মীরের অধোগতির ইতিহাস।

রানী দিদ্দার কঠোর শাসন ব্যবস্থার আমলে (৯৮১—১০০৩) প্রাক্তন মহিষ-পালক 'তুঙ্গ' স্বীয় প্রতিভার গুণে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থায় কাশ্মীরের অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি তাদের সুখসমৃদ্ধির আশ্বাসলাভ করে। কিন্তু রাজা সংগ্রামরাজের মন তুঙ্গের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হয় ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে এবং রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত সপুত্রক তুঙ্গ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। তিনি বর্ণবিদ্বেষের বলি। কোথাও রাজা অযোগ্য, রানী অসচ্চরিত্রা; কোথাও রানী বুদ্ধিমতী, রাজা লম্পট এবং বিলাসপ্রিয়। রাজা যেখানে সাধু, মন্ত্রীদল সেখানে ষড়যন্ত্রকারী। এমনি করে চলে এসেছে রাজা হরিরাজ, অনন্ত, কলস, উৎকর্ষ এবং হর্ষ (১০০৩—১১০১ খৃঃ)। এর মধ্যে এসেছেন রানী শ্রীলেখা, জয়লক্ষ্মী, সূর্যমতী। কোথাও রাজা অপদার্থ, রানী কোথাও জারজ সন্তানের জননী। রাজা কোথাও সন্তানের দ্বারা বিতাড়িত, রানী কোথাও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আবার রানী কোথাও মন্দিরাদির স্থাপনায় প্রমত্ত, রাজা কোথাও চাটুকার ও কুচক্রীর দ্বারা পরিবৃত। রাজপ্রাসাদের মধ্যে যখন দুর্নীতি, দুষ্কৃতি ও কুকীর্তির নরককুণ্ড রচিত হচ্ছে বাইরে এসে তখন বিষ্ণু ও শিবস্থাপনা চলছে! বাইরে থেকে রাত্রির অন্ধকারে সঙ্গোপনে আসছেন পরস্ত্রীর দল রাজপুরুষগণের গুপ্তমহলে; ভিতর থেকে রানী, রাজকন্যা বা রাজবধূরা প্রাসাদ সীমানা ত্যাগ করে যাচ্ছেন তাঁদের গুপ্ত বৃন্দাবনে। আবার কোথাও রাজা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছদ্মবেশে রাজধানীর পথে-ঘাটে মধ্যরাত্রে নারীর অন্বেষণে—

"The king in his lust after illicit amours used to roam about from house to house during the night, finding no pleasure in the embraces of his own wives : Rajatarangini".

অন্যদিকে এরই পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় স্থাপত্যকীর্তি রচনার অতি বাহুল্য। চারিদিকে অজস্র পাহাড়, গিরিনদী, উপবন, সরোবর, নিকুঞ্জবীথিকা এবং প্রাকৃত দাক্ষিণ্যের অনন্ত সম্ভার। যেখানে-সেখানে, যে-কোনও নদীতটে, সরোবরের তীরে, ছোট ও বড় পাহাড়ের চূড়ায়, অরণ্যে, উপত্যকায়, গিরিখাদের তলায় তলায়—মন্দিরের পর মন্দির, কিংবা বেদী রচনা, মূর্তি প্রতিষ্ঠা, বিজয়-স্তম্ভ,—কিছু না হোক, নাটমন্দির। রাজকন্যা রাজার প্রিয়, সুতরাং তার নামে হল সুপ্রসিদ্ধ লতিকামঠ।

জয়াকর ছিলেন এক রাজার বিদূষক, সুতরাং তাঁর নামে হল মস্ত জনপদ জয়াকরগঞ্জ। সংগ্রামরাজের রানী সঞ্চয় করেছিলেন প্রচুর ধনরত্ন, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হল মায়াগ্রাম। এর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ছিল সম্পদের আত্মাভিমান, রাজকীয় দম্ভ, গর্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ছিল প্রতিযোগিতার ঠোকাঠুকি। কিন্তু এমনি করেই গড়ে উঠেছে মাতৃগুপ্তস্বামী (বিষ্ণু), দিদ্দামঠ, কিন্নরগ্রাম, মধ্যমঠ, চক্রধর, বিজয়েশ্বর, নরপুর, তক্ষনাগ, জয়বন, হরেশ্বর, ভোগবতী, হিরণ্যাক্ষ (হিরণ্য গঙ্গা তীরবর্তী), জয়েন্দ্রবিহার, ত্রিপুরেশ্বর, রত্নবর্ধনেশ, সুগন্ধেশ, ভীতিকা, উত্তরমানস (গঙ্গাবল), উল্লোলসরস (উলার হ্রদ)। ভদ্রাপীঠ ইত্যাদি ইত্যাদি। একালে বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে কিছু রাজপুত, কিছু শিখ বা পাঞ্জাবী, কোড়নের মতো দু'চারজন মারাঠা,—এঁরা গিয়ে কাশ্মীরে বসে গেছেন। কিন্তু কাশ্মীরের হিন্দুসংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে আর্যসংস্কৃতির নামান্তর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কাশ্মীরের ইতিহাস অনাচার ও কলঙ্কের মসীলিপ্ত। ১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে রাজা জয়সিংহ অনাচারী ভূম্যধিধারী ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী 'দামার'দের সঙ্গে ১৭ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে মারা যান। তারপর থেকে দু'শ' বছর অবধি আবার কাশ্মীরে অন্ধকার ও অরাজকতার যুগ ফিরে আসে। ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম আফগান আক্রমণ ঘটে। পশ্চিম দিক থেকে তাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়। মোট ২৬টি প্রধান প্রবেশপথ ছিল কাশ্মীরে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল 'দ্বারবতী'। সেটি আধুনিক মুজাফ্ফরাবাদের নিকট—আগেই বলেছি। এই 'দ্বার' ভেঙ্গে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসে কান্দাহার রাজের প্রধান সেনাপতি ডুলুচা জুলুকাদের খান। সেটি রাজা শুহদেবের রাজত্বকাল (১৩০০—২০)। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সমতল উপত্যকায়। চারিদিকে 'মার মার' শব্দ ওঠে, অবারিত লুটতরাজ আরম্ভ হয়, আগুনের লকলকে শিখায় রাজধানীর আকাশ লাল হতে থাকে, রক্তে ভেসে যায় রাজপথ, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তারা ছিনিয়ে নেয়, বেদম মার দিয়ে তারা কাশ্মীরের হাড় পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেয়। রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতি যত বাড়ে, ততই তার সঙ্গে বেড়ে ওঠে আত্মিক দুর্বলতা। বহিঃশত্রুর পক্ষে সেইটিই সুবিধা। কানাকানি, ষড়যন্ত্র, ব্যক্তিবিদ্বেষ, রাজকোষ নিয়ে চৌর্যবৃত্তি, দরিদ্র সাধারণের দুর্দশার প্রতি উপেক্ষা, আহার্যসামগ্রী ও বস্ত্রাদি লুকিয়ে ফেলা, রাজধানীর দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও কদাচার, ব্যভিচার ও নীতিচ্যুতি—কাশ্মীরের হিন্দু-রাজত্বের এই পরিণতির উপরে ডুলুচা হানল খড়্গাঘাত! এর সঙ্গে এল বালতিস্তানী ভোট্টা সামন্তপুত্র রিনচনের প্রচণ্ড আক্রমণ পূর্বপর্বতের প্রান্তের জোযিলা গিরিসঙ্কটের অন্তরালে সেই ব্যক্তি সসৈন্যে ওৎ পেতে

ছিল। একদিকে কান্দাহার রাজের সেনাপতি জুলকাদের, অন্যদিকে রিনচনের আক্রমণ—ছারখার হল উপত্যকা, পুড়ে ছাই হল রাজধানী—রাজা শুহদেবকে প্রথমেই হত্যা করা হয়। শুহদেবের পরে সেই ফাঁকে রাজা সেনদেব এসে সিংহাসনে বসলেন।

চারিদিকের ওই মহৎ সর্বনাশের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়ালেন জাতীয়তাবাদী জননেতা তরুণ পণ্ডিত রামচন্দ্র। এঁকে সেনদেব তাঁর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি ডাক দিলেন সমগ্র কাশ্মীরকে—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! হিন্দু কাশ্মীর অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু রিনচন প্রথমেই হত্যা করলেন সেনদেবের সেনাপতি পণ্ডিত রামচন্দ্রকে! কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদ ওইখানেই আবার মুইয়ে পড়ল। ওদিকে গগনগিরির তলায়-তলায় শাখা-সিন্ধুর ধার দিয়ে সোনামার্গ পেরিয়ে আরেকজন আসছেন ৬০ হাজার (?) ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদল নিয়ে,—তাঁর নাম কর্মসেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজ সেনদেব তাঁর প্রাক্তন সেনাপতি রামচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী কোটাকে নিয়ে ঘরকন্না পেতেছিলেন! কিন্তু কর্মসেনের অস্ত্রশস্ত্র এবং ৬০ হাজার ঘোড়ার গল্প শুনে তিনি তাঁর নবপরিণীতা শ্রীমতী কোটাকে ফেলে একদিন মধ্যরাত্রে ছদ্মবেশ ধরে পালিয়ে গেলেন সোজা তিব্বতের দিকে। কিন্তু কর্মসেনের দল এসেছিল লুটতরাজ করতে এবং আগুন জ্বালাতে। শ্রীনগরসহ সমগ্র উপত্যকা আবার দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল।

লুটপাট সেরে ঘোড়ার পিঠে প্রচুর ধনরত্ন সামগ্রী চাপিয়ে কর্মসেনের দল 'তার্বল' গিরিসঙ্কট পার হয়ে চলে গেল! এদিকে কান্দাহারের জলুকাদের ধনরত্নাদিসহ যাবার পথে ৫০ হাজার 'ব্রাহ্মণ' নরনারীকে গরুর পালের মতো ধরে নিয়ে গেলেন! কিন্তু সেবার পীর পাঞ্জালের দ্বারপথে বোধ করি অকালে প্রবল তুষারপাত ও হিমঝঞ্ঝা ঘটে। তার ফলে সেই '৫০ হাজার' নানা দুর্দশার মধ্যে 'ঠাণ্ডা' হয়ে যায়! তাদের পক্ষে আর কান্দাহার পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। ১০ম শতাব্দীতে রানী দিদ্দার আমলে গজনীর মামুদ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। তবে তিনি সফলকাম হননি। 'অসচ্চরিত্রা' রানী ওদিকে ছিলেন প্রবল পরাক্রান্তা!

ইতিমধ্যে কান্দাহারবাসী এক পাঠন পর্যটক কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের হালচাল দেখে বেড়াচ্ছিলেন! তাঁর চালচুলো বিশেষ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিল। তিনি নানা উমেদারির পর রাজসরকারে ব্রাহ্মণদের কল্যাণে একটি চাকরি পেয়ে যান। এই ভদ্রলোকের নাম শাহমীর। ইনি সুশ্রী, সুরসিক ও বন্ধুবৎসল। কান্দাহারী (গান্ধারী) পাঠান এবং আর্যসম্ভূত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ—এই দুইয়ের মধ্যে একটি বংশপরম্পরাগত প্রচ্ছন্ন সমগোত্রীয়তা থাকার জন্য

শাহমীরকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরি শিক্ষিত ব্রাহ্মণের দল একটি আড্ডা জমিয়ে তোলেন। শাহমীর নিজেও পণ্ডিত ছিলেন এবং ভাগ্য ছিল তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন। ব্রাহ্মণদের সহায়তায় রাজসরকারে ধীরে ধীরে তাঁর পদোন্নতি ঘটতে থাকে। পারিবারিক জীবন বলতে তাঁর কিছু ছিল না। সুতরাং বেতনাদি যা পেতেন তা তাঁর আড্ডাতেই খরচ হয়ে যেত।

এমন দিনে বৌদ্ধ ভৌট্টা রিনচনের সেনাদলের নিকট পলাতক রাজা সেনদেবের সৈন্যদল পরাস্ত হয়। রিনচন কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করতে এসে দেখলেন, সামনে শ্রীমতী কোটা! রিনচন তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হল, শুধু এই শুষ্ক সিংহাসনে বসে লাভ কি, যদি এমন মনোরমা পাশে না বসে? রিনচন প্রথম দর্শনেই নতজানু হয়ে কাশ্মীরি সুন্দরীর পাদ্য অর্ঘ নিবেদন করলেন। বললেন, দেবি, এ সিংহাসন তোমারই, আমি শুধু দাসানুদাস!

কাশ্মীরের ভয়াবহ রাজনীতিক সঙ্কটকালে চরম অপমানের মধ্যে কোটারানীকে ফেলে রাজা সেনদেব সঙ্গোপনে কাপুরুষের মতো দেশত্যাগ করে পালিয়েছেন, সেকথা রানী ভোলেননি! সুতরাং চারিদিকের বেপরোয়া অবস্থা অনুধাবন করে শ্রীমতী কোটা এগিয়ে এসে এই বীর বিজয়ী রিনচনের হাত ধরে তুললেন!

পরবর্তীকালের হিন্দু-ইতিহাস বলে বেড়াত, রিনচন বলপূর্বক কোটাকে বিবাহ করেছিলেন। বলপূর্বক হয়ত ধর্ষণ করা চলে, কিন্তু বিবাহ করা চলে কিনা বলা কঠিন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, প্রথমটিতে দেহশৈথিল্য ও দ্বিতীয়টিতে চিত্তশৈথিল্যের প্রয়োজন। এই কোটারানীই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পরে বলছি।

রাজা শুহদেবের আমলে শাহমীর তাঁর দরবারে চাকরি নিয়েছিলেন (১৩১৩—১৪)। শুহদেবকে হত্যা করেন রিনচন। এই ব্রহ্মহত্যার জন্য কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পারিষদরা বৌদ্ধ রিনচনকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু রিনচন তাঁর কোটারানীর পরামর্শক্রমে কাশ্মীরে ন্যায়শাসন প্রবর্তন করেন। তাঁর শক্তিমত্তা, যোগ্যতা, সুবিচার ও বদান্যতার গুণে কাশ্মীরের অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং তিনি শাহমীরকে মন্ত্রণাসভায় গ্রহণ করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই কোটারানীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

রাজা রিনচনকে হিন্দুসমাজভুক্ত করার জন্য কোটারানী সমস্ত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরে বেড়ান। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর শিশুপুত্রকে কাশ্মীরি সন্তান বলতে তাঁরা নারাজ। রিনচন বিধর্মী, সে ঘৃণ্য ভৌট্টাজাতির সন্তান, সে সমাজপরিত্যক্ত এবং জাতিচ্যুত। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের স্থান নেই হিন্দুসমাজে।

রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজ ধর্মচ্যুতা কোটারানী বা রিনচনের অনুনয়-বিনয়ে

কর্ণপাত করল না। রানী ফিরে এলেন। এককালে যে সকল বৌদ্ধ নর-নারী ব্রাহ্মণ-সভ্যতার উৎপীড়নে কাশ্মীর ছেড়ে লাদাখ আর তিব্বতে পালিয়ে বেঁচেছিল— যারা এককালের কাশ্মীরি আদিবাসী-রাজা রিনচন ছিলেন প্রায় তাদেরই মুখপাত্র! সুতরাং আশাহত, বিক্ষুব্ধ এবং লোকসমাজচ্যুত এই রাজা অতঃপর ফিরে তাকালেন ইসলামের উদার গণজীবনবাদের দিকে! সেখানে অনাদর, অসম্মান এবং জাতিচ্যুতির ভয় নেই!

রাজা রিনচন ডেকে পাঠালেন শাহমীরকে। শাহমীর রাজপ্রাসাদে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। রাজা রিনচন বললেন, এই ভাবী যুবরাজকে আপনি ইসলামে দীক্ষিত করুন এবং এর সর্বপ্রকার শিক্ষার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। শাহমীর সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে রাজপ্রাসাদের সঙ্গে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হলেন এবং সেই শিশুপুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। শিশুর নাম রাখা হল 'হায়দার!' কাশ্মীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শারদা-সরস্বতী অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে হাসলেন কিনা, উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণসমাজ সেটি লক্ষ্য করেন নি। শাহমীর এবার রাজ-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন।

তিন বছর পরে রাজা রিনচনের সহসা অকাল মৃত্যু ঘটল (১৩২০)। এই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজমন্ত্রী শাহমীর সচকিত হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন! তিনি এখন জনপ্রিয়, প্রচুর প্রভাবশালী এবং যুবরাজের অভিভাবক। বহু ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট উপকৃত, বহু ব্যক্তিকে তিনি রাজসরকারে চাকরি দিয়ে 'গোলামে' পরিণত করেছেন এবং বহু ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট স্বর্ণমুদ্রা লাভ করে ঋণী রয়েছেন। সুতরাং এই সুযোগ সামান্য নয়!

কোটারানী শাহমীরের প্রভাব প্রতিপত্তি, ভাবগতিক এবং ঈষৎ অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচার লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে সতর্ক হচ্ছিলেন। শাহমীর সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করে ভাবলেন, না, এখনও সময় হয়নি। সুতরাং তিনি রানীকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্রাহ্মণদের পরামর্শক্রমে প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের একটি অভিজাত পারিষদ শ্রীউদয়নদেবাচার্যকে রাজসিংহাসন গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। উদয়ন ছিলেন গান্ধারে। 'দুলুচা' জুল্‌কাদের খানের আক্রমণকালে তিনি কাশ্মীর থেকে পালিয়ে গান্ধারে গিয়ে 'রেফুজী' হন। শাহমীরের আমন্ত্রণে উদয়ন কাশ্মীরে ফিরে আসেন এবং সিংহাসন লাভ করেন। এদিকে ভয়ে, দুর্ভাবনায়, উৎকণ্ঠায় রানী কোটা দিনাতিপাত করছিলেন এবং তাঁর শিশুপুত্র 'হায়দর' শাহমীরের এক্তিয়ারের মধ্যেই বড় হচ্ছিল। উদয়ন যখন সিংহাসনে বসলেন, কোটারানী গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁর পাদ্য অর্ঘ দিয়ে বললেন,আচার্যদেব, তুমি রাজাধিরাজ, কিন্তু আমি

তোমার ক্রীতদাসী!

ষড়ৈশ্বর্যশালিনী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কোটারানীর দিকে চেয়ে রাজা উদয়নদেব প্রণয়ে মুগ্ধ হলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণরা এবার উভয়ের বিবাহ দিলেন। কোটারানী পুনরায় আসন নিলেন রাজার বামপার্শ্বে সিংহাসনে এবং শয়ন করলেন রাজশয্যায়!

ওদিকে অন্তরালে গিয়ে শাহমীর এক পাথরের টুকরো দিয়ে প্রাসাদের এক দেওয়ালে আগে লিখলেন কোটারানী,—তার ঠিক পাশে লিখলেন রামচন্দ্র, সেনদেব, রিনচন এবং উদয়ন। উদয়নের পাশে লিখলেন 'শাহমীর!' কিন্তু সেটির উপর আবার হিজিবিজি কেটে দিলেন!

ঠিক এক বছর পরে কোটারানীর গর্ভে আরেকটি শিশুপুত্রের জন্ম ঘটল! কিন্তু কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ রাজা তা হলে কে হবে? রিনচনের পুত্র হায়দার, না উদয়নদেবের এই শিশুপুত্র? দুটি শিশুর একই জননী! একটি মুসলমান, অন্যটি হিন্দু! শাহমীর তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, জ্যেষ্ঠই ত' যুবরাজপদে আগে থেকে অভিষিক্ত।

রাজপ্রাসাদে আবার দেখা দিল নাটকীয় উৎকণ্ঠা! উদয়ন জানিয়ে দিলেন, রানী কোটার ইচ্ছা অন্যরূপ! হিন্দু-কাশ্মীরের রাজা হিন্দুই হোক। শাহমীর হাসিমুখে বললেন, তা কেমন করে হয়!

শাহমীরের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং স্পর্ধিত আচরণ লক্ষ্য করে রানী এবং রাজা উদয়নদেব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে একদা ভিক্ষণভট্ট নামক এক পণ্ডিতকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। ভিক্ষণভট্ট অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করে চললেন। কিন্তু শাহমীরের প্রভাব এবং লোকপ্রিয়তা এতে খর্ব হয়নি। বরং তাঁর সঙ্গে একযোগেই ভিক্ষণভট্ট প্রশাসনের কাজ চালিয়ে যান। ওদিকে শাহমীরের মনে যাই থাক, তিনি বালক হায়দারকেই জনসমাজে যুবরাজ হিসাবে পরিচিত করতে থাকেন!

"He kept the king and queen in perpetual terror by threatening to raise Haider, Rinchana's son, to the throne".

১৫ বছর পরে রাজা উদয়নদেব মারা যান (১৩৩৮ খৃঃ)। তখন দুটি পুত্রই নাবালক। এইবার এল শাহমীরের পালা! তিনি কাশ্মীরে আসেন ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে, এবং পরবর্তী ২৫ বছরকাল অবধি তিনি এই অভিশপ্ত ভূখণ্ডের রাজনীতিক অধোগতি, জাতির চরিত্রের অশুচিতা, অপৌরুষ ও অসাধুতা আগাগোড়া দেখে এসেছেন! সুতরাং এবারে তিনি প্রস্তুত হয়ে আসরে নামলেন। কোটারানী উদয়নদেবের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন। ভিক্ষণভট্ট রানীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, কিন্তু ভিক্ষণ শাহমীরের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। রাজকোষ, অর্থনীতি,

ভূমিবিষয়ক সর্বপ্রকার দলিল, গোপনীয় কাগজপত্র, সমগ্র সামরিক বিভাগ,—এবং যেটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, সেই জনপ্রিয়তা,—সমস্তই শাহমীরের পক্ষে! উদয়নদেবের রাজত্বকালে রাজশক্তির প্রভাব কেবলমাত্র রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার বাইরে কাশ্মীরের বৃহত্তম অংশে শাহমীরের প্রচুর খ্যাতি রটনা হয়েছিল। এদিকে সমগ্র কাশ্মীরের নরককুণ্ডের মধ্যে পড়ে মানুষ তখন চাইছে বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে! যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাদের প্রতি উপেক্ষা ও উৎপীড়ন ততদিনে আরম্ভ হয়ে গেছে।—সমাজপতি ব্রাহ্মণের দল ধর্মান্তরিত নিরুপায় নরনারীকে জাতিচ্যুত করতে তখন ব্যস্ত। অন্যদিকে একটি নূতন মুসলমানগোষ্ঠী সামাজিক এক সমস্যার মতো দেখা দিয়েছে! এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়কে জাতিচ্যুতির ভয়ে কাছে আসতে দিচ্ছে না। ব্রাহ্মণরা জমি থেকে উচ্ছেদ করছে নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে। পিতা পুত্রকে স্বীকার করছে না। ভগ্নি কাঁদছে ভাইয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে। সন্তান তার জননীকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না! ধর্মান্তরিত স্বামীকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য স্ত্রী আত্মনাশ করছে! রাস্তাঘাটে এক সহোদর অন্য সহোদরকে কাঁদতে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে!

কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ কঠোর বিক্রমে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন দিনে হঠাৎ গুপ্তঘাতকের হাতে ভিক্ষণভট্ট নিহত হলেন। কোটারানীর সিংহাসন টলমল করে উঠল। সবাই জানল, একাজ শাহমীরের। কিন্তু রানী যখন শাহমীরকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্য গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে তাঁর ঘুষখোর ব্রাহ্মণ পারিষদবর্গরা রানীকে বাধা দিয়ে বললেন, সর্বনাশ, এমন কাজ করবেন না, দেবি! শাহমীর অতিশয় জনপ্রিয়! এত বড় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশাসক আপনার দ্বিতীয় নেই। রাজ্যে ভয়াবহ অশান্তি ঘটবে!

শাহমীরের অন্নপুষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, রানী কোটা নিরস্ত হলেন। শাস্তি দেবার এই সুযোগটি হারিয়ে পরবর্তীকালে রানী কোটা নাকি বহু অনুতাপ করেছিলেন।

দেখতে দেখতে শাহমীর সমগ্র কাশ্মীর এবং রাজধানীর অবিসম্বাদী ও একচ্ছত্র শাসনকর্তা হয়ে উঠলেন। রানীর প্রত্যেক কর্ম সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন তোলেন। ইচ্ছায় বাধা দেন। গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। রানীর নিজস্ব লোকদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেন। এইভাবে যখন একদিন অবস্থা চরমে উঠল, তখন একদা অসীম বিরক্তি, বিক্ষোভ ও আক্রোশ নিয়ে শ্রীমতী কোটা অন্ধকার রাত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করে 'অন্দরকোট' নামক এক পার্বত্য দুর্গে গিয়ে বাসা নেন, এবং কি উপায়ে শাহমীরকে বিতাড়িত করবেন, তার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন।

শাহমীর ঈষৎ হাসলেন। তিনি এখনও অবিবাহিত, এবং কোটারানীর যৌবনশ্রী আজও অটুট! শাহমীর সদলবলে চললেন অন্দরকোট অবরোধ করতে। বশম্বদ কয়েকজন ব্রাহ্মণও চললেন সঙ্গে। অন্দরকোটে প্রবেশ করে শাহমীর সোজা গিয়ে রানীর পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বললেন, দেবি, আমি তোমার দাসানুদাস, ক্রীতদাস!

অবরুদ্ধ অন্দরকোট: রানী নিরুপায়, আশাহতা! দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাহমীরের সমকক্ষ পুরুষ তখন কাশ্মীরে দ্বিতীয় নেই! যারা আছে তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারা মনীষী, বিদ্বান, সংস্কৃতিবান, তারা মানুষের মতো মানুষ—কিন্তু পুরুষ নয়! বৃহত্তর কাশ্মীরের হিন্দুরা ভয়ভীরু, প্রবঞ্চক, অকর্মণ্য, জাতিবর্ণবিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর, চক্রান্তকারী অশুচিস্বভাব, আত্মসম্ভ্রমবোধহীন,—তারা জন্তু, কিন্তু মানুষ নয়। ব্রাহ্মণ যারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা নীতিভ্রষ্ট, পরপদলেহী, উৎকোচখাদক এবং তারা চিরকালের বিশ্বাসঘাতক দেশশত্রু!

শাহমীর নাছোড়বান্দা! দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের কামনায় তিনি বিগত ২৫ বৎসর কাল ধরে তপস্বীর জীবন যাপন করছেন। অনুনয় বিনয় আরাধনায় ও পাণিপ্রার্থনায় কোটারানী এক সময় এই বিবাহে সম্মতি দিলেন! সিংহাসনে তিনি শাহমীরের বামপার্শ্বে বসবেন বটে, তবে তিনি হিন্দু রানীই থাকবেন,—এই শর্ত রইল!

হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার এই সমন্বয় সাধন করার জন্য কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ সমাজের একশ্রেণীর মধ্যে ধন্য ধন্য রব উঠল! যথাসময়ে কোটারানীর সঙ্গে শাহমীরের বিবাহ হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে শাহমীর যেখানে নিজের নামের উপর হিজিবিজি কেটেছিলেন, সেটি মুছে দিয়ে পুনরায় উদয়নদেবের নীচে নিজের নাম লিখলেন! সেইদিন থেকে তাঁর নাম হল শাহমীর শামসুদ্দিন!

কিন্তু বিবাহ করা এক বস্তু এবং ফুলশয্যার রাত্রে অতি নিভৃতে স্বামীর অঙ্কশায়িনী হওয়া অন্য কথা! তাঁর গর্ভজাত দুই তরুণ পুত্র ভবিষ্যৎকালে যদি কখনও প্রশ্ন তোলে, দুই সভ্যতার সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের জননীর পক্ষে মোট পাঁচটি পুরুষের সঙ্গে যৌন-সহবাসের প্রয়োজন কি সত্যই হয়েছিল?—তখন এই প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেবার জন্য হয়ত কাশ্মীরের ইতিহাসে একজনও সত্যাশ্রয়ী থাকবে না! সুতরাং ইতিহাসের সেই জটিল প্রশ্নের জবাব নিজেই তিনি দেবেন! রানী মনোরম প্রসাধনসজ্জায় কিন্নরীর বেশ ধারণ করলেন।

ওদিকে ফুলশয্যার রাত্রে প্রাসাদকক্ষ পুষ্পমালঞ্চে পরিণত হয়েছে। কোমল মখমল শয্যা সুগন্ধ পুষ্পশোভায় আকীর্ণ। বাইরের আলোকমালায় সজ্জিত সুলতানের

প্রাসাদ মধুর নহবৎ বাদ্যে মুখরিত। এমন সময় আতর গোলাপ চুয়াচন্দন মেখে যখন অধীর প্রতীক্ষার মধ্যে শাহমীর প্রতিটি ক্ষণ গণনা করছিলেন, সেই সময় বধূবেশিনী কোটারানী শান্ত মনে কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, হ্যাঁ, সুলতান, ইতিহাসের সেই প্রশ্নের জবাব আমি দেবো! মুসলমান সভ্যতার উন্নতি হোক, ইসলামের জয়যাত্রা ঘটুক, সমস্ত কাশ্মীর গণজীবনবাদের নীতি যদি গ্রহণ করে করুক, কিন্তু চরম অপমানের মধ্যে আমার এই শোচনীয় অধোগতি—ইতিহাস কখনও ক্ষমার চক্ষে দেখবে না। সুতরাং মহাকালের পায়ের তলায় আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে যাই!

বক্ষোবাসের ভিতর থেকে ধারালো ছোরা বার করে শ্রীমতী কোটারানী সজোরে আপন স্তনযুগলের মধ্যস্থলে বসিয়ে দিলেন।

॥ ২১ ॥

কাশ্মীরে ইসলামের প্রথম পত্তন

কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর যিনি প্রথম মুসলমান শাসক হন, সেই শাহমীর শামসুদ্দিন ১৮ বছরকাল কাশ্মীরে রাজত্ব করে ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান এবং তাঁরই কালে শেষ হিন্দুরানী কোটারানীর দুটি ছেলেরই কারাগারে মৃত্যু ঘটে। এর পর আসেন সুলতান শাহাবুদ্দিন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন উদয়শ্রী, বেগম ছিলেন ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী এবং তাঁর রক্ষিতা ছিলেন লক্ষ্মীরই এক ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী আলসা। শ্রীমতী আলসার সঙ্গে বেগম লক্ষ্মীর বিদ্বেষ-সম্পর্ক থাকার জন্য শ্রীমতী আলসা সুলতানকে এই প্ররোচনা দেন, লক্ষ্মীর গর্ভজাত তিনটি বয়স্ক পুত্রকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। সুলতান তাঁর অবাধ্য হন নি। সুতরাং শাহাবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কুতুবুদ্দিন কাশ্মীরের গদি পান। কুতুবুদ্দিন পরিণত বয়সে দুটি নাবালক ছেলে রেখে মারা যান। তাদের মধ্যে যেটি বড়, সেই সিকান্দার নাবালক বয়সেই সুলতান হন (১৩৯০ খৃঃ)। ইতিহাসে এই নাবালক সুলতানেরই নাম হয়, 'মূর্তিনাশা' সিকান্দার।

শাহমীর, শাহাবুদ্দিন, কুতুবুদ্দিন,—এঁরাই কাশ্মীরে প্রথম মুসলমান সুলতান। এঁদের আমলে কাশ্মীরে ইসলামের পত্তন ঘটে। সংস্কৃত ভাষা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে; আরবি ও পারসিক এসে পৌঁছয়। হিন্দুদের সামাজিক বা প্রশাসনিক ছাঁচের মধ্যে মোটামুটি সদ্ভাবের সঙ্গে মুসলমানগণের ব্যবস্থাপনা খাপ খেতে থাকে। এর মধ্যে বিদ্রোহ, আন্দোলন, গণপ্রতিবাদ—কোনটা খুঁজে পাওয়া যায় না। হিন্দু-কাশ্মীর মুসলমান শাসনকে গ্রহণ করার আগে বিপ্লবের বা সংগ্রামের ধ্বজা তোলে নি। কাশ্মীরে হাজার হাজার দেবস্থাপনা, মন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ এবং বিভিন্ন অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্র অক্ষত অবস্থায় ছিল। তবে ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় অনেকগুলি দেবস্থাপনা-মন্দিরের মূর্তি সরিয়ে পীরের কবর স্থাপনা করা হয়েছিল। কাশ্মীরের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনন্য।

পূর্বোক্ত প্রথম সুলতানের আগে 'দুলুচা' জুল্‌কাদের যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তাতে হাজার হাজার ধর্মান্তরিত কাশ্মীরিদের নিয়ে একটি মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। হিন্দু সমাজ তাদেরকে ফিরিয়ে নেয় নি। তারা পাহাড়ে-পর্বতে, বনে মাঠে বা গ্রামে চাষবাস, পশুপালন, শাল-আলোয়ান বোনা, কাঠশিল্প ইত্যাদি নিয়ে রইল। কিন্তু এদের জীবনযাত্রার ধরন, দেবদেবীর প্রতি

এদের অনুরাগ, শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক, খাদ্য, চালচলন, ভাষা ও সংস্কৃতি—সমস্তই রয়ে গেল হিন্দু। বিগত ছয় শ' বছর থেকে অদ্যাবধি এর কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। শুধু ইসলাম চর্চার সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এগিয়ে এসেছে। মোগল আমলের শান্তি ও স্বস্তির কালে সুখ ও সুবিধার আশ্বাস লাভ করে কাশ্মীরি হিন্দুরা প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও তার প্রকৃতি প্রায় একই প্রকার থেকে যায়। যারা জাত-কাশ্মীরি মুসলমান তারা হিন্দু-সংস্কৃতিকে কোনও দিনই আঘাত করে নি। এরা একই আর্যসভ্যতার সন্তান।

বাইরে থেকে যে সকল মুসলমান এসেছিল—যাদেরকে বলা হয় আফগান, পাঠান, কিরগিজ, তুর্কি, ইরানী প্রভৃতি—এরা মূল কাশ্মীরে জায়গা পায় নি। এরা থেকে গেছে পশ্চিম ও উত্তর কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকায়। এদের সঙ্গে জাত-কাশ্মীরি মুসলমান বা হিন্দুর সংস্কৃতি মেলে নি। সেই কারণে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে উপজাতীয় পাঠানদের আক্রমণকালে জাত-কাশ্মীরিরা মার খেয়েছিল বেশি। কৌতুকের বিষয় এই 'যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা' যেভাবে টানা হয়েছে তাতে ওপারে প্রধানত পড়েছে বাইরের মুসলমান, এবং এপারে প্রধানতঃ পড়েছে মূল কাশ্মীর ভূখণ্ডের জাত-কাশ্মীরি হিন্দু ও মুসলমান। এ সীমারেখা যেদিন মুছে যাবে সেদিনও উভয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ঘটবে না।

রাজা রামচন্দ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছিল একটি ওষুধের সাহায্যে। এক মুনি একটি লতামূল এনে দেন, সেইটি বেটে খেয়ে রাজা দশরথের তিন রানী গর্ভধারণ করেন। সুলতান কুতুবুদ্দিনের শেষ বয়সে এক কাশ্মীরি মুনি একটি লতামূলসম্ভূত বড়ি এনে তাঁর বেগমকে খাওয়ান—তার ফলে 'মূর্তিনাশা' সিকান্দারের জন্ম হয়। একদা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কথায়-কথায় বলেছিলেন, 'বাঙ্গলাদেশ পলিমাটির দেশ বলেই আশ্চর্য এদেশে কমলালেবুর চারা বসালে গোঁড়ালেবু ফলে। কথাটি আজও ভুলি নি। কাশ্মীর উপত্যকা পলিমাটির দেশ, এবং কাশ্মীরে কমলালেবু ফলে না। কাশ্মীরি মুনি বোধহয় ফলাতে গিয়েছিলেন কমলালেবু,' কিন্তু হয়ে গেল গোঁড়ালেবু। যাই হোক, সিকান্দার প্রথমকালে 'গোঁড়ালেবু' ছিলেন না, তিনি পূর্ব-সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন শুদ্ধাচারী কাশ্মীরি এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে। মেয়েটির নাম ছিল শ্রীমতী শোভা। বস্তুত, হিন্দু ইতিহাসই এই কথা বলে, কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা মুসলমান রাজপুরুষগণের হাতে মেয়েকে দিতে পারলে খুশী হতেন। একটি, দুটি বা পাঁচটি নয়,—শত সহস্র কাশ্মীরি বর্ণ-হিন্দুর কন্যা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এঁদের সংসারে গিয়ে ঘরকন্না পেতেছে। কয়েক বছর আগে মাদ্রাজ থেকে রাজাগোপালাচারী ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানকে

নিয়ে এক মিলিত জাতি গঠন করতে গেলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অবারিত থাকা অবশ্য প্রয়োজন। একথায় মুসলমানরা চুপ করে ছিলেন, কিন্তু রাজাজীর ভক্তরা তাঁকে মারতে উঠেছিল (১৯৪৬ খৃঃ)।

কাশ্মীরে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও পারিবারিক দুর্গতি, ইতরতা, দুর্নীতি, মূঢ়তা ও শ্রেণীবিদ্বেষ যত বেশি অসহনীয় হয়েছে তত বেশি ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। শাহমীর, শাহাবুদ্দিন বা কুতুবুদ্দিন—এঁরা এত বেশি লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, কাশ্মীরিদের রাজভাষা পর্যন্ত বদলিয়ে যেতে লাগল। শুধু তাই নয়, অন্যদিকে আরবদের মতো গোঁড়া মুসলমানরা বলতে লাগল, কাশ্মীরে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাবে ইসলামের মূল নীতির অবনতি ঘটেছে। এখানকার সুলতানরা এবং ধর্মান্তরিত কাশ্মীরিরা কাফেরের সমতুল্য। ইসলাম কাশ্মীরে অপমানিত। এ অবস্থার সংস্কার করা দরকার। ইসলামকে অবিমিশ্র থাকতে হবে। ভিন্ন নীতির স্থান ইসলামে নেই।

সুতরাং গোঁড়া মুসলমানদের চোখে শাহাবুদ্দিনের মতো সুলতান হলেন ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী উদয়শ্রী যখন প্রস্তাব করলেন, হুজুর, বৌদ্ধদের ওই 'বৃহদ্বুদ্ধ' মূর্তিটি আগুনে গালিয়ে ওই ধাতুটাকে রাজকীয় স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করুন, তখন শাহাবুদ্দিন রেগে আগুন হন, এবং উদয়শ্রীকে 'কুলাঙ্গার' আখ্যা দিয়ে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তাঁর ভ্রাতা কুতবুদ্দিনও এই প্রকার ছিলেন। কাশ্মীরের হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অনুরাগ গোঁড়া মুসলমান জগতে তাঁদেরকে প্রিয় হতে দেয় নি।

সুলতান সিকান্দার (১৩৯০—১৪১৪ খৃঃ) যখন তাঁর পিতা ও পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন, তখন বাইরের গোঁড়া মুসলমান জগৎ একজন বিশিষ্ট ইসলাম দর্শনশাস্ত্রী মহম্মদ হামাদানি (শাহ হামাদান)-কে কাশ্মীরে পাঠান। ইনি এসে সুলতান সিকান্দারকে বিভিন্ন প্রকার শলাপরামর্শ এবং নানা হিতোপদেশ দান করেন। তিনি পবিত্র কোরানের মূল নীতি ও ঐস্লামিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে তরুণ সুলতানের সঙ্গে বহু দিন অবধি আলোচনা করেন এবং সুলতানকে স্বমতে আনার চেষ্টা পান। কিন্তু সুলতান ছিলেন আপন বিশ্বাসে কঠোর। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন, হিন্দু-কাশ্মীরকে ধর্মীয় ব্যাপারে আমি স্পর্শ করব না ; গায়ের জোরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে আমার হাতকে আমি নোংরা করতে পারব না। এ আমার নীতি-বিরুদ্ধ।

মহম্মদ হামাদানি ব্যর্থ মনোরথ হন। কিন্তু তিনি নিজে বিশেষ ধর্মনীতিপরায়ণ ছিলেন। কাশ্মীরেই তাঁর জীবন কাটে। তাঁরই নামে 'শাহ হামাদান' নামক একটি অতি সুদৃশ্য মসজিদ শ্রীনগরের সুপ্রসিদ্ধ কালীশ্বরী দেবীর মন্দিরের একই সীমানায় নির্মিত হয়।

বহিরাগত যাঁরা গোঁড়া বা রক্ষণশীল মুসলমান মৌলবী অথবা পীর তাঁরা কেউই স্থলতান সিকান্দারকে কাশ্মীরি হিন্দু-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে পারেন নি। পেরেছিলেন একজন, কিন্তু তিনি মুসলমান নন। তিনি এক অতি সদাচারী কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান ও মনীষী। তাঁর নাম পণ্ডিত শুহভট্ট। স্থলতান সিকান্দারের একদিকে ছিলেন তাঁর বেগম শ্রীমতী শোভা, অন্যদিকে সবপ্রধান পরামর্শদাতাস্বরূপ তাঁর মন্ত্রী এই পণ্ডিত শুহভট্ট। ইনি ছিলেন সমাজবিদ্রোহী, সংস্কারক এবং হিন্দু-গণের ধর্মান্ধতার ঘোর বিরোধী। জরাপ্রাচীন কাশ্মীরের জীর্ণ সভ্যতা, ধর্মের নামে প্রতারণা ও কুসংস্কার, শাস্ত্রমাহাত্ম্য ও পুরানের নামে মূঢ় অন্ধতা, বর্ণ ও শ্রেণীবিদ্বেষ, ধর্মান্তরিত নিরীহ জনগণের উপরে উৎপীড়ন, শিক্ষার নামে ধর্মান্ধতা, তীর্থ-দেবতার নামে দুষ্কৃতি এবং পাপ ব্যবসায়, দরিদ্র ও দুঃস্থকে অমানুষিক শোষণ, দেশব্যাপী দুর্নীতি ও অনাচার,—এইগুলির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে তিনি খড়্গহস্ত হন। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ জাতিকে তিনি ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার, শাস্ত্রধর্ম, মন্দির-মূর্তি, সমগ্র উত্তর হিমালয়ের চরিত্র এবং শেষ অবধি নিজেকে তিনি ঘৃণা করতে থাকেন। আপন পিতামাতা, পিতৃপুরুষ, আত্মীয়পরিজন, স্বজন বান্ধব, নিজ জন্ম, স্ত্রী ও সন্তান—তাঁর ঘৃণা থেকে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু মুক্তি পেল না! অবশেষে আপন জন্মপরিচয়কে বিলুপ্ত করার জন্য পণ্ডিত শুহভট্ট মুসলমানধর্ম গ্রহণ করলেন এবং স্থলতান সিকান্দার শাহকে 'সর্বনাশা' ভাঙনে অনুপ্রাণিত করে তুললেন! তাঁর এই ভাঙনের রব রাজ্যময় বিঘোষিত হল। সিকান্দার শাহ বসে পড়েছিলেন ভয় পেয়ে! কিন্তু বিপ্লববাদিনী স্থলতান-মহিষী শোভা দেবী এসে তাঁর এক হাত ধরলেন—ভাঙো স্থলতান, সব ভাঙো,—যেখানে যা কিছু আছে ভাঙো! দয়াহীন দস্যুর মত ভেঙে দাও সব, ছারখার করো—ভেঙে চুরে আবার নতুন করে গড়ে তোলো—ওঠো স্থলতান—!

শুহভট্ট এসে স্থলতানের আরেক হাত ধরে এবার তুললেন, ভয় পেয়ো না স্থলতান! তুমি হুকুমনামায় শুধু সই করে দাও, আমি ভেঙে দিচ্ছি! জরাকে, প্রাচীনকে, মানুষের পুরানো মনকে, গতানুগতিক জীবনের পঙ্গুতাকে, অন্ধ আচার-সংস্কারকে, মূঢ় অভ্যাসকে—আমি সব ভেঙে দিতে চাই স্থলতান, তুমি অনুমতি দাও—!

কিন্তু—

হ্যাঁ, হিন্দু ইতিহাস তোমাকে মন্দ বলে বলুক, আমি এই ধর্মত্যাগী নীতিভ্রষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ থাকব ছায়ার মতন তোমার পিছু পিছু! আমি কাশ্মীরকে ভাঙতে চাই স্থলতান, ভাঙতে চাই শিক্ষা আর সভ্যতাকে, ঘর-দোর-সমাজ-পরিবার,

কীর্তিস্থাপনা, মূর্তিমন্দির আর এই কাপুরুষ জাতির সমস্ত সংসারযাত্রাকে—সব ভেঙে দিতে চাই। আমি দেখতে চাই কাশ্মীরে একজনও পুরুষ আছে কিনা—একজনও মানুষ আছে কিনা—যে ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে! তুমি আমাকে দানবের শক্তি দাও, সুলতান!

সুলতান সিকান্দার শাহর নিকট থেকে পণ্ডিত শুহভট্ট অবশেষে সেই সাংঘাতিক অনুমতি আদায় করে নিলেন! সিকান্দারের জন্মের মূলে ছিল ব্রাহ্মণদত্ত লতামূল, আজ সেই একই কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিলেন সর্বনাশা ধ্বংসের বীজ! সিকান্দার প্রাসাদে বসে রইলেন—শুহভট্ট আগুন জ্বালালেন কাশ্মীরে।

আগে তিনি ভাঙলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কয়েকটি তীর্থমন্দির—যেমন বিষ্ণু-চক্রধর, পাপসূদন, ত্রিসন্ধ্যা, সরস্বতী, স্বয়ম্ভু, নন্দীক্ষেত্র, শারদা, বিজয়েশ্বর, মার্তণ্ড নগরীর প্রত্যেকটি মন্দির, অবন্তীপুরের প্রত্যেকটি দেবস্থাপনা! পুরাকীর্তি যেখানে যত ছিল, চূর্ণ করলেন! প্রতি গ্রামে, জনপদে, নগরে নদীতীরে, অরণ্যে, পর্বতে, বিভিন্ন উপত্যকায়, শারদায়, মনসায়—মঠ, মন্দির, বিহার, মূর্তি স্থাপনা, কেন্দ্র, আশ্রম—শুহভট্ট প্রত্যেকটি স্থলে তাঁর ধ্বংসকারীব দলকে পাঠিয়ে প্রতিটি তীর্থ ধূলিসাৎ করলেন। অশোক, কণিষ্ক, প্রবরসেন, ললিতাদিত্য—কোনও কালের কোনও স্থাপত্যকে তিনি ক্ষমা বা দয়া করলেন না—একে একে প্রত্যেকটিকে চূর্ণবিচূর্ণ বিধ্বস্ত এবং তাদেরকে ছোট ছোট পাথরের টুকরোয় পরিণত করলেন! কাশ্মীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শারদা সরস্বতীর মন্দির ও মূর্তি তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল!

কিন্তু ধর্মত্যাগী সেই 'কালাপাহাড়' শুহভট্ট ওখানেই নিরস্ত হন নি। এবার তিনি ভাঙলেন সমাজকে। সুলতানকে দিয়ে ফতোয়া জারি করলেন, 'কাশ্মীর ছাড়ো! মুসলমান ছাড়া কাশ্মীরে কেউ থাকবে না!' এই হুকুমের ফলে সকল শ্রেণীর হাজার হাজার পরিবার যখন নিজ নিজ ঘর ছেড়ে পাহাড় পর্বতের দিকে ধাওয়া করল তখন শুহভট্ট বিশেষ পথের সীমানায় এমনভাবে প্রহরা নিযুক্ত করলেন, যার ফাঁকের মধ্যে পড়ে কেউ না পালাতে পারে! তখন তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হুকুম করলেন, হয় এই পর্বতসন্ধিস্থলে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ, নচেৎ মৃত্যুবরণ!

কিছু লোক সেইখানে মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু অধিকাংশ নরনারী সেইখানেই ইসলামে দীক্ষিত হল! শুহভট্টের আদেশ জারি করা ছিল, হিন্দুর শবদেহে অগ্নিসংকার করা চলবে না! তাদেরকে পুঁতে ফেলতে হবে! তাই হল। সেই স্থলটির আজও নাম, "বাট্‌মাজার"।

১৪১৪ সালে সিকান্দার শাহর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ধর্মত্যাগী ও সর্বনাশা শুহভট্ট তার পরেও অপ্রতিহত প্রভাবে সাত বছর জীবিত থেকে কাশ্মীরকে এক প্রকার

শ্মশানে পরিণত করেন। তিনি প্রাচীন কোনও মূর্তি বা মন্দিরকে অক্ষত রাখেন নি। কাশ্মীরে এখন সামান্য যা কিছু দেখা যায়, তা কেবল ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ মাত্র! অতঃপর শুহভট্ট ক্ষয়রোগে মারা যান। কিন্তু তিনি প্রমাণ করে যান, তাঁর কালে কাশ্মীরে পুরুষ এবং মানুষ ছিল না!!

সিকান্দারের এক মুসলমান বেগমের (রাজা ফিরোজের কন্যা) গর্ভে হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ধারকর্তা এবং ন্যায়নীতি ও ধর্মপরায়ণ সুলতান জয়নুল আবেদিনের জন্ম ঘটে। তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত কাশ্মীরকে বুকের মধ্যে তুলে ধরেন এবং পরম স্নেহে তাকে লালন করেন! তাঁর আবির্ভাব ঘটে অনেকটা যেন সিকান্দার ও শুহভট্টের অপরাধের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করতে। করুণায় এবং মমতায় প্রথম থেকেই তিনি কোমল প্রকৃতি ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনেন। তিনি বৌদ্ধ মতাবলম্বী পণ্ডিত তিলকাচার্যকে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রথম দিকে নিয়োগ করেন, এবং পণ্ডিত সূর্যভট্ট কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। তিনি বহু মন্দির, বিহার এবং বিভিন্ন হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করেন। তাঁর রাজত্বকাল হল স্বর্ণযুগ এবং তাঁর ন্যায়শাসনের ফলে কাশ্মীরের পুনরুজ্জীবন লাভ ঘটে। এর আগে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

জয়নুল আবেদিন প্রায় ৫২ বছর অবধি সগৌরবে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (১৪৭৪ খৃঃ) তাঁর পরবর্তী সুলতানদের আমলে ধীরে ধীরে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। উত্তর কাশ্মীরের পার্বত্য চাক ও দাদরা উপত্যকায় নেমে এসে হানা দেয়। চাকরাজা গাজীখান কাশ্মীরের শাসক হন, এবং তাঁর পরে একে একে সাতজন সিয়া মুসলমান কাশ্মীরের গদিতে বসেন। মোগল আমলে সম্রাট বাবর এবং তাঁর পুত্র হুমায়ুন চাকদের নিকট হার মেনে যান। তারপর আসেন সম্রাট আকবর। তিনি তিনবার পরাস্ত হয়ে চতুর্থবারে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি ভগবান-দাসের নেতৃত্বে উপত্যকা কাশ্মীর দখল করেন। এ আলোচনাও আগে করেছি।

জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর একশ' বছর পরে আবার কাশ্মীরে গৌরবের যুগ ফিরে আসে।—

পূর্ণিমার রাত্রে পীর পাঞ্জালের কোলের মধ্যে ক্ষুদ্র গুলমার্গ জনপদটি কিরূপ চেহারা ধারণ করে, সেটি উপলব্ধি করতে গেলে ওখানকার বিশাল দেওদার বনের তলায় তলায় ঘুরতে হয়। এ যেন মধুমরীচিকা! পুষ্পাসবের অন্বেষণে নিভৃত জ্যোৎস্না রাত্রে একা একা চলে যেতে হয় নামহারা পরিচয়হারা ফুলের দল মাড়িয়ে-মাড়িয়ে! দিনমানে যা অবিশ্বাস্য, জ্যোৎস্না রাত্রে সেই সব যেন বাস্তব—বিবাগী

মনের ভাবনার পথ ধরে নেমে আসে 'চন্দ্রহাস' রাত্রির ভিতর দিয়ে অশরীরী অপ্সরার দল! স্তব্ধ গম্ভীর উদার দেওদারের নীচে দিয়ে অনাদি অনন্তকালের 'ক্রন্দসী' যেন ভুলিয়ে নিয়ে যায় সেই মধুমরীচিকার নিত্যকালীন আকর্ষণে! এ যেন আর থামবার যো নেই! ঝরাপাতার দল মাড়িয়ে, পুষ্পমালঞ্চ ছাড়িয়ে বৃক্ষমূলের অষ্টাবক্র জটলার পাশ কাটিয়ে চললুম যেন দিশাহারা! দুই চোখ ভরে আসে ব্যাকুল কান্না—কিন্তু সেও যেন বিগলিত জ্যোৎস্নার ধারা! বোধ হয় একদা বৃন্দাবনের অরণ্যালোকের ভিতর দিয়ে বিবশা শিথিলবস্ত্রা শ্রীরাধা এইভাবে দ্রুতধাবিতা হয়েছিলেন, যখন—"গুরুদুরুজনভয় কিছু নাহি মানয়ে, চীর নাহি সম্বরু দেহে; ঘন আঁধিয়ার ভুজগভয় কত শত, পন্থ বিপথ নাহি মান—"

বোধ হয় এরই নাম চন্দ্ররোগ, 'লুনাসি'। এই চন্দ্ররোগে কেবল শ্রীরাধাই জর্জরিতা হন নি, তাঁরই মতো দেহজ্যোতিসম্পন্না আরেক নারী উঠে এসেছিলেন ইতিহাসের যুগে। তাঁরও দেহলতার জ্যোতির্লেখন মিলে গিয়েছিল এখানকার এই দেওদারবনের পূর্ণিমায়। তিনি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান—যাঁর চন্দ্রজর্জর কবি-মন কেঁদে-কেঁদে ঘুরেছে গুলমার্গের পুষ্পবীথিকার আনাচে-কানাচে।

মধু-মরীচিকার আকর্ষণ কাশ্মীরের পাহাড়ে-পাহাড়ে আছে শত শত। কিন্তু সম্রাট শিল্পী জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের বনভোজনের জন্য গুলমার্গ প্রসিদ্ধিলাভ করে রয়েছে। অথচ এই ক্ষুদ্র উপত্যকার আয়তন কতটুকুই বা। লম্বায় মাইল তিনেক, চওড়ায় বড় জোর মাইল খানেক। এখানকার বনে আর প্রান্তরে নিজের থেকেই ফুলশয্যা গজিয়ে ওঠে, বোধ করি সেই কারণেই মুসলমান আমলে এই পার্বত্য দেওদারবেষ্টিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের নাম হয়, 'গুলমার্গ।' গুল শব্দটি আরবী, মার্গ হল সংস্কৃত। গুলমার্গ ৮ হাজার ফুট উঁচু এবং এর তিন দিকে পাইন বন উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে ১৫ হাজার ফুট উঁচু পীর পাঞ্জালের প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। একদিকের পথ ধীরে ধীরে টাংমার্গের দিকে নেমে গিয়ে সমতল কাশ্মীর উপত্যকায় মিলেছে। স্পষ্টত, নীচের তলাটা হল টাংমার্গ, দোতলা গুলমার্গ, তিন তলাটা খিলেনমার্গ (১১,০০০)। শ্রীনগর থেকে এই স্থলগুলি ২৫, ২৮ এবং ৩২ মাইল পথ। টাংমার্গ থেকে খিলেনমার্গ মাত্র ৭ মাইল—মাঝখানে পড়ে গুলমার্গ জনপদ।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পক্ষে এসব অঞ্চলে বসবাস আনন্দদায়ক। আর নয়ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—যাঁদের ভাগ্যে 'টি-এ' বিলের টাকা জোটে। পুজোর ছুটির কালে আসেন বাঙ্গালী চাকরীজীবীরা যাঁরা গৃহিনীদেরকে এ অঞ্চলে ঘোড়ায় চড়িয়ে ছবি তুলিয়ে রেখে দেন কাশ্মীরের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।

গ্রীষ্মের মরশুমের সময় গুলমার্গে যাঁদের জন্য হোটেলগুলি বা ডাকবাংলোর

ঘরগুলি পূর্বাহ্নে সংরক্ষিত থাকে—তাঁরা প্রায়ই অভিজাত বা ধনবান শ্রেণীর নর-নারী,—যাঁরা প্রায় প্রতিক্ষণেই দাস-দাসী পরিবৃত থাকেন। তখন চাকর হয়ে ওঠে 'বয়', এবং ঝি হয়ে ওঠে 'আয়া'। খরচ এখানে প্রচুর এবং বকশিসের রেওয়াজ তার চেয়েও বেশি। এই নিরিবিলি জনপদে সর্বাধুনিক নাগরিক উপকরণ সহজেই মিলে যায়। শীতকালে 'স্কী' খেলার জন্য সাহেবরা এখানে আসে। এ অঞ্চলে তখন প্রচুর তুষারপাত ঘটে।

গ্রীষ্মের দুপুরে বৃহচ্ছত্রের নীচে মাঠের মাঝখানে বসে লাঞ্চের আসর মজলিশী হয়ে ওঠে। মেয়েরা যদি শেরি কিংবা ভার্মুৎ পায়—নিদেন পক্ষে লালমদ,—তাহলে আর জল খেতে চায় না। হোটেল বাড়ির সংখ্যা বড়ই কম,—সেজন্য তাঁবু সঙ্গে আনে অনেকে। ডাকবাংলা ছোট নয়, ঘর অনেকগুলি,—তার সঙ্গে লাগোয়া মস্ত ডাইনিং হল—কিন্তু মরশুমকালে এতে কুলোয় না। অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে আসে 'অমর সিং ক্লাবে',—ওটি তখন গৌরবগর্বে টলমল করে। বছরের অনেকগুলি মাস অবধি দেওদারের যে সকল অরণ্য এবং উপত্যকার বিভিন্ন পুষ্পমালঞ্চ স্তব্ধ, জনশূন্য এবং নিভৃত থাকে,—মরশুমের কালে তাদের ভিতরে-ভিতরে চাপাকণ্ঠের কানাকানি শোনা যায়। কে কোথায় কখন কোন্ ইশারায় এবং কিরূপ সঙ্কেতে কাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় কোথাকার কোন্ বনপথে কি প্রকার লক্ষ্যে—এগুলি অনুমান করা বড় কঠিন। লণ্ডনের হাইড পার্ক বা কেন্‌সিংটন গার্ডেন সম্বন্ধে অনেকের লালাসিক্ত মোহ আছে। তারা ভ্রান্ত। লণ্ডনের ওই দুটি বৃক্ষবহুল 'গড়ের মাঠে' কোথাও নিভৃত নিকুঞ্জ নেই,—সমস্তটা অতিশয় প্রত্যক্ষ, অন্তরাল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে নিরিবিলিতে গিয়ে বসা চলে মাত্র, গা ঢাকা দেওয়া যায় না। ওখানে জুন-জুলাই মাসের অসভ্যতাগুলি যে-কোনও রসিক ব্যক্তির চক্ষেও বর্বরতার নামান্তর। ভারতে তথা কাশ্মীরে মানুষের এক প্রকার সুরুচিশীল চক্ষুলজ্জা আছে। সেই লজ্জাকে এদেশের নরনারী বৃক্ষলতায়, পাতায়, মালঞ্চে, নিকুঞ্জে, পুষ্পবীথিকায়, অরণ্যের জনশূন্যতায়, গিরিখাদের আশেপাশে, প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে-আবডালে—ঢেকে রাখে। হাইড পার্ক বা কেন্‌সিংটনের কোনও অংশে ভারতের এই সুরুচিবোধ ও শালীনতা নেই।

গুলমার্গ একটি ঢালু জনপদ। সেই কারণে চারিদিকের পাহাড় থেকে নামছে কতকগুলি গিরিজলধারা। সেই জলধারাগুলির আশেপাশে মৃন্ময় উপত্যকায় যে বিচিত্র বর্ণের ফুলের রাশি বছরের প্রায় অধিকাংশ কাল ধরে ফুটতে থাকে, সেই দৃশ্য মনোরম। তাদেরই শোভায় পর্যটকদের সঙ্গে ছুটে আসে প্রজাপতি পতঙ্গের দল। উত্তর কাশ্মীর, উপত্যকা কাশ্মীর এবং জম্মুর পার্বত্যভূমিতে এমনতরো 'গুলমার্গ'

আছে শত শত। যাঁরা 'কুষ্টোয়ারকে' কেন্দ্র করে পূর্ব জম্মুর 'মেরুবর্ধন' (Warwan Valley) অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরাই এটি জানেন। এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে জাস্কার গিরিলোকের অন্তর্গত 'উমাসি' পার হয়ে একদা জরোয়ার সিং-এর সৈন্যদল লাদাখ আক্রমণ করেছিল।

পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে গুলমার্গের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা আনন্দদায়ক। অনেকে বনে-পাহাড়ে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সাহেবী মরশুমের কালে সেই কারণে জন্তুজানোয়ারের জগতে হৃৎকম্প দেখা দেয়। গুলমার্গ থেকে একটি পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে ক্ষুদ্র নওশেরা গ্রামের দিকে এবং অপর একটি পথ নীলকণ্ঠ গিরিসংকট পার হয়ে ফিরোজপুর জনপদ ছাড়িয়ে 'পুঞ্চ' শহরের দিকে চলে গেছে। 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' পুঞ্চের পশ্চিম দিক দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে ঝিলমের দিকে।

খিলেনমার্গে কিছুই নেই। একদিকে উত্তুঙ্গ পর্বত-প্রাকার—তার ওপারে ২০ মাইলের মধ্যে 'যুদ্ধবিরতি সীমা।' অন্যদিকে নীচে দেখতে পাওয়া যায় কাশ্মীরের বিশাল 'সুখী উপত্যকা'—যেখানে এক হাজার বছরের মধ্যে 'সুখের' সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায়নি। খিলেনমার্গে বাস করে না কেউ, তবে 'চৌকি' আছে। বহু লোক এই ছাদের উপরে এসে বেড়িয়ে যায়, এজন্য চা-বিস্কুটের দোকান মেলে। খিলেন-মার্গের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

গুলমার্গে দাঁড়িয়ে দেখা যায় নাঙ্গা-পর্বতের শ্বেত শোভা। দক্ষিণ পূর্ব থেকে এসেছে হিমালয়ের গিরিশ্রেণী এবং উত্তর পশ্চিমে গিয়ে সেই গিরিশ্রেণী শেষ হয়েছে নাঙ্গাপর্বতে। নাঙ্গার চূড়াই (২৬.৬২৮) হল হিমালয়ের সর্বশেষ বৃহৎ চূড়া। এই চূড়ার নীচে উত্তর দিকে চিলাসের ভিতর দিয়ে মহাসিন্ধু নদ চলেছে পশ্চিমে। এটি এখন পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট এজেন্সির অন্তর্গত। নাঙ্গার শোভা গুলমার্গের অন্যতম আকর্ষণ। পশ্চিম কাশ্মীরের এই অঞ্চলে 'যুদ্ধবিরতি সীমারেখা' একপ্রকার অবাস্তব কুব্জপৃষ্ঠের (bulge) মতো চক্রবেড় পার্বত্যভূভাগ ধ'রে উত্তরে উরি জনপদ থেকে দক্ষিণে পুঞ্চ শহর অবধি ঘুরেছে। এই অস্বাভাবিক চক্রবেড় ভূখণ্ডটি অনেকটা যেন গায়ের জোরে 'সীজ ফায়ার লাইন' ছাড়িয়ে পূর্বাঞ্চলে ঢুকেছে। এই ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে হাজীপীর গিরিসঙ্কট (১২০০০)।

গুলমার্গ থেকে বরামূলা মাত্র মাইল পঁচিশেক। বরামূলা থেকে একটি সরু সুন্দর পথ টাংমার্গের দিকে আসবার আগে বাদগাঁও গিয়ে পৌঁছয়। এখান থেকে অপর একটি পথে যুশমার্গ উপত্যকায় যাওয়া যায়। শ্রীনগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে এই মনোরম পার্বত্য উপত্যকা প্রায় ৩০ মাইল সমতল পথ।

॥ ২২ ॥

আধুনিক শ্রীনগর ও ডাঃ করণ সিং

মেঘকজ্জল একটি মধ্যাহ্নকালে খিলেনমার্গ থেকে নামছিলুম ঘোড়ার পিঠে। এটি ঠিক পর্বতগাত্র নয়, উচ্চ উপত্যকাভূমি। আশেপাশে বৃহদাকার বৃক্ষজটলার ছায়ালোকের নীচে ছমছমে বনভূমি—সেখানে আরক্তিম পাথুরে পথ বর্ষাধারার আঘাতে যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে। অরণ্যলোক জনশূন্য এবং শব্দশূন্য।

পিচ্ছিল ঢালুপথে সপসপিয়ে যখন বৃষ্টি নামল, ঘোড়াওয়ালা তার নিজের গা থেকে অকুণ্ঠায় লুই-কম্বলটা খুলে নিয়ে আমার উপরে জড়িয়ে দিল। প্রতিবাদ জানালুম, কিন্তু সে শুনল না। সে কাশ্মীরি মুসলিম—পাঠানও নয়, মোগল বা চাকও নয়—তার জাত আলাদা। এরা ভয়ভীরু নিরীহ, কিন্তু উদার ভাবনায় লালিত। লুই-কম্বলটি আমাকে দেবার পর তার গায়ে শুধু রইল ছিন্নজীর্ণ একটি আজানুলম্বিত সুতী কামিজ। প্রশ্ন করে জানলুম, ওটি বছর পাঁচেক আগে তকলির সুতোয় ঘরে তৈরি। শীতবস্ত্রের মধ্যে ওই কম্বলটি তার একমাত্র সম্বল। আমার কাছে সে বাঁধা রেট পাবে একালের সাড়ে তিন টাকা,—যার থেকে ভাগ দিতে হবে পৌর প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়নকে। ওর থেকেই ঘোড়ার খাবার এবং ওর থেকেই তার পরিবারবর্গের আহার্য-বস্তু কেনা। এক সের চাউলের কম তার নিজের চলে না। অন্যান্য সামগ্রীর দাম অনেক। মাছ মাংস স্বপ্নবৎ। ভাতের সঙ্গে 'কড়ম' বা 'লওকি-কা-শাক'—এর বেশি নয়। বাকিটুকু খাবে ঘোড়া। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা এখানে ওঠে না। তবে সাত দু গুনে চৌদ্দ মাইল আনাগোনা করলে সেদিন অবস্থার কিছু উন্নতি! আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, এই লুই কম্বলটি মাঝে মাঝে ভিজে যায় বটে, তবে ঝেড়ে ঝুড়ে গায়ে দিলে রাত্রে এটাতেই কাজ চলে যায়। এরা কাশ্মীরি মুসলিম, উগ্রস্বভাব পাঠান মুসলমান নয়। এরা জাত-কাশ্মীরি বলেই শান্তপ্রকৃতি। লোকটা আমাকে অপরিসীম যত্ন ও সমাদরের সঙ্গে গুলমার্গের ভিতর দিয়ে টাংমার্গে নামিয়ে এনে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। আমি যখন তাকে বললুম, তোমার ওই সাড়ে তিন টাকার হিসেব আমি শুনেছি, এবার বলো, মোট কত পেলে তুমি খুশী হও এবং আজকের দিনটিতে পেট ভরে মাংস-ভাত খেয়ে ঘরে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারো!

'কাশ্মীরি মুসলিম' ঈষৎ নিরীহ বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে অর্ধস্ফুট

দৃষ্টিতে তাকালো। লোকটা রূপবান, চোখ দুটো একটু কটা, উন্নত সুন্দর নাসা। আমি তার সেই দুই আয়ত চক্ষে যেন শত শত বছরের বিলুপ্ত কাশ্মীর-কাহিনী আরেকবার পাঠ করে নিচ্ছিলুম! আমি তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু বেশিই দিলুম।

এক সময় বিদায় নিয়ে ঘোড়াটার লাগাম ধরে অনেক দূরে গিয়ে লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওর হয়ত ধারণা, আমার মাথার ঠিক নেই! কিন্তু আমার বিশ্বাস, লোকটা তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কাশ্মীর যেন ছায়ার মতো আমার পিছু পিছু নড়ে বেড়াচ্ছিল। সাম্প্রতের আবরণে ঢাকা যে-কাশ্মীর তার কোনও কীর্তিকলাপ আমার চোখে পড়ছে না, এর জন্য দুঃখ বোধ করছি। একালের কাশ্মীর অগ্রগতিবাদী, এখানে কোনও প্রতিক্রিয়াশীল আজও মাথা তোলেনি। পুন-র্নিরীক্ষণের দ্বারা কেউ এখানে সংশোধনবাদীও হয়ে ওঠেনি। ব্রাহ্মণ-বংশজাত শুহভট্ট সিকান্দার শাহর নামে কাশ্মীরের হিন্দু-সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করেছিলেন এবং অন্য এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি ভগবানদাস সম্রাট আকবরের দ্বারা মোগল রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই কাশ্মীরে—এ দুটি ঘটনা ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে! পার্বত্য প্রাকারের দ্বারা অবরুদ্ধ কাশ্মীরের হিন্দু-সংস্কৃতির বদ্ধজলার কাশ্মীরিরাই একদা চেয়েছিল নতুন মন ও চিন্তা, নতুন কল্পনা ও সংস্কৃতি এবং নতুন জীবনবেদ। সম্রাট ললিতাদিত্যের বহু আগে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ কুমারজীব চীন দেশে গিয়েছিলেন আপন বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যকে প্রসারিত করার জন্য (৩৮৪-৪১৭ খৃঃ)। তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ এবং বৌদ্ধদর্শনে অনুপ্রাণিত। শুধু মাত্র বিদ্যা নয়, সেইকালে তিনি চীন দেশে একটি নূতন ধরনের বর্ণমালা (new alphabet) প্রবর্তিত করেন। বিদ্যা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র রচনা, বেদ ব্যাখ্যা পুরাণ ও মাহাত্ম্যের বিবিধ প্রকার চর্চা ও অধ্যয়ন—এসব বিষয়ে একদা কাশ্মীর ছিল ভারতের শিরোভূষণ। কুমারজীবের দুশ' বছর পরে আসছেন হুয়েন সাঙ। তিনি কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে তখনকার দিনে বলছেন, 'এ দেশ অতি প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ।'

কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কাশ্মীরে না ছিল পৌরুষ, না বীর্যসাধনা। আচার্যদের বিদ্যার তপস্যা ছিল, বেদান্তের চুলচেরা ব্যাখ্যা ছিল—কিন্তু তার সঙ্গে ছিল না ক্ষাত্রশক্তি। শাস্ত্র ও সংস্কৃতি বড় ছিল, কিন্তু তার বিধিনিষেধের শাসনে মানুষের প্রাণ হয়ে উঠেছিল কণ্ঠাগত। জীবনের সর্বপ্রকার ব্যাখ্যা কেবলমাত্র জড়তা ও পঙ্গুতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। গান্ধীজি একদা বলেছিলেন, 'আমার ঘরের জানলা পৃথিবীর দিকে খোলা থাক, বাইরের আকাশ থেকে আলো হাওয়া আসুক। সেই

আমার স্বাস্থ্য, সেই আমার সুস্থ জীবন!' কিন্তু প্রাচীন কাশ্মীরের আচার্যগণ আপন দেশ ও জাতিকে অবরোধের মধ্যে রেখে চতুর্দিকের মোট ২৬টি 'দ্বার' বন্ধ করেছিলেন। পাহারা রেখেছিলেন, ভিতরে কেউ না আসে, বাইরে কেউ না যায়! এর ফলে মানুষের সমাজে পচ ধরে, হিন্দু সংস্কৃতি প্রগতিবাদের অভাবে বদ্ধজলায় পরিণত হয়, শাস্ত্র ও পুরাণ মাহাত্ম্য নব নব চিন্তাধারার পথ খুঁজে পায় না, ভয়াবহ রক্ষণশীলতার মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীণ পঙ্গুতা ও অসম্মান ঘটতে থাকে। সমাজ জীবনে ইতরতা, নোংরামি, দুর্নীতি এবং স্বভাব-কপটতা দেখা দেয়। এই সর্বব্যাপী দুর্গতির মধ্যে মাঝে মাঝে এসে পৌঁছয় বড় বড় শক্তিধর পুরুষ—দুর্লভবর্ধন, ললিতাদিত্য, অবন্তীবর্মণ এবং আরও কয়েকজন। কিন্তু কাশ্মীরি হিন্দু সংস্কৃতির পূর্বোক্ত দুর্বলতার থেকে জনসমাজ উদ্ধারলাভ করতে সমর্থ হয় না। ফলে, হুয়েন সাঙ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের ইংরেজ অবধি কাশ্মীরিদের সম্বন্ধে একই মন্তব্য রেখে গেছেন, "they were volatile and timid...they were good-looking but deceitful......they were fond of learning." (Life of Huen Tsang)

'উল্লোলাসরস' থেকে 'উত্তর মানসের' পথ, এ পথের নাম হয়েছে বোলর বা উলার থেকে গঙ্গাবল। 'ক্রমরাজ্য' থেকে 'মাধবরাজ্য' অর্থাৎ বরামূলা থেকে শ্রীনগর হয়ে অনন্তনাগ! কিন্তু আমি নানাস্থলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম সেই সেকালের ১০০ বৌদ্ধ বিহার। সন্ধান করে ফিরছিলুম ৪টি অশোক স্তূপ—যে ৪টির মধ্যে গৌতম বুদ্ধের দেহবিশেষ সযত্নে রাখা আছে। কিন্তু আজ তার কিছু নেই। বুদ্ধের দাঁতটি খোওয়া গেছে লাদাখে আলীশেরের হাতে, এবং বুদ্ধের দেহাবশেষ নষ্ট করেছেন শুহভট্ট! আমার মনে ছিল সেই হেলরাজ, জয়েন্দ্র, গোপাদিত্য, মেঘবাহন আর হলাদিত্য। আমি ভুলি নি সেই রানী সুগন্ধা আর সূর্যমতীকে; ভুলি নি সুরবর্মণ ও যশস্করকে। এটি মনে রেখেছি রানী দিদ্দার প্রধানমন্ত্রী ও প্রাক্তন মহিষপালক তুঙ্গ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন কাবুলের (তৎকালীন কপিষ) হিন্দু 'শাহিয়া রাজগোষ্ঠীর' এক নরপতি 'শাহী' ত্রিলোচনপালের সাহায্যে, যাঁর পতন ঘটে গজনীর মামুদের হাতে! আমার কাশ্মীর ভ্রমণকালে এরা যেন প্রেতচ্ছায়ার মতো আমার সঙ্গ নিয়েছিল। যে-পর্বতচূড়ারা অবরোধ করে রয়েছে এই উপত্যকাকে, তারাও যেন এসে দাঁড়ায় এক প্রকার গর্বোন্নত শিরে—হরমুখ, গগনগিরি, ভৈরবঘাটি, নৌবন্ধন, ক্রমসারস, ব্রহ্মসাকিল, সিদ্ধপথ, রতনপির, কর্কটধার, তাতাকুটি, নন্দনসায়র, কাজনাগ—একে একে সবাই। আমার মন কেন জানি কেঁদে বেড়িয়েছে ভেদবনে, পুরাণাধিষ্ঠানে, জ্যেষ্ঠেশ্বরে, মার্তণ্ডে—আর পদ্মপুর, বিষ্ণুপুর, ভীমকেশব, তক্ষকনাগ,

রানী অমৃতপ্রভার কীর্তি অমৃতভাবন, লতিকামঠ, আর বর্ধনমহেশে। আমি দেখে বেড়াচ্ছিলুম এক আয়ুনাশা, কীর্তিনাশা, যশোনাশা সর্বনাশন আর্য সভ্যতাকে—সমগ্র ভারতের কোনও রাজ্যে যার জুড়ি নেই।

মোগল আমলের শেষ দিকের অরাজকতার মধ্যে আফগানরাজ নাদির শাহ বহু অনাচারের পর কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেন কাবুলের অধিকারে (১৭৩৯)। এর ৮০ বছর পরে মহারাজা রণজিৎ সিং কাবুলের তৎকালীন নরপতি আমীর দোস্ত মহম্মদের হাত থেকে পুনরায় কাশ্মীরকে উদ্ধার করে পাঞ্জাবী শিখদের অধিকারের মধ্যে আনেন। রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর (১৮৩৯) পর শিখ-ইংরেজ যুদ্ধ বাধে এবং শিখ রাজত্বের অবসান ঘটে (১৮৪৫)। অতঃপর অমৃতসর-চুক্তির ফলে ডোগরারাজ গুলাব সিং কাশ্মীরের উপর প্রভুত্ব করেন (১৮৪৬)।

এই ডোগরা রাজবংশের যিনি সর্বশেষ রাজ্যপালক, তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্নর নিযুক্ত হন (১৯৪৯ খৃঃ)। তাঁকে বলা হয় 'সদর-ই-রিয়াসৎ।' মাত্র কিছুকাল আগে কাশ্মীরের সবশেষ মহারাজা হরিসিংয়ের মৃত্যুর পর এই তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান করণ সিং অল্প কয়েক দিনের জন্য 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন পৈতৃক সূত্রে। কিন্তু অভিশপ্ত এই উপাধি সম্ভবত তিনিই ত্যাগ করে পুনরায় 'সদর-ই-রিয়াসৎ' হন। সম্প্রতি কাশ্মীরের জনসাধারণের এবং তাদের শাসকবর্গের ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীর এখন ভারত শাসনযন্ত্রের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত। করণ সিং এখন রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত। এখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর (১৯৬৪)। রাজ্যপালগণের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ।

কাশ্মীর ত্যাগের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলুম—কেন না ১৯৫৩ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরের দিনই একখানি সোনালী রংয়ের ছাপা চায়ের আমন্ত্রণ এসে পৌছল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরে যখন পার্ক হোটেলে 'কুণ্ড স্পেশালের' রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুরছি তখন আরেকজন পত্রবাহক আরেকখানি সোনালি কার্ড নিয়ে 'করণ মহল' প্রাসাদ থেকে এসে উপস্থিত হল। খুলে দেখি, চায়ের আমন্ত্রণ বাতিল করে সদর-ই-রিয়াসৎ মহাশয় মধ্যাহ্ন ভোজনে আহ্বান জানিয়েছেন।

দাল-গেট ছাড়িয়ে ইউনাইটেড নেশনসের বড় দপ্তর পেরিয়ে অনেকটা গেলে তবে 'করণ মহলের' সীমানা। কিন্তু 'করণ মহল' প্রাসাদটি এমন কিছু বড় নয়। তবে এর প্রাঙ্গণ সীমানা অতি বৃহৎ। সমতল শ্রীনগরের প্রান্তে এটি একটি বিশাল কূর্মপৃষ্ঠ উপত্যকা এবং চারদিক থেকে প্রাকার-প্রহরার দ্বারা অতি সুরক্ষিত।

ভারতের কোনও গভর্নর বোধকরি এত অধিক সংখ্যক সশস্ত্র সামরিক প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত নন।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার পথ একাধিক এবং প্রত্যেকটিই একেকটি বিশাল তোরণ—সেগুলি রাজকীয়। নগরের নিম্নভূমি থেকে বোধহয় এই কূর্মপৃষ্ঠ উপত্যকা আন্দাজ ৩০ ফুট উঁচু। কিন্তু ঢালু পথ দিয়ে ধীরে ধীরে মূল প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছলে সুবৃহৎ শ্রীনগর যেন চারিদিক থেকে তার অমরাবতীর দ্বার খুলে দেয়! সমগ্র দালহ্রদসহ দেখা যায় দূরদূরান্তর। দালের এক পারে হরিপর্বত, অন্য পারে শঙ্করাচার্য। দূরে হরমুখ আর ব্রহ্মসাকিল। আরও দূরে পীর পাঞ্জাল তার অরণ্যের শোভায় ও সৌন্দর্যে অপরূপ। এ পাশ দিয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা বিতস্তা।

বাইরের বৃহৎ সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষটি আমার পরিচিত। কিন্তু বৈঠকখানায় বসবার আগে করণ সিং ডেকে নিয়ে গেলেন ভেতরে তাঁর স্টাডিতে। এখন তিনি সেই ২৩ বছরের তরুণ যুবা আর নন, এখন তাঁর কথায় ও কর্মে এসেছে ব্যক্তিত্ব। আমি বললুম, কিন্তু কই, আজও আপনি সিগারেট ধরেন নি!

করণ সিং স্বচ্ছকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বললেন, আমি একেবারে দল ছাড়া গোত্র ছাড়া। কোনও নেশা ধরতে পারলুম না! আমি কিন্তু 'টিটো-ট্যালার' নই,—সবাইকে আমি সবই 'অফার' করি। কি জানেন, ওটা ব্যক্তিগত রুচি!

আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' তাঁর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি সেটি তিনি জানেন। সেই সূত্রে তিনি একবার তাঁর নিজস্ব একটি ভ্রমণ পুস্তিকা আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর মনে আছে। আজ আমার সঙ্গে ছিল 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' একখানা জার্মান-সংস্করণ গ্রন্থ। এখানা ওঁরই জন্য আনা। সেখানি হাতে নিয়ে এবার তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—ভাগ্যের কী বিদ্রূপ! আমি না জানি বাঙলা, না জার্মান! নিশ্চয় অন্তত দু-একটা ভালো কথা এ বইতে আপনি আমার সম্বন্ধে বলেছেন! বাস্তবিক বাঙলা শেখবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আপনি নিশ্চয়ই আমার নতুন বইখানা এখনও দেখেন নি? দাঁড়ান আনি—

করণ সিং সুশ্রী, সৌম্যদর্শন, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। তাঁর ঘন কালো এবং বৃহৎ দুটো কাশ্মীরি চোখের বর্ণনায় বলতে ইচ্ছা করে পদ্মপলাশলোচন! মুখশ্রী তাঁর সুন্দর এবং অধরোষ্ঠ রাঙা। তাঁর হাসিখুশী, বয়সোচিত চাঞ্চল্য, প্রাণপ্রাচুর্য এবং প্রত্যেকটি বাক্যকে সরস করে তোলার ভঙ্গী—এগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। এটি উল্লেখ করা অশোভন জানি যে, তাঁর একটি পায়ে সামান্য একটু দোষ আছে। চলবার কালে এবং বসবার সময় পাখানা একটু টানতে হয়। তাঁর আলাপের আন্তরিকতা এবং আচরণের স্বাচ্ছন্দ্য খুবই মনোজ্ঞ।

মিনিট দুই পরেই যে বইখানি তিনি আমাকে এনে দিলেন, সেখানির নাম, "Prophet of Indian Nationalism : Political Thought of Sri Aurobindo Ghose."

করণ সিং এম, এ পাস করেন ১৯৫৭ সালে এবং শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করে যে 'থেসিসটি' তিনি পেশ করেন, সেইটিই এই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই থেসিসটির জন্যই তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন (১৯৬১)। বইখানি বিলাতে ছাপা হয়।

বাঙ্গালীর প্রখর জাতীয়তাবাদ, বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি বাঙ্গালীর সহজাত আকর্ষণ, বাঙ্গালীর সাহিত্য, শিল্পকলা, অধ্যাত্ম জীবনবাদ, বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভা,—এগুলির প্রতি কাশ্মীরের এই তরুণ ও সুশিক্ষিত যুবরাজ কি প্রকার আন্তরিক ও নিঃশব্দ আকর্ষণ বোধ করেন, এটি দেখে গিয়েছিলুম ১৯৫৩ সালে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা সেবার লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছিলুম এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলুম। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ করে কলকাতায় নিয়ে যান। করণ সিং এটি ভোলেন নি।

এক সময় তিনি বললেন, সেবার দুটি জিনিস আপনি দেখে যান নি। এ বাড়ি তখন ছিল একতলা, এখন দোতলায় ঘর তুলেছি!

দ্বিতীয়টি?

আমার মেয়ে! বয়স ৬ বছর। কিন্তু তৃতীয় খবরও একটা আছে।

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি সহাস্যে বললেন, আমার শিশু-পুত্রটির আজ ৫০ দিন বয়স পূর্ণ হল। (২৫-৯-৬৫)

হেসে বললুম, এটি কিন্তু ঐতিহাসিক! ডোগরা রাজবংশের সর্বশেষ কুমার! এখন আর আপনি যুবরাজ নন্।

করণ সিং সাবলীল স্বচ্ছ আনন্দে আবার হেসে উঠলেন!

লাদাখের কথা উঠল। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অন্য একটি ঘরে। সেখানে এক টেবিলের উপর একটি বৃহৎ মৃৎনির্মিত পার্বত্য কাশ্মীর, জম্মু ও লাদাখের মানচিত্র রয়েছে। উত্তরে হিন্দুকুশ, কারাকোরম. সিনকিয়াং, পামীর। পূর্বে তিব্বত, কুয়েনলান ও কৈলাস। কাশ্মীর এবং লাদাখকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে হিমালয়। জম্মুর দক্ষিণে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ।

হাসিমুখে এবার প্রশ্ন করলুম, এর মধ্যে আপনার রাজ্য কত বড়?

করণ সিং উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন,—লাদাখ সমেত ৮৪ হাজার বর্গমাইল! এর মধ্যে প্রবেশ করেছে চীন ও পাকিস্তান! সে-রাজ্যের কতখানি অবশেষ এখনও আছে, সেটি হিসেব হয় নি। তবে বোধহয় আধাআধি।

এরপর স্বভাবতই যেসব আলোচনা ওঠে, সেগুলি এল একে একে। শেখ আবদুল্লা, বক্সী গোলাম, গোলাম সাদিক, শ্রীনগরের অগ্নিকাণ্ডে দুটি সিনেমাহল্ পুড়ে যাওয়া,—শ্রীনগরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার জন্য তাঁর অপরিসীম আকিঞ্চন এবং দিল্লীর ঔদাসীন্য, শেখ আবদুল্লার 'শের-ই-কাশ্মীর' ছাড়া আরও কতগুলি পদবীর তিনি অধিকারী—ইত্যাদি বিভিন্ন পরিহাস-সরস কথাবার্তার পর খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকতে হল। সেখানে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করলুম, ভোজনের পাত্রগুলি সমস্তই একই প্রকারের। সেখানে গৃহকর্তার জন্য পক্ষপাতিত্ব নেই।

একটু পরেই এসে পৌছলেন করণ সিংয়ের স্ত্রী শ্রীমতী যশোরাজ্যলক্ষ্মী এবং ৬ বছরের চঞ্চল কন্যাটি। মহিলার বয়স এখন তিরিশ। এঁর পরিচয় হল ইনি তিব্বতের মেয়ে,—সেখানেই পিত্রালয়। কন্যাটি সুশ্রী, কিন্তু যথেষ্ট শুভ্রবর্ণা নয়। রাজবধূকে আমি ১১ বছর আগে দেখে গিয়েছিলুম, সেকথা তুললেন করণ সিং। কিন্তু বধূরানী পুত্র সন্তান প্রসব করার পর থেকে অদ্যাবধি কিছু অসুস্থ আছেন। এক সময় হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলুম। কিন্তু সেই রাজকীয় ভোজ্য সামগ্রীর তালিকা অদ্যকার স্বল্পান্ন বাঙ্গালী সমাজের সামনে নাই বা পেশ করলুম।

পরবর্তীকালে ডাঃ করণ সিংয়ের লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ "শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক চিন্তাধারা" বইখানি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। এই বইখানিতে তিনি শ্রীঅরবিন্দের ১৭ বছরের রাজনীতিক কর্মধারা (১৮৯৩-১৯১০) ও চিন্তামানস নিয়ে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি আলোচনা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলার ইতিহাস, বৈপ্লবিক রাজনীতি, বঙ্গচ্ছেদ, শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম ভাবনা ও ভবিষ্যৎ কালের প্রতি তাঁর বাণী, তাঁর দেশাত্মবোধ-সাধনার পরিণত ফলস্বরূপ তাঁর ৭৫তম জন্মতিথিতে (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) ভারতের স্বাধীনতা লাভ—প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি অতি চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা হল, বাঙ্গালী মনীষার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। দেড় হাজার মাইল দূরে বসে এক রাজকুমার বাঙ্গালী জাতির প্রতি এই দুর্লভ শ্রদ্ধানুরাগ আপন ভাবনার মধ্যে বহন করে চলেছেন, এটি যেন একটু বিস্ময়কর।

আমার মনে সান্ত্বনা ছিল এই, কলকাতার কোনও সংবাদপত্র তাঁর হাতে বোধ হয় পড়ে না। কেননা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা, বিধান পরিষদ, কলকাতা কর্পোরেশন,

মনুমেণ্টের তলাকার সভা বা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জমায়েৎ—এদের বিবরণগুলি পাঠ করলে ডাঃ করণ সিং বুঝতে পারতেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ—এঁদের বাঙলা দেশের অপমৃত্যু ঘটে গেছে অনেক আগে। সেই মৃতদেহে ইদানীং পচ ধরেছে। কাক, চিল, শকুন, শেয়াল ঘুরছে সেই দুর্গন্ধে।

ভারতীয় সামরিক বিভাগের স্থানীয় দপ্তরে কিছু কাজ ছিল। কাশ্মীর ত্যাগের আগে সেগুলি সেরে যাওয়া দরকার। সুতরাং একদিন সকালের দিকে বাদামিবাগের দপ্তরে গিয়ে উঠলুম।

বাড়িটি বেশ বড় এবং তিনতলা। এর পিছনের অংশে ভারতীয় সামরিক বিভাগের দপ্তর, এবং সামনের অংশে কাশ্মীর রাজ্যের তথ্যদপ্তর। একদিকে মিলিটারি পোশাক-পরা বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসার গিজগিজ করছে—তাদের দেখলে ভয় করে। কে কোন্ রাজ্যের লোক, কার কোন্ ভাষা, প্রত্যেকের জাতি পরিচয় কি প্রকার,—এ সমস্ত চাপা পড়েছে পোশাকের আড়ালে। তাদের গাম্ভীর্য, বুটের শব্দ, কুর্নিশের কায়দা, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, কঠিন নিয়মানুগত্য,—চারিদিক যেন থমথম করছে। এপাশ ওপাশ দিয়ে আনাগোনা করতে যেন গা ছমছম করে।

জন দুই কর্নেল এবং জনৈক মেজরের সঙ্গে আমার দরকার ছিল। তাঁদের পোশাকে লটকানো নানা বর্ণের বিভিন্ন ফিতা, দড়ি ও চিহ্নাদি। কারো কারো কাঁধে বা বুকে সোনালি বা রৌপ্যতারকা। তাঁদের কাছাকাছি যেতেও শরীর আড়ষ্ট হয়। কক্ষ, বারান্দা, দপ্তর—সমস্তগুলোর সঙ্গে যেন আমারই মনের উৎকণ্ঠা জড়ানো। তাঁদের গাড়িতেই আমি এসেছি, তাঁরাই আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেবেন কথাবার্তার পর—এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু একজন যখন চেয়ার এগিয়ে দিলেন এবং অন্যজন চায়ের ফরমাস করলেন, তখন যেন একটু ভরসা পেলুম। বেশ মনে পড়ে, অত ঠাণ্ডাতেও কপালের ঘাম মুছেছিলুম। পরে জেনেছিলুম, এঁদের বাইরের দিকটি ঝুনো নারকেল হলেও ভিতরের দিকে মোলায়েম মধুর শাঁস। এঁদের প্রতি আমি বিশেষ অনুরক্ত হয়েছিলুম।

আলাপচারীর বর্ণনা এখানে না করলেও চলবে। কাজ ছিল মোট আধঘণ্টার। অতঃপর কর্নেল সাহেব বলে দিলেন, বিকেল ৪-৪৫ মিনিটে আপনার হোটেলে গাড়ি যাবে আবার। দয়া করে আসবেন।

সেদিন একজন তরুণ বয়স্ক মিলিটারী ড্রাইভার আমাকে 'পার্ক হোটেলে' যখন পৌঁছিয়ে দিতে এল, তখন আমিও তাকে বলে দিলুম, আজ বিকেল ৪-৩৬ মিনিটে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে

অপেক্ষা করব। দয়া করে এসো।

ছোকরা সেলাম ঠুকে চলে গেল সোঁ ক'রে।

বিকেলে ঘড়ির কাঁটা ধরে এসে ছোকরা আবার আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই বাদামিবাগের নীচে পৌঁছিয়ে দিল। কাশ্মীরের তথ্য দপ্তর থেকে কিছু কাগজ-পত্র নেবার জরুরী প্রয়োজন ছিল, সুতরাং রাস্তার দিক দিয়ে ঘুরে আমি উঠে গেলুম তথ্য দপ্তরে। ডাইরেক্টর মহাশয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি কাশ্মীরি, সম্ভবত পণ্ডিতই হবেন। সুতরাং অতি সদাশয় এবং বাক্যরসিক ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু আমি এখন মিলিটারীদের সঙ্গে ওঠাবসা করছিলুম, সেই হেতু আমি এখন কাজ বুঝি। হাসি বা তামাসা পরে হবে। ভদ্রলোক কিন্তু সকৌতুকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি আমার ফর্দ অনুযায়ী এক একটি কাগজ এবং পুস্তিকা তাঁর হাত থেকে বুঝে-পড়ে নিচ্ছিলুম।

হয়ত বা মিনিট পনেরো কুড়িই হবে। হঠাৎ উৎকর্ণ হলুম। কে যেন কোথায় কোন্‌দিকে গান ধরেছে। শুধু গান নয়, সুরটিও যেন আমার চেনা-চেনা। ভদ্রলোককে এবার প্রশ্ন করলুম, এখানকার আপিস পাড়ায় কোথাও গান-বাজনার আড্ডা আছে নাকি ?

জানেন না আপনি ? সে কি ?—ডাইরেক্টার সাহেব ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, এঁকে পৌঁছে দাও কর্নেল সাহেবের ওখানে।

কাগজপত্র নিয়ে আমি নমস্কার জানিয়ে উঠলুম। দু'একটি কক্ষ এবং দু'তিনটি করিডর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলুম আমার সেই পরিচিত সামরিক বিভাগের মহলে। কিন্তু সেখানে আমার জন্য একটি নাটকীয় বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। সকালে যেখানে দেখে গেছি কঠোর-গম্ভীর সামরিক লোকজনের কঠিন নিয়মানুগত্য, এবেলায় সেখানে দেখি শিথিল রসাবেশের ললিত মধুর রূপ! যে-হলে সকালে ঢুকতে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছেছি, এবেলায় সেই থমথমে হল্ বাঙালী তরুণ-তরুণীর নাচের আসরে পরিণত! একজন তরুণ নৃত্যশিক্ষক শ্রীমান সান্যাল বিশেষ-বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা নাচ শেখাচ্ছেন বড় বড় কয়েকটি বাঙ্গালীর মেয়েকে,—এবং তারা নিজ নিজ পায়ে ঘুঙুর বেঁধে যখন নাচতে আরম্ভ করল, তখন যে সৌম্যকায় ও শার্টপরা বাঙ্গালী ভদ্রলোক মেয়েদের নাচের সঙ্গে হারমনিয়ম্ ধরলেন তিনি সকালের দিকে ছিলেন মস্ত সামরিক অফিসার!

আমি একেবারে থ!

কর্নেল অগ্নিহোত্রী যখন সামনে এসে কলরব সহকারে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, আমি তাঁকে যেন চিনতে পারলুম না। একেবারে শাদাসিধে ভদ্রলোক।

এলেন হৈচৈ করে আমাদের জমাদার সাহেব, এলেন মেজর শর্মা, এলেন লেফটেনান্ট কর্নেল। কারও পরনে সেই সাংঘাতিক পোশাক নেই, বিন্দুমাত্র নেই কোথাও সামরিক আদবকায়দা।

আমি থ। কিন্তু ওদিকে ঘুঙুর নৃত্যের সঙ্গে তখন হারমনিয়মে সুর উঠেছে—"প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে। প্রলয় নাচন—"

উঠে এলেন কয়েকজন আমার কাছে। আমার সম্বন্ধে তাঁদের নানা কৌতূহল এবং নানান অর্থহীন ঔৎসুক্য। ওর মধ্যেই অটোগ্রাফে সই এবং কে আগে দেবে চা বিস্কুট ইত্যাদি। এবারে এগিয়ে এলেন নৃত্যশিক্ষক সান্যাল (!), বললেন, শ্রীনগরের দুর্গাপুজোয় এবার আপনাকে পাওয়া যাবে কেউ ভাবেনি।

মেজর বসু বললেন, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপতে যাচ্ছে। প্রতিমা উদ্বোধন করবেন আপনি। সদর-ই-রিয়াসৎ সভাপতি। এসব আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনি—

কর্নেল অগ্নিহোত্রী সহাস্যে বললেন, এখানে রোজ বিকেল চারটে থেকে রিহার্সাল চলছে। শ্রীনগরের দুর্গাপুজোয় খুব ধুমধাম হয়।

জমাদার সাহেব উচ্চকণ্ঠে বললেন, মস্ত প্যাণ্ডাল্ তৈরি হচ্ছে। নাচগান থিয়েটার সার্কাস—সবাই আসবে, শহর ভেঙে পড়বে। প্রতিমা তৈরি হচ্ছে···অল্ ইণ্ডিয়া ফাংশান।

ওই বাঙালীর জনতার মধ্যে মহিলারা ছিলেন প্রচুর তৎপর। কিন্তু ওঁদের মধ্যেই একজন প্রবীণ বয়স্ক ডাঃ কাহালী বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথা পেড়েছিলেন। আমি তাঁকে একটি সিগারেট দেবার চেষ্টা করতেই তিনি হেসে উঠে বললেন, এ কি করছেন? আমি যে আপনার গুরুজন হই?

মুখ তুলতেই তিনি পুনরায় বললেন, আমি যে আপনার ছোট শ্যালীর খুড়শ্বশুর। এই যে ইনি আমার গিন্নি। আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছেন না···কাল রাত্রে আমাদের ওখানে আপনাকে খেতেই হবে।

খুড়শাশুড়ীর আন্তরিক আমন্ত্রণ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সব মিলিয়ে সেই হৈচৈ আমোদ আহ্লাদ এবং পরিচয় বিনিময়ের মধ্যেও আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আমি তখনও হতবাক।

দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, আমার ভ্রমণকালে নানা কারণে আমি কিছু আত্মগোপনশীল থাকতে বাধ্য হই। এতে আমার দেখাশোনা গতিবিধি ইত্যাদি অবারিত থাকে। কি জানি কেন অপরিচয়ের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। বলা বাহুল্য, সর্বপ্রকার পাদপ্রদীপের আলো এড়িয়ে একদা নিঃশব্দে আমি কাশ্মীর ত্যাগ

করেছিলুম। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা আমার হয়ে ওঠেনি।

হিমাচল প্রদেশের দিকে আমার ডাক ছিল।

দূর থেকে দূরে, আমি চলে যাচ্ছিলুম শ্রীনগর ছাড়িয়ে উপত্যকার ভিতর দিয়ে 'কাজিকুণ্ড' পেরিয়ে। বিতস্তা যেন হারিয়ে গেল কোন্‌দিক। কিন্তু তবু মহাকবির গানটি যেন ছিল আমার কানে: "যাবার বেলায় পিছু ডাকে···ভরা নদীর ছায়াতলে ছুটে চলে, খোঁজে কাকে···পিছু ডাকে—"

কি জানি, কাশ্মীর আসছে কি পিছনে পিছনে? সেই রৌদ্রোজ্জ্বল আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কাশ্মীর,—কিন্তু ডাকছে কি পিছন থেকে? তার শতসহস্র বছরের কান্নার কাহিনী আরও কি কিছু বাকি? গৈরিক বিতস্তা আবার কি রাঙা হবে? শকুনির পাশাখেলায় আবার কি ওর বস্ত্রহরণ ঘটবে?

চারিদিকে পার্বত্য শোভা,—অরণ্যে কান্তারে প্রান্তরে উপত্যকায় সেই আশ্চর্য সৌন্দর্য ছায়া ফেলেছে। সেদিনকার ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় 'কুদ' ছাড়িয়ে এসে উঠলুম বাটোট্ জনপদের ডাকবাংলায়। বাসা বাঁধলুম সর্বোচ্চ ঘরটিতে। ঘরের বাইরে বাঁকা চাঁদের আভা পড়েছে ছড়িয়ে। গম্ভীর বৃক্ষজটলার ফাঁকে ফাঁকে কিছু দেখা যায়—কিছু বা অস্পষ্ট,—কাশ্মীরের ভবিষ্যতের মতো।

॥ ২৩ ॥

জম্মু-লাহুল-স্পিতি

পীর পাঞ্জালের অনেকগুলি গিরিসঙ্কটের একটি হল 'বান্নাহ্‌ল বা বানিহাল বা বনশাল' সঙ্কট। বানিহালের চূড়া ১২ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। এরই ৩ হাজার ফুট নীচে অর্থাৎ আপার মুণ্ডায় এককালে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ ক'রে নাম দেওয়া হয়েছিল, বানিহাল পাস বা টানেল্। কিন্তু এতে দেখা গেল, বছরে মাস চারেক ধ'রে সমগ্র অঞ্চল কঠিন তুষারে দুর্গম ও দুস্তর হয়ে থাকে। এটি ছিল মোগল আমলের পথ। একালে এপথটি ব্যবহার হত খুবই কম, কারণ কাশ্মীর প্রবেশের পক্ষে রাওয়ালপিণ্ডি-কোহালা-মুজাফ্‌ফরাবাদ-উরির পথ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই পথটি ধরেই গিয়েছিলেন। এটির এককালে নাম ছিল 'ঝিলম ভ্যালী টাঙ্গা রোড'। অর্থাৎ স্বামীজি ঘোড়ার গাড়িতে চ'ড়ে শ্রীনগরে পৌঁছেছিলেন। তখন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী মহারাজা প্রতাপসিংয়ের আমল,—১৮৮৫-র পর।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলেন, রাওয়ালপিণ্ডির পথ যখন বন্ধ, হানাদাররা কথায় কথায় যখন পাকিস্তানের 'চুট্‌কি' (তুড়ি) শুনেই এদিকে ছুট্‌কিয়ে আসে, তখন আপার মুণ্ডা ছেড়ে লোয়ার মুণ্ডায় অপর একটি সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা ভাল। জম্মু-কাশ্মীরের যোগাযোগ-পথ সহজ-সাধ্য হওয়া দরকার। পণ্ডিত নেহরুও উৎসাহ দিলেন। পরিকল্পনাটা শেখ আবদুল্লা ও নেহরুজির, কিন্তু তা'কে রূপায়িত করলেন আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পর নবনির্বাচিত 'প্রধান' মন্ত্রী বক্সী গোলাম। সুড়ঙ্গপথের নাম দেওয়া হল 'নেহরু-টানেল্।' এই টানেলের বৈশিষ্ট্য হল, এর ছিদ্রপথ দুটি—যাওয়ার এবং আসার। দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল! আধুনিক বিজ্ঞানের এমন একটি শ্রেষ্ঠ ও সার্থক নিদর্শন কাশ্মীরে দ্বিতীয় নেই। এটি সমস্ত বছর ধ'রেই এখন খোলা থাকে, এবং এটি নির্মাণের ফলে মোট ১৭ মাইল পথ কমে গেছে। টানেলের এ-মুখে কাশ্মীর, ও-মুখে জম্মু। ভারতের অন্য কোথাও এই সুড়ঙ্গপথের জুড়ি নেই।

জম্মুর অরণ্যে পর্বতে শরতের হরিৎ সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। এটি দেবীপক্ষের তৃতীয়া। সামনের প্রাঙ্গণের সীমানায় বিশাল দেওদার ও চীড়ের বনে দেখতে দেখতে একপ্রকার অস্পষ্ট ও মলিন জ্যোৎস্না নামল। সেই উদার গম্ভীর বনরাজির

উপরে সেই ক্ষীণ চন্দ্রের মৃদু আলোক যেন সমস্তটাকে রহস্যময় ক'রে তুলল এবং আমার বিবাগী বন্য কল্পনা সেই চরাচরব্যাপী রহস্যালোকে সম্ভব-অসম্ভব সর্বপ্রকার কাব্যের ব্যঞ্জনা খুঁজে পেতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বন্য ভল্লুকের আকস্মিক আবির্ভাবের কল্পনায় ভয় পেয়ে বারান্দায় উঠে এলুম।

জাত-কাশ্মীরিরা বোধকরি চন্দ্ররসিক। সেই জন্যই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দপ ক'রে ইলেকট্রিকের সব আলোগুলি একসঙ্গে নিভে গেল এবং নিরুপায় পর্যটকের দল নিঃঝুম অন্ধকারে ডুব দিল। আমার বালক ভৃত্য শ্রীমান্ শশাঙ্ক জানত এই কাশ্মীরী কৌতুক। সুতরাং সে এবার তার সযত্নরক্ষিত মোমবাতি ও টর্চ বার করল।

পরদিন মধ্যাহ্নকালের প্রখর এবং ধূলিধূসর রৌদ্রে জম্মুর জনবহুল বাজার এলাকায় এসে পৌঁছলুম। একালে জম্মুর জনসংখ্যা এবং কাজকারবার বেড়েছে অনেক। কাশ্মীরের সর্বপ্রকার রসদ এখন জম্মুর ভিতর দিয়েই সরবরাহ করতে হয়। এর ঝামেলা পর্যটকমাত্রই অবগত। কিন্তু সুবিধা এই, পার্বত্য সঙ্কট ও সঙ্কীর্ণ গিরিপথ জম্মুর পর থেকে পাঠানকোটের দিকে বিস্তারলাভ করে। নদীপথ এখান থেকে নানা শাখায় ও নালায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছি হিমাচল রাজ্যে। পথ অনেকদূর।

কাশ্মীর উপত্যকার প্রধান নদী বিতস্তা এবং অন্য সব নদী বিতস্তায় গিয়ে মেলে। তেমনি জম্মুর প্রধান নদী চন্দ্রভাগা বা চেনাব (চেন্-অব বা পাথুরে জল)। এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে পূর্বোত্তর পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহুল উপত্যকার হিমবাহে। অতঃপর লাহুল থেকে বেরিয়ে কেলং জনপদের পশ্চিমপার দিয়ে সোজা উত্তরে জম্মুর অন্তহীন পর্বতমালার তলায় তলায় এই নীলবর্ণা চন্দ্রভাগা কৃষ্টোয়ার (প্রাচীন 'কাষ্ঠবৎ') নগরীর পশ্চিমে ভিন্ন এক নদীর সঙ্গে মিলেছে। কৃষ্টোয়ার নগরী পার্বত্য রাজাদের অধীনে থেকে এসেছে চিরদিন। অনেকের ধারণা, প্রাচীন আর্যজাতির একটা বড় অংশ কোনও এককালে এখানে এক বৃহৎ উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং তাদেরই বংশাবতংসের আজও দেখা মেলে দক্ষিণের 'পাঙ্গী' পর্বতমালার আশেপাশে। কৃষ্টোয়ার এলাকা অদ্যাবধি খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার ফল, ঘি, মাখন, দুগ্ধ ও 'দুম্বা' অতিশয় লোভনীয়। রামবান থেকে পার্বত্যপথ চলে গিয়েছে 'দোদা' নামক জনপদের দিকে, সেখান থেকে কৃষ্টোয়ার যাওয়া চলে। অন্য একটি পথ পাঠানকোট থেকে বাসোলি এবং ভদ্রাওয়া হয়ে গেছে চন্দ্রভাগার দিকে। নদী পার হয়ে কৃষ্টোয়ার। এই পথের প্রাকৃতিক শোভা কিন্নরদেশের মায়াকাননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি একটির পর একটি নদী পার হয়ে যাচ্ছিলুম। পাঠানকোট থেকে একটি পথ উত্তরপূর্বে চলে গেছে রানীক্ষেতের দিকে। তারপর সেই পথটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি গেছে ইঙ্গ-মুসলিম পার্বত্য শহর ডালহাউসী, অন্য-পথটি বাঁদিক দিয়ে প্রায় ৩২ মাইল গিয়ে ইরাবতী পার হয়ে চম্পাবতীতে প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় একটি পথ জম্মু থেকে আখনুর, রিয়াসি, রাজাউরি বা প্রাচীন রাজাপুরী হয়ে পুঞ্চের দিকে গেছে। আখনুরের দ্বিধাবিভক্ত পথের সংযোগটি জম্মু ও কাশ্মীরের মাঝখানে একটি মস্ত ঘাঁটি। এটি কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার নিকটবর্তী। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছাম্ব ও জৌরিয়ানের সীমান্ত ঘাঁটি।

চম্পাবতী পার্বত্য হিন্দুরাজ্য এবং মন্দিরপ্রধান। এ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল ভরমৌর,—এখন চম্পাবতী। এটি হিমাচল রাজ্যের উত্তরাংশ। এখানকার মণিমহেশের মেলা, চম্পানগরীর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ভূরি সিং যাদুঘর—এগুলি বিশেষ প্রখ্যাত। মণিমহেশের বিশাল সরোবরটিতে অবগাহন স্নানের জন্য প্রতি বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে জনসমাগম হয় প্রচুর। এই সরোবরটি 'ভাণ্ডাল' উপত্যকায় অবস্থিত, এবং এটির উচ্চতা প্রায় ১২ হাজার ফুট। এমনি আরেকটি উপত্যকা পাঙ্গী গিরিমালার মধ্যস্থলে পাওয়া যায়। সেটি বহুদূর। চন্দ্রভাগার উত্তরপ্রবাহ পথে 'কিলার' নামক অত্যুচ্চ জনপদ হয়ে সেখানে যেতে হয়। এই জনপদটি পাঙ্গীর প্রধান ঘাঁটি। এখানে পার্বত্য ভল্লুক, বন্য ও বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত হরিণ, কস্তুরী, লোমশ বন্য ছাগল, নেকড়ে ও চিতাবাঘ প্রভৃতি পাওয়া যায়। 'ভাণ্ডাল' ছাড়িয়ে ১০।১১ মাইল দূরবর্তী জনপদ লাঙ্গেরায় গেলে জম্মুর সীমানা। কিন্তু শেষের এই অঞ্চলগুলি অতিশয় দুঃসাধ্য। এই সকল অঞ্চলে ভ্রমণের পক্ষে শ্রেষ্ঠকাল আগস্ট ও সেপ্টেম্বর। বীরত্ব বা দুঃসাহস অপেক্ষা ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার বেশি দরকার। 'সাচ' নামক সঙ্কট অতিক্রম করে এই অভিযানপথে নামতে হয়।

হিমাচল রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানটি কৌতুকজনক। উত্তর অংশ থেকে দক্ষিণ অংশে আসতে গেলে পাঞ্জাবের একটি অঞ্চলকে অতিক্রম না করলে চলবে না। এই অঞ্চলটিরই নাম কাংড়া উপত্যকা। এইখানে হিমাচল রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করেছে যে নীলাভ ধূসর গগনচুম্বী পর্বতমালা, তার নাম ধওলাধার বা ধবলাধার। এমন সুন্দর ও সুশ্রী, এমন মহিমান্বিত ও গর্বোন্নত, এমন নীল-জটাবিভূষিত রাজর্ষিরূপ সমগ্র হিমালয়ে যেন বিরল। এই ধওলাধার গিরিমালার তলায়-তলায় ছবির মতো আঁকাবাঁকা কাংড়ার উপত্যকাপথ আমাকে কতবার টেনে নিয়ে গেছে তার রহস্যলোকে। একে একে পেরিয়ে গেছি নূরপুরের মস্ত পশমিনার হাট, কালিধরের জ্বালামুখী, কাংড়ার বজ্রেশ্বরী, নাগ্রোটা আর পালামপুরের সেই আশ্চর্য বনশোভা।

ধওলাধারের একদিকে যেমন পার হয়েছি আরণ্যক ইরাবতী, অন্যদিকে বারম্বার তেমনি পার হয়ে গেছি বিপাশা,—সেই বিপাশার উপলাহত স্রোতের ঘূর্ণীর সঙ্গে ঘুরেছে আমার মন। পৃথিবীকে বার বার আশ্চর্য মনে হয়েছে।

এই ধওলাধার বিভিন্ন নামে বিভক্ত হয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে হিমাচল রাজ্যের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এসেছে এবং কাংড়া উপত্যকালোক ছিন্নভিন্ন হয়েছে। যেমন একদিকে ধওলাধার থেকে বেরিয়েছে হাতীধার ও বীর বাঙ্গাহাল, অন্যদিকে তেমনি প্রসারিত হয়েছে পাপরোলাধার ও সিকান্দারিধার। এখানে একদা আমাকে থমকিয়ে যেতে হ'ল। সিকান্দার শব্দটি উত্তর হিমালয় ভূভাগে খুবই প্রচলিত। মণ্ডি থেকে দূর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবার কালে এই সিকান্দারিধার পর্বতচূড়া অনেকটা যেন সামনেএসে দাঁড়ায়। সিকান্দার শব্দটির তুর্কি অর্থ বোধকরি দিগ্বিজয়ী। উত্তর কাশ্মীরের এস্‌সেনি বা ইয়াসেন, হুনজাদেশ বা নাগর, পামীর, চিত্রল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালের দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার 'সিকান্দার' নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সোভিয়েটশাসিত বর্তমান সমরকন্দ নগরীর দূর দক্ষিণ-পূর্বে যে ধূসর একটি পর্বত দেখেছিলুম সেটির নাম 'সিকান্দার পীক' বা আলেকজান্দার হিল্! মণ্ডি শহর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরে গেলে অস্পষ্ট জনশ্রুতি আজও শোনা যায়, নিকটবর্তী পার্বত্য বনাঞ্চলে একদা সম্রাট আলেকজান্দার একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং বনমধ্যে সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও পাওয়া যায়। বর্তমানে সেই দুর্গ এলাকায় চরে বেড়ায় শুধু পার্বত্য রাজবোড়া সাপ, ভয়াল সরীসৃপ এবং অজগর, কৃষ্ণকান্ত ভল্লুক, পার্বত্য চিতা, কালো কাঁকড়াবিছা ইত্যাদি। জনৈক ইংরেজ পর্যটক জি-টি-ভিগ্‌নে একবার এটি সন্ধান করতে গিয়েছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীতে কাংড়ায় চন্দ্রবংশের রাজত্ব ছিল বটে, কিন্তু তার গল্পও এখন কেউ শোনে না। বরং ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীর মামুদ কাংড়া দুর্গ জয় ক'রে বজ্রেশ্বরীর মন্দির লুটপাট করেছিলেন (১০০৯ খৃঃ), সেটি অনেকে স্মরণ করে। যে-ব্যক্তি মোট ১৬ বার ধ'রে একটি দেশের ধনরত্ন লুটপাট ক'রে নিয়ে অনায়াসে নিজের দেশে চলে যায়, তা'কে সর্বদা গালি দেওয়া অপেক্ষা তা'র সমকালীন ভারতবাসীর অধঃপতিত জনসাধারণের ভীরুতা ও অপৌরুষের আলোচনাটাই শোভনীয়। গজনীর মামুদের বিজয়যাত্রার সঙ্গে এসেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ও লেখক আরবদেশীয় আলবেরুনি। তাঁর ন্যায় নিরপেক্ষ এবং উদারবুদ্ধিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক যে কাহিনী রচনা করে গেছেন, সেটি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা ভাল। উত্তর ভারতের হিমালয় ভূভাগে শত শত বছর ধরে যে অগণিতসংখ্যক হিন্দুনরপতি এপাহাড়ে-ওপাহাড়ে রাজত্ব ক'রে গেছেন,—প্রতি প্রাতঃকালে উঠে তাঁদের নাম

স্মরণ না করাই উচিত। মধ্যযুগে যেমন ছিল কাশ্মীর, তেমনি ছিল পাঞ্জাব এবং হিমাচল। প্রজাপীড়ন, জনশোষণ, দুর্নীতি, বর্ণবিদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বেচ্ছাচার এবং সর্বব্যাপী অরাজকতা—এগুলি যুগ-যুগান্তকালের উত্তর হিমালয়ের হিন্দু নরপতিগণের ইতিহাস!

পাঞ্জাব এবং হিমাচলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু। এই চারটি নদীর প্রবাহ সেকালের সেইসব কলঙ্ককাহিনী আজও বহন ক'রে চলেছে। ১৯ শতাব্দীতে ইংরেজ এসে এই কলঙ্কবানদের মাথায় হাত বুলিয়ে একে একে তাদের হাত থেকে অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। বোধ হয় ভালই করেছিল, কেননা লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন নিত্য উৎপীড়নের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কাংড়ার এই পরম সুন্দর উপত্যকাপথে ভ্রমণের কালে একথা ভয়ে-ভয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে, উত্তর হিমালয়ের এই ভূখণ্ডে হিন্দুরাজত্বের চরম অধঃপতন, দুর্গতি, শ্রেণীবিদ্বেষ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অনাচারের কালে একদা পাঠান এবং মোগল এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরের থেকে ; অতঃপর হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অরাজকতা, জাতি-বর্ণ-শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের হানাহানির ফলে পুনরায় একদা ইংরেজ বহু দূর থেকে খবর পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল উভয়ের মাঝখানে। আজ তারা যাবার আগে দেশ ভাগ করে দিয়ে গেল উভয়ের মধ্যে—যা হোক একটা বোঝা-পড়ার পর। কিন্তু ততঃ কিম? পিছনের ইতিহাস আবার কি ঘুলিয়ে উঠছে এই উত্তর হিমালয়ে? আবার কি এই কাশ্মীরে, হিমাচলে ও পাঞ্জাবে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

হিমাচল রাজ্য এবং লাহুল-স্পিতির 'গাদ্দি' সম্প্রদায় এ অঞ্চলের জনগণের একটি বৃহৎ অংশ। এরা মূলত পার্বত্য—যেমন কুমায়ুনের গাড়োয়ালি। এরা সমতল অঞ্চলে নামে না গরমের ভয়ে—নামলেও সুস্থ থাকে না। কাশ্মীরের মতই 'গাদ্দিরা' প্রধানত হিন্দু, এবং তাদের মধ্যে বড় একটা অংশ ব্রাহ্মণও বটে। পাহাড়ে পাহাড়ে এদের জীবন কাটে অনেকটা যাযাবর (Semi-nomads)-এর মতো। গ্রীষ্মকালে এরা প্রধানত বাস করে লাহুল-স্পিতির অতি উচ্চ উপত্যকায়—যার উচ্চতা ১০ থেকে বাড়তে বাড়তে ২০ হাজার ফুটে গিয়ে দাঁড়ায়। চিরকাল ধরে এরা স্বচ্ছন্দচারী। এদের অবাধ আনাগোনা তিব্বতের হুন:দেশে, লাদাখের অন্তর্গত রূপসু ও জাস্কার এলাকায়। এরা মেরুবর্ধন বা ওয়ারওয়ান উপত্যকা অথবা পাঙ্গী পর্বতশ্রেণীর তলা দিয়ে চলে যেত জম্মুপ্রদেশে এবং সেখান থেকে কাশ্মীরের পাহাড় পর্বতে। তুষার উপত্যকায় গিয়ে এরা যব, ভুট্টা, চানা প্রভৃতির চাষ করে এবং শীত পড়তে থাকলেই নিম্ন উপত্যকার দিকে (৫।৬ হাজার ফুট উচ্চতার কাছাকাছি)

নেমে যায়। কাংড়া উপত্যকায় এদের বড় বড় উপনিবেশ। এরা অতিশয় সরল, সত্যভাষী এবং সৎ। এরা রাষ্ট্রের বিবাদ বা সামাজিক বিপর্যয়ের ধার ধারে না। সর্বাপেক্ষা বড় কাজ এদের হাতে, অর্থাৎ পশুপালন। ভেড়া এবং ছাগলের সুবৃহৎ এক একটি পাল নিয়ে এরা চলে যায় দুর্গম ও দুঃসাধ্য পার্বত্যলোকে। যত বেশী ঠাণ্ডা, তত বেশী পশম ও পশমিনার উৎপাদন। বিশেষ বিশেষ জাতির ভেড়া ও ছাগল বিশেষ বিশেষ উচ্চতায় ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন পশম বা পশমিনা উৎপাদন করে। লাহুল ও স্পিতিতে এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে গাদ্দিরা কয়েকটি সুশিক্ষিত কুকুরের পাহারায় শত শত পশুকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা চাষ-বাসের জন্য অন্যত্র চলে যায়। তিব্বতে, হিমাচলে, কুমায়ুনে বা নেপালে, সিকিমে—কুকুরের দলই ভেড়া বা ছাগলের পালের প্রধান প্রহরা। এরা প্রত্যেকটি ভেড়া, বা ছাগলকে চোখে-চোখে রাখে এবং ছটকিয়ে কোথাও পা বাড়ালেই কুকুরের ধমক খেয়ে মরে। এরা অতিশয় হিংস্র, সন্দিগ্ধ, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং এদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল। পার্বত্য ভল্লুক বা অন্যান্য জানোয়ার এদের ধারে-কাছে আসতে সাহস পায় না। এরা অধিকাংশই লোমশ এবং বহু ক্ষেত্রেই বৃহদাকার। উত্তর সিকিমের বন্য উপত্যকায় অথবা জনশূন্য তিব্বতের অন্ধকার রুক্ষ প্রান্তরে এই কুকুরের ডাক যারা শোনেনি বা এদের প্রহরা লক্ষ্য করেনি, তাদেরকে এদের প্রকৃতি বোঝানো কঠিন।

গাদ্দি ব্রাহ্মণরা চাষ করে, শিব ও শক্তির পূজা দেয়, এবং পশু বলিদানের বিধিও পালন করে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক ঠাণ্ডা দেশে জন্তুর মাংস খাওয়ার যেমন অনস্বীকার্য রেওয়াজ আছে, তেমনি গাদ্দিরাও তাদের ঠাণ্ডা দেশে জন্তু বলি দিয়ে "মহাপ্রসাদ" হিসেবেই খায়। প্রকৃতপক্ষে লাহুল, স্পিতি বা কাংড়া উপত্যকায় পশুপালক বলতে 'গাদ্দিকেই' বুঝায়। 'গাদ্দি'-র মূল শব্দটি হল গদর (ভেড়া), এবং তার থেকে 'গদরিয়া।' এদেরই অপভ্রংশ 'গাদ্দি বা গদ্দি।'

বস্তুত, অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাব প্রদেশ ছিল ভারতের বৃহত্তম অংশ। পাঠান ও মোগল আমলে যে-রাজপুত গোষ্ঠী নানা পার্বত্যখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, পরবর্তী-কালে তাদের বৃহৎ অংশটাকে বলা হয়েছে পাঞ্জাবী। যেমন কাংড়ার পাঞ্জাবী রাজপুত; যেমন পূর্ণিয়া, কাটিহার দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলের বহুলাংশের অধিবাসীকে একালে বাঙ্গালীর বদলে বলা হচ্ছে বিহারী। সেই অর্থে বৃহত্তর পাঞ্জাবের একটি অংশ হল জম্মু। কেননা জম্মুর অধিবাসীরা মূলত পাঞ্জাবী। এদিকে পূর্ব পাঞ্জাবের দিকে পাঞ্জাবের শেষ সীমানা ইংরেজরাই এককালে (১৮৪৬-এর পর) তিব্বতের ধার অবধি টেনে দিয়েছে

লাহুল-স্পিতি জেলায়। কিন্তু এই তুষারপর্বতমালাপরিকীর্ণ ও জনবসতিশূন্য ভূভাগ চিরকালই ছিল ভারতীয় লাদাখের অন্তর্গত,—১০ম শতাব্দী থেকে সেটি আরও সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বিশাল পাণ্ডব-বর্জিত তুষারভূমি,—রোটাং গিরিসঙ্কটের উপর থেকে যার দিকে আজ চেয়ে রয়েছি,—এটি লাদাখ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হল, তার প্রকৃত কারণটি আলেকজান্দার কানিংহাম বলে গেছেন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মুখের কথাগুলি এখানে বেমানান হবে না—"১৮৪৬ সালের যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে (এই যুদ্ধে ইংরেজের নিকট শিখদের পরাজয় ঘটে) 'রাজা' গুলাব সিং লাদাখের অবিসম্বাদী শাসক হলেন। তিনি যদি তাঁর প্রাক্তন প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য পুনরায় তিব্বত আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হন, তাহলে আমাদের অধিকৃত অঞ্চলে এবং পার্বত্য সামন্ত রাজ্যগুলিতে তিব্বতী পশমিনা আমদানির কাজকারবার বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া চীন সম্রাটকে একথা বোঝানো কঠিন হবে যে, ভারতশাসক ও কাশ্মীর-শাসক—দুইয়ের মধ্যে তফাত আছে অনেক। এমতাবস্থায় এটি বাঞ্ছনীয় যে, লাদাখ ও তিব্বতের মাঝখানে উভয় পক্ষের রাষ্ট্রসীমানা নির্ভুলভাবে নির্ণীত হোক—যাতে ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোনও বিরোধের ক্ষেত্র উপস্থিত না হয়,—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এইটিই দৃঢ় অভিলাষ। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৪৬ সালের আগস্ট মাসে লাদাখ ও তিব্বতের মাঝখানকার প্রাচীন সীমানা নির্ধারণ এবং গুলাব সিংয়ের রাজ্য ও বৃটিশ এলাকার মধ্যবর্তী সীমানা নির্ণয়—এই দুটি ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্য দু'জন অফিসারকে নিয়োগ করা হয় (deputed)। এটির বিশেষ দরকার ছিল। আমরা নূরপুর (কাংড়ার অন্তর্গত বৃহত্তম পশমিনা আমদানির কেন্দ্র) দখল করার পর দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীর থেকে কোনও পশমই আসছে না—আসছে পাহাড়ী সামন্ত রাজ্যগুলি থেকে। যুদ্ধের পর এটি আমিই ধরিয়ে দিলুম যে, লাদাখের অধীনস্থ অঙ্গ দেশগুলি গুলাব সিংয়ের দখলে ছেড়ে দিয়ে যেন আমরাই আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র করে দিলুম। কেননা শতদ্রুর তীরবর্তী আমাদের একদিকে নিজস্ব এলাকা, আর ওধারে পশমিনার রপ্তানির কেন্দ্র তিব্বতী চানথান এলাকা।'

কানিংহাম সাহেবের আশঙ্কা ছিল এই, পাছে গুলাব সিং লাহুল-স্পিতির ভিতর দিয়ে তিব্বতী চানথানের সমস্ত মূল্যবান পশম ও পশমিনা জম্মুর ভিতর দিয়ে টেনে নেন। সেই কারণে লাদাখের পূর্বাংশ (রূপস্থ সমেত) তৎকালে যেমন-তেমনভাবে গুলাব সিংকে বুঝিয়ে, দিয়ে তার বিনিময়ে সুচতুর ইংরেজ লাদাখের স্পিতি জেলাটি দখল করে।

লাহুল-স্পিতি জেলাটি পাহাড়ী সামন্ত রাজাদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে ইংরেজ রাখল নিজের হাতে, অর্থাৎ পাঞ্জাবের সঙ্গে সংযুক্ত হল। ধওলাধারের তলায় এই

প্রধান পরিচয়। এ গুম্ফা যেন অনেকটা শাক্তমতবাদী, এবং সম্ভবত কাংড়ার দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণে এখানে পশুবলিদান দেওয়া বিধি।

লাহুল-স্পিতি পাঞ্জাবের শেষ প্রান্তসীমা। কিন্তু এই অত্যুচ্চ উপত্যকাভূমি বছরের বহু সময় অবধি তুষারভূমিতে পরিণত হয়। এখানে বৃষ্টিপাত যৎকিঞ্চিৎ। পার্বত্য অঞ্চল বনময় নয়। এ ভূভাগ লাদাখেরই সমগোত্রীয়। দিবালোকে প্রখর উত্তাপ, রাত্রে আগাগোড়া হিমাঙ্ক। চমরী ও ঝব্বুর দুধ সুলভ, এবং চমরীর দুধের মাখন উপাদেয়। রোটাং পাস পার হলে লাহুল-স্পিতি অঞ্চলে একে একে চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিপাশার উৎসমুখ সন্ধান করা যায়। এদের প্রত্যেকের উৎস বিশাল এক একটি চিরস্থায়ী হিমবাহের মধ্যে।

রোটাং পাস থেকে দশ মাইল নেমে এলে বাঁ হাতি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম এবং রঘুনাথজির মন্দির। এখানে পণ্ডিত নেহরু দু' একবার ঘুরে গেছেন। তাঁকে আনবার জন্য 'ভূন্তার'নামক প্রান্তরেএকটি বিমান অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়,—সেটি কুলু ছাড়িয়ে আউট-এর দিকে। আজকাল বিমানযোগে দিল্লী-কুলু আনাগোনা করা যায়।

মুনি বশিষ্ঠ ছিলেন রাজর্ষি। হিমালয়ের বহু দুর্গম অঞ্চলে তিনি একদা তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তববাদী লোক ছিলেন বলেই তাঁর ১২টি তপস্যার ক্ষেত্রে ১২টি আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। মানালির আশ্রম তাদের মধ্যে একটি। তবে এটি মানালি থেকে বোধ করি মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ের উপর। রাজর্ষি তাঁর কালে অনুমান করেন নি যে, তাঁর এই পার্বত্য আশ্রমের পাশ দিয়ে পাকা সড়ক হবে এবং বিংশ শতাব্দীতে সেই পথে মোটর ছুটবে। এই প্রাচীন ও পাথরের ঘরগুলির মধ্যে একটিতে রয়েছে ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মনুষ্যমূর্তি—যার চোখ দুটো প্রোজ্জ্বল ও গোলাকার। মন্দিরটি দরিদ্র এবং ভিতরটি ছায়া-ছমছমে। উপকরণ এবং আড়ম্বরের বাহুল্যবর্জিত বলেই এই আশ্রমটির ভিতরটি ভাল লাগে। এ যেন বিদুরের বিদ্যার কুটীর। দারিদ্র্য যার অলঙ্কার, শূন্যতাই যার পরম গৌরব। এখানে বুভুক্ষুর স্থান নেই কিন্তু তৃষ্ণার্তের এটি তীর্থ। এই আশ্রমে প্রবেশ করলে একটি পরম জিজ্ঞাসার তৃষ্ণা জাগে—সেই তৃষ্ণা ওই অদূরবর্তী উপবীতগুচ্ছধারী রাজর্ষির উজ্জ্বল দৃষ্টিই জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি বোধ হয় ঘটে—যদি ওই প্রাচীন পাথরের ভূমিতলে সমস্ত আত্মাভিমান ভুলে ধূলির শয্যায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। বাইরে টা-টা রৌদ্র, ভিতরের স্নিগ্ধ মধুর মুখচোরা হাওয়া পৌরাণিক পাথরের এক প্রকার বন্য গন্ধ নিয়ে ঘুরছে। এপাশে-ওপাশে পাখি-ডাকা জনপদ,—চারিদিকে কেমন যেন এক অখণ্ড মহাশান্তি। এদেরই মাঝখানে ওই ধারালো দুটি চোখের সামনে শুয়ে নিজ সর্বাঙ্গকে ধূলায়-ধূলায় ধূসর করে নেওয়ায় এক প্রকার বিচিত্র

আনন্দ আছে বৈকি। আমিও যে এক চিরকালের এবং চিরতীর্থপথের আশ্রমিক।

মন্দিরের পাশেই বশিষ্ঠ কুণ্ড। সেখানে উষ্ণ ধাতব জলের একটি প্রস্রবণে অনেকে স্নান করে যায়। একটি দেওয়ালে ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করা। নীচের দিকে ছোট একটি গহ্বর, এবং উপর অংশে ত্রিমূর্তি ছাড়াও বিভিন্ন মূর্তি খোদিত। এগুলি অতি পুরাতন। দেওয়ালে খোদিত এই প্রস্তরচিত্র সমগ্র আশ্রমের মূল ভাষ্যটিকে প্রকাশ করছে। এটি স্মরণ করতে ভাল লাগছে, একদা পণ্ডিত নেহরু এই আশ্রমে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। মন্দিরের পূজারীরা সেটি মনে রেখেছে।

ফিরবার পথে মাইল দেড়েক নেমে এলে বাঁ হাতি 'পাঞ্জাব হিমালয়ান্ ইনস্টিট্যুটের' মস্ত প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অধুনা অত্যধিক। এ প্রতিষ্ঠানটি দার্জিলিং-এর 'হিমালয়ান্ মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটের' অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি পর্বত আরোহণ ও অবরোহণের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। রাজনীতিক কারণে সমগ্র হিমালয় আজ জীবন্ত। এগুলির উদ্ভব সেই কারণেই।

মানালি থেকে অপর একটি পথ নদী পার হয়ে ডান দিকে চলে গেছে বিপাশা উপত্যকার ভিতর দিয়ে। পথ সঙ্কীর্ণ ও পাথুরে। এপাশে-ওপাশে ছোট ছোট পাহাড়ি জনপদ। তাদেরই ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে হরিপুর জনপদ, অরণ্য ও পর্বতের ধারে-ধারে পথটি চলে গেছে প্রসিদ্ধ 'নাগর' জনপদের দিকে। এ অঞ্চল অনেকটা জানা পথের বাইরে। যানবাহনের অসুবিধার জন্য এ পথটি পর্যটকদের চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু মাত্র ১৫ মাইল পেরিয়ে 'নাগরের' প্রাচীন রাজবাড়িতে এসে পৌঁছলে সব মনোক্ষোভ মিটে যায়।

একটি ক্রোড় পর্বতের চূড়ায় 'নাগর' রাজপ্রাসাদ। এ প্রাসাদের মালিক ছিলেন 'কুলুর' রাজা। ভিতর মহল অতি প্রশস্ত এবং বিস্তৃত। এই অট্টালিকার তিন দিকের সুপ্রশস্ত বারান্দা থেকে বহু দূর দূরান্তরের পার্বত্য শোভা চোখে পড়ে। এ বারান্দা যেন পাঁচশ' ফুট উঁচু থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। নীচে তাকালে ভয় করে। দূরে দেখা যায় পাপ্রোলাধার, বীর বাঙ্গাহাল এবং ধওলাধারের বিভিন্ন গিরিচূড়ার সঙ্গে শিবরাজের উত্তুঙ্গ শীর্ষ। মানালির উচ্চতা সাড়ে ৬ হাজার ফুট, নাগরের সর্বোচ্চ শীর্ষ প্রায় তারই সমান।

রাজপ্রাসাদটি এখন অনেকটা আসবাবসজ্জিত ধর্মশালার মতো। এতদূর পার্বত্য জগতের নিভৃত-লোকে এসে এমন চমৎকার বসবাসের ব্যবস্থা পেয়ে যাব এটি অভাবনীয়। পালঙ্ক, ড্রেসিং-টেবল, এন্টিরুম, মস্ত ডাইনিং হল, লাউঞ্জ, প্রায়-আধুনিক বাথরুম, দেওয়ালে ছবি, বিভিন্ন ক্রোকারি, ডাইনিং সেট,—এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সর্ববিধ সুব্যবস্থা। মস্ত উঠোন পেরিয়ে গেলে রন্ধনশালা। একটি সুসজ্জিত ঘরের

সংযোগ-ভূখণ্ডের নাম কাংড়া উপত্যকা। কিন্তু এই উপত্যকা-পথের উত্তরে এবং পূর্বে ধওলাধারের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করতে গেলে হিমাচল রাজ্যে প্রবেশ না করে উপায় নেই। কাংড়া জেলার অন্তর্গত কুলু উপত্যকা উত্তরে গিয়ে শেষ হয়েছে শিবরাজ পর্বতশীর্ষের নীচে বিপাশার উপত্যকা মানালির প্রান্তে।

মানালি ছোট জনপদ,—লম্বায় হয়ত বা মাইলখানেক। এটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঢালু হয়ে উঠে গেছে। এই বন্য উপত্যকার দেওদার অরণ্যের তলা দিয়ে চলে গেছে দুটি পার্বত্য জলপ্রবাহ—একটি মানালি, অন্যটি শর্বরী। এই দুই উপনদী কুলু শহরের প্রান্তে বিপাশার সঙ্গে মিলেছে। আবার কিছু দূর গিয়ে অপর একটি উপনদী 'পার্বতী' তার জলাঞ্জলি দিয়েছে বিপাশায়। সেটি 'মণিকরণের' নিকটবর্তী সমতল-ভাগে—যেখানে একটি উৎস থেকে উত্তপ্ত ধাতব জলধারা নির্গত হচ্ছে।

মানালি ছাড়িয়ে আমি যাচ্ছিলুম 'রোটাং' (১৩,১২৬) গিরিসঙ্কটের দিকে। এটি 'শিবরাজ' গিরিশৃঙ্গলোক। নিচের দিকে বনময় নিভৃত নদী,—দেওদার ও চীড়বনের ছায়াতলে জন্ম ঘটেছে মানালি এবং শর্বরী নদীর। জন্মের ইতিহাস সামান্যই। রোটাংয়ের শীর্ষলোক থেকে ঝিরঝিরিয়ে ছোট ছোট জলধারা নামছে, এবং এটার সঙ্গে ওটা একত্রিত হচ্ছে—যার কোনও পরিচয়ই নেই। সেই সম্মিলিত ধারাটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে দু' তিনটি পানচাক্কি বসিয়ে। জলস্রোতের তাড়নায় একটি পাথরের ঘরের ভিতরে ঘুরে যাচ্ছে কাঠের চাকা, এবং তার সঙ্গে যাঁতাকলে গম, যব বা ভুট্টা পেষাই হচ্ছে। আশেপাশে পাহাড়তলীতে দু'তিন ঘর গাদ্দি,—আধুনিক কালের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই বললেই হয়। সামান্য সব্জি, বিভিন্ন ফল, আটা বা চাউল, ভেড়া বা ছাগলের দুধ, মাংস—এইগুলি ভোজ্য বস্তু। পরনের সুতীবস্ত্র কিনে আনে, ফল বিক্রি করে—যার দাম আজকাল বেশি। ঘরে তকলিও ঘোরায়। লোম থেকে কম্বল বা জ্যাকেট বানায় নিজের হাতে। জীবনযাত্রা অতি সহজ।

চারিদিকে কোথাও মানুষের হাতের সাজানো বন-বাগান নেই। যেমন তেমনি আছে,—যেমন থেকে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে। অরণ্যলোক স্তব্ধ, শিবরাজ গর্বোন্নত, আদি সৃষ্টির ভাষ্য নিশ্চুপ, যেন কল্প-কল্পান্তের তপস্বীর। আপন মর্মের অন্তস্তলে এই নিস্তব্ধতার বীজমন্ত্র যেন শুনতে পাচ্ছিলুম। অরণ্যের ছায়ানিভৃতির ভিতরে বায়ুমর্মর, কচিৎ কোনও অলক্ষ্য পাখি বা সরীসৃপের ডাক, আর নয়ত এই নদীর উল্লোলধ্বনি,—এরই সঙ্গে মিলে রয়েছে আমার স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড। এই অপার স্তব্ধতা যেন অন্তহীন কালের একটি বিস্ময় আনে, বেদনা জাগায়,

অনির্বচনীয়ের পরম আস্বাদ যেন ক্ষুধাতুর চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে যায়। এটি দেবলোক,—বলে সবাই। কিন্তু দিনমানের প্রখর রৌদ্রকিরণেও দেওদার বনের নীচে ছায়ান্ধকার থমথম করছে। ওরই মধ্যে বার বার পাক খেয়ে ঘুরেছে আমার দেহ-মন। ওখানকার বিশাল উদ্দণ্ড দেওদারের উদার মহিমাকে লক্ষ্য করেই কি বলা হচ্ছে দেবলোক? অরণ্য-অটবীর আদিম রহস্যাধারের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতি লতায় পাতায় শিকড়ে কোটরে গুহায় গহ্বরে পাথরে ও জলস্রোতের আবর্তে যে অনাদি-অনন্ত প্রাণলীলা নিত্য উচ্ছ্বসিত, তাকেই কি বলা হচ্ছে দেবলোক? এ যেন মানালির আসনে বসে রয়েছে শিবরাজশীর্ষ এক উর্ধ্বায়িত স্তবের মতো।

ফিরে চললুম যেদিকে লোকালয়, যেদিকে মানুষের কণ্ঠস্বর এই স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মানালি যেন হিমালয়ের একটি অন্তঃপুর। এখানকার প্রত্যেকটি বনভূমি সংরক্ষিত, প্রত্যেকটি ফলের বাগান যেন ছবির মতো। একশ' বছর আগে এখানে আসেন এক বৃটিশ সামরিক কর্মচারী, সম্ভবত ইংরেজ মিঃ বেনন। তিনি এবং তাঁর সহযোগী মিঃ লী—এখানে স্থানীয় দুই নারীকে বিবাহ করে বসে যান। সেই বেনন পরিবারের এখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা। এখন তাঁরা বহু এস্টেটের অধিকারী এবং বহু ফলের বাগান ও গেষ্ট হাউসের মালিক। এঁদের সম্পর্কে 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে বিশদ্ আলোচনা আছে।

মানালি থেকে একটি পথ গেছে 'রোটাংয়ের' দিকে ১৩ মাইল দূরে নদী পার হয়ে। এটি মোটরপথ। এটি ঘুরে ঘুরে চলে গেছে উচ্চ উপত্যকায়। উপর দিকে পার্বত্য প্রান্তর। গিরিসঙ্কট পার হয়ে গেলে দিগন্তের দ্বার খুলে দেয় চারিদিকে। পূর্ব পথে স্পিতি বা পিতির শুভ্র চূড়াদল, যার পিছনে তিব্বতের হূনদেশ। দক্ষিণে হিমপ্রান্তর পেরিয়ে গেলে হিমাচলের অন্তর্গত বুশাহর রাজ্য—যার মূল নাম কিন্নর-ভূমি। স্পিতির উত্তরে লাদাখের অঙ্গদেশ রূপস্থ্। উত্তর পশ্চিমে লাহুল অঞ্চল,—যার প্রধান পার্বত্য জনপদ হল কেলং, এবং যেখানে 'বড়ালাচা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে গেলে লাদাখের অন্তর্গত জাস্কার উপত্যকাপ্রদেশ। লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা বালু-পাথরে আকীর্ণ। কিন্তু তিব্বতের মতো এ অঞ্চলেও মাঝে মাঝে হরিৎক্ষেত্রে ফসলের উৎপাদন ঘটে। গাদ্দিরা এখানে চাষ করতে আসে। কিন্তু তারা ছাড়া, আছে লাহুলী যাযাবর চাম্বা। এখানে তিব্বতী মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে, ভাষা বিকৃতিলাভ করেছে। লাহুল-স্পিতি জেলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্মিলিত চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দুর দেবালয়ে বৌদ্ধ আনুষ্ঠানিকতা, এবং বৌদ্ধগুম্ফায় শৈব ও শাক্তের প্রভাব,—এখানকার অনন্য বৈশিষ্ট্য। শতদ্রুর এক উপনদী 'ডঙ্কার'-এর তীরে যে দুর্গসদৃশ বৌদ্ধ গুম্ফাগ্রাম দেখা যায়, সেটি স্পিতি অঞ্চলের

॥ ২৪ ॥

কুলু-কাংড়া-পাঞ্জাব-চণ্ডীগড়

অরণ্য ও পর্বত মিলিয়ে অতি ক্ষুদ্র 'নাগর' হল বন্য জনপদ। এমন নিঃঝুম নিরিবিলি এবং এমন জনশূন্য ও নিঃসঙ্গ যে, রাত্রে ঘুমোবার আগে দুর্ভাবনা দেখা দেয়। এই বিরাট ও প্রাণীশূন্য 'নাগর প্রাসাদ' যেন ক্ষুধিত পাষাণের মতো। দিনের বেলায় দেখেছি, এই প্রাসাদের পাথরের ফাটলে-ফাটলে হাজার হাজার অন্তিকায় গিরগিটি। বাইরে পুলিশ চৌকি এবং খানসামা পরিবার,—কিন্তু ভিতরের প্রত্যেকটি মহল খাঁ খাঁ করছে। ২ হাজার ফুট নীচে নেমে গেলে তবে গ্রামের ইশারা পাওয়া যায়।

কিন্তু নামবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনেকটা বিপজ্জনক: পাথুরে সরু উৎরাই-পথ, বর্ষার আঘাতে ভাঙ্গা, তার উপর দিয়ে ছুটছে ঝরনার জলধারা, বড় বড় গর্ত—জীপগাড়ির পক্ষেও মারাত্মক। ওই সরু পথে আবার এক একটি বাঁক দেখলে গলা শুকোয়। কিন্তু অন্য কোন পথ আর নেই। সুতরাং ওই পথ দিয়েই প্রায় মাইল তিনেক গড়গড়িয়ে নেমে এক সময় বিপাশার কাঠের পুল পেরিয়ে পাওয়া গেল 'পাৎলিকুল।' এটি মণ্ডি, কুলু ও মানালির রাজপথ। এবার চেনা জগতে এলুম।

'পাৎলিকুল' থেকে কাটরাঁই এক মাইল সমতল পথ। উপত্যকা এদিকে বিস্তৃত। এক দিকে এক একটি গ্রাম, অন্য দিকে বিপাশার তটভূমি। কুলু, মানালি, কাটরাঁই, মণিকরণ প্রভৃতি সবগুলি তহশিল নিয়েই কাংড়া জেলা। কিন্তু কাংড়া বা কুলু—এরা দেশপ্রসিদ্ধ উপত্যকা। চট করে মনে পড়ে না কুমায়ুনে বা নেপালে এমন একটা সুদীর্ঘবিস্তৃত ও চিত্রবৎউপত্যকা দেখেছি কিনা। রামগঙ্গা পথ, বাগমতীর পথ, সরযূ-সোমেশ্বরের পথ—এদের ভুলিনি। কিন্তু তারা এমনটি নয়। ধওলাধারের তলায়-তলায় এই আশ্চর্য 'দেবভূমকে' পাহারা দেবার জন্য একদিকে দাঁড়িয়ে বীর বাঙ্গাহাল, হাতীধার,—অন্যদিকে ধওলাধার। কাংড়ার উত্তর-পূর্বে লাহুল-স্পিতি, আর দক্ষিণে 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পার হয়ে গেলে 'নারকান্দার' পথ।

কাটরাঁইয়ের টুরিষ্ট বাংলোর সুন্দর একটি ঘরে একরাত্রি বাস করে গেলুম। পূর্ণিমার বিলম্ব ছিল না। সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত বিপাশার তটভূমিকে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হয়েছে। এপাশে চীড়ের জঙ্গলের আশেপাশে আপেলের বাগান। চারিদিকে জনবিরল নীরবতা। বাংলোর একদিকে নদী, অন্যদিকে যে-

প্রশস্ত পথটি উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে,—এটি অতি প্রাচীন। এই পথে পাঞ্জাবী, আফগানি ও ইয়ারকন্দি বা চানথানিরা চিরকাল ধরে পশমের ব্যবসায় করে এসেছে। লাহুলী, লাদাখী, তিব্বতী,—কেউ বাদ যায় নি। এই পথটি কারাকোরম, লেহ্, উপসি, সুতক ও বড়ালাচা পেরিয়ে আসে কেলঙে, তারপর কেলং ছেড়ে চন্দ্রভাগার তীর ধরে এসে বিপাশার উৎস ছাড়িয়ে রোটাং দিয়ে নামে শিবরাজের নীচে অরণ্যপথে। অতঃপর মানালি থেকে কাটরাঁই, কুলু ও মণ্ডি হয়ে একেবারে কাংড়ার প্রায় শেষ প্রান্ত নূতরপুরের পশমিনাহাটে। এই নূরপুর থেকেই সেই বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

এই সুপ্রাচীন পথ ধরে ১২ মাইল দক্ষিণে এলে কুলু শহর—যার মূল নাম সুলতানপুর। এ শহর খুবই প্রাচীন। পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের কালে এই জনপদের নাম ছিল, "কিউ-লুতো," অর্থাৎ দেবভূমি। একে এই সেদিন অবধি বলা হত, Valley of Gods. এই দেবভূমের দুই পারে উত্তুঙ্গ গিরিলোক, আর মাঝখানে বিপাশা ও তার বিভিন্ন উপনদী অতি বৃহৎ ও বিস্তৃত সমতল উপত্যকা রচনা করেছে।

প্রাচীন কালের জনপদ কুলু এখন রীতিমতো একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হয়েছে। নির্মাণের কাজ চলছে এখানে-ওখানে। বহু বছর আগে প্রথম যখন কুলুতে এসেছিলুম, তখন খাদ্যসামগ্রী ছিল দুষ্প্রাপ্য, এখন অতিশয় দুর্মূল্য। এখন 'দশহরার' মেলার কাল। সমগ্র কাংড়া উপত্যকার জনসাধারণ ছাড়াও বাইরে থেকে এসেছে হাজার-হাজার। বিপণি-বেসাতি, প্রদর্শনী, নাচ-গান-সিনেমা-কৌতুক —সব মিলিয়েই মেলা। মাঠে মাঠে ধুলো উড়ছে, তারই মধ্যে মন্ত্রীমহলের বক্তৃতা, দেশগঠনের উপদেশ, রেডিয়োযন্ত্রে বোম্বাই গানের চিৎকার, বিকিকিনির জনতা এবং ভাতের হোটেলে গিয়ে ঢোকবার জন্য হুড়োহুড়ি। পুরনো এবং নতুন-শহরের মাঝখানে একটি গিরিনদী বয়ে চলেছে। সেখান দিয়ে যে সুবৃহৎ জনসমাগমটি দেখা যায়, সেটি বাঙ্গালীর দুর্গাপুজোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। সার্কাসের সঙ ছাড়া পুরুষের পোশাকে বর্ণবাহার কোথাও চোখে পড়ে না। কিন্তু কুলুতে গিয়ে রঙ্গীন 'কুলু-ক্যাপ' কিনে মাথায় চড়ায়নি, এমন পুরুষকেও দেখছিনে কোথাও। হাজার হাজার মেয়ের পোশাকে বিভিন্ন বর্ণের ও রঙের যে বন্যা দেখা যায়, সেটি খুবই চিত্তাকর্ষক। বিদেশী সাহেব-মেম যারা ওই 'দুসেরা' মেলায় গিয়ে হাজির হয়, তারাও মাথায় চড়ায় ওই রঙ্গীন কুলু-ক্যাপ।

আগে থেকে বন্দোবস্ত না থাকলে এই মেলার কালে বসবাসের জায়গা পাওয়া বড়ই কঠিন হয়। অনেক বাঙ্গালীকে হতাশ হয়ে ফিরতে দেখেছি।

ভাড়া প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৩ টাকা মাত্র। শ্রীমান শশাঙ্ক হঠাৎ যেন রামরাজ্যের আস্বাদ পেয়ে গেল।

প্রাসাদের কোলে যে-পথ, তারই নীচে একটি ঝুনো মারোয়াড়ির দোকান। খাদ্যাদির দরদস্তুর করে জানা গেল, লালাজি ঠিক রামরাজ্যের দরে ভোজ্য সামগ্রী বিক্রয় করেন না। কাঠকয়লা, নুন আর চা-চিনির দাম শুনে রাজপ্রাসাদকে ঈষৎ কণ্টকাকীর্ণ মনে হল। কিন্তু বিতর্কের আশঙ্কায় শ্রীমান শশাঙ্ক অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর সঠিক দরগুলি আমাকে আর জানতে দিল না। অতঃপর সে কোমর বেঁধে রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল এবং আমি প্রাসাদের তোরণদ্বারে সশস্ত্র পুলিশ-চৌকির লোকজনদের সঙ্গে বসে বর্তমান কলকাতার 'রামরাজ্যের' আলোচনায় মেতে উঠলুম।

'নাগরের' পার্বত্য উপত্যকা বিভিন্ন ফল-পাকড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বেরী, আঙুর, আখরোট, পীয়র (স্থানীয় নাসপাতি) ত বটেই, আপেলের বৈচিত্র্যও বিভিন্ন প্রকার। ওর মধ্যে 'সোনালি আপেল' নাগরের বৈশিষ্ট্য। প্রতি গৃহস্থ এক একটি ফলের বাগানের মালিক—যেমন মালদহ জেলার আম-বাগানের ইতিহাস। মালদহে এমন-এমন প্রাচীন বৃদ্ধা আছেন—যাঁদের তিনকুলে কেউ নেই, কিন্তু আছে এক টুকরো আমবাগান। ওই দিয়েই ভরণ পোষণ এবং আমের দু'মাস ভাতের হাঁড়ি না চড়ালেও চলে। কুলু উপত্যকাতেও তাই। কুলুর জনসাধারণ খায় মাছ-ভাত-মাংস-ডিম। মেয়েরা এয়োতীর সিঁদুর পরে, ভীমকালীর পুজো দেয়, শিবমন্দিরে মাথা ঠোকে, মহালয়ায় তর্পণ-শ্রাদ্ধ, দুর্গাপুজোয় সাজসজ্জা। সে যাই হোক, কুলুর অন্তর্গত নাগরের এই সুবৃহৎ ফলের বাগানই স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে অর্থনৈতিক ভিত্তি। প্রতি বছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই দুটি মাসে শত শত বর্গমাইলব্যাপী বিপাশার এই উপত্যকা যেন লক্ষ লক্ষ 'স্বর্ণপুষ্পে' ঝলমল করতে থাকে।

বন্য এবং আরণ্যক 'নাগর' জনপদটি যেন বহির্জগৎ থেকে বিচ্যুত এত নিভৃত নিলয়। এখান থেকে নিকটতম রেল স্টেশন কমবেশি ২০০ মাইল দূরে। নাগরিক জীবনের উপকরণাদি বা সুখসুবিধা এই জনপদের ত্রিসীমানায় নেই। আছে অন্তহীন পর্বতমালা আর তুষারচূড়ার দৃশ্য। নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে সম্পূর্ণ নিরুপায়। যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু মাইল তিনেক উৎরাই পথে নেমে 'পাৎলি কুলের' বড় রাস্তার সামনে গিয়ে বাসরুটে দাঁড়ানো যায় মাত্র। সেটি কুলু থেকে মানালি যাবার অতি সুন্দর প্রশস্ত পথ। সুতরাং একথা যদি কেউ বলে, আধুনিক কালের ফ্যাশনেবল্ সমাজের দুইজন অতি শৌখিন নরনারী এই সভ্যতাচ্যুত নাগরের সর্বোচ্চ চূড়ায় সানন্দে বনহংসের মতো বাসা বেঁধে আছেন তাহলে বিশ্বাস করতে বাধে। কিন্তু এটি

অবিশ্বাস্য হয় নি। নাগরের প্রাসাদ থেকে আন্দাজ এক মাইল চড়াই পথে ঘুরে গিয়ে আমি যে পুষ্পকাননের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়ালুম সেটি এক বাঙ্গালী ললনা ও প্রাক্তন অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারানী ও তাঁর চিত্রশিল্পী স্বামী সোয়েৎলাভ রোয়েরিরেখ ইন্দ্রপুরী। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোন দেশের কোন শিল্পী, কবি বা দার্শনিক কেবলমাত্র শান্তি, আনন্দ এবং জীবনপাত্রের উচ্ছলিত মাধুরীর পিপাসায় এমন একান্ত নিভৃত ও উচ্চ বাসভূমির স্বপ্নও দেখেননি। জগৎ সমাজকে ওঁরা বাইরে ফেলে এসেছেন।

মনে করেছিলুম আমার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের দ্বারা ওঁদের দুজনকে চমকিয়ে দিতে পারলে সারাদিন হাসির ফোয়ারা ছুটবে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। ওঁরা এখন বাঙ্গালোরে। আমার স্থায়ী নিমন্ত্রণ ছিল দেবিকারানীর এই নাগরের বাগান-বাড়িতে। কিন্তু কবে এ পাহাড়ে আবার আসব আমিই জানতুম না।

এই সম্পূর্ণ পর্বতচূড়াটির নাম 'রোয়েরিখ এষ্টেট।' চারিদিকে একটি সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এই দ্বিতল অট্টালিকা নির্মিত। পুষ্পকানন, ফলের বাগান, সব্জির খামার, দূরের ঝরনা থেকে পানীয় জল বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় হাতের মধ্যে আনা, জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পুষ্পলতা এবং বিচিত্র ধরনের গাছের চারা এনে লালন করা, প্রত্যেকটি কক্ষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ বৈশিষ্ট্য রচনার অধ্যবসায়,—রোয়েরিখ দম্পতির হাতে এগুলি সার্থক হয়েছে। আমি নীচের তলায় ঘুরে-ঘুরে মিঃ রোয়েরিখের চিত্রশালা এবং অন্যান্য কৃতিত্বগুলি পর্যবেক্ষণ করছিলুম। এখানে লোকজন মোতায়েন করা আছে। তারাই দেখাশোনা করে।

বোম্বাইয়ের চিত্র-প্রযোজক পরলোকগত হিমাংশু রায় মহাশয় ছিলেন দেবিকারানীর প্রথম স্বামী এবং তাঁরই প্রযোজিত অনেকগুলি ছবিতে সার্থক অভিনয় করে এই সুন্দরী চিত্রতারকা এককালে যশোশিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীমতী দেবিকারানী মহাকবি রবীন্দ্রনাথের এক সম্পর্কে নাতনি হন। মিঃ সোয়েৎলাভ রোয়েরিখ পরলোকগত প্রসিদ্ধ রুশ চিত্রশিল্পী নিকলাস রোয়েরিখের পুত্র। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবকালে ইংরেজের সহায়তায় এই ধনী পরিবার ভারতে এসে আশ্রয়লাভ করেন। সোয়েৎলাভ সেই শিল্পপ্রেরণা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ তাঁর ভারত সফরকালে মিঃ রোয়েরিখের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁরই আমন্ত্রণক্রমে কয়েক বছর আগে রোয়েরিখ দম্পতি সোভিয়েট দেশ ভ্রমণে গিয়ে সর্বত্র জনসমাদর লাভ করেন।

ওঁদের জন্য সেদিন কয়েক ছত্র চিঠি লিখে ফিরে এসেছিলুম। এবার আমি 'কাটরাঁইতে' নেমে যাব। কুলুতে দশহরা আসন্ন।

সন্তানটির কি প্রকার উত্তরাধিকারসূত্র। তিনি ঠিকই জানেন, কার সন্তান কোন্‌টি। তিনি অতি সতর্ক ও চতুর। স্বামীদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিত্তবান, অথবা যিনি পরিবার প্রতিপালনে যোগ্যতম, দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব তাঁর প্রতি। এজন্য বহু ক্ষেত্রেই তিনি 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান।' মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মতো নিরভিমান এবং নির্বিকার ব্যক্তিও তাঁর শেষ জীবনে এই নিয়ে একবার মাত্র অভিমান জানিয়েছিলেন। স্বর্গারোহণের পথে প্রথম পতন ঘটে দ্রৌপদীর। তিনি ছিলেন সেই যাত্রায় সকলের পিছনে। দেহত্যাগের আগে তিনি একবার সেখান থেকে চেঁচালেন, হে ধর্মরাজ, সশরীরে স্বর্গে পৌঁছবার আগে আমারই কেন প্রথম এই শোচনীয় পতন ঘটল, বলতে পার?

সর্বাগ্রগামী যুধিষ্ঠির থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, পারি। তোমার সঙ্গে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের বিবাহকালে এই চুক্তি ছিল, সকলকে তুমি সমান চক্ষে দেখবে এবং সমভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডবটির প্রতি ছিল তোমার সর্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ।

ধর্মরাজ, মেয়েমানুষের পক্ষে সেটি কি স্বাভাবিক ছিল না?

দুর্গম হিমালয়ের সেই তুষার বর্ষণের নীচে হিমায়িত হয়ে যাবার আগে দ্রৌপদীর শেষ আর্তকণ্ঠ শুনে ধর্মরূপী কুকুরটিও থমকিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দিলেন, সেইটিই তোমার পতনের কারণ।

পাঁচ ভাই মৃতা দ্রৌপদীকে ফেলে এগিয়ে গেলেন।

লাহুল-স্পিতিতে সামাজিক গণ্ডগোল দেখা দিল যখন পাঁচ-সাত বা দশ ভাই মিলে হয়ত দুটি, তিনটি বা চারটি মেয়েকে নিয়ে এল ঘরে। এবার মেয়েমহলে পারস্পরিক বিদ্বেষ দেখা দিল। উত্তরাধিকার সূত্রটি হয়ে উঠল জটিল অর্থাৎ এবার হল ঘরভাঙ্গার পালা।

এ ছাড়া আরেক প্রশ্ন এসে পৌঁছল। একত্র সহবাসের অর্থ হল বিবাহ। ফলে, সন্তানবতী কোনও মেয়েকে কোনও পুরুষ যদি তার পরিবারের মধ্যে আনে তবে সেই সন্তানরাও উত্তরাধিকারসূত্র লাভ করে। বিধবা যদি তার মৃত স্বামী বা স্বামীস্বরূপ মৃত রক্ষকের ঘরে থেকে বাইরে-বাইরে গণিকা-বৃত্তিও করে, তৎসত্ত্বেও সে প্রাক্তন স্বামী বা রক্ষকের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। "(A widow, whether she was a wife by marriage, or only by reputation, is allowed to keep possession of her deceased husband's estate so long as she lives in his house, however immoral her character may be)."—Imperial Gazette.

প্রকৃত কথা এই, লাদাখের মতো লাহুল-স্পিতিতে স্ত্রীলোকের জন্মসংখ্যা চিরদিনই কম। স্ত্রীলোক সেটি জানে, সেই কারণে শৈশব থেকেই সে চতুর হয়ে ওঠে। পুরুষ সে-ক্ষেত্রে নিরুপায় বলেই নিরীহ এবং মেয়ের উৎপাত সহ্য করতে সে বাধ্য। স্ত্রীলোক যে-দেশে কম, সেখানে সতীত্ব বা নারীর চরিত্র-সততার প্রশ্নই ওঠে না।

জ্বলামুখী, বজ্রেশ্বরী, ভীমকালী, তারা, কালিকা, ভবানী—এঁরা হলেন পাঞ্জাব-হিমাচলের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ ছাডা আছেন চূড়াধর, বৃন্দাবনী, ত্রিলোকনাথ, চম্পাদেবী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। রেণুকা বা নয়নাদেবীর আকর্ষণে বহু রাজ্যের পর্যটকরা আসে। কিন্তু মন্দির বা তীর্থের দেবদর্শন বড় নয়। তীর্থ মানে তীর্থপথ। একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে জাত, সম্প্রদায়, লোকাচার ও বিশেষ সংস্কৃতি। সেই কারণে তীর্থভ্রমণ বা মেলা ছিল এদেশের বড় রকমের শিক্ষাস্থল। সম্রাট হর্ষবর্ধন ভারতবর্ষকে এক-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন কুম্ভমেলার সৃষ্টি করে,—যে চারটি মেলা বসে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, উজ্জয়িনীতে ও নাসিকে। গঙ্গা, যমুনা, শিপ্রা ও গোদাবরী।

কালী পাহাড়ের কোলে জ্বলামুখীর মন্দির। এ পাহাড় হল আগ্নেয় ধাতবে পূর্ণ। এখানকার পাণ্ডারা এই পাহাড়ের বিভিন্ন ছোট-বড় আগ্নেয় ছিদ্রকে ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়ে উপার্জনের কাজে লাগায়। ফলে, তীর্থযাত্রীরা তাদের মুখ থেকে নানাবিধ আজগুবী কথা শুনতে বাধ্য হয়। ইদানীং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ফলে এই সকল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কমে গেছে। পাণ্ডারা যখন একটি কুণ্ডের মধ্যে বিশেষ পদার্থ ছিটিয়ে জলের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে জ্বলামুখীর নাম সার্থক করতে চায়, তখন তীর্থযাত্রীরা কৌতুক বোধ করে। ভক্তিগদগদ হবার যুগ বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু ভক্তিবাদের নামে অপরের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে চতুর পাণ্ডাসমাজ এতকাল ধরে প্রতিপালিত হবার ফলে তাদের ভিতরে ঢুকেছে দুর্নীতি এবং দুর্গতি। সমস্ত ভারতের তীর্থস্থান ও মন্দির-এলাকা এই ব্যাধিতে জরোজরো। যে-সমস্যা জ্বলামুখীতে, ঠিক সেই সমস্যাই কলকাতার কালীঘাটে, গুজরাটের দ্বারকায়, পুরীর জগন্নাথে। সেই সমস্যাই দক্ষিণের রামেশ্বরমে, হিমালয়ের কেদার-বদরিনাথে, উজ্জয়িনীর মহাকালে, কাশীর বিশ্বনাথে বা অযোধ্যার রামচন্দ্রে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের পাণ্ডাসমাজের সঙ্গে গয়ার গদাধরের পার্থক্য কম। দুর্নীতির সঙ্গে দুষ্কৃতি—অধিকাংশ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এই। অসাধু, জুয়াড়ি, গুণ্ডা, প্রতারক, পাগল, নেশাখোর, গণিকা, ভিখারী,—এবং এদের সঙ্গে বহু তীর্থের

এই মেলায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। শ্রীশ্রীরঘুনাথজীকে চতুর্দোলায় আনা হবে। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ করবেন। কুলুর রাজা স্বয়ং সমারোহসহকারে এসে নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির ভিতর দিয়ে শ্রীরঘুনাথের উদ্দেশে পূজা দেবেন। চেয়ে দেখলুম সেই রাজা এলেন মাথায় পাগড়িমুকুট পরে,—মুকুটের উপরে উড়ছে ময়ূরের পালক—যেন রাজা দুষ্মন্ত। কটিদেশে তরবারি,—ওটা চকচক করছে বটে, তবে শান-দেওয়া নেই। পরনে রঙ্গীন রেশমের সাজ। কণ্ঠে মুক্তালহরী মালা। ঈষৎ খর্বকায়, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, রঘুডাকাতের মতো গোঁফ। সব মিলিয়ে যাত্রাদলের 'বালিরাজা'। তাঁর পাত্র-মিত্র-পারিষদবর্গ আছেন আশে-পাশে। ভিড়ের ভিতর থেকে জনৈকা আমেরিকান মহিলা কয়েকটি ছবি তুললেন।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য, অগণিত দেবদেবীর মূর্তির সমাবেশ ও শোভাযাত্রা। এগুলি রোপোর অথবা পিতলের। একই ছাঁচে দুটি, পাঁচটি বা দশটি মূর্তির মুখ। বহু গ্রামের এরা কুলদেবতা,—গ্রামবাসীরা দূর-দুরান্তরের পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে এগুলি উৎসব উপলক্ষ্যে আনে। গাঁদা ফুলের মালা, সিঁদুর, মখমল ও লালশালু দিয়ে ঢাকা,—বড় বড় মূর্তিমুখ। মাঠের মধ্যেই ওই মূর্তিগুলিকে ঘিরে পূজা-অর্চনা ও আহারাদির পাট, আশেপাশে শৌচাদি, মাঠে-মাঠেই কম্বল মুড় দিয়ে রাত্রে পড়ে থাকা। মেয়েরা লাজুক, নম্র, ভদ্র এবং অনেকটা প্রাণোত্তাপশূন্য। পুরুষরা নিরীহ এবং নির্বিরোধ। প্রতি মেয়ের কপালে লাল ফিতে, মাথায় সিঁদুর, হাতে কাঁকন, গলায় মুক্তোর মালা, গায়ে লাল কালো নীল বা সবুজ জ্যাকেট, পরনে হাতে-বোনা পশমের ঘাগরা,—যার কোনটার দাম দেড়শ' টাকার কম নয়। ওর মধ্যে যারা কিছু শৌখীন, তাদের সম্পূর্ণ পোশাকটির মূল্য কম পক্ষে প্রায় সাতশ' টাকা। বিস্ময়ের কথা এই, পাথরের আর পাতা-লতার দরিদ্র ঘরের গৃহস্থালীতে চাষী পরিবারের সংখ্যাই বেশি, অন্নের সংস্থান পরিমিত, রোগে ও দারিদ্র্যে স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালীর মতোই জীর্ণ তার উপর তুষারপাতের কালে বছরে চার মাস বেকার। কিন্তু উৎসবের কালে বাঙ্গালীর মতোই ওদের আত্মহারা উদ্দীপনা দেখা দেয়। উৎসব এবং আনন্দটাই বড়,—জীবনযাত্রার শোচনীয় দারিদ্র্য, অন্নাভাব, সংস্থানহীনতা, এগুলি তখন আনন্দের পথরোধ করে দাঁড়ায় না। এটি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, কুলু উপত্যকার চাষীরা 'গাদ্দি'দের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ পশম কেনে, এবং সেগুলি নিজেদের হাতে বোনে। এদের হাতের শিল্পকার্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুলুর শাল, স্কার্ফ, টুপি ও পশমের ঘাগরা, পশমিনা চাদর ইত্যাদি বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রতি বছরের 'দুসেরা' মেলায় কুলুর নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদাই বেশি। সে যাই হোক, হিমাচল প্রদেশের গর্ভলোকে কাংড়া, কুলু, মানালি ও লাহুল-স্পিতি থাকা সত্ত্বেও

যখন এগুলি পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত, সেই হেতু পাঞ্জাবের আধুনিক অর্থনীতি এখানে কাজ করেছে বেশি। স্বর্গত সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পাঞ্জাবে এখন বেকার সমস্যা ও রেফুজি সমস্যার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। এই অর্থনীতির বড় বড় তরঙ্গ এসে পৌঁছেছে কাংড়া উপত্যকার প্রত্যেকটি পার্বত্য অঞ্চলে। বিগত ১০।১২ বছরের মধ্যে নির্জীব গ্রামগুলি জনপদ এবং শহরে পরিণত হয়ে যে প্রবল প্রাণময়তাকে প্রকাশ করছে, সেটি বিস্ময়জনক। অতি নিভৃত হিমালয়ের গহনলোকে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাবীদের ব্যবসায় ও বাণিজ্য। আজ পালামপুর, ধরমশালা, ডেরাগোপীপুর, কাংড়া শহর, নাগরোতা, মুখেরিয়াঁ, নূরপুর,— এদের সেই পুরনো চেহারা কোথায় হারিয়ে তলিয়ে গেছে। শুধু কাংড়া নয়, গরীব হিমাচল রাজ্যের বিভিন্ন শহরাঞ্চলেও পাঞ্জাবের এই অর্থনীতির তরঙ্গ পৌঁছেছে। আজকে যেমন কাংড়ার অন্তর্গত সেই প্রাচীন ও পার্বত্য বৈজনাথকে দেখে আর চিনতে পারা যায় না, তেমনি চেনা কঠিন হিমাচলের অন্তর্গত মণ্ডি, বিলাসপুর, যোগিন্দরনগর এবং চম্পা নগরগুলিকে। এদেরও উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পদসম্ভার সম্ভব হয়েছে পাঞ্জাবের অর্থনীতিক উন্নতির প্রভাবে। উত্তর ভারতে পাঞ্জাবের সমকক্ষ কেউ নেই।

যা বলছিলুম। কুলুর 'দশহরার' মেলায় অপর একটি বৈশিষ্ট্য যেটি চোখে পড়ে সেটি হল এর শাক্তনীতি বা মত। বস্তুত, দক্ষিণ হিমালয়ের সর্বত্র শক্তিপূজা ছাড়া ভিন্ন নীতি নেই। শৈবের সঙ্গে শাক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঙ্গালী জাতিই প্রথম ঘুচিয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু কাশ্মীরে, হিমাচলে, পাঞ্জাবে, নেপালে, ভুটানে, আসামে, এমন কি 'পশ্চিম' পাঞ্জাবের বহু অঞ্চলেও এই শাক্তমত কাজ করে এসেছে চিরকাল। একমাত্র কুমায়ুনে বোধ করি শৈবমতের প্রাধান্য প্রবলতর। কুমায়ুনে বলিদান প্রথা কম।

কুলুর মন বাঙ্গালীর মতো। এখানে দশহরা উপলক্ষ্যে মোট ৭ রকমের বলিদান দেওয়া হল আনুষ্ঠানিক বিধি। যথা, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মোরগ, মাছ ও কাঁকড়া। বলিদানের মাংসের নাম বোধ করি 'মহাপ্রসাদ'। তবে মহিষের মাংস সুস্বাদু বা স্বাস্থ্যদায়ক কিনা, এটি আমি কুলুতে খোঁজ করে দেখিনি।

লাহুল-স্পিতি অঞ্চলের সঙ্গে কুলু-মানালির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। উভয়ের স্বার্থ এক, কিন্তু সামাজিক জীবনে পার্থক্য প্রচুর। লাহুল-স্পিতি চিরকাল ছিল লাদাখের অন্তর্ভুক্ত, সেই কারণে লাদাখের নিজস্ব সংস্কৃতি এরা বহন করে। লাহুল-স্পিতির নারীসমাজ বহুভর্তৃক। প্রতি পরিবার মাতৃশাসিত (matriarchal)। মেয়েমাত্রই দ্রৌপদী। সন্তানমাত্রেরই পিতা হল 'যুধিষ্ঠির'। দ্রৌপদীই নির্দেশ করবেন কোন্

আমি যাচ্ছিলুম হিমাচল রাজ্যের দিকে। এই রাজ্যটি পেয়ে বসেছে আমাকে বহুকাল থেকে। আমার পাঞ্জাব বসবাস কালে এমন একদিন ছিল যে, জলন্ধর-লুধিয়ানার পর মাঝ রাত্রে যখন আম্বালার নামোচ্চারণ শুনতুম, ঘুম-চোখে পুঁটুলি নিয়ে নেমেই পড়তুম ট্রেন থেকে। আমি জানতুম আমাকে টেনে নিয়ে চলল হিমাচল!

কিন্তু পাহাড় পর্বত পেরিয়ে যখন বিলাসপুরের দিকে যাচ্ছিলুম, মাঝপথে একটু বাধা পড়ল। দুইজন বন্ধু এসে দাঁড়ালেন সামনে। প্রথমজন বীরভূমের নেতৃস্থানীয় মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, কবি বিজয়লালের সহোদর—এবং দ্বিতীয়জন দুলালগোপাল মুখোপাধ্যায়—হিমাচল গভর্নমেণ্টের উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারি। 'তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা নাস্তি'—এই প্রবচনটি ভুলে গিয়ে ওঁরা বললেন, তা শুনব না—চলুন, চণ্ডীগড় ঘুরে আসি।

সুতরাং দুলালবাবুর সরকারী গাড়িতে চড়ে একদা কাল্কায় এসে পৌঁছলুম—তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল। পার্বত্যপথের ঠাণ্ডার মধ্যে রৌদ্র ছিল বড় মধুর। এখন পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছে—সেটি শরৎ এবং হেমন্ত। মিহিরলালের সঙ্গ ও সান্নিধ্য আনন্দদায়ক ছিল। দুলালবাবু বহুদর্শী, তিনি বোধ করি আমাদের জবরদস্ত স্বাস্থ্যের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে প্রচুর পরিমাণে আহার্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছিলেন!

কাল্কা স্টেশন দেখলেই আমার মন বিমর্ষ হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে সিমলা থেকে নেমে কাল্কা-অমৃতসর-লাহোর হয়ে কোয়েটা যাচ্ছিলুম। এই কাল্কায় তৎকালীন পুলিস আমার ন্যায় নিরীহ ব্যক্তিকে কিছু বিব্রত করে। তাদের ধারণা, আমি পলাতক বিপ্লবী! আমার পকেটে ছিল দীনবন্ধু সি-এফ-এনড্রুজ মহাশয়ের লিখিত একখানি চিঠি। দীনবন্ধু তখন ইংরেজ পুলিসের চোখে একজন 'পলিটিক্যাল্ এজিটেটর' মাত্র। পরবর্তী ৫ দিন অবধি "ইঁদুর ও বিড়ালের" লুকোচুরি খেলা শেষ করে হায়রান হয়ে এই কাল্কা স্টেশনেই বোধ হয় দিন দুই পড়েছিলুম। তখন প্রখর গ্রীষ্মকাল।

কিন্তু সেই কাল্কা এখন আর নেই। স্টেশন হয়েছে সুবিস্তৃত এবং ব্যবসা-বিপণি বসেছে চারিদিকে। সেই জনবিরলতা এখন স্বপ্নবৎ। কাল্কার সঙ্গে মিল আছে কাঠগোদামের—স্টেশন ছেড়ে বেরুলেই অদূরে পাহাড়তলী! স্টেশনের কোলের কাছ দিয়ে চলে গেছে মসৃণ সুন্দর রাজপথ। পাঞ্জাবের শ্রী, শোভা, সম্পদ ও ঐশ্বর্য এবং এদের সঙ্গে ছবির মতো পথঘাট—চোখ দুটোকে বার বার অভিভূত করে!

পাহাড়তলীর পথ নেমে এসে মিলে গেছে সমতল প্রদেশে। বহুকাল অবধি আমি যেন একটা পার্বত্য বন্যজীবন যাপন করছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম সমতলের চেহারা। এখনও চোখে আমার বন্যতার স্পর্শ রয়েছে, এখনও আমার চিন্তা মিলিয়ে রয়েছে বড়ালাচায়, লাহুলে আর রোটাংয়ে। মন ঘুরছে শিবরাজ পর্বতের তলায় দেবদারুবনের গিরিনির্ঝরের আশেপাশে, আমি যেন সেখান থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনেছি অসময়ে। আমি সহজ হতে পারব, যখন আবার বন্য শতদ্রুর প্রবাহপথ ধরে গিরিখাদের নীচে নীচে ফিরে যাব দূর পর্বতের পারে সেই কিন্নর রাজ্যে!

কাল্‌কা থেকে সোজা দক্ষিণপথে চণ্ডীগড় প্রায় মাইল কুড়ি। এই দুইয়ের মাঝখানে 'পিন্‌জোর' অঞ্চলে একটি জনবিরল আধুনিক গ্রামে যে প্রাচীন 'মোগল গার্ডেন'টি পাওয়া যায়, সেটির শোভা ও সৌন্দর্য মনোরম। বৃহৎ বৃক্ষদলের ছায়া চারিদিকে, তারই নীচে নীচে কোমল নধর তৃণভূমি—যেমনটি পাওয়া যায় তাজমহলে! সমস্ত বাগান জুড়ে পুষ্পকানন রচিত—যেটি ছিল পূর্বকালে। সামনে জলাশয় এবং জলেরই বিভিন্ন খেলায় বাগানটি প্রাণময়। জল মানেই জীবন। অজস্র জল মানেই প্রাণের অজস্রতা। মোগল কীর্তি সর্বদা এই জলকে গ্রহণ করেছিল। জলের ব্যবস্থা হয় নি বলে 'ফতেপুর সিক্‌রির' অমন বৃহৎ 'বুলন্দ্‌ দরওয়াজা' আজও পিপাসায় হাঁ করে রয়েছে! জলাশয় ছাড়া ভারতের কোনও নগর বসেনি। জলাশয় শুকিয়ে গেলে সভ্যতার নাভিশ্বাস ঘটে। আমরা কোমল নধর তৃণভূমিতে গা এলিয়ে দিয়েছিলুম।

চণ্ডীগড়ের সীমানায় যখন পৌঁছলুম তখন অপরাহ্ণ। এটি শিবলিঙ্গ পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তের সমতল উপত্যকা। এই উপত্যকা অবশ্য পাঞ্জাবের মধ্যে, কিন্তু উত্তরে ও পূর্বে হিমাচলের গিরিশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। হিমাচল রাজ্যের দক্ষিণ ভূভাগ পার্বত্য 'শিরমুর' জেলা এখানে চণ্ডীগড় ও আম্বালার সঙ্গে মিলেছে। সামরিক বা প্রতিরক্ষার দিক থেকে চণ্ডীগড় নগরের প্রাধান্য এখন সর্বজনস্বীকৃত। পাঞ্জাব হল ভারতের সর্বাপেক্ষা বলবান প্রহরা। এ রাজ্যের প্রত্যেক বড় বড় শহরই ছাউনি শহর।

হিমালয়ের তরাই অঞ্চল শত শত মাইল বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বে আসাম ও নেফা অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা। সমস্তটার দৈর্ঘ্য বোধ করি কম-বেশী দু'হাজার মাইল। এই তরাই অঞ্চল কোথাও পার্বত্য উপত্যকাময়, কোথাও বা সমতল। এই বৃহৎ বিস্তৃত তরাই অঞ্চলে হিমালয় থেকে নেমেছে হাজার হাজার জলধারা, এক একটি সর্বনাশা নদ ও নদী—যারা কথায় কথায় বন্যা আনে!

পাণ্ডাগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এরা বংশানুক্রমিকভাবে পরান্নজীবী এবং অলস। ব্যাধি, দুর্নীতি এবং চাতুরীতে এরা নিত্য জরোজরো। সবাই মন্দ তা বলছিনে, সৎ ব্যক্তিও আছে ওদের মধ্যে। সেবাপরায়ণতা, আতিথেয়তা, বিদেশ-বিভুঁয়ে যাত্রীদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ, আহার ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেওয়া,—এগুলির জন্যও বহু পাণ্ডা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা সর্বত্রই কম।

কাংড়ার একাধিক মন্দিরের পাণ্ডাদের সমাজে উপরোক্ত দুর্নামগুলি আছে। এদের নাম 'ভোজকি' অথবা 'পূজকি', অর্থাৎ পূজারি বামুন। এরা অনেকে প্রকাশ্যে পাণ্ডা, অপ্রকাশ্যে হালুইকর। দেবোত্তর সম্পত্তি এদেরই হাতে। যাত্রী এবং যজমানের টাকায় এরা ব্যবসাও ফাঁদে, জুয়াও খেলে। এরা থাকে বিলাস-ব্যসনে। দিনের বেলাকার উপবীতধারী পূজারী, সন্ধ্যার পর হয়ে ওঠে রঙ্গরসের ক্রীড়নক। তার উপকরণাদির অভাব যাতে না ঘটে তার জন্য অনুগ্রহ-জীবীরা মোতায়েন থাকে। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের মরশুমও আছে। কালীপুজো, দশহরা, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি, অক্ষয় তৃতীয়া,—এগুলি সর্বভারতীয়। প্রত্যেকটি প্রদেশের পাণ্ডাদল নিজ নিজ মন্দিরের জন্য বছরে ৩।৪টি পর্বদিন স্থির করে এবং তার জন্য প্রচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। জ্বলামুখী, ভবানী, বজ্রেশ্বরী,—এগুলির কোনটাই তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে পাণ্ডাদের উপার্জন অনেক বেশি। পাণ্ডাদের পারিবারিক জীবনের ইতিহাস নাই-বা আলোচনা করলুম। অনেকেই জানেন, কাংড়ায় 'পূজকি' সমাজের মহিলাদেরও যথেষ্ট সুনাম নেই।

কাংড়ার ব্রাহ্মণদের নানা শাখা আছে। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হল চাষী। গাদ্দি বা গদ্দিদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ আছে প্রচুর—যারা ভেড়া ছাগল নিয়ে পাহাড় পর্বতে ঘোরে। তৃতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বলা হয় 'নাগ্রাকোটিয়া'। চতুর্থ শ্রেণীকে বলা হয় 'বাটেরাস'। এদের মধ্যে গাদ্দিদের খ্যাতি ও সুনাম সর্বাপেক্ষা বেশি। বস্তুত, কাশ্মীরে, উত্তর পাঞ্জাবে বা হিমাচলে—যাঁরা ভ্রমণে আসেন, গাদ্দিদের সম্বন্ধে সুখ্যাতি তাঁরা ঠিকই শুনতে পান। এরা চিরকালই শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী এবং নির্বিরোধ। পাঠান অধিকারের কালে এরা দক্ষিণে পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ—ইত্যাদি অঞ্চল থেকে পালিয়ে হিমালয়ের নিগূঢ়লোকে গিয়ে নানা অঞ্চলে বাসা বাঁধে এবং সামন্ত রাজাদের কৃপায় চাষবাসের কাজ পায়। রেফুজি সমস্যা আমাদের দেশে নতুন নয়। বিগত ছয় শ' সাত শ' বছর ধরে পাঠান-মোগল-ইংরেজ-পর্তুগীজ প্রভৃতি প্রত্যেকের আমলেই এক-একবার দেখা দিয়েছে এই উদ্বাস্তু সমস্যা। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার, দস্যুরাজ মিহিরকুল,—এঁদের আমলও বাদ যায়

নি। কিন্তু মানববংশপরম্পরা মনুষ্য জাতির দুর্গতি ও দুর্দশার ইতিহাস ভুলে যায় সহজে। তারা মনে রাখে সুখের ও আনন্দের স্মৃতি,—শিল্প কাব্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথাই শুধু মনে রাখে। সভ্যতার মহিমা, বিরাট কীর্তিস্তম্ভ, উদার করুণার কাহিনী, ভালবাসার মহৎ আত্মত্যাগ,—মানুষের সমাজ এই নিয়ে জপ করে। কাংড়ার সামাজিক ইতিহাস অপেক্ষা কাংড়ার সাংস্কৃতিক ও চিত্রশিল্পের (Kangra School of Art) ইতিহাস মানুষকে মনে রেখেছে। মানব সমাজে ক্লেদ জমে অতি নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে। পাপ ও অন্যায় ঢোকে কুটিল পথ দিয়ে। ছোট ছোট দুষ্কৃতি সুড়ঙ্গপথে আসে। ব্যভিচার, অনাচার, উৎপীড়ন, বলদর্পীর অপরাধ,—এরা অলক্ষ্যে এসে ধীরে ধীরে জায়গা দখল করে বসে। কিন্তু যখন ভাঙনের রব ওঠে, যখন বিপ্লবের ডম্বরু বাজে, মহাকাল যখন তাঁর শিঙ্গায় ফুৎকার দেন,—মানুষের সমাজ তখন প্রলয়ের নাড়ায় নড়ে উঠে ভাবে, হঠাৎ এই ঝড় কেন?

গাদ্দিদের কথায় আবার ফিরে আসি। ভুন্তার, মণিকরণ, আউট প্রভৃতি অঞ্চল পেরিয়ে জ্বালামুখী বৈজনাথ ছাড়িয়ে যাবার সময় দেখছিলুম, 'গাদ্দি' শব্দটির অন্তরালে রয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ত' বটেই, রাজপুতের দলও আছে এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে 'রাঠী'। সম্ভবত রাঠোর বংশীয় থেকেই 'রাঠী'। এরা এখন ভুলে গিয়েছে নিজেদের পূর্ব ইতিহাস এবং পূর্ব বংশের ইতিবৃত্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে এরা অজানা ভূভাগে বা অনধ্যুষিত পার্বত্যলোকে সর্বসমাজচ্যুত অবস্থায় জীবন যাপন করেছে—আজ যেমন পূর্ববঙ্গের রেফুজিরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের পাহাড়ে প্রান্তরে। এরা চাষবাস করে এমন অগম্য ও দুস্তর তুষার ভূমির আশেপাশে—যেখানে অন্য সমাজের স্বার্থ সামান্যই। উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত অঞ্চলকে এরা আপন অধ্যবসায়ের দ্বারা গড়ে তুলেছে। সেই কারণে যেখানে উচ্চ পর্বতের কোলে প্রতিষ্ঠিত গাদ্দি গ্রাম, সেখানে অন্য কেউ নেই! পশুর দল নিয়ে ওরা যেখানে চরাতে যায়, সেখানে অন্যের স্বার্থহানি ঘটে না। ওরা শত শত বছর আগেকার 'রেফুজি', কিন্তু ভিক্ষা করেনি কোন দিন! ওরা পরিশ্রমের দ্বারা আপন অন্ন অর্জন করেছে—রাজদরবারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কেঁদে বেড়ায় নি! ওদের পুরুষরা অতি ভদ্র এবং নিরীহ। ওদের মেয়েরা যেমন সচ্চরিত্রা, তেমনি নম্র ও মধুরপ্রকৃতি। মেয়েরা প্রকৃতই সুন্দরী, পুরুষরা স্বভাবতই সুশ্রী। দোকানে, বাজারে, হাটে, মেলায়, পাহাড়গুলির আশে-পাশে—ওদের মুখোমুখি হয়েছি কতবার। দেখেছি ওদের সাধুতা ও সততাবোধ, প্রকৃতিগত সরলতা, ব্যবহারের শুচিতা এবং লোকমুখে শুনেছি ওদের সত্যনিষ্ঠা এবং নীতিপরায়ণতা। ভারতীয় সমতলে ওরা আসে কম। ওদের দেখেছি কাশ্মীরে, জম্মুর নানা পাহাড়ে, হিমাচলের বহু অঞ্চলে এবং এই কাংড়া জেলার নানা স্থানে।

এখানে হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী গহন বনভূমি—যেখানে জন্তু, পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র। আবার এর সঙ্গেও আছে বৃহৎ প্রান্তর, জনশূন্য উপত্যকা, সুবিস্তৃত জলাশয়, অনধিগম্য আরণ্যভূমি। তারই অঞ্চলের এমনি একটি সুবৃহৎ সমতল ও পার্বত্যপ্রাকারবেষ্টিত বিশাল প্রান্তর একটি নূতন নগর নির্মাণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল! এই নগরের নামকরণের কালে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবী শক্তিরূপিণী কালিকার নামানুসারে এর নাম রাখেন 'চণ্ডীগড়'। চণ্ডীগড়ের পাশেই দেবী কালিকা অর্থাৎ কাল্‌কা।

এই অতি বৃহৎ নগরটি নির্মাণের আগে তিনি জগতের সর্বত্র খোঁজখবর সংগ্রহ করে বিশেষজ্ঞের দ্বারা সর্বাধুনিক ধরনের এবং আগাগোড়া বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় এই নগরের নকশা বা ডিজাইন প্রস্তুত করেছিলেন। যেমন উত্তরের আলো, পশ্চিমের হাওয়া, দক্ষিণের শীতকালীন রৌদ্র, গ্রীষ্মোত্তাপের মাত্রা, প্রত্যেক উদ্যানবাটির আয়তন, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের বিবিধ পন্থা এবং সর্বোপরি সুশ্রী নগর নির্মাণের আগে তার সুন্দর দৃশ্যের পরিকল্পনা—এগুলির সম্বন্ধে ছিল তাঁর বিচক্ষণ বিচার। চণ্ডীগড়ের এই সুন্দর নকশাটি প্রস্তুত করার আগে তিনি ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ নগর-নকশাবিদ্ ল্য কর্বুজিয়েকে (Le Corbusier) এদেশে আনিয়েছিলেন এবং এই বৃহৎ কর্মসম্পাদনের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ রেফুজিকে নিযুক্ত করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর পার্টির হাত থেকে ডিক্টেটরি বা সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র পাঞ্জাবে তিনি ছোট বড় অনেকগুলি জনপদকে স্ফীত করে তুলেছেন, সেগুলি সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু তাদেরই সঙ্গে পাঞ্জাবের এই নূতন রাজধানী নির্মাণের কাজও নিয়েছিলেন। কল্যাণ-রাষ্ট্রের মূল নীতি ও আদর্শ তাঁর জানা ছিল বলেই পাঞ্জাবে আজ তিলমাত্র রেফুজি সমস্যা নেই! আততায়ীর হাতে নিহত হবার আগে তিনি 'অসাধু' প্রমাণিত হয়ে নেহেরুজীর মৃত্যুর পরে গদিচ্যুত হন! কিন্তু গদিচ্যুত হবার আগে তিনি বহু লক্ষ সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু পরিবারকে বিত্তশালী করে যান। চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাবীরাই বলেন, এ কালের ভারতে তাঁর ন্যায় কীর্তিমান ব্যক্তি দ্বিতীয় নেই! চণ্ডীগড়ের জগৎ-প্রসিদ্ধ নকশার ল্য কর্বুজিয়ে সম্প্রতি ফ্রান্সের দক্ষিণ রিভিয়েরায় সন্তরণকালে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। (২৭-৮-৬৫)

মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীর বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য আতিথ্য নিতে গিয়ে জানলুম, চণ্ডীগড়ে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা প্রচুর এবং তাছাড়া প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকীল, এ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি নানা উপজীবিকাসম্পন্ন বাঙালীও আছেন। বাঙালীরা এখানে একাধিক দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। নগর পরিভ্রমণ কালে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর স্মৃতিসৌধ দুটির নির্মাণকলা লক্ষ্য করে চমৎকৃত

হয়েছিলুম। নগরের মধ্যস্থলে যে বিশাল আরক্তিম হ্রদটি ক্ষুদ্র এক সাগরের মতো চোখে পড়ে, সেটি যেন ছুরিকাহত পাঞ্জাবের বুকের রক্তেই গৈরিকবর্ণ। এই হ্রদের তীরভূমি পরিভ্রমণের পক্ষে চমৎকার। 'নির্জলা' নূতন দিল্লীতে এমন একটি সুন্দর জলাশয়ের একান্তই অভাব। যাই হোক, চণ্ডীগড়ের বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক কলেজ, প্রধান দপ্তর, পূর্ত বিভাগ ভবন—এগুলি পাঞ্জাবের পক্ষে গৌরবের বস্তু। জীবন-যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য, ভবিষ্যতের নির্ধারিত কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যোন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্র—এগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকার জন্য পাঞ্জাবের ছাত্রসমাজে না আছে অসন্তোষ, না রাজনীতিক দ্বন্দ্ব, না মারমুখী মিছিল, না বিধিলঙ্ঘনের জন্য হুড়োহুড়ি!

আলাপ-আলোচনা, দেখা সাক্ষাৎ এবং নগরভ্রমণ শেষ করতে গিয়ে রাত দশটা বাজল। অতঃপর সদাশয় ও মধুরভাষী মিহিরলালকে তাঁর ভগ্নীর বাড়িতে রেখে অতিথিবৎসল দুলালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আলোকোজ্জ্বল চণ্ডীগড় ত্যাগ করে আবার সেই রাত্রেই হিমাচল রাজ্যের অন্ধকার পথের দিকে আমরা অগ্রসর হলুম।

॥ ২৫ ॥

বুশাহর-রামপুর-মাহাসু (হিমাচল রাজ্য)

গহন গভীর হিমালয়ের তলায়-তলায় চলে যাচ্ছিলুম দূর থেকে দূরান্তরে। চারিদিকে অনাদিকাল যেন অনন্তের জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। দুরারোহ নামহারা এক-একটি আরণ্যক উত্তুঙ্গ শীর্ষ,—তার প্রারম্ভ ও পরিণতির ইতিহাস আমার জানা নেই।

দক্ষিণ হিমাচলের পূর্বপথ অপরিচিত থেকে এসেছে বহুকাল অবধি। শতদ্রুর দুই পারে এই পর্বতমালা কোথাও ছেদ বা অবকাশ সৃষ্টি করেনি। দুই দিক থেকে বিশাল গগনস্পর্শী প্রাকার উঠেছে অথৈ নীচেকার শতদ্রুর নীল ধারার দুই পারে। ভয় করে সেই অতলস্পর্শ গিরিখাদের নীচের দিকে চোখ ফেলতে। সেখানে ছম ছম করছে ছায়ান্ধকার,—সে যেন এক অটবী সমাকীর্ণ বন্য বিভীষিকা,—যেখানে কল্পে ও কল্পান্তরে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। সূর্যের উদয়াস্ত পথে সেই বন্য দুরন্ত শতদ্রু ঝলমল করতে থাকে। আমি ওরই ধারে ধারে যেন কীটাণুকীটের মতো অগ্রসর হচ্ছিলুম।

পর্বতগাত্রে মানুষের এক একটি বসতি—সেও যেন অতি ক্ষুদ্র এক একটি কীটের মতো হিমালয়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে। ওরা চিরকাল ওই ভাবেই থেকে এসেছে। ওদের উপর দিয়েও চলে গেছে কালের পর কাল, সভ্যতার পর সভ্যতা। ওরা নড়েনি, সরেনি। ওরা রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাজনীতিক বিপর্যয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি। পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধভাবে একেকটি চত্বর বানিয়ে ওরা যব ও মটরের খামার প্রস্তুত করে, ঘরের সামনে পাথর সাজিয়ে মন্দির বানায়, ভেড়ার লোম দিয়ে পোশাক বোনে, ঝরনার থেকে জলের ধারা টেনে আনে খামারে,—ওদের জীবনের সীমানা ওরই মধ্যে আবদ্ধ। জরা, ব্যাধি, বিকার, মৃত্যু—ওদের সবই আছে, কিন্তু খোঁজ করে না কেউ। ওদেরই দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছিলুম অনেকদূর।

হিমাচল রাজ্যের উত্তরাংশ হল জম্মুর ক্রোড়ভূভাগ—যার এক দিকে লাহুল-স্পিতি, অন্যদিকে পাঞ্জাব। এই রাজ্যের উত্তরাংশের নাম চম্পাবতী, মধ্যাংশ মণ্ডি ও বিলাসপুর, দক্ষিণাংশের নাম বুশাহর, মাহাসু, সিরমুর ইত্যাদি। দক্ষিণ হিমাচলের বিশাল প্রাকারের ঠিক ওপারে উত্তর কুমায়ুনে জন্ম ঘটছে গঙ্গা ও যমুনার। প্রকৃতপক্ষে হিমাচল রাজ্যেরই আশেপাশে ভারতের বৃহত্তম ছয়টি নদ ও নদী

উৎসারিত হচ্ছে। যথা, মহাসিন্ধু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, যমুনা ও গঙ্গা। হিমাচলের হিমবাহের জল সমগ্র পাঞ্জাবকে সঞ্জীবিত করছে—সেই কারণে পাঞ্জাব ও হিমাচল—এ দুটি রাজ্য অঙ্গাঙ্গিযুক্ত।

উত্তর ও মধ্য হিমাচল যেমন চন্দ্রভাগা ও বিপাশার দেশ, তেমনি দক্ষিণ হিমাচল শতদ্রুর দ্বারা বিধৌত। শতদ্রু যতক্ষণ তিব্বতে, ততক্ষণ তার নাম 'ল্যাংছেন খাব-অব' কিন্তু তিব্বতী 'ল্যাংছেন' মন্দগতি, বালু পাথরের মধ্যে সে স্তিমিত। তার ঝিরি-ঝিরি প্রবাহের উপর দিয়ে ঝব্বু ও চমরীরা পারাপার করে অনায়াসে। কিন্তু ভারতের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই অগণিত সংখ্যক হিমবাহের কল্যাণে এই নদী শতধারার জল পেয়ে দ্রুতগতি লাভ করে। বোধহয় তার জন্তই এর নাম হয় শতদ্রু। এর জীবনের মধ্যে তখন জোয়ার আসে, প্রাণবেগে দপদপিয়ে ওঠে, প্রবল কলরোল তোলে আপন প্রবাহে,—এর সেই প্রবাহধারার উপর দুই ধার থেকে যেন সহস্র ফণায় নেমে আসতে থাকে সংখ্যাতীত ঝরনা ও জলপ্রপাত। বন্ধ শতদ্রু তখন উন্মত্তের মতো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়।

পূর্ব-পশ্চিমে শতদ্রুর তীরবর্তী যে-পথটি বিলাসপুর এবং সিমলা হয়ে বুশাহরের প্রাক্তন সামন্ত রাজ্যের দিকে চলে গেছে, সেই পথটির নাম 'হিন্দুস্তান-তিব্বত রোড।' এ পথ বহু প্রাচীন,—যেমন প্রাচীন মণ্ডি-কুলু-রোটাং-কেলঙের পথ। এই দুই প্রধান পথে ভারতের সঙ্গে তিব্বত ও সিন্‌কিয়াংয়ের বাণিজ্য বিনিময় চলে এসেছে চিরদিন। বিলাসপুরের ৩ হাজার ফুট উঁচু উপত্যকা থেকে এই পথ উঠতে উঠতে চলে গিয়েছে ১৫ হাজার ফুট উঁচু শিপকি গিরিসঙ্কট পার হয়ে তিব্বতের মালভূমিতে। এই পথ ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি নিভৃত জগতে। তখনকার কালের গতি ছিল মন্থর, জীবন ছিল নিরঙ্কুশ, প্রাণসমস্তা ছিল সরল।

একদা শৈল শহর সিমলাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫টি সামন্ত রাজ্যকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছিল। তাদের কেউ ছিল ছোট, কেউ বড়। সবগুলি মিলিয়ে নাম ছিল 'সিমলা হিল্ স্টেটস্।' ইংরেজ চলে যাবার পর আরেকবার এগুলিকে অদল-বদল করে নাম দেওয়া হল 'পেপসু।' অর্থাৎ 'পাতিয়ালা এণ্ড ইষ্টার্ন পাঞ্জাব স্টেটস্ ইউনিয়ন।' কিন্তু এটিরও পরিবর্তন ঘটল বোধ করি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতটির প্রভাবে। কেননা 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির মধ্যে 'হিমাচল' শব্দটির উল্লেখ আছে। হিমাচল রাজ্যে হিমাচলের সর্বপ্রকার প্রাকৃত রূপ ও পটপরিবর্তন বর্তমান। যেমন চিরতুষারমণ্ডিত শীর্ষলোক—যার হিমবাহগুলি প্রসিদ্ধ; শত সহস্র ঝরনা ও জলপ্রপাত, আদিম অরণ্যের অন্ধলোক, অতল গিরিখাদের ভীষণ রূপ, জন্তু-জানোয়ার এবং বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুলের অবাধ ক্ষেত্র, ভয়াল অজগর ও বিভিন্ন

প্রকার সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী, অদ্ভুত চেহারার কীট-পতঙ্গ দলের চলাফেরা এবং সর্বশেষে ঔষধি অরণ্যের লতাপাতা শিকড় ও শিলাজতুর সমাবেশ। হিমাচল রাজ্যে সেই আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান আজও ঢোকেনি—যার সাহায্যে মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়। যে লতাপাতা ও শিকড়কে বিষাক্ত বলে অনুমান করি, তাদের রস বা নির্যাসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অমৃতে পরিণত করা যায় কিনা, এ পরীক্ষা আজও হয়নি। সাপের বিষ থেকে সাপে কামড়ানোর ওষুধ প্রস্তুত করা সহজ,—এটি কলকাতায় এসে জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস্ জীন্স ডাঃ রাম ভট্টাচার্যের গবেষণাগারে দেখে গিয়েছিলেন।

বুশাহর রাজ্যের ভিন্ন নাম 'কানাওয়ার' বা কিন্নর দেশ। কিন্তু এর প্রধান জনপদ পার্বত্য 'রামপুর' হওয়ার জন্য এই সীমান্ত রাজ্যটিকে অনেকে বলত, রামপুর-বুশাহর। শিমলা ও শিপকি সঙ্কটের মাঝামাঝি দুস্তর ও দুঃসাধ্য পার্বত্যলোকে এই ক্ষুদ্র রামপুর ছিল মধ্যযুগীয় বিকিকিনির হাট। মোটরের চাকা সেই যুগে এপথে ঘোরবার সাহস পায়নি। গাছের গুঁড়ির সাঁকো দিয়ে পার হতে হত দড়ি ধরে। ভেড়া, ছাগল, পাহাড়ী ঘোড়া, নয়ত ঝব্বু,—এরা বয়ে আনত নুন আর লোম এবং অন্যান্য সামগ্রী। ১৯ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে লর্ড ডালহাউসি এসে বুশাহর ও তিব্বতের মাঝখানে সীমারেখা পরীক্ষা করেছিলেন।

শতদ্রুর দুই পারে অবিচ্ছিন্ন পর্বতমালার তলায়-তলায় পথ চলে গিয়েছে কিন্নরভূমিতে। সিমলা থেকে মাত্র নারকান্দা পর্যন্ত মোটর পথ ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। এখন নূতন যুগ। এখন গাড়ি চলছে, বুশাহরের শেষ প্রান্ত অবধি—যেখানে চীনা শাসকবর্গের অন্তঃসারশূন্য হুমকি শুনে রাঙা চোখ মেলে ভারতীয় জওয়ানরা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়ে। কালের পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষুদ্র নারকান্দা থেকে থানাদার হয়ে অতঃপর রামপুর। বিরাট পাহাড়ের নীচে এ এক অপরিচিত অরণ্যলোক—যেখানে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার স্পর্শমাত্র এসেছে এই সেদিন। রামপুর একটি ছোটখাটো শহর। সবাই জানে, রামপুর বহুকাল অবধি শৌখীন 'রামপুরি' চাদরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই চাদরের টানা-পোড়েনে থাকত অতি মিহি পশমিনার সঙ্গে জরির সুতোর কাজ। দাম ছিল তৎকালীন ১০। ১২ টাকা। বাঙ্গালী সমাজে এই রামপুরি চাদর অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। পার্বত্য রামপুরের শোভা অতি মনোরম। বছরে তিনবার এখানে মেলা বসে। একবার গ্রীষ্মে, একবার হেমন্তে, তৃতীয়বার শীতে। এর মধ্যে হেমন্তের 'লোই' মেলাটি সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক। তখন আকাশ হয় নীলোজ্জ্বল, নদী বা নদ অতি খরবাহী, রক্তিম আপেলে আর আনারে লাল হয়ে ওঠে রামপুর। এই মেলায় শ্বেত-রক্তিমবর্ণ

কিন্নর ও কিন্নরীরা নাচের আসর বসায় প্রাণের উদ্দীপনায়।

একটি সুন্দর নাচের কথা বলি। এটির নাম 'ফুলেচ নৃত্য।' কিন্তু 'ফুলেচ' হল কিন্নরের একটি মেলার নাম। এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য, পরলোকগত আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের স্মৃতির উদ্দেশে ফুল উৎসর্গ করা। কিন্তু শোকাচ্ছন্ন গাম্ভীর্যের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। এই বৃহৎ অনুষ্ঠান জীবনের সমারোহে সম্ভোগের আনন্দে উদ্দীপ্ত উল্লাসে এবং প্রাণের উদ্দীপনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রাচুর্য সেখানে মৃত্যুকে স্বীকার করে না। সেখানে বসে অবারিত ভোজনের আসর, সেখানে পশুবলিদানের পর মাংস·বিতরণ করা হয়, এবং মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পুষ্পমাল্যগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় নরনারী নির্বিশেষের মধ্যে—কে কার গলায় পরিয়ে সোহাগ জানাবে। এর পরেও আছে এ মেলার স্বাভাবিক পরিণতি। মৃত্যু যখন সামাজিক·বিধিনিষেধ এবং নৈতিক বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটায়, তখন এই সামান্য আয়ুষ্কালের মধ্যে জীবনের পাত্র রসের মাধুরীতে ভরিয়ে নেওয়ার অন্যায় কোথায়? তখন কিন্নর-কিন্নরীদের পানপাত্রগুলি দেশীয় মদিরার উত্তপ্ত ফেনায় ভরে ওঠে, এবং সেই পান-ভোজন ৩।৪ দিন অবধি যখন চলতে থাকে তখন কে কার সঙ্গে আলু-থালু হয়ে নাচল এবং কোন্ কিন্নর কার শিথিল তনুলতায় ধরা দিল—তার হিসাব-নিকাশ নিয়ে কেউ অন্ধকার রাত্রে খোঁজ করে দেখবে, এমন শারীরিক অবস্থাও কারও থাকে না। এ ধরনের অনুষ্ঠান কিন্নর দেশের বাইরে ভারতের অন্য কোথাও নেই।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের এমন একটি অবাধ মিলনক্ষেত্র সহসা অপর কোথাও চোখে পড়ে না। একই মন্দিরে উভয়ের পূজা, একই মেলায় একত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং একই ভোজনের আসরে উভয়ের সমাবেশ—এ দৃশ্য সুলভ নয়। ব্রাহ্মণের কাজ লামারা সম্পন্ন করছে—এটি কিন্নরের বৈশিষ্ট্য। কালী, শক্তি ও তন্ত্র—এগুলির সাধনা কিন্নরের অপর একটি চরিত্র গুণ। ১৯ শতাব্দীর (১৮১৬) প্রথম দিক পর্যন্ত আদিম ব্যবস্থা অনুযায়ী 'কামরু' জনপদের অন্তর্গত ভীমকালীর মন্দিরে 'নরবলি' দেওয়া বিধি ছিল, কিন্তু তৎকালীন সামন্ত-রাজের উজীর বা মন্ত্রী মনসুখদাস এই বর্বর বিধির উচ্ছেদ সাধন করেন। তৎকালে সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় বর্বর বিধি 'সতীদাহ' প্রচলিত ছিল। যার ফলে মহারাজা রণজিৎ সিংহের মোট ৬টি বিধবা স্ত্রী আগুনে পুড়ে মরতে বাধ্য হন। এই 'কামরু' জনপদে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা এই জনপদ রাজা বাণাসুরের অন্তর্গত ছিল। সেইকালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অপর এক পৌত্র প্রদ্যুম্ন রাজা বাণাসুরের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করতে চান। বাণাসুর এ প্রস্তাবে রাজি হন না। গোয়ালার বংশে যাবে ব্রাহ্মণ কন্যা!—অসম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে বাণাসুরকে বধ করে প্রদ্যুম্ন এই

কামরুপে তাঁর রাজ্যপাট বসান। কিন্তু বাণাসুরের সেই কন্যা শ্রীমতী উষাকে বিবাহ করেন শ্রীকৃষ্ণের অপর এক পৌত্র গুণধর শ্রীমান অনিরুদ্ধ। শ্রীমতী উষার নামেই উখা বা উখীমঠ। এটি গাড়োয়ালের অন্তর্গত।

কিন্নরের 'ছোট কৈলাস' ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। এ যেন ক্রমে ক্রমে চারিদিকে বৃহতের দ্বার খুলে দিচ্ছে। 'ওয়াংটু' জনপদ রইল পিছনে,—পৃথিবীর সকল বার্তা ওয়াংটু পর্যন্তই শেষ। তারপরেই যেন স্বর্গদ্বার—হিমালয়ের মহাতোরণ। সেই তোরণে এসে দাঁড়ালে নিসর্গশোভার অতীত এক মহিমা চোখে পড়ে। সে যেন সুন্দরের স্বপ্নজাল দিয়ে ঘেরা আকাশ-পৃথিবী জোড়া এক মায়াচ্ছন্ন লোক,—যেন সৃষ্টির আদি কল্পে এসে পৌঁছেছি। সেই বিরাটের ব্যাদানের মধ্যে এমনভাবে মিলিয়ে গেছি, যেখানে আপন সত্তার উপলব্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সম্মুখের উত্তুঙ্গ শ্বেতশৃঙ্গের নাম 'পরী পাহাড়' বা 'অপ্সরাপর্বত'। এখানে চন্দ্রহাস রাত্রি যখন নামে, তখন তারই হিমেল জ্যোৎস্না বায়ুশীর্ণতার মধ্যে একটি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। মনে হয় শুভ্রবর্ণা ছায়াচারিণীরা শূন্যলোকে নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছে। এরই অদূরে ছোট কৈলাস। সামনে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উদ্দাম শতদ্রু,—উন্মত্ত ভৈরব যেন প্রলয়-নাচনে আত্মহারা!

শোভা ও অরণ্য সৌন্দর্যের অমরাবতী হ'ল মাঝপথের একটি নিরিবিলি জনপদ 'সারাহান'। একালে পাঞ্জাব ও সিমলা থেকে বহুলোক এই অরণ্য সমাকীর্ণ পুষ্পালঙ্কারভূষিত 'সারাহানে' জ্যোৎস্না রাত্রি অতিবাহিত করতে আসে। এ যেন কাশ্মীরের সেই চন্দনওয়ারি, কিংবা নেপালের সেই মন্দারপুষ্পভরা পারিজাত কানন, যার নাম 'পোখরা'।

সারাহানেও সেই বৃহৎ ভীমকালীর মন্দির—যেখানকার উপাস্য দেবী হলেন চণ্ডিকা। এখানে প্রতি একশ' বছরে একটি রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়,—সেটির নাম 'উদযাপন' যজ্ঞ। এই বৃহৎ যজ্ঞ ছয়মাস ধরে চলে এবং ছয়শ' ছাগল বলি দেওয়া হয়। কিন্নর দেবতা 'শৃঙ্গার মহেশ্বরের' সম্মুখে ১১ দিন ধরে হোমাগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকে। এই যজ্ঞে লামারাও অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের যজ্ঞ ছাড়াও বাৎসরিক পাল-পার্বণ উপলক্ষে কিন্নরবাসীরা দেবমূর্তিগুলি বাইরে আনে—সেগুলি পিতলের। যেমন দেখেছি কুলুর দশহরা উৎসবে। বসন্ত পঞ্চমী, দোল, বৈশাখের প্রথম দিন, শাওনের প্রথম বর্ষণ, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী,—এই সকল পার্বণে নাচতে আসে গৃহস্থ নরনারী মদিরাপানে বিহ্বল হয়ে, ভোজনের আসর বসায় ইত্যাদি। যস্মিন দেশে যদাচারঃ।

সারাহানের মনোরম জনপদটি পর্যটকমাত্রেরই স্মরণ-যোগ্য।

বুশাহর অঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চল—যেটি গহন গভীর হিমালয়ের নিভৃত লোক, সেটিরই নাম কিন্নর। কিন্তু বুশাহরের বাকি অংশ রামপুর ও রোহরু তহশিলের মিলিত নাম হ'ল 'কচি'। কিন্নর হ'ল প্রাক্তন 'চিনি' তহশিলের অন্তর্গত। কিছুকাল আগে 'চিনি'-র নাম বদলিয়ে রাখা হয়েছে 'কল্পা।'

কেন বদলানো হয়েছে জানিনে। কিন্তু এটি অনেকেরই মনে আছে, কয়েক বছর আগে একদল সশস্ত্র চীনা শিপকি সঙ্কটের ভিতর দিয়ে কিন্নর দেশে ঢুকে পড়ে। তাদের ধারণা, এটি তিব্বত ভূভাগেরই কোনও একটা অংশ। তারা নাকি ভুল করে ঢুকে পড়েছিল! সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় একশ'। ভারতীয় চৌকির লোকেরা তাদের সেই 'ভুল' অবশ্য সেবারের মতো ভেঙে দিয়েছিল। অতঃপর চীনারা পাছে দ্বিতীয়বার ভুল করে, এবং 'চিনি' নামটির মধ্যে পাছে চৈনিক দাবি আবিষ্কার করে, হয়ত এজন্যই এখন 'চিনির' নাম হয়েছে 'কল্পা।' চিন বা চিনি শব্দটির তাৎপর্য হল পাথর বা পাথরী, যার মধ্যে রস কস নেই! 'আকসাইচিন' মানে পাথরের দেশ। কিন্তু 'ক' শুনলেই যেমন কৃষ্ণকে মনে পড়ে, তেমনি 'চিন' শব্দটি শোনামাত্র চীনা শাসকবর্গ লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা এই, খাদ্যবস্তুর মধ্যে চিনি, মসলার মধ্যে দালচিনি, নদীর মধ্যে কালচিনি, বন্দরের মধ্যে কোচিন, বন্ধুদের মধ্যে শচীন, ভোজ্যের মধ্যে চিনাবাদাম,—এগুলি তাঁদের সম্প্রসারবাদের মধ্যে পড়ে কিনা!

বুশাহরের এই দুই অংশের মাঝখানে যে-বৃহৎ উপত্যকায় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার নাম 'বাস্পা' উপত্যকা। এখানে দেখা যায় শতদ্রুর সহোদর 'পাবর' নদ। অপর কয়েকটি নদীও বয়ে চলেছে পাহাড়তলীর এপাশে ওপাশে। তাদের নাম স্পিতি, নগলি, বাস্পা ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলি অবশেষে একে একে ঝাঁপ দিয়েছে শতদ্রুর রাক্ষসগ্রাসে।

হিমালয়ের গগনচুম্বী দেওয়াল যেখানে উঠেছে ২১ হাজার ফুটের উপর, তারই ঠিক নীচে চিনি বা কল্পা জনপদ। এখানেও এই ক্ষুদ্র জনপদ দ্বিধাবিভক্ত। দক্ষিণ কল্পা হল হিন্দু, উত্তর কল্পা বৌদ্ধ। কিন্তু এই উভয় কল্পা মিলেছে একই অধ্যাত্ম ভাবনায়। যাঁর নাম দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁরই নাম 'রিমপোচে।' অপার করুণায় বুদ্ধ যেখানে নিমীলিত নেত্র, সেখানে বিশ্বের পরম কল্যাণ কামনায় দেবাদিদেব শিবনেত্র! লাদাখে দেখেছি বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের শারীরজন্ম স্বীকার করে না! শিবের মতো তিনিও অশরীরী দেবতা!

কল্পা জনপদের সর্বোচ্চ তুঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালে তিব্বতী কৈলাসের চূড়াটি দেখা যায়। কল্পা থেকে প্রাচীন পথটি কিন্নর অতিক্রম করে তিব্বতের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র গার্তক্

হয়ে মানস সরোবরের দিকে দক্ষিণে চ'লে গেছে। এ পথ দুস্তর, বিপজ্জনক ও হিমবাহ সমাকীর্ণ। কিন্তু ভারতীয় তীর্থযাত্রীর পথ দুঃসাধ্য হয়নি কোনও যুগে। পূর্ব বুশাহর অগণিত সংখ্যক অত্যুচ্চ হিমবাহের জন্ম প্রসিদ্ধ। অপরাহ্নের দিকে এই সকল হিমবাহ থেকে ব্যাঘ্র বিক্রমে জলরাশি নেমে আসে শতদ্রুর দিকে। কিন্তু সেই সব বিভীষিকা ভয়ত্রস্ত করেনি তীর্থযাত্রীদেরকে। তারা নির্ভয়ে একে একে শিপকি, রানিসো, শিমদাং, খিমোকুল প্রভৃতি বিভিন্ন গিরিসঙ্কট পেরিয়ে হিমালয়ের ওপারে তিব্বতে গিয়ে পৌছত। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে চীনা শাসকবর্গের রাজনীতিক ইতরতা, কূটনীতিক নোংরা চাতুরী এবং স্পর্ধিত আচরণের ফলে তিব্বত-ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে।

উত্তর দিকে তুষারাবৃত চূড়াদল, নীচের দিকে আদিম অরণ্যলোক, মাঝে মাঝে দেওদার বনের ছায়া নিরিবিলি ছোট ছোট উপত্যকা,—সব মিলিয়ে যেন মর্তলোকের বহির্দ্বার। হিমাচল রাজ্য ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যেন মহাকাব্যের পাতা উলটিয়ে চলেছি। চারিদিকের অটল গাম্ভীর্য, নীল বনরাজি, উদার উদাত্ত এক কালজয়ী মহিমা,—যেন সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে বীজমন্ত্র পাঠ করছে মহাতপস্বীর মতো। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ কীটাণুকীটের দিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। আমি যাচ্ছিনে, আমাকে টেনে নিচ্ছে। আমাকে ডাকছে ভীমকায় শিলাতল, জলপ্রপাতের রহস্যরন্ধ্র, অরণ্যের বায়ুশিহরণ, প্রজাপতি-পতঙ্গের প্রলাপগুঞ্জন,—এরা আমাকে কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। উন্মত্ত শতদ্রুর আত্মহারা বিঘূর্ণন, 'নারকান্দা-খাত্রালা-বাগ্‌গির' সেই রক্তমুখী আপেলের বন, 'রোহরু' জনপদের তলায়-তলায় 'পাবরের' দুরন্ত গতি, 'পাজী ও জজীর' সেই মায়াকাননের নিভৃত বনলোক—এদের কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে থেকে-থেকে আমার মন ফুঁপিয়ে উঠছিল। আমি মিলিয়েছিলুম হিমাচলের প্রতি ধূলিকণার মধ্যে, এবং শতদ্রুর শিকর-বিচ্ছুরণে। প্রতি বৃক্ষ-গুল্মলতার শিকড়ে-শিকড়ে—যেন আমারই রক্তরসের নির্যাস ভিতরে ভিতরে সঞ্চালিত। আমি বাসা বেঁধেছিলুম হিমাচলের রঙীন পাখির ডানায় আর পতঙ্গ দলের পাখায়, দেওদার বনের জঠরে আর অন্ধকার ভীমকালীর সুচিত্রিত গুহাগর্ভে। আমার উৎসুক প্রাণ-কীট আপন ক্ষুধার তাড়নায় তিল-তিল ক'রে লেহন করেছে চম্পাবতী আর খাজিয়ার, কালাটোপ আর লাক্কেরা, মণিমহেশ আর শিরমুর। আমি ছুটে বেড়িয়েছি নাহান থেকে ধওলাকুয়াঁ, ভগানি থেকে রেণুকার সেই সুবৃহৎ সরোবর। কে যেন বলেছিল কানে কানে, ক্ষত্রিয়নাশা পরশুরামের জননী দেবী রেণুকার দেহগঠনের আকার ও আয়তনে এই হ্রদের

উৎপত্তি। রেণুকা থেকে রেবলসায়র—লোমশঋষির বাসভূমি। ছোট ছোট সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট এই রেবলসায়র একদা ছিল বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মসম্ভবের আশ্রমস্থল। উত্তরকালে এই রেবলসায়রে শিখ সম্প্রদায়ের ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং একটি আশ্রম স্থাপন ক'রে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। লোমশঋষি এবং গুরুগোবিন্দ সিংয়ের নামে এখানে বছরে দুটি মেলা বসে। মহর্ষি বেদব্যাসের পিতা পরাশর মুনি হিমাচলে যেখানে তাঁর তপস্যাশ্রম স্থাপন করেন সেখানে আজও সেই প্রাচীন সরোবরটি বনচ্ছায়ার অন্তরালে দূর পর্বতের কোলে অবস্থিত। মণ্ডি থেকে পরাশর প্রায় ২২ মাইল পায়ে হাঁটা পার্বত্যপথ।

'তপ্তপাণির' গন্ধক-ঝরনা ছেড়ে যোগিন্দরনগরের হাইড্রো-ইলেকট্রিকের বিরাট নির্মাণ-প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলুম 'বল্‌থ' উপত্যকার ভিতর দিয়ে। দিগন্তজোড়া পার্বত্য হিমাচল,—নীচে সুশ্যাম সমতল, চারিদিকে সুবিস্তৃত প্রান্তর। অনেক বলে হিমাচল রাজ্যটি ভিন্ন নামে দ্বিতীয় কাশ্মীর! শোভায়, সৌন্দর্যে, আরণ্যক প্রকৃতিতে, আর্যহিন্দু ও বৌদ্ধসংস্কৃতিতে কাশ্মীর যেমন ঐশ্বর্যশালী, হিমাচল রাজ্য তেমনি তার বন্যরূপ, অরণ্যশোভা, পাখিডাকা উপত্যকা এবং ভারতীয় স্থাপত্যে পরিপূর্ণ। উভয়ের খাদ্য, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতা —অনেকটা সমগোত্রীয়। উত্তর হিমালয়ের চারটি প্রদেশ—হিমাচল, কাশ্মীর, লাদাখ ও জম্মু—এরা এক সূত্রে এবং একই মনেপ্রাণে বাঁধা। এদের জাতি সমাজ সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়—কেবল নামের বৈচিত্র্য বহন করে মাত্র। এরা একই কাননের বিভিন্ন পুষ্পলতা।

সুন্দরনগরের ভিতর দিয়ে মহামায়ার মন্দির আর শুকদেবের আশ্রমের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। আমি আমার এককালের পুরনো পথ ধ'রে দেখে যাচ্ছিলুম বিপাশার তীরবর্তী মণ্ডি শহরের সেই সুপ্রাচীন ভূতনাথ আর ত্রিলোকনাথ আর শ্যামাকালীর মন্দির। আজ মণ্ডির চেহারা ফিরে গেছে পাঞ্জাবের অর্থনীতির কল্যাণে। শহর ব্যাপক হয়েছে, বাজার হয়েছে বৃহৎ, মানুষের সেই মধ্যযুগীয় দারিদ্র্য ঘুচেছে, জীবনের সেই বিপুল অপচয় আর দেখা যাচ্ছে না। পাহাড় কেটে পথ হচ্ছে, নদীর উপরে নতুন সাঁকো, উপত্যকার ধারে ধারে নতুন নগর, পার্বত্য এলাকার আশেপাশে ফলন, এবং সর্বোপরি যানবাহনের সুব্যবস্থা,—হিমাচলে যেন নবকালের সাড়া জেগেছে। জীবন-নদীতে এসেছে নতুন জোয়ার। যেখানে য কিছু স্তিমিত, সেখানেই প্রাণের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতের বিপুল কর্ম-সমুদ্রের তরঙ্গ কাশ্মীরের মতো হিমাচলেও প্রবেশ করেছে।

আরণ্য হিমাচলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এ রাজ্য পশুপক্ষী সরীসৃপের অবাধ বিচরণ-

কেন্দ্র। এখানকার বর্ণাঢ্য ব্যাঘ্র বাঙলার সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের মতোই রাজকীয়। উপত্যকার নিভৃত লোকে সুন্দর দেহগঠনযুক্ত চিতা, শৃঙ্গশাখা-প্রশাখাযুক্ত উৎকর্ণ হরিণ এবং বন্য ছাগ, কস্তুরী মৃগ ও পার্বত্য ভল্লুক,—এগুলির প্রাচুর্য চোখে পড়ে। রাজবোড়া, গোখরো, ময়াল, শঙ্খচূড়, কালনাগ—প্রভৃতি বিভিন্ন বিষধর সর্পের আবাসস্থল। বিভিন্ন বর্ণের অপরিচিত পাখি উপত্যকায় ও অরণ্যে উড়ে বেড়ায়—যাদের নাম জানে না আমার মতো অনেকে। কিন্তু দুঃখের কথা এই, সমগ্র ভারতে যখন বন্য পশু ও পক্ষীকে রক্ষা করার জন্য নানা দিকে একটি আন্দোলন চলছে, তখন বিদেশী পর্যটককে ভারতে আমন্ত্রণ করে আনা হয় পশুপক্ষী শিকারের লোভ দেখিয়ে। ভারত গভর্নমেন্টের প্রায় প্রত্যেকটি প্রচার-পুস্তকে বিদেশী পর্যটকদের নিকট এই জীবহত্যার প্ররোচনা থাকে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আরণ্য ভারতের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের বিনাশ সাধন করার সুযোগ-সুবিধা দান—এটি অসঙ্গত। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে পশু-পক্ষী-সরীসৃপাদি এক বিশিষ্ট সম্পদ এবং তার বৈচিত্র্যের পরিচয়। বিদেশী মুদ্রার জন্য সেই পরিচয়ের অবলোপ ঘটানো বেদনাদায়ক।

প্রাক্তন সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে যেমন বুশাহর, মণ্ডি ও চম্পা, তেমনি অপর একটি প্রধান রাজ্য ছিল পার্বত্য ও অনধিগম্য বিলাসপুর। কিন্তু একালের মোটরপথে বিলাসপুরে পৌঁছানো এখন সহজ, কেননা এদিকে রেলপথের যোগাযোগ নেই। আগে ছিল ঘোড়া কিংবা পায়ে হাঁটা। বিলাসপুর হল শতদ্রুর কোলে। আধুনিক বিলাসপুর তার নবনির্মাণের কল্যাণে নানা ভাবে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বিলাসপুরের একদা নাম ছিল 'কোটকাহ্‌লুর'। এটি মধ্যযুগে রাজা কহলচাঁদের দেওয়া নাম। পরে ১৭শ শতাব্দীতে রাজা দীপচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন বিয়াসপুর বা ব্যাসপুর,—কারণ এখানে ব্যাসের একটি আশ্রম ছিল। সেই বিয়াসপুর থেকে বিলাসপুর। এই সুবৃহৎ নূতন নগরী এখন শতদ্রুর দুই পারে প্রসারিত। এরই আশেপাশে ছিল ছোট ছোট সামন্ত নরপতি,—অনেকটা পার্বত্য ভূস্বামীর মতো। যেমন মনগাল, সুকেত, মণ্ডি, হোসিয়ারপুর, নালাগড়, বাঘাল প্রভৃতি। কথিত আছে, বিলাসপুরের রাজগোষ্ঠীর প্রথম উৎপত্তি ঘটে মহাভারতের শিশুপাল থেকে —যিনি দক্ষিণ রাজস্থানের নিকট 'চান্দেরীতে' রাজত্ব করতেন। 'চান্দেরী' থেকে 'চান্দেল্লা' গোষ্ঠী—যাঁরা ১১শ শতাব্দীতে বিন্ধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে 'খাজুরাহো' নির্মাণ করেছিলেন। এই চাঁদরাজগোষ্ঠীর গেয়ানচাঁদ একদা পাঠানযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। অদূরবর্তী কিরাতপুরে আজও তাঁর সমাধি বর্তমান।

কৌতুকের বিষয় ছিল এই, তাঁর হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের দুই স্ত্রী ছিলেন। গেয়ানচাঁদ তাঁর জীবিতকালেই তাঁর মুসলমান পুত্র সুলতানচাঁদকে রাজতক্তে বসিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অবধি (১৮৮৮) এই চাঁদবংশ বিলাসপুর শাসন করে।

শতদ্রুর তীরে দাঁড়িয়ে বিলাসপুরকে আরেকবার দেখছিলুম। বক্র শতদ্রু দূর দুর্গম হিমালয়ের রহস্যলোক ছেড়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে এসে বিস্তারলাভ করেছে। চিরকালের দুরন্ত ও সর্বনাশা নদ বিলাসপুরের উপত্যকায় নেমে এবার পোষ মেনেছে। স্বচ্ছ সুনীল ও স্থির জল। এ জল একালে মানুষের হাতে বাঁধা পড়েছে। অদূরে ভাকরা দাম্—যেখানে নাঙ্গাল জনপদের নিকটবর্তী 'গোবিন্দ সাগরে' শতদ্রুর জল জমা হয়। সমতল থেকে এই সুবৃহৎ গোবিন্দ সাগর সাতশ ফুটেরও বেশি উঁচু। পুরাকালের সেই ক্ষুদ্র বিলাসপুর এযুগের গোবিন্দসাগরের তলায় কিন্তু হারিয়ে গেছে। ভাকরার ভিত্তির নীচে যে পরিমাণ মালমসলা ঢালা হয়েছে, তাতে নাকি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার মতো একটি ৮ ফুট চওড়া মোটর পথ নির্মাণ করা চলত। গোবিন্দসাগরের পরিধি ৬৬ বর্গমাইল এবং এর গহ্বর যদি শূন্য থাকতো তাহলে ১ লক্ষ কক্ষবিশিষ্ট একটি ৬ তলা প্রাসাদ সেই গহ্বরে লুকিয়ে থাকতে পারত। শুধু তাই নয়, এই "সাগরে" যে পরিমাণ শতদ্রুর জল মজুত করা হয়, সেই জল দিয়ে সমগ্র ভারতের পক্ষে এক বছরের মতো জলের প্রয়োজন মিটতে পারে। এই জলরাশিকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে মুক্তি দেবার কালে মোট ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেই বিপুল জলভাণ্ডারকে খাল কেটে নিয়ে গিয়ে সম্প্রতি প্রায় ১ কোটি একর পরিমাণ জমি চাষ করা চলছে। এ সকল সংবাদ অবিশ্বাস্য ছিল ইংরেজ আমলে। বলা বাহুল্য, ভাকরা দাম-এর জুড়ি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই, এবং ভারতবাসীর যোগ্যতায় আজও কিছু সন্দেহ আছে বলেই অভ্যাগতগণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর সংখ্যা সাধারণত বেশি দেখা যায়।

মধ্যাহ্ন রৌদ্রের ভিতর দিয়েই সিমলা শহরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যাবার আগে 'দেওমতী' মন্দিরের কথা ভুলিনি। পুরাকালে এক নারী তাঁর মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে পারেন নি, কারণ তাঁর গর্ভে ছিল সন্তান। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল এবং মানুষ হয়ে উঠল। এবার 'সতী দেওমতী' আপন হাতে চিতা বানিয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। তাঁরই নামে পাহাড়তলীতে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া রঙ্গনাথ শিব ও নয়নাদেবী দুর্গার মন্দির বিলাসপুরের নিকটবর্তী আনন্দপুর পর্বতচূড়ায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, নয়না নামে এক রাখাল বালক একদা পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে, তারই একটি গাভীর পালান থেকে দুধ ঝরে

পড়ছে একটি শ্বেতবর্ণ প্রস্তরমূর্তির উপর। নয়না কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে সেটি দশভূজা দুর্গার মূর্তি। সেটি ৮ম শতাব্দী। হোসিয়ারপুরের তৎকালীন সামন্তরাজ বীরচাঁদ সেই মূর্তিটি এনে এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেটির নাম দেন 'নয়না-দুর্গা।' আনন্দপুর গোবিন্দসাগরের চক্রবেড়ের মধ্যেই পড়ে। এই পার্বত্য অংশ নাঙ্গালের পথেই পাওয়া যায়। আনন্দপুরের সঙ্গে রাজর্ষি বশিষ্ঠ, বাল্মীকি এবং গুরু গোবিন্দের নাম বিজড়িত। গুরু গোবিন্দ এই স্থলে তাঁর শিষ্যগণকে প্রথম সামরিক দীক্ষায় দীক্ষিত করেন।

উত্তর হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। জাস্কার গিরিমালা ছেড়ে এলুম স্পিতি আর কিন্নর দেশে। সেটি উত্তর-পূর্ব তুষারশুভ্র গিরিলোক। এবার হিমালয়ের মূল মেরুদণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে নেমে আসছি শিউয়ালিক বা শিবলিঙ্গ পর্বতমালায়—পশ্চিম নেপালের প্রান্ত থেকে যে-পর্বতমালা কুমায়ুন, হিমাচল পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উপর দিয়ে পীর পাঞ্জালের তলায় মিলিয়ে গেছে। পাঞ্জাব হল শিউয়ালিক রেঞ্জের হৃৎকেন্দ্র।

মধ্যাহ্নকালের রৌদ্র প্রখর। হোক না কেন শরৎ, হেমন্ত বা শীত—বাতাস যদি পড়ে যায়, মেঘ যদি না ওঠে, তবে হিমালয়ের রৌদ্রের উত্তাপ অতি প্রবল। এভারেস্টের তুষারচূড়াপথও অতিশয় রৌদ্রতপ্ত হয়ে ওঠে এবং কপালে ঘাম ফোটে—যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। হিমালয়ের আকাশে ধূসর মেঘের সঞ্চার মানেই বাতাসের আবির্ভাব এবং আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন। অভিযানকারীরা ভয় পায় ধূসর মেঘে,—দুগ্ধশুভ্র মেঘে নয়। ধূসর মেঘ অতিদ্রুতগতি এবং তারা তুষারঝটিকা সঙ্গে আনে। তখন আকাশ পৃথিবী ও শূন্যলোক—সমস্তই মেঘসমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে এই ধূসর মেঘের করুণার উপর।

আজ আমার নীলোজ্জ্বল আকাশে ছিল শুভ্র মেঘদল। যতদূর দৃষ্টি চলে, হরিৎ-নীল পার্বত্য অরণ্যানী। নীচের দিকে গভীর গিরিখাদ। শতদ্রু আবার গেছে হারিয়ে। হাজার-হাজার মানব-কীট চারিদিকের পাহাড়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে,—কিন্তু এই দিগন্তজোড়া পার্বত্য পরিব্যাপ্তির মধ্যে তাদের অস্তিত্বের কোনও সাড়া নেই। সব যেন নিষ্কম্প, নিশ্চুপ,—এ যেন মহাস্থবির এক জটাধারীর জপের মালায় কল্প-গণনা চলছে বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে। আমিও যেন চোখ বুজে শুনছিলুম সেই জপের বীজমন্ত্র।

হিমাচলের এই বীজমন্ত্রপাঠ যাদের কানে গুঞ্জন তুলেছে একবার, সেই দুঃখ-জয়ীদের মন ঘরে থাকেনি। দূর দেবালয়ের ঘণ্টার মতো তারা দূরান্তরের ডাক শুনে ছিন্নবাধা পলাতকের মতোই বেরিয়ে পড়ে—যেদিকে দুর্যোগ, যেদিকে দুস্তর ও

অনধিগম্য, যেদিকে দুঃখ, সহিষ্ণুতা, মৃত্যুভয় এবং অনশন। কিন্তু আবার এরাই হল সেই দুষ্টশক্তি, সেই বাধাবিপত্তি, যারা পরিব্রজ্যা ও আনন্দের পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। অথচ এই ডাক যত সত্য হয়, ততই শক্তিদায়ক হয়ে ওঠে। এই ডাক তাদেরকে নিয়ে যায় অরণ্যে, গিরিখাদে, তুষারলোকে, দুরন্ত জলস্রোতে এবং বিশ্বব্যাপী নিঃসঙ্গতার মধ্যে। তাদের মন মিলিয়ে থাকে বিপাশায়, বিতস্তায়, চন্দ্রভাগায় আর শতদ্রুর পাথরে-পাথরে। আপন কস্তুরীর উগ্র গন্ধ কোথাও তাদেরকে স্থির থাকতে দেয় না। সেই আত্মতাড়নায় কেঁদে বেড়ায় মন। তারই বেদনা স্পর্শ করে দেওদারের শীর্ষে, চীড়বনের মর্মরে, ইরাবতীর উল্লোলে, আর অরণ্যপক্ষীর চূর্ণ কণ্ঠে।

আমি বিদায় নিচ্ছিলুম হিমাচলের কাছে। অশ্বক্ষুরাকৃতি বৃহৎ শৈলনগরী সিমলাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করলুম শিরমুর আর নাহান, মাহাসু আর মণ্ডি, লুরি আর রামপুর, সুন্দরনগর, রেবল ও রেণুকা। বিদায় নেবার কালে আমার আচমনী মন্ত্র রেখে যাব এখানকার বয়লুগঞ্জ থেকে মশোব্রায়, যক্ষপর্বতের চূড়া থেকে লোয়ার সিমলা ও আনানদেলে, প্রস্‌পেক্ট পাহাড় থেকে আরম্ভ করে কুফরি, নালদেরা, তারাদেবী আর পাতিয়ালার নিজস্ব জনপদ চাইল্‌ অবধি। সোলন, কসৌলি, ডগসাই, খিয়োগ,—এরা আমার বহুকালের পরিচিত। যাদের সঙ্গে একদা এখানে মিলিয়ে ছিলুম, যারা রাঙিয়ে ছিল মন, যারা এই হিমাচলের বনে-উপবনে আমার পায়ে একদা কাঁটা ফুটিয়েছিল, পাইন বনের তলায়-তলায় ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল্‌-এর আশেপাশে, যুজনদীর আনাচে-কানাচে যারা বুকের রক্ত ঝরিয়েছিল, যারা আমার কপালের ঘাম দেখে পরিহাস মুখর হয়ে উঠত,—আজ তারা কে কোথায় যেন সব হারিয়ে গেছে। সেই সিমলা আছে, অনেক বড় হয়েছে, বহু প্রাসাদ উঠেছে, বহু পথ কাটা হয়েছে,—কিন্তু আমার সেই সিমলা নেই। সে হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। আমি তারই উদ্দেশ্যে আমার আচমনীমন্ত্র রেখে যাই।

উত্তর হিমালয়ে এবারের মতো আমার বাসনা-বেদনা ছড়িয়ে থাক, গিরি-নির্ঝরের ধারায় থাক সেই চিরকালের স্বপ্নজাল। এবার যেন আবার শুনছি সেই দেবালয়ের ক্লান্ত ঘণ্টার ডাক মধ্য হিমালয়ের মহাভারতীয় পর্বতমালার জটিল রহস্য পথ থেকে। সুতরাং এবারের মতো হিমাচল রাজ্য থেকে বিদায় নিলুম।